পরমপুরুষ

শ্রীশ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী

সুধাংশুরঞ্জন ঘোষ

পূর্ণ প্রকাশন

৮এ, টেমার লেন ● কলিকাতা ৯

প্রকাশক ঃ
রথীন্দ্রনাথ বিশ্বাস
পূর্ণ প্রকাশন
৮এ, টেমার লেন
কলিকাতা-৭০০ ০০৯

প্রথম প্রকাশ ঃ
জ্যৈষ্ঠ,১৩৬৩

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ ঃ
চারু খান

মুদ্রাকর ঃ
বিশ্বনাথ ঘোষ
নিউ জয়গুরু প্রিন্টার্স
৩৩/ডি, মদন মিত্র লেন
কলিকাতা-৬

উৎসর্গ

যিনি ছিলেন লোকনাথচরণে সমর্পিতপ্রাণ, লোকনাথের অনুধ্যানে অনন্যমতি, দেশে বিদেশে লোকনাথের মাহাত্ম্য ও মহিমা প্রচারে সতত স্বতঃপ্রবৃত্ত, সেই মহাপ্রাণ, মহানুভব ডাঃ নিশিকান্ত বসু মহাশয়ের পুণ্যপূত স্মৃতির উদ্দেশে পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রন্থখানি উৎসর্গ করলাম।

নিবেদন

পৌরাণিক ও ঔপনিষদিক যুগের মুনি ঋষিদের উত্তরকালে পুণ্যভূমি ভারতের অধ্যাত্ম-আকাশে আজ পর্যন্ত যে সব সিদ্ধ সাধক ও যোগীপুরুষ আবির্ভূত হয়েছেন, তাঁদের মধ্যে শ্রীশ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী এক উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্করূপে আজও জ্যোতিষ্মান ও দেদীপ্যমান হয়ে আছেন এক অম্লান মহত্ত্বে। অন্যান্য শক্তিমান সাধকেরা সাধারণতঃ এক একটি যোগমার্গকে অবলম্বন করে কয়েকটি যোগসিদ্ধি বা বিভূতি লাভ করে তার প্রকাশ ঘটান। কিন্তু লোকনাথ ব্রহ্মচারী ছিলেন এমনই এক মহাসাধক মহাযোগী একাধারে যিনি জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তি এই তিনটি যোগেই সমানভাবে সিদ্ধ হয়ে মুখ্য ও গৌণসহ অষ্টাদশসিদ্ধি লাভ করেন, যিনি একই সঙ্গে ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মস্বরূপতা প্রাপ্ত হন এবং যাঁর যোগসিদ্ধিগুলি অলৌকিক লীলা বিভূতিরূপে তাঁর প্রকট ও অপ্রকট অবস্থায় সমানভাবে ঝরে পড়ে ভক্ত ও অভক্ত নির্বিশেষে অসংখ্য শরণাগতের জীবনে। একজন সাধক সাধনপথে কত কঠিন ও দীর্ঘকালব্যাপী কৃচ্ছ্রব্রত পালন করে ভারতীয় যোগ-সাধনার কত উচ্চভূমিতে উন্নীত করতে পারেন নিজেকে, কত বেশী পরিমাণ সিদ্ধিলাভ করে সেই সিদ্ধির দ্বারা কত বেশী সংখ্যক মানুষের ত্রিতাপজ্বালা দূর করতে পারেন, লোকনাথ ব্রহ্মচারী তার প্রমূর্ত ও জীবন্ত প্রতীক।

অধ্যাত্মজগতে প্রধানতঃ জীবকোটি ও ঈশ্বরকোটি এই দুই শ্রেণীর সিদ্ধ সাধক দেখা যায়। জীবকোটির সাধকেরা সাধনার দ্বারা ব্রহ্মলাভ ও ভগবৎদর্শনের পর আর কোন কর্ম করেন না। তাঁরা শুধু ব্রহ্মতত্ত্বে নিমগ্ন থেকে অবশিষ্ট জীবন যাপন করেন। কিন্তু যাঁরা ঈশ্বরকোটির সাধক, তাঁরা ব্রহ্মলাভের পরে শুধু ব্রহ্মতত্ত্বে নিমগ্ন না থেকে লোকশিক্ষা ও লোককল্যাণের জন্য এই জগতেই অবস্থান করে নিষ্কামভাবে কর্ম করে যান। লোকনাথ ব্রহ্মচারী ছিলেন সেই ঈশ্বরকোটির সাধক যিনি সাধনশেষে সুদুর্লভ যোগসিদ্ধি ও ব্রহ্মস্বরূপতা লাভের পর কল্যাণতম রূপে এই জগতে নেমে এসে তাঁর অর্জিত অধ্যাত্মসম্পদ অকাতরে বিতরণ করে যান অসংখ্য জীবের মধ্যে, যেন এক মহাপ্রাণ পাখি দীর্ঘক্ষণ আকাশ পরিক্রমা করার পর অনন্ত স্বর্গীয় সুষমা নিয়ে এসে তার গানের মধ্য দিয়ে সে সুষমা ছড়িয়ে দিয়েছে অজস্র জনপদের মাঝে।

লোকনাথের সাধনজীবনের বিশেষত্ব হলো এই যে, তিনি কোন দেব দেবীকে ইষ্টজ্ঞানে অবলম্বন করে তাঁর সাধকজীবন শুরু করেননি, শুধুমাত্র ব্রহ্মজ্ঞান লাভের জন্যই তিনি তাঁর যোগসাধনা ও অধ্যাত্মসাধনাকে পরিচালিত করেন। এই সাধনপথে সিদ্ধিলাভের পর ব্রহ্মের কয়েকটি প্রধান গুণ বা লক্ষণ যেমন সর্বজ্ঞতা, সর্বব্যাপিত্ব, সমদর্শিতা ও সর্বশক্তিমত্তা সম্যকভাবে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে তাঁর জীবনে। অনিমা, লঘিমা, ঈশিতা, বশিতা, কামবসায়িতা প্রভৃতি প্রধান প্রধান সিদ্ধির দ্বারা তিনি দূরের জিনিসকে প্রত্যক্ষ করা, কায়া ছেড়ে সূক্ষ্মদেহে যথা ইচ্ছা চলে যাওয়া, পরের মনের কথা বোঝা ও সে মনকে স্বমতে আনা, যে কোন জীব বা দেবতার রূপ পরিগ্রহ করা প্রভৃতি অলৌকিক ক্ষমতাগুলি লাভ করেন। তিনি ছিলেন গীতাবর্ণিত সেই শ্রেষ্ঠ যোগী যিনি যোগসিদ্ধির ফল স্বরূপ ভগবৎদর্শন লাভ করে ব্রহ্মভূত হন। তাঁর পবিত্র করুণাধারায় মানুষ,

পশু পাখি, কীটপতঙ্গ, সরীসৃপ এমনকি হিংস্র জন্তুরা পর্যন্ত সিক্ত ও কৃতার্থ হয়েছে।

ব্রহ্মচারী বাবা লোকনাথের দিব্যজীবনের যে দিকটি সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ও স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে সবচেয়ে সমুজ্জল তা হলো এই যে, তাঁর জীবদ্দশায় তাঁর স্থূলশরীরকে অবলম্বন করে যে সব অলৌকিক লীলা বিভূতি ঝরে পড়ত, তাঁর মহাপ্রয়াণের দীর্ঘকাল পর আজও তাঁর সূক্ষ্ম শরীরকে কেন্দ্র করে সেই সব লীলাবিভূতিই ঝরে পড়ছে অগণিত শরণাগতের জীবনের উপর। যোগশক্তিপ্রসূত অলৌকিক লীলাবিভূতির এই ক্রমপ্রসারিত অনন্তত্ব, অর্জিত অধ্যাত্মসম্পদের এমন অফুরন্ত ভাণ্ডার জীবন থেকে মহাজীবনে এমন সার্থক উত্তরণ আর কোন সিদ্ধ সাধকের মধ্যে দেখা যায় না। অন্য কোন সাধক জীবনের অনির্বাণ দীপশিখাটি চিরপ্রোজ্জ্বল থেকে এমন অনন্তকাল ধরে অসংখ্য জীবের তমোরাশিকে অপসারিত করে চলে না।

তবে শুধু দৈহিক বা বৈষয়িক কোন বিপদ হতে উদ্ধারের জন্য বাবা লোকনাথ ব্রহ্মচারীকে স্মরণ করলে চলবে না। যেদিন অসংখ্য মানুষ ধর্মের প্রকৃত সত্যের উপলব্ধি ও পরমার্থলাভের জন্য তাঁর শরণাপন্ন হয়ে আকুল প্রার্থনা জানাবে তাঁর চরণে, একমাত্র সেই দিনই লোকনাথের মাহাত্ম্য ও মহিমা এক উত্তুঙ্গ সমুন্নতি লাভ করে ব্যাপ্ত হয়ে পড়বে সারা বিশ্বে।

সুভাষিতম্

তদেজতি তন্নৈজতি তদ্দূরে তদ্বন্তিকে
তদন্তরস্য সর্বস্য তদু সর্বস্যাশ্য বাহ্যতঃ ॥

(৫ম শ্লোকঃ ঈশোপনিষদ)

অনুবাদ ঃ

তিনি এক জায়গায় অবস্থিত, তবু চলায়মান, আবার তিনি চলৎশক্তি রহিত। তিনি অতি দূরে, আবার অতি নিকটে। তিনি সমস্ত জগতের অন্তরে ও বাহিরে সর্বস্থানে পরিব্যাপ্ত। অর্থাৎ তিনি জ্ঞানীগণের পক্ষে অতি নিকটে এবং অজ্ঞানদের পক্ষে অতি দূরে।

যস্তু সর্বানি ভূতান্যাত্ম ন্যে বানুপশ্যতি।
সর্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুপ্সতে ॥

(ঈশোপনিষদ—৬)

অনুবাদ ঃ

যিনি সমুদয় বস্তু নিজ আত্মাতে পরিদর্শন করেন এবং সমুদয় বস্তুকে নিজ আত্মা বলে দর্শন করেন, তিনি কারো প্রতি দ্বৈতভাবাপন্ন হন না। অতএব কাউকে তিনি ঘৃণাও করতে পারেন না।

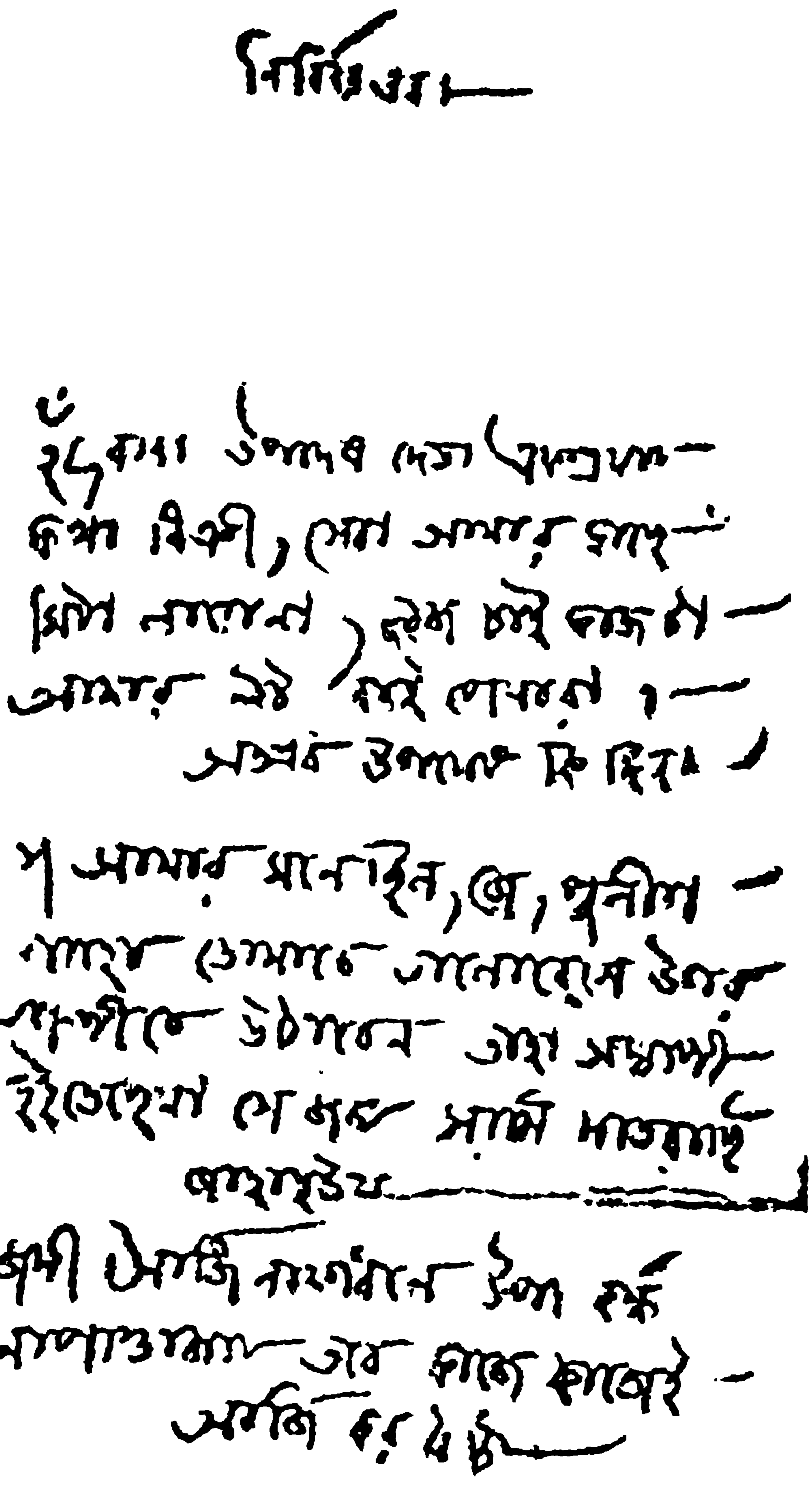

বাবা লোকনাথের স্বহস্তলিখিত পত্র

সে আজ প্রায় দুশো ষাট বছর আগের কথা।

চব্বিশ পরগণার বসিরহাটের অন্তর্গত কচুয়া গ্রামের বাসিন্দা রামকানাই ঘোষাল একটা কথা প্রায়ই বলতেন, যে প্রজ্ঞাবান ব্যক্তি বলেন, আমি বৈদিক সন্ন্যাস নিয়েছি, তিনি অতীত ষাটকুল ও আগামী ষাটকুল উদ্ধার করেন। তাই তাঁর বড় ইচ্ছা, তাঁর তিনটি পুত্রসন্তানের মধ্যে একটি সন্ন্যাসী হোক। কিন্তু স্ত্রী কমলাদেবী মনে দুঃখ পাবেন বলে সে কথা বাইরে প্রকাশ করেননি কারো কাছে।

ধর্মপ্রাণ নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ রামকানাই ছিলেন বড় সরল প্রকৃতির লোক, কিন্তু বিষয়বুদ্ধিতে বড় কাঁচা। সংসারে অভাব অনটন ও অস্বচ্ছলতা থাকলেও সেদিকে কোন ভ্রূক্ষেপ ছিল না তাঁর। দিনের বেশীর ভাগ সময় কেটে যেত তাঁর ইষ্টদেবের পুজা অর্চনায়। স্ত্রী কমলাদেবীরও কোন বিষয়-বুদ্ধি ছিল না। স্বামীর মত তিনিও ছিলেন ধর্মপ্রাণা। স্বামীর মত তাঁর অন্তরে ছিল গরীব দুঃখীদের প্রতি অসীম দয়া আর মায়ামমতা।

এইভাবে তিন ছেলে আর স্ত্রীকে নিয়ে দিন কাট্‌ছিল রামকানাই এর। সহসা একদিন রাত্রিতে ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন দেখলেন রামকানাই। দেখলেন, তুষারধবল দিব্যকান্তি এক জ্যোতির্ময় পুরুষ দাঁড়িয়ে আছেন তাঁর সামনে। তাঁর অঙ্গবিচ্ছুরিত জ্যোতিতে উদ্‌ভাসিত হয়ে উঠেছে অন্ধকার ঘরখানি। তাঁকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে ভক্তিভরে তাঁর পাদবন্দনা করতে শুরু করে দিলেন রামকানাই। তখন সেই দিব্যপুরুষ বললেন, আমি তোমার ভক্তিতে তুষ্ট হয়েছি। তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে। অবিলম্বে আমি তোমার পুত্র হয়ে জন্মাব।

এই কথা বলেই অন্তর্হিত হলেন সেই দিব্যপুরুষ। তাঁর একটি পুত্র সন্ন্যাসী হোক,—রামকানাইএর মনের এই গোপন বাসনার কথা জেনেই যেন তাঁকে অভয় দিয়ে গেলেন সেই অন্তর্যামী মহাপুরুষ।

ঘুম ভেঙে গেলেও মন থেকে গেল না সে স্বপ্নের আবেশ। এক অপার অপার্থিব আনন্দের আবেগে ভরে উঠল তাঁর সমস্ত মনপ্রাণ। কিন্তু সে স্বপ্নের কথাটা কাউকে বললেন না রামকানাই।

এ দিকে দিনকতকের মধ্যেই আর একটি আশ্চর্য ঘটনা ঘটল স্ত্রী কমলাদেবীর জীবনে। বাড়ির গৃহদেবতা শিবলিঙ্গের একটি বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত ছিল বাড়িতে। একদিন সন্ধ্যাবেলায় ঠাকুরঘরে শীতল বা সায়ংকালীন ভোগারতির জন্য পুজোর যোগাড় করছিলেন কমলা। এমন সময় আশ্চর্য হয়ে দেখলেন, তাঁর সামনে শিবলিঙ্গের গা থেকে এক দিব্যজ্যোতি বার হয়ে দুর্বারবেগে ছুটে এসে প্রবেশ করল তাঁর শরীরে। এই অদ্ভুত কাণ্ড দেখে ভয়ে জ্ঞান হারিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন কমলা।

কিছুক্ষণ পর জ্ঞান ফিরে এলে দেখলেন, স্বামীর কাছে শুয়ে আছেন তিনি। তারপর ধীরে ধীরে সব কথা বললেন স্বামীকে। রামকানাইও তখন সেই স্বপ্নের কথাটা খুলে বললেন স্ত্রীকে।

এই ঘটনার তিন চার মাস পর আবার সন্তানসম্ভবা হলেন কমলাদেবী। রামকানাই বুঝতে পারলেন, এবার মহাযোগী মহেশ্বর পুত্ররূপে ঘরে আসছেন তাঁর। একথা ভাবতেই রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল তাঁর সর্বাঙ্গ। এক পরমানন্দে বিভোর হয়ে উঠল তাঁর অন্তরাত্মা।

এর আগেও কয়েকবার গর্ভধারণ করেছেন কমলাদেবী। কিন্তু এবার গর্ভধারণের পর থেকে অনেকগুণে বেড়ে গেল তাঁর রূপ-লাবণ্য। এক দিব্য ভাবের দীপ্তি ফুটে উঠল তাঁর সর্বাঙ্গে। চোখ বন্ধ করলেই দিব্যদর্শন হয় অনেক সময়। হর্ষ, বিষাদ, শঙ্কা, উদ্বেগ প্রভৃতি ভাববিকার দেখা যায় মাঝে মাঝে।

একদিন ঘরের মাঝে শুয়ে থাকতে থাকতে দেবাদিদেব মহাদেবকে দর্শন করলেন কমলাদেবী। পরিধানে ব্যাঘ্রচর্ম, সর্বাঙ্গে বিভূতি, নাগভূষণ, ত্রিলোচন, জটাজুটমণ্ডিত মস্তক ; ধূম্র, পীত, শ্বেত, রক্ত ও অরুণ—এই পঞ্চবর্ণের পঞ্চমুখ। শিরে গঙ্গা, ললাটে অর্ধচন্দ্র। বৃষপৃষ্ঠে আরোহণ করে আছেন।

১১৩৭ সালের ফাল্গুন মাস একদিন শেষরাতের দিকে প্রসববেদনা উঠল কমলাদেবীর। আঁতুর ঘরে নিয়ে যাওয়া হলো তাঁকে। গ্রামের ধাত্রীকে

ডেকে আনা হলো প্রসব করানোর জন্য। শেষরাতে ব্রাহ্মমুহূর্তে দেবশিশুর মত অনিন্দ্যসুন্দর এক পুত্রসন্তান প্রসব করলেন কমলাদেবী।

ছেলে দেখে অবাক হয়ে গেলেন রামকানাই। দেখতে দেখতে এক দিব্যভাব জেগে উঠল তাঁর অন্তরে। ঠাকুর ঘরে গিয়ে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন শিবলিঙ্গের দিকে। যাঁর অংশসম্ভূত হয়ে জন্মগ্রহণ করেছে এই শিশু, সেই দেবাদিদেবকে স্মরণ করতে লাগলেন ভক্তি ভরে।

দিনে দিনে বেড়ে উঠতে লাগল শিশু। স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্যের ঢেউ খেলে যাচ্ছে যেন দেবতুল্য এই শিশুর দেহে। পাড়া পড়শীরা যে দেখে সেই মুগ্ধ হয়ে যায়। দেখতে দেখতে ছেলে ছ মাসে পা দিতেই রামকানাই একদিন চলে গেলেন পাশের গাঁয়ের বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণপণ্ডিত ভগবান গাঙ্গুলীর কাছে। ছেলের অন্নপ্রাশন আর নামকরণ নিয়ে কথা বললেন তাঁর সঙ্গে।

রামকানাই-এর অনুরোধে ভগবান গাঙ্গুলী এসে শিশুকে দর্শন করেই বললেন, যে লোকেশের কৃপায় এই ছেলেকে পাওয়া গেছে, তাঁরই নামে এই ছেলের নাম রাখছি লোকনাথ। নাম হচ্ছে নামীর রূপ ও গুণবাচক। নাম উচ্চারণে নামীর রূপ অনুভব ও গুণস্মরণ হয়ে থাকে এবং এইভাবে নামীর সত্তার উপলব্ধি হয়। কোন বস্তুকে মনোগ্রাহ্য করার জন্য যে সাঙ্কেতিক শব্দ প্রয়োগ করা হয় তাকেই বলা হয় নাম। ঈশ্বরই ভক্তের উপাসনাকালীন মনোগ্রাহ্য বস্তু। তাঁকে সর্বদা অনুভব করার জন্য যে সকল সাঙ্কেতিক শব্দ ব্যবহার করা হয় তাকেই ঈশ্বরের নাম বলা হয়। ঈশ্বরের এই নাম বেদমধ্যে ওঁকার, পুরাণমধ্যে শিব, নারায়ণ, হরি ইত্যাদিবাচক। ছেলের অন্নপ্রাশন উপলক্ষে গোটা গাঁয়ের লোককে নেমন্তন্ন করে খাওয়ালেন রামকানাই।

হাঁটতে শেখার সঙ্গে সঙ্গেই বাড়ির মধ্যে ছোটাছুটি আর খেলাধূলা করে বেড়াতে থাকে শিশু লোকনাথ। এইভাবে চার বছর কেটে যেতেই ছেলের বিদ্যারম্ভ অর্থাৎ হাতেখড়ির জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলেন রামকানাই। সর্বশাস্ত্রবিদ্ পণ্ডিত ভগবান গাঙ্গুলীর কাছে গিয়ে দিনক্ষণ দেখে দিতে বললেন। বললেন, ছেলের কিন্তু পড়াশুনোয় মতিগতি নেই।

যাই হোক, ছেলের হাতেখড়ির অনুষ্ঠান হয়ে গেল। বিদ্যারম্ভ হলো। কিন্তু সত্যিই পড়াশুনোয় কোন উৎসাহ দেখা গেল না লোকনাথের। দেখতে দেখতে মাসের পর মাস, বছরের পর বছর কেটে যেতে লাগল। কিন্তু ছেলের

লেখাপড়ায় মতিগতি হলো না। বরং তাতে অনিচ্ছা বেড়ে যেতে লাগল দিনে দিনে।

এজন্য চিন্তিত না হয়ে পারলেন না রামকানাই। ক্রমে ছেলের বয়স যখন নয় বছর তখন আর চুপ করে থাকতে পারলেন না। তিনি তখন পণ্ডিতমশাই ভগবান গাঙ্গুলীর কাছে গিয়ে বললেন, দুঃখের কথা কি বলব পণ্ডিতমশাই, ছেলের বয়স নয় বছর হলো, কিন্তু এখনো পর্যন্ত অক্ষরজ্ঞান হলো না। ওর মত বয়সে আমরা ব্যাকরণের কত সূত্র মুখস্থ করেছি।

জ্ঞানী ও ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টা ভগবান গাঙ্গুলী রামকানাইএর কথা শুনে হাসলেন। লোকনাথের ভবিষ্যতের কথা জানতে পেরে তিনে হেসে বললেন, রামকানাই, তোমার এই কনিষ্ঠ পুত্র দীর্ঘায়ু, মহাযোগী ও সর্বসিদ্ধিসম্পন্ন হবে। আজ যাকে তোমরা মূর্খ ভাবছ, সেই ছেলেই একদিন ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করবে। সে হবে মহাযোগী, সর্বশাস্ত্রে মহাপণ্ডিত। তাই আমার অনুরোধ, শিক্ষার বিষয়ে তোমরা অযথা পীড়ন করো না লোকনাথকে।

ওঁ

গাঁয়ের শেষে ছিল একটা শিবমন্দির। বিভিন্ন জায়গা থেকে প্রায়ই সাধুসন্ন্যাসীরা এসে ডেরা নিত সেখানে। সাধুসন্ন্যাসীদের প্রতি এক দুর্বার আকর্ষণ ছিল লোকনাথের। তাই তিনি প্রায়ই সেই শিবমন্দিরে গিয়ে সাধুসন্ন্যাসীদের কাছে বসে থাকতেন আর তাদের কথাবার্তা শুনতেন।

এইভাবে সাধুসন্ন্যাসীদের প্রতি আসক্তি ও ভক্তিভাব এসে গিয়ে ছিল বালক লোকনাথের। একদিন মা তাকে একটা নতুন কাপড় পরিয়ে দিলে লোকনাথ সেই কাপড়টা ছিঁড়ে খণ্ড কৌপীন করে পরলেন আর বাকি খণ্ডগুলো ছড়িয়ে দিলেন উঠোনময়। তারপর সেই খণ্ড কৌপীন পরে চোখ বুজে ধ্যান করতে বসলেন।

তা দেখে মা হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করলেন, তুই কার ধ্যান করছিস?

মার কথায় চোখ মেলে তাকিয়ে লোকনাথ বললেন, আমি সন্ন্যাসী হয়েছি, আমি শিবের ধ্যান করছি।

মা হাসতে হাসতে কথাটা বাবার কানে তুললেন। কথাটা শুনে মনে মনে হাসলেন রামকানাই। মুখে কিছু প্রকাশ না করলেও মনে মনে বললেন,

এই ছেলেই একদিন সন্ন্যাসী হয়ে তাঁর বহুদিনের মনস্কামনা পূর্ণ করবে।

একদিন সন্ধ্যার পর অন্যাদিনকার মত বাড়ি ফিরে এলেন না লোকনাথ। পরদিন খবর পাওয়া গেল গতরাত্রে শিবমন্দিরে সাধুদের কাছেই খাওয়া দাওয়া করে ঘুমিয়েছেন। সাধুদের নামগান শুনেছেন। সাধুসঙ্গে এত ঝোঁক দেখে সাধুরা তাঁকে আদরযত্ন করেছে।

সন্ন্যাসী দেখলেই মন যেন বিবাগী হয়ে যায় লোকনাথের। ঘর-বাড়ী, বাবা, মা, জগৎ জীবন সব কিছুর কথা ভুলে যান নিমেষে। সেবার চৈত্র-সংক্রান্তিতে চড়কপুজোর মেলায় কত সন্ন্যাসী এসেছে। অনেকে শিবের সাজ সেজেছে। তাদের মত লোকনাথও বাঘের ছাল পরে গায়ে ভষ্ম মেখে হাতে ত্রিশূল নিয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। এক দিব্য জ্যোতি ফুটে উঠল সেই বালক শিবের শুভ্র কান্তিতে। যে দেখে সে-ই মুগ্ধ হয়ে যায়।

এখানে সেখানে ঘুরতে ঘুরতে রাত হয়ে যায়। অন্ধকারে পথ হারিয়ে ফেলেন লোকনাথ। বাড়ি যেতে না পেরে একটা বটগাছের তলায় দাঁড়িয়ে কাঁদতে থাকেন। একমনে শিবের কথা ভাবতে ভাবতে বলতে লাগলেন, হে বাবা ভোলানাথ, আমি পথ হারিয়ে ফেলেছি, আমাকে পথ দেখিয়ে দাও।

এমন সময় সহসা কোথা থেকে এক জটাজুটধারী সাধু এসে দাঁড়ালেন সামনে। সাধুর শুভ্র কান্তি থেকে এক উজ্জ্বল আলোর ছটা বার হয়ে চারদিক আলোকিত করে তুলেছে। মাথার পিছনে ঠাকুর দেবতার মত এক গোলাকার দিব্য জ্যোতি বিরাজ করছে। পথ আলো করে নীরবে আগে আগে যেতে লাগলেন সাধু। লোকনাথও নীরবে অনুসরণ করে যেতে লাগলেন তাঁকে। বাড়ির কাছে আসতেই লোকনাথ দেখলেন, সহসা মিলিয়ে গেল সেই সাধুর মূর্তিটি।

একবার পাশের গাঁয়ে সপ্তাহব্যাপী নাচগান হবে শুনে সেখানে যাবার জন্য বায়না ধরলেন লোকনাথ।

মা তখন বললেন, অত দূরে গিয়ে কাজ নেই। ফিরতে অনেক রাত হবে। আসবি কি করে ? তোর কি কোন ভয়-ডর নেই ?

লোকনাথ বললেন, ভয় করবে কেন ? কোথাও রাত হয়ে গেলে তুমিই ত আলো হাতে লোক পাঠিয়ে দাও। সেই লোকই ত আমাকে বাড়ি পেঁছে দেয়। লোকটাকে দেখতে ঠিক শিবের মত।

কথাটা শুনে ভয় পেয়ে গেলেন মা। ভাবলেন, কোন ব্রহ্মদৈত্য নয় ত? বললেন, সাধুসন্ন্যাসীরা তোর মাথাটা বিগড়ে দিয়েছে।

সেবার জ্যৈষ্ঠ মাস শেষ হয়ে গেল। কিন্তু মেঘ বৃষ্টির কোন চিহ্ন নেই। সারা মাস ধরে চলছে দারুণ খরা। চাষীরা হাহাকার করছে। গ্রামবাসীরা ঠাকুর দেবতাকে কত ডাকছে। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা যজ্ঞ করছেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হচ্ছে না। আকাশে মেঘের লেশমাত্র দেখা দিচ্ছে না। রামকানাইও চিন্তিত আর পাঁচজনের মত। বালক লোকনাথ একদিন বাবাকে বললেন, আমাদের যে শিবলিঙ্গ আছেন তাঁকে মহাস্নান করালেই বৃষ্টি হবে। খরা যাবে।

কথাটা শুনে অবাক হয়ে ভাবতে লাগলেন রামকানাই। এদিকে লোকনাথ গাঁয়ের সবাইকে বলে এলেন। চল সবাই, আমাদের বাড়ির শিব-লিঙ্গের মাথায় জল ঢালি। তাহলেই বৃষ্টি হবে। কোন চিন্তা নেই।

সঙ্গে সঙ্গে গাঁয়ের নারী-পুরুষ সবাই জলপূর্ণ পাত্র নিয়ে হাজির হলো। বালক লোকনাথ সবার আগে 'নমঃ শিবায়' বলে জল ঢালতেই অন্য সকলে জল ঢালতে লাগল শিবলিঙ্গের মাথায়।

এইভাবে জলেশ্বর শিবকে মহাস্নান করাতেই সহসা ঘন কালো মেঘ দেখা দিল আকাশে। বৃষ্টি নামল মুষলধারে। চাষীদের ও গ্রামের সকলের সব ভাবনা দূর হয়ে গেল। তাদের পরিত্রাতা বালক লোকনাথের জয়জয়কার করছে গাঁয়ের সকলে।

একদিন খেলার সময় লোকনাথ ছেলেদের এক এক জনের হাত টেনে নিয়ে হাত দেখতে থাকেন। এক একটা হাত দেখে বলতে থাকেন, না, তোর ভাগ্যে সন্ন্যাসী হওয়া নেই। তোর কপাল খারাপ।

সন্ন্যাসী হওয়াটা কি করে মহাভাগ্যের কথা হবে, তা বুঝতে না পেরে ছেলেরা হাসাহাসি করতে থাকে। এমন সময় বেণীমাধব নামে একটি ছেলে আগ্রহের সঙ্গে হাতটা বাড়িয়ে দেয়। বলে, দেখ দেখি, আমার হাতটা, আমি সন্ন্যাসী হতে চাই।

লোকনাথ তার হাতটা ভাল করে দেখে বললেন, তোর সন্ন্যাসী হওয়ার যোগ রয়েছে। তোর শিবদর্শন হতে পারে।

বেণীমাধব বলল, তুই যেদিন ঘর ছেড়ে সন্ন্যাস নিয়ে বেরিয়ে যাবি,

আমি সেদিন তোর সঙ্গী হব। সেদিন যেন তাড়িয়ে দিস নে আমায়।

লোকনাথ বললেন, ঠিক আছে, তাই হবে।

আজকাল মাঝে মাঝে চোখ বুজে ধ্যান করতে বসেন লোকনাথ। একদিন তা দেখে মা জিজ্ঞাসা করলেন, অমন করে কি করছিস?

লোকনাথ বিরক্ত হয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন, আমার ধ্যানটা ভঙ্গ করে দিলে ত?

চোখ বুজে ধ্যান করলেই মাথায় জটা গজাবে।

ছেলের বয়স দশ পার হয়ে এগারয় পড়তেই কমলাদেবী একদিন রামকানাইকে ছেলের পৈতে দেবার কথা বললেন।

সঙ্গে সঙ্গে রামকানাই ছুটে গেলেন পণ্ডিতমশাইএর কাছে। আচার্য ভগবান গাঙ্গুলীও রাজী হয়ে গেলেন লোকনাথের উপনয়ন সংস্কার করতে।

উপনয়ন সংস্কার শেষ হতেই দণ্ডীঘরে গিয়ে দণ্ডীবেশী লোকনাথকে ভগবান গাঙ্গুলী বললেন, আর কালক্ষেপ করা উচিত হবে না লোকনাথ। চল, আমরা এখনি বেরিয়ে পড়ি।

লোকনাথ জিজ্ঞাসা করলেন, কোথায় যাব?

ভগবান গাঙ্গুলী বললেন, গৃহত্যাগ করে তপস্যা করতে হবে। তোমাকে সন্ন্যাস-আশ্রম গ্রহণ করতে হবে লোকনাথ।

এর পর রামকানাই ও কমলাদেবীকে ডেকে আচার্য গাঙ্গুলী মশাই বললেন, বাবা রামকানাই, মা কমলা, আমার উপর ঈশ্বরের যে আদেশ আছে, তা এবার পালন করতে হবে। আমাদের এবার বিদায় দাও। জগতের মঙ্গলের জন্য, ত্রিতাপজ্বালা জর্জরিত অসংখ্য মানুষকে মুক্তির পথ দেখানোর জন্য, তোমাদের বংশের মুখ উজ্জ্বল করবার জন্য সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করতে হবে লোকনাথকে।

রামকানাই সবই জানেন, সবই বোঝেন। তিনি নিজে মনে মনে প্রস্তুত হয়ে স্ত্রীকে বোঝাতে লাগলেন, আমিও জানি, তুমিও জান, এই ছেলে লোকনাথ যে মহতী ব্রত উদ্‌যাপনের জন্য আবির্ভূত হয়েছে, যে ব্রত উদ্‌যাপন আমাদের অন্য কোন পুত্রের পক্ষে সম্ভব নয়। ঈশ্বরের অমোঘ ইচ্ছাতেই ওর জন্ম হয়েছে। সুতরাং ওকে যেতে দাও। আচার্য গাঙ্গুলী মশাইএর ইচ্ছা ও আমার মনোবাসনা পূর্ণ হোক এতদিনে। দুঃখ করে

চোখের জল ফেলে ওর যাত্রাপথে বিঘ্ন সৃষ্টি করো না।

কমলাদেবীও বুঝলেন। নিজের মনকে শক্ত করে নিজেকে বোঝালেন, তাঁর ছেলে জগতের কল্যাণ সাধনের জন্য সন্ন্যাস গ্রহণ করবে—এ ত পরম সৌভাগ্যের কথা। এতে দুঃখের কি আছে! তাছাড়া তাঁর ছেলে ত সাধারণ ছেলে নয়। তিনি ভালভাবেই জানেন, তাঁর ছেলে মানবশিশু হলেও মহাযোগী দেবাদিদেব মহাদেবের অংশ থেকে তার জন্ম হয়েছে। দেবজ্যোতি-সম্ভূত এই বালক তাঁদের ঘরে মানবরূপে জন্মগ্রহণ করলেও দেবকার্য তাকে সাধন করতেই হবে।

উপনয়ন সংস্কার হয়েছে। কিন্তু শাস্ত্রাচার অনুসারে এখনো ভিক্ষা গ্রহণ হয়নি। গর্ভধারিণী মাকেই প্রথম ব্রতভিক্ষা দিতে হবে। তাই কমলাদেবী দণ্ডীঘরে প্রবেশ করতেই তাঁর সামনে এসে হাত পেতে 'ভবতী, ভিক্ষাং দেহী' বলে দাঁড়ালেন লোকনাথ। মা কমলাও স্নেহভরে তাঁর ছেলের ভিক্ষার ঝুলি ভরে দিলেন। শত দুঃখের মাঝেও প্রাণভরে আশীর্বাদ করলেন। এক অটল সংকল্পে দৃঢ় হয়ে নিশ্চলভাবে নীরবে দাঁড়িয়ে রইলেন রামকানাই।

আর বিলম্বের কিছু নেই। বিদায়ের কাল সমাগত। আচার্য ভগবান গাঙ্গুলী ও দণ্ডীসন্ন্যাসবেশী বালক লোকনাথ প্রস্তুত। এমন সময় লোকনাথের খেলার সাথী আবাল্য বন্ধু বেণীমাধব এসে হাজির। পরনে গৈরিক বসন, মুণ্ডিত মস্তক, কাঁধে ভিক্ষার ঝুলি।

বেণীমাধব এসেই ব্যস্তভাবে বলল, লোকনাথ, আমিও তোমাদের সঙ্গে যাব। আমিও সন্ন্যাসী হব।

আচার্য ভগবান গাঙ্গুলী তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার নাম কি? কেন সন্ন্যাসী হবে?

বেণীমাধব বলল, আমার নাম বেণীমাধব বন্দ্যোপাধ্যায়। লোকনাথ প্রায়ই সাধু সন্ন্যাসীদের কথা বলত। বলত, সন্ন্যাসী হলে নাকি শিবদর্শন হয়। সে আমার হাত দেখে বলেছিল, আমারও নাকি সন্ন্যাসী হবার যোগ আছে। সন্ন্যাসী হয়ে গৃহত্যাগ করার সময় সে আমায় সঙ্গে নেবে বলে কথা দিয়েছিল। আমার বয়স এগার। আজই আমার উপনয়ন সংস্কার হয়েছে। দণ্ডীঘরে আমার মা আমাকে ব্রতভিক্ষা দিতেই আমি লোকনাথের

কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম স্পষ্ট, বেণী, আমি তোকে কথা দিয়েছিলাম, যাবার সময় ডেকে নেব। আজ এখনি আমি বেরিয়ে পড়ছি। যাবি ত এখনি আমাদের বাড়ি চলে আয়। সন্ন্যাসী হতে চাস ত দেরী করিস নে। দেখবি, সন্ন্যাসী হবার কী মজা!

দুটি ঘটনার কি আশ্চর্য যোগাযোগ! কি অপূর্ব একমুখিনতা! মহাজ্ঞানী, সত্যদ্রষ্টা গুরু ভগবান গাঙ্গুলী তাঁর দুটি বালকশিষ্যের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে তন্ময় হয়ে ভাবতে লাগলেন, কত সরল ও পবিত্রচিত্ত এই দুটি বালক! কি প্রবল তাদের সন্ন্যাসব্রত গ্রহণের বাসনা! দেবদর্শনের জন্য কত ব্যাকুল তাদের অন্তর! মনে মনে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়ে বললেন, হে ঈশ্বর তোমাকে কোনদিন পাব কিনা জানি না, তবে তোমার কৃপা ও করুণাতেই এদের আমি শিষ্যরূপে পেয়েছি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তোমাকে আমি স্বতন্ত্রভাবে না পেলেও এদের মধ্য দিয়েই একদিন তোমাকে পাব। এদের মধ্যেই তোমার মহিমাকে প্রত্যক্ষ করব। এদের জন্যই সার্থক হয়ে উঠবে আমার জন্ম ও জীবন।

৩

চিরদিনের মত ঘর ছেড়ে একটি বারের জন্যও পিছন ফিরে না তাকিয়ে ক্রমাগত সামনের দিকে এগিয়ে চলতে লাগলেন তিন জনে। আচার্য ভগবান গাঙ্গুলী আর তাঁর দুই বালক ব্রহ্মচারী শিষ্য লোকনাথ ও বেণীমাধব। পথ চলতে চলতে বেলা পড়ে এল। সায়ংসন্ধ্যার আর বেশী দেরি নেই। রাত কাটাবার মত একটা আশ্রয় দরকার। অথচ চারদিকে শুধু শূন্য প্রান্তর। জনবসতির কোন চিহ্ন নেই কোথাও। আরও কিছুদূর যাওয়ার পর বনের ধারে একটা পর্ণকুটির দেখে তার দিকে এগিয়ে গেলেন আচার্য গাঙ্গুলী।

কুটিরের ভিতরে গিয়ে দেখেন কেউ নেই। বুঝলেন, কোন সাধু হয়ত এই কুটিরে বাস করেন। এখন কোথাও গেছেন। যাই হোক, সায়ংসন্ধ্যাদি কার্যের পর দুই শিষ্যকে নিয়ে বসে গায়ত্রীর অর্থ আলোচনা করতে লাগলেন আচার্য। এমন সময় কোথা থেকে এক বিরাট সাপ এসে ফণা বিস্তার করে উপস্থিত হলো তাদের সামনে। সাপটি কিন্তু কোন ক্ষতি

করল না তাঁদের। স্থির হয়ে একদৃষ্টে দুই বালক ব্রহ্মচারীর দিকে অনেকক্ষণ ধরে তাকিয়ে থাকার পর তিনবার প্রদক্ষিণ করল তাঁদের। তার পর আপনা থেকেই কুটির থেকে বেরিয়ে ঘন বনের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। সত্যদ্রষ্টা আচার্য বুঝলেন, এই নাগরাজ হয়ত সর্পদেহধারী কোন দিব্য পুরুষ। এই নাগরাজের আকস্মিক আবির্ভাব ও অন্তর্ধানের ঘটনায় তাঁদের সর্বদেহ রোমাঞ্চিত ও সমগ্র অন্তর আলোড়িত হয়ে উঠল।

পর পর বারদিন শিষ্যদের নিয়ে সেই কুটিরেই কাটিয়ে দিলেন আচার্য ভগবান গাঙ্গুলী। সাধারণতঃ বার বছর গুরুগৃহে থেকে ব্রহ্মচর্য শিক্ষা করাই হলো শাস্ত্রবিধি। তারপর গুরুগৃহ থেকে ব্রহ্মচর্যের গার্হস্থ্য জীবনে প্রবেশ করতে হয়। এই বারদিনে ব্রহ্মচর্য শিক্ষা শুরু হলো লোকনাথ আর বেণীমাধবের। বারদিন পর আচার্য তাঁদের ডেকে বললেন, তোমাদের ব্রহ্মচর্য শিক্ষার এই সূচনা হলো মাত্র। গার্হস্থ্য জীবনে তোমরা ত আর ফিরবে না। তাই বাকি জীবনটাই ব্রহ্মচর্য শিক্ষা করে যেতে হবে তোমাদের।

কিন্তু কি আশ্চর্যের কথা, এই বারদিনের প্রতিদিনই যখন গায়ত্রী মন্ত্র নিয়ে আলোচনায় বসেছেন তাঁরা, তখনই সেই নাগরাজ তাঁদের সামনে এসে উপস্থিত হয়েছে এবং কিছুক্ষণ স্থির হয়ে শোনার পর আপনা থেকেই বনের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেছে।

যেদিন ওঁরা কুটির ছেড়ে যাবার জন্য প্রস্তুত হলেন, সেইদিন কুটিরের অধিকারী সাধু এসে উপস্থিত হলেন। কথাপ্রসঙ্গে সেই সর্পরাজের কথা তাঁকে জানানো হলো। তা শুনে বিস্মিত হয়ে সাধু আচার্য ভগবানকে বললেন, আপনার এই দুই শিষ্য খুবই ভাগ্যবান। আমি ঐ নাগরাজের দর্শনের আশায় এখানে এই কুটির বেঁধে বার বছর ধরে বাস করছি। কিন্তু আজ পর্যন্ত তাঁর দর্শন আমার ভাগ্যে ঘটল না। আসলে ঐ নাগরাজ হচ্ছেন এক দিব্যজ্ঞানী মহাপুরুষ। স্বেচ্ছায় সর্পদেহ ধারণ করে সাধকদের কৃপা করবার জন্য বিচরণ করছেন। কোন সুকৃতির জোরে তাঁর দর্শন ও কৃপা লাভ আপনাদের ভাগ্যে ঘটল তা বুঝতে পারছি না।

এবার কুটির থেকে বিদায় নিয়ে গঙ্গার তীর ধরে ক্রমাগত এগিয়ে চললেন তাঁরা। অবশেষে একদিন মহাজাগ্রত শক্তিপীঠ কালীঘাটে এসে উপস্থিত

হলেন। সেকালে কালীঘাট ছিল ঘন জঙ্গলে ভরা। অদূরে মহাশ্মশান কালীগঙ্গার তটে নির্জন কালীমন্দির। জটাজুটধারী তান্ত্রিক সাধু সন্ন্যাসীরা এসে তন্ত্রসাধনা করতেন মন্দিরসংলগ্ন সেই মহাশ্মশানে। তান্ত্রিকেরা শব শেয়াল কুকুরের দ্বারা পরিবৃত হয়ে তন্ত্রসাধনা করতেন। বিশেষ করে অমাবস্যার দিন সারারাত ধরে তাঁদের সাধনা চলে। এই সব তান্ত্রিকেরা কখনো উন্মাদের মত, কখনো পিশাচের মত, আবার কখনো বা বালকের মত আচরণ করেন।

কিন্তু ঘন জঙ্গলঘেরা এই মহাশ্মশানে ভয়ংকর তান্ত্রিকদের উন্মাদ বা পিশাচসুলভ আচরণ দেখেও কোন ভয় পান না এগার বছরের বালক লোকনাথ ও বেণীমাধব। ভয়-ডর ত নেই-ই, উল্টে অনেক সময় তাদের উত্যক্ত করেন নানাভাবে। ছেলেদুটির উপদ্রবে অতিষ্ঠ হয়ে একসময় ভগবান গাঙ্গুলীর কাছে অভিযোগ জানালেন তান্ত্রিকেরা। আচার্য গাঙ্গুলী তাঁদের অভিযোগ শুনে বললেন, আমি এদের ঘরের মায়া ছাড়িয়ে বার করে এনেছি। আপনারা সন্ন্যাসী, ওরাও সন্ন্যাসী। আপনারা ইচ্ছামত ওদের গড়ে-পিটে তৈরি করে নিন।

একথা শুনে লোকনাথ ও বেণীমাধব আশ্চর্য হয়ে গেলেন। তাঁদের গুরুর অসীম স্নেহমমতা দেখে এক অদ্ভুত পরিবর্তন দেখা দিল তাঁদের মনে। তান্ত্রিকেরাও কোন কথা বলতে পারলেন না।

এরপর থেকে লোকনাথ ও বেণীমাধব দুজনেই সেই সব তান্ত্রিকদের সেবায় তৎপর হয়ে ওঠেন। তাঁদের সাধনরহস্য জানবার জন্য তাঁদের ধর্মালোচনা শুনতে থাকেন তন্ময় হয়ে। এক একদিন সারারাত তাঁদের কাছেই থাকেন। বাইরে থেকে কোন সাধুসন্ন্যাসীকে আসতে দেখলেই তাদের সেবা করতে থাকেন পরম ভক্ত ও অনুগতের মত। আচার্য গাঙ্গুলী তাঁদের এই ভাবান্তর দেখে খুশি হলেন মনে মনে। তিনি বুঝতে পারলেন, সাধুসন্ন্যাসীদের প্রতি যতই তাদের আসক্তি বাড়বে ততই বৈরাগ্যবাসনা নিবিড় ও দৃঢ় হবে তাদের মনে।

একদিন তাঁদের দুজনকে ডেকে আচার্য বললেন, আজই আমরা এখান থেকে বেরিয়ে পড়ব।

সঙ্গে সঙ্গে শিষ্য দুজনকে নিয়ে অরণ্যপথে অজানার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে

পড়লেন গুরু। পথের দুদিকে শুধু জল আর জঙ্গল। অবিরাম পথ চলে চলে ক্লান্ত ও ক্ষুধাতৃষ্ণায় কাতর হয়ে পড়লেন তাঁরা। খাদ্য ও পানীয় জল পাবার কোন সম্ভাবনা দেখতে না পেয়ে আকুল হয়ে ভাবতে লাগলেন গুরু। ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানাতে লাগলেন মনে মনে। এমন সময় কোথা থেকে এক সন্ন্যাসী এসে তাঁকে বললেন, এই দানা নাও, ক্ষুধা-তৃষ্ণা সব দূর হয়ে যাবে।

সেই দানা দিয়েই মুহূর্তে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেলেন সেই সন্ন্যাসী। এদিকে সত্যিই সেই দানা দু একটি মুখে দিতেই এক মুহূর্তে ক্ষুধাতৃষ্ণা পথক্লান্তি সব দূর হয়ে গেল। আবার নতুন উদ্যমে পথ চলতে লাগলেন। গুরু তখন শিষ্যদের বললেন, শোন বাবারা, শুধু দেহের ক্ষুধাতৃষ্ণা মিটে গেলেই হবে না। ব্যাকুলভাবে খুঁজতে হবে ঈশ্বরকে। তার জন্য সাধনা করে যেতে হবে। মাটি খুঁড়ে হোক, পাহাড় ফাটিয়ে হোক, সাগর ছিঁচে হোক সেই দুর্লভ ধনকে খুঁজে বার করতেই হবে। তোমাদের স্বরূপকে চিনতে হবে। আত্মাকে না চিনলে পরমাত্মাকে কখনই চিনতে পারবে না।

ঘুরতে ঘুরতে অবশেষে এক আশ্রমে এসে উঠলেন আচার্য গুরুদেব। তিনি স্থির করলেন, এবার যোগসাধনা শেখাতে হবে তাঁর শিষ্যদের। যোগসাধনার মধ্য দিয়েই এগিয়ে যেতে হবে তাঁর শিষ্যদের। যোগসাধনায় জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ, কর্মযোগ প্রভৃতি নানা প্রকারভেদ আছে। তার যে কোন একটিকে অবলম্বন করেই সাধনা করতে হবে।

তিনি আরও বুঝলেন, তিনি নিজে দার্শনিক পণ্ডিত হিসাবে জ্ঞান মার্গের সাধক। কিন্তু এই জ্ঞানমার্গ তাঁর এই দুটি বালকশিষ্যের সাধনার সঠিক পথ নয়। নীরস জ্ঞানযোগের সাধনায় বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের জ্ঞান হয়। জটিল দার্শনিক যুক্তিতর্কের মাধ্যমে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রতিপন্ন হয় বটে, কিন্তু প্রেমভক্তি ছাড়া ঈশ্বরদর্শন, ঈশ্বরের সাযুজ্য, সামীপ্য বা সালোক্য লাভ করা যায় না। তাই তিনি তাঁর শিষ্যদের প্রেমভক্তিসমৃদ্ধ কর্মমার্গে চালনা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন।

লোকনাথ এই সময় বললেন, গুরুদেব, আমি নিরক্ষর মূর্খ। কর্মমার্গে সাধনা করার আগে বিদ্যাশিক্ষার ব্যবস্থা করলে ভাল হয়।

গুরুদেব বললেন, বাবা লোকনাথ, লেখাপড়া শেখার জন্য তোমাকে কষ্ট

করতে হবে না। আমি যে শিক্ষা তোমায় দেব, তার প্রভাবে তোমার হবে অনন্ত শাস্ত্রজ্ঞান। তাছাড়া আমার প্রতি তোমার যে অপরিসীম ভক্তি, শ্রদ্ধা আছে, তাতে বিনা অধ্যয়নেই আমার সমস্ত বিদ্যা সঞ্চারিত হবে তোমার মধ্যে।

গুরু ভগবান গাঙ্গুলী নিজে মহাজ্ঞানী দার্শনিক ও যোগী হয়েও সিদ্ধিলাভ করে জীবনকে ধন্য করতে পারেননি। কারণ প্রেম, ভক্তি ও ঈশ্বরদর্শনের তেমন ব্যাকুলতা ছিল না তাঁর। তাই তিনি বুঝলেন, শাস্ত্রজ্ঞান ও জ্ঞানযোগের সাধনায় সিদ্ধিলাভ করা লোকনাথের পক্ষে সম্ভব হতে পারে। কিন্তু ভক্তিবিহীন জ্ঞানযোগ বা কর্মযোগের অনুষ্ঠানকালে চিত্তবৈকল্য উপস্থিত হতে পারে। ভক্তিশূন্য যোগে যতক্ষণ সমাধি ততক্ষণই সাধক নিরাপদ থাকে। সমাধি শেষ হলে বা ধ্যানভঙ্গ হলে চিত্তে ইন্দ্রিয়কামনা বা কামাগ্নির উদ্ভব হতে পারে এবং তখন সাধকের পতন ঘটতে পারে। কিন্তু ভক্তিযুক্ত হয়ে যোগাদির অনুষ্ঠান করলে সাধক অবশ্যই মোক্ষলাভ করতে পারে।

কিন্তু ভক্তিযোগও সহজ ব্যাপার নয়। ভগবৎকৃপা, সাধকের অকৃত্রিম অনুরাগ আর শ্রদ্ধা ছাড়া ভক্তিলাভ হয় না। গুরুর উপদেশ লাভ করে অভ্যাসযোগ দ্বারা জ্ঞানে ও কর্মে সিদ্ধিলাভ হতে পারে বটে, কিন্তু নিজে শ্রদ্ধাবান বা অনুরাগী না হলে গুরুর উপদেশ লাভ করেও ভক্তিতে সিদ্ধিলাভ হয় না। সাধক শাস্ত্রজ্ঞ ও যোগাভ্যাসী হলেও যিনি শুধু যোগাদি কার্যেই রত, হৃদয়ে প্রেমভক্তি জাগাতে পারেননি, তিনি যোগী হলেও ভগবৎকৃপা লাভ করতে পারেন না। শঙ্করাচার্যের মত জ্ঞানযোগী মহাসাধক প্রথমে অদ্বৈতবাদ অবলম্বন করে তা প্রচার করলেও চূড়ান্ত সিদ্ধি লাভ করতে পারেননি। পরে দ্বৈতভাব আশ্রয় করেই প্রেমভক্তির দ্বারা তাঁর হৃদয় সরস হয়।

একমাত্র ভক্তির অভাবে জ্ঞানযোগের সাধনায় আচার্য ভগবানের সমস্ত পরিশ্রম ব্যর্থ হতে চলেছে। সে পরিশ্রমের কোন মূল্য পাননি। কিন্তু তিনি বুঝেছেন, লোকনাথের মধ্যে ভক্তির প্রবণতা আছে। ঈশ্বর দর্শনের ব্যাকুলতা আছে। সুতরাং ভক্তিযুক্ত হয়ে লোকনাথ বিশুদ্ধ কর্মযোগের সাধনা করলে তাতে সিদ্ধিলাভ করবেই।

একদিন আচার্য ভগবান তাঁর দুই শিষ্যকে বললেন, আজ আমি তোমাদের পাতঞ্জলের কর্মযোগ শিক্ষা দেব।

লোকনাথ তখন বললেন, পাতঞ্জলের কর্মযোগ কি?

গুরু বললেন, তপস্যা, ওঁকারাদিমন্ত্র জপ ও ঈশ্বরে সমস্ত কিছু অর্পণ করাকেই পাতঞ্জলের কর্মযোগ বলে। মনে রাখবে, তপস্যাবিহীন ব্যক্তির যোগসিদ্ধি হয় না। কর্মযোগ ঠিকমত সম্যক অনুষ্ঠিত হলে সমাধি উৎপাদন করে আর অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ এই পাঁচ-রকম ক্লেশকে শক্তিহীন করে। অবিদ্যাদি ক্লেশ হীনবল হলে অপরামৃষ্ট বা অসংমিশ্রিত বুদ্ধি ও পুরুষের ভেদজ্ঞান দৃঢ় হয়। তখন যোগজজ্ঞান উৎপন্ন হয়। তাতে সত্ত্ব, রজ, তম এই গুণত্রয়ের অধিকার বা কার্যকারী শক্তি বিনষ্ট হয় এবং মুক্তি জন্মাতে থাকে। এই অবিদ্যাদি ক্লেশের নাশকেই চিত্তশুদ্ধি বলা হয়। ক্লেশ কর্মযোগ দ্বারা বিনাশের যোগ্য হলেই জ্ঞানযোগদ্বারা তাদের সম্যক উচ্ছেদ করা যায়।

ঐ পাঁচরকম ক্লেশই সমস্ত অনর্থের মূল। এদের মধ্যে অবিদ্যাই প্রধান এবং স্বয়ং বিপর্যয়স্বরূপ আর বাকি চারটি স্বয়ং বিপর্যয়রূপ নয়। তারা অবিদ্যা থাকলেই থাকে এবং অবিদ্যা না থাকলে তারা থাকে না।

এবার লোকনাথ জিজ্ঞাসা করলেন, অবিদ্যা কি?

আচার্য ভগবান বললেন, অনিত্য বস্তুতে নিত্যজ্ঞান, অশুচিতে শুচি-জ্ঞান, দুঃখে সুখজ্ঞান আর অনাত্মায় আত্মজ্ঞানকে অবিদ্যা বা অজ্ঞান বলা হয়। পুরুষ চেতন ভোক্তা আর বুদ্ধি অচেতন ভোগ্য এই উভয়ের অভেদ জ্ঞানকে অস্মিতা ক্লেশ বলা হয়। বুদ্ধিই প্রকৃতি, পুরুষ ও প্রকৃতির মিলন-কেই জীবভাব বলা হয়। সুখ বা সুখের উপায়ে আসক্তি বা কামনাকে রাগ বলে। দুঃখ বা দুঃখের কারণে যে ক্রোধ হয় তাকে বলে দ্বেষ। পূর্ব পূর্ব জন্মের মরণদুঃখ অনুভব করে বিজ্ঞ বা অজ্ঞ লোকের যে মৃত্যুভয় হয় তাকেই বলা হয় অভিনিবেশ। এটা হলো জন্মান্তরের সংস্কার।

লোকনাথ আবার প্রশ্ন করলেন, সংস্কাররূপ ক্লেশগুলিকে কি উচ্ছেদ করা যায়?

আচার্য ভগবান তার উত্তরে বললেন, পঞ্চক্লেশের সুখদুঃখ ও মোহ-স্বরূপ স্থূল বৃত্তিগুলিকে সংসারীদের ভোগ করতে হয়। কর্মযোগে

তাদের ক্ষয় হয় ও তারা ত্যাগের যোগ্য হয়। কিন্তু যতদিন তারা একেবারে দূরীভূত না হয় সম্যক জ্ঞানরূপ ধ্যান করে যেতে হয়।

আচার্য আরও বলেন, কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ থেকেই পুণ্যকর্মাশয় বা ধর্ম এবং অপুণ্যেকর্মাশয় বা অধর্ম উৎপন্ন হয়। ঐ কর্মাশয়ের কতকগুলি দৃষ্টজন্মবেদনীয় অর্থাৎ যে জন্মে অনুষ্ঠিত হয় সেই জন্মেই তাদের পরিপাক বা ভোগ হয়। আবার কতকগুলি হলো অদৃষ্টজন্মবেদনীয় অর্থাৎ মৃত্যুর পর জন্মান্তরে ফল উৎপাদক করে। পঞ্চক্লেশ থাকলেই ধর্মাধর্মরূপ কর্মাশয়ের বিপাক হয়, ক্লেশরূপ মূলের উচ্ছেদ হলে আর তা হয় না।

আত্মজ্ঞান দ্বারা অবিদ্যার বিনাশ হলে কর্মাশয়ের নাশ অর্থাৎ কার্যবিমুক্তি হয়। তার ফলে হয় চিত্তবিমুক্তি। তখন পুরুষ গুণসমস্ত অতিক্রম করে বা সত্ব রজ তম এই তিন গুণের অতীত হয়ে আপন চৈতন্যরূপে নির্মলভাবে অবস্থান করে।

সেদিনকার মত এইখানেই গুরুর উপদেশ সমাপ্ত হলো। পরদিন আবার আলোচনা শুরু হলে লোকনাথ প্রশ্ন করলেন, আচ্ছা গুরুদেব, সাধন ছাড়া কি মোক্ষলাভের উপায় বিবেকখ্যাতি সিদ্ধ হয়ে থাকে ?

আচার্য বললেন, না বাবা, সাধন ছাড়া সিদ্ধি হয় না। এই সাধন মানে অষ্টাঙ্গ যোগের অনুষ্ঠান। যোগাঙ্গ আটটি—যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি।

প্রথমে অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা চিত্তবৃত্তির নিরোধ করতে হবে। অহিংসা, সত্য, অস্তেয় বা চুরি না করা, ব্রহ্মচর্য ও অপরিগ্রহ—এই পাঁচটিকে যম বলা হয়। আর যথার্থ বাক ও মনকে সত্য বলা হয়। তবে বাক্যের প্রয়োগ এমনভাবে করতে হবে, যাতে সমস্ত জীবের উপকার হয়, অনিষ্টের কারণ না হয়।

লোকনাথ এই সময় প্রশ্ন করলেন, অনিষ্টকর বলে সত্য কথা না বললে সত্যরক্ষা হবে কিকরে ?

গুরু বললেন, পরের অনিষ্টকারক সত্য কথা বললে পুণ্য হয় না। যদি পরের অনিষ্ট হয়, তাহলে তাতে সত্যরক্ষা বা পুণ্য হয় না। বরং পাপ হয়। যোগীর বাক্য অমোঘ হয়, কখনো অন্যথা হয় না। পুরাণে শাপ ও শাপদানের ব্যাপারে এটাই প্রমাণিত হয়। শাস্ত্রে বলে দাঁড়ি পাল্লার এক-

দিকে শত অশ্বমেধ যজ্ঞ আর একদিকে সত্যকে রেখে ওজন করলে সত্যের ভারই বেশী হয়। আবার অস্তেয় ব্রতসিদ্ধি হলে অর্থাৎ স্বপ্নেও পরদ্রব্যে অভিলাষ না হলে যোগীর সংকল্প মাত্রেই হাতের কাছে সমস্ত রত্ন উপস্থিত হয়।

একবার গুরু মীননাথ শিষ্য গোরক্ষনাথকে নিয়ে পরিভ্রমণে বার হয়েছেন। মীননাথের বিষয়াসক্তি ছিল। বহুমূল্য রত্নাদি ছিল তাঁর সঙ্গে। কিছুদূর চলার পর গোরক্ষনাথ বলল, প্রভু, আপনার ঐ রত্নের বোঝাটি আমায় দিন, আমি তা বহন করে নিয়ে যাব।

মীননাথ বোঝাটি গোরক্ষনাথের হাতে দিলে সঙ্গে সঙ্গে গোরক্ষনাথ তা বনের মধ্যে ফেলে দিলেন। মীননাথ তা দেখে রোষাবিষ্ট হয়ে তিরস্কার করতে থাকলে গোরক্ষনাথ বলল, এর জন্য আপনি বিচলিত হচ্ছেন কেন? এ সব রত্নের কী এমন মূল্য? প্রস্রাব করলেও তা থেকে এমন রত্ন পাওয়া যায়। এ কথার সত্যতা পরীক্ষা করার জন্য মীননাথ গোরক্ষনাথকে তা দেখাতে আদেশ করলেন। গোরক্ষনাথ তৎক্ষণাৎ প্রস্রাব করল আর সত্যিই সেই প্রস্রাব থেকে ভূরি ভূরি রত্নরাজি উৎপন্ন হলো। তা দেখে নিজের ভুল বুঝতে পেরে মীননাথ বললেন, বুঝলাম বিষয়বৈভব অনর্থের মূল। তার প্রকৃত কোন মূল্য নেই।

আচার্য বলেন, আবার অপরিগ্রহ বা বৈরাগ্যসিদ্ধি হলে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ জন্মের বিবরণ জানা যায়। প্রথমে সব জন্মবিষয়ে স্বরূপ জিজ্ঞাসা হয়। তারপর আপনা থেকেই জ্ঞানলাভ হয়।

এবার শোন নিয়মের কথা। নিয়ম পাঁচপ্রকার—শৌচ, সন্তোষ, তপস্যা, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বরপ্রণিধান। পবিত্র সলিলে বাহ্য শরীরকে ধৌত করার নাম শৌচ আর চিত্ত হতে রাগ দ্বেষ ইত্যাদিকে দূর করার নাম অন্তঃশৌচ। বিষয়ভোগ হতে ইন্দ্রিয়নিবৃত্তিই হলো সন্তোষ। সুখ দুঃখ, ক্ষুধা তৃষ্ণা, শীত গ্রীষ্মজনিত দ্বন্দ্ব সহ্য করাই হলো তপস্যা। মোক্ষ শাস্ত্র অধ্যয়ন ও ওঁকার জপকে বলা হয় স্বাধ্যায়। আর পরমেশ্বরে সমস্ত কর্ম অর্পণ করার নাম হলো ঈশ্বর প্রণিধান।

এবার লোকনাথ প্রাণায়ামের বিষয় জিজ্ঞাসা করলে অবশিষ্ট যোগাঙ্গ গুলি বুঝিয়ে দিলেন আচার্য। তিনি বললেন, সাধারণতঃ শ্বাস প্রশ্বাস

নিয়ন্ত্রণকেই প্রাণায়াম বলা হয়। এই প্রাণায়াম কার্যটি তিনটি অংশে বিভক্ত। প্রাণবায়ুকে বার করে সেখানেই স্থির রাখাকে রেচক বলে। বাইরের বায়ুকে ভিতরে প্রবেশ করানোকে বলে পূরক। আবার বাইরের সেই বায়ুকে ভিতরে স্থির রাখাকে বলা কুম্ভক। এইভাবে শরীরের দূষিত বায়ু বেরিয়ে গিয়ে পরিশুদ্ধ বায়ু অন্তরে প্রবেশ করে। এই জন্য প্রাণায়ামকে যোগের প্রধান অঙ্গ বলা হয়।

স্থিরভাবে অনেকক্ষণ থাকলে যাতে কষ্ট হয় না, তাকে আসন বলা হয়। এই আসন নানা প্রকার—পদ্মাসন, বীরাসন, ভদ্রাসন, গোমুখী আসন, স্বস্তিকাসন, দণ্ডাসন, পর্যঙ্কাসন ইত্যাদি। আসন সিদ্ধি হলে শীত গ্রীষ্মের কষ্ট হয় না।

শব্দদৃশ্যাদি বিষয় থেকে চিত্ত নিবৃত্ত হলে ইন্দ্রিয়গণও নিবৃত্ত হয়ে চিত্তের অনুকরণ করে—একেই বলে প্রত্যাহার। প্রত্যাহার সিদ্ধি হলে ইন্দ্রিয়জয় হয় এবং চিত্তের একাগ্রতা জন্মায়।

এর পর আচার্য বললেন, যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম ও প্রত্যাহার—এই পাঁচটি হলো যোগের বহিরঙ্গসাধন আর ধ্যান, ধারণা, সমাধি এগুলি হলো যোগের অন্তরঙ্গ সাধন। এগুলির কথা পরে বলব। এখন থেকে তোমাদের এই বহিরঙ্গ যোগ সাধন করতে হবে।

তবে মনে রাখবে কঠোর ব্রহ্মচর্যই সিদ্ধ জীবনের মূল ভিত্তি। ইন্দ্রিয়-জয় করে উপস্থসংযম করলে বীর্যলাভ হয়, অনিমাদি ঐশ্বর্য লাভের ক্ষমতা জন্মায়। ব্রহ্মচর্য ছাড়া যে তপস্যা, সে তপস্যা তপস্যাই নয়।

গুরু আরও বললেন, মহাভারতের একলব্য, উপমন্যু ও উতঙ্কের মত যাঁর মধ্যে গুরুতে ভক্তি নিষ্ঠা দেখা যায় তিনিই প্রকৃত ও উপযুক্ত শিষ্য। এই গুরুভক্তির অর্থ হলো গুরুতে পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ। প্রকৃত শিষ্যের কাছে গুরুই তার ব্রহ্মচর্য, গুরুই তার সাধনা তার মোক্ষ ও গুরুই তার জীবন। সে শিষ্য গুরুতত্ত্বসাগরে একেবারে ডুবে যায়।

আচার্য ভগবান এবার লোকনাথ ও বেণীমাধবকে নিয়ে দুর্গম অরণ্য পথে পথ চলতে লাগলেন। ঘুরতে ঘুরতে এক নির্জন পাহাড়ের গুপ্তমুখ দেখতে পেয়ে সেখানে আস্তানা পাতলেন। গুহার পাশেই ছিল এক গভীর

পার্বত্য খাদ। তার মধ্য দিয়ে বয়ে চলেছিল এক খরস্রোতা নদী। পরদিন সকালেই শিষ্যদের নিয়ে সেই নদীতে স্নান করে এসে আচার্য তাঁদের বললেন, আজ আমি তোমাদের ব্রহ্মচর্য ব্রত আচরণের অভ্যাস করাব।

সেদিন থেকেই লোকনাথ ও বেণীমাধবের কঠোর কৃচ্ছ্রব্রত শুরু হলো। একই সঙ্গে চলল একনিষ্ঠ সাধনা আর চরম আত্মত্যাগ। দুই শিষ্যকেই নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী করে তোলার জন্য আচার্য তাঁদের একে একে নক্তব্রত, একান্তরা, ত্রিরাত্র, পঞ্চাহ, নবরাত্র, দ্বাদশাহ ও মাসাহ ব্রত উদ্‌যাপন করতে লাগলেন। নক্তব্রতে ব্রহ্মচারীকে দিনের বেলায় উপোসী থেকে রাতে ব্রহ্মচর্যের উপযোগী খাদ্য গ্রহণ করতে হয়। একান্তরা ব্রতে অহোরাত্র উপোসী থেকে পরের দিন ব্রহ্মচারীকে খাদ্য গ্রহণ করতে হয়। ত্রিরাত্র ব্রতে তিন অহোরাত্র উপোসী থেকে পরের দিন খাদ্য গ্রহণ করতে হয়। পঞ্চাহ ব্রতে পাঁচদিন এবং নবরাত্র ব্রতে নয় অহোরাত্র উপবাসী থাকার পর খাদ্যগ্রহণ করতে হয়। দ্বাদশাহে দ্বাদশ দিন আর মাসাহ ব্রতে একমাস উপবাসী থেকে একমাস পর খাদ্য গ্রহণ করতে হয়।

দুই শিষ্যই ঐ সব ব্রত উদ্‌যাপন করতে লাগলেন। সব সময় খাওয়া দাওয়া, শোয়া-বসা প্রভৃতি শিষ্যদের কৃচ্ছ্রসাধনের সব কাজেতেই সজাগ দৃষ্টি রাখতেন আচার্য।

তপস্যা আর কৃচ্ছ্রসাধনের ফলে এক আশ্চর্য পরিবর্তন দেখা যায় লোকনাথের শরীরে। স্থির নিষ্পন্দ সারা শরীর থেকে এক উজ্জ্বল আভা বার হচ্ছে, প্রশস্ত ললাট, উন্নত নাসিকা, চোখদুটি উজ্জ্বল রক্তবর্ণ।

আচার্য ভগবান লোকনাথের এই তপোদীপ্ত শরীরের দিকে লক্ষ্য করে ভাবলেন, এই স্থিতিই পরমাগতি। লোকনাথের এই স্থির ভাবই লক্ষ্যে পেঁছিতে সহায়ক হবে তার।

একদিন লোকনাথ গুরুকে বললেন, গুরুদেব, এই দ্বিতীয়বার মাসাহ ব্রতের সময় একদিন আমার মানসনেত্রে আমার পূর্বজন্মের এক অদ্ভূত ছবি ভেসে উঠেছিল।

গুরু কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, বল, কি সে ছবি ?

লোকনাথ বললেন, তখন স্বপ্নের মত দেখতে পেলাম, বর্ধমান জেলার মধ্য দিয়ে দামোদর নদ কলকল শব্দে বয়ে চলেছে। ঐ নদের তীরে

বেড়ুগাঁ নামে এক গ্রাম। সেই গ্রামে এক বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারে আমি সীতানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় নামে বিচরণ করছি। আমি আমার ভাইদের মধ্যে ছোট। অবিবাহিত। আমার প্রকৃতি হচ্ছে, আমি কারো সঙ্গে মিশিনা। বেশী কথা বলি না। দশজনের সঙ্গে কোথাও যাই না। একা একা নির্জন ঘরে থাকতে ভালবাসি। এইভাবেই আমার জীবনের বেশীর ভাগ সময় কেটেছে।

আচার্য ভগবান তখন কাগজ ও দোয়াত কলম এনে সমস্ত বৃত্তান্ত আগাগোড়া লিখে নিলেন। তারপর বললেন, বাবা লোকনাথ, আগামী কাল আমরা এ স্থান ত্যাগ করে পরিভ্রমণে বার হব।

এইভাবে সাধনপথে অনেকখানি এগিয়ে লোকনাথ দেখতে পান যেন এক স্বচ্ছ আয়না ফুটে উঠেছে তাঁর চোখের সামনে। আর সেই আয়নার মধ্যে দেখতে পেলেন তাঁর অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ জন্মের স্বরূপ।

ওঁ

লোকনাথ ও বেণীমাধবকে নিয়ে এবার এক বন থেকে আর এক গভীরতর বনে প্রবেশ করলেন আচার্য ভগবান। ঘুরতে ঘুরতে সহসা একটি পরিত্যক্ত কুটির দেখতে পেয়ে সেখানেই আস্তানা পাতবেন ঠিক করলেন, সেই নির্জন নিস্তব্ধ বনের মধ্যে এই কুটিরেই কয়েকটা দিন কাটাবেন। রাত্রিতে সামান্য কিছু ফলমূল আহার করে শোয়ার ব্যবস্থা করতে লাগলেন।

লোকনাথ বললেন, গুরুদেব আপনি বেণীমাধবকে নিয়ে কুটিরের ভিতরে শয়ন করুন। আমি বাইরের এই বারান্দায় শুয়ে পড়ে আজকের রাতটা কাটিয়ে নিই।

গুরু তাতে সম্মত হলে লোকনাথ বারান্দাতেই একা শুয়ে পড়লেন। গভীর রাতে সহসা কোথা হতে একদল ডাকাত এসে উপস্থিত হলো সেই কুটিরের সামনে। লোকনাথ ঘুমিয়ে ছিলেন বলে ডাকাতরা তাঁকে দেখতে পায়নি। ডাকাতরা ডাকাতি করতে আসেনি। তারা জানত কুটিরটা পরিত্যক্ত। তাই তারা এসেছিল সেই কুটিরে তাদের লুটের সম্পত্তি ভাগ বাটোয়ারা করতে।

ডাকাতের দল ঘরের ভিতর ঢুকতে গিয়েই দেখতে পেল, গৈরিক বসন-ধারী এক সন্ন্যাসী শুয়ে আছে দরজার সামনে। তাদের মধ্যে একজন তখন চিৎকার করে বলল, এখানে আবার শুয়ে কে আছে? এই শালা ভাগ এখান থেকে।

কিন্তু সে কথার উত্তরে কোন সাড়াশব্দ পেল না ওরা। তখন লোক-নাথের খুব কাছে গিয়ে দেখল, পর্যঙ্কাসনে হাঁটুর উপর দুই বাহু প্রসারিত করে স্থির যোগাসনে শুয়ে আছেন এক তরুণ তপস্বী। তাঁর গা থেকে জ্যোতি বার হচ্ছে। তখন তারা ঠিক করল, এই ছোকরা সাধুকে ওরা কেটে ফেলবে।

কিন্তু ডাকাতদের সর্দার বলল, না, আমার কথা শোন। সাধুকে হত্যা করলে আমাদের ক্ষতি হবে।

অন্য ডাকাতরা বলল, ওকে ছেড়ে দিলেই বরং বিপদ হবে। কাকে গিয়ে খবর দিয়ে বসবে কে জানে।

এই বলে খোলা তরোয়াল নিয়ে এগিয়ে গেল তারা। কিন্তু পরক্ষণেই ওরা আশ্চর্য হয়ে গেল। মারতে গিয়ে কিছুতেই হাত তুলতে পারল না। ফলে নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইল বিমূঢ়ের মত।

এমন সময় কোথা থেকে হঠাৎ ছুটে এল দুটো বাঘ। তখন মাল পত্তর সব ফেলে রেখে পালিয়ে গেল ডাকাতরা। কিন্তু সর্দার পালাল না। সে উঠোনের এক পাশে দাঁড়িয়ে রইল। কিন্তু বাঘ দুটো তার দিকে না এসে আবার বনের মধ্যে চলে গেল।

এই সব ঘটনার কথা কিছুই জানতে পারলেন না যোগরত লোকনাথ। নিদ্রামগ্ন আচার্য ভগবান ও বেণীমাধবও কিছু জানতে পারলেন না। কিন্তু সকালে উঠে তিন জনেই দেখতে গেলেন, একটি লোক কুটিরের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। তাকে দেখে আশ্চর্য হয়ে গেলেন তাঁরা। সেই লোকটিই ছিল ডাকাতদের সর্দার। সে গতরাতের ঘটনার কথা সব বলল।

আর একদিন লোকনাথ আচার্যকে বললেন, গুরুদেব, আজ আমি সমস্ত রাত যোগাসনে বসে থাকব। আপনি ও বেণীমাধব আমার পাশে ঘুমোবেন।

আচার্য ভগবান আর বেণীমাধব পাশাপাশি শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন। আচার্যের একপাশে যোগাসনে খাড়া হয়ে ধ্যান করতে লাগলেন লোকনাথ।

বনের হিংস্র জন্তুদের গর্জন কিছুমাত্র প্রবেশ করল না তাঁর কানে।

ব্রাহ্মমুহূর্তে আচার্য ভগবান উঠে পড়ে বেণীমাধবকে ডেকে তুললেন। এমন সময় তাঁর চোখে পড়ল একটা প্রকাণ্ড বিষধর সাপ লোকনাথের গলা জড়িয়ে আছে। অথচ নিশ্চল নির্বিকার ভাবে সমানে ধ্যান করে চলেছেন লোকনাথ। ব্যাপারটা দেখে আশ্চর্য হয়ে গেলেন আচার্য। কোন কথা বলতে পারলেন না। কিছুক্ষণের মধ্যে সাপটা ধীরে ধীরে লোকনাথের গলা থেকে নেমে বনের মধ্যে চলে গেল।

এরপর একদিন সেই কুটির ছেড়ে যাত্রা শুরু করলেন আচার্য। এবার শিষ্যদের নিয়ে এক অচেনা জায়গায় এসে উঠলেন। সেখান থেকে একটু দূরে একটি নদী দেখিয়ে আচার্য লোকনাথকে বললেন, বাবা লোকনাথ, এ জায়গা কখনো দেখেছ কি ?

লোকনাথের এবার মনে পড়ল, মাসাহব্রতের সময় এই জায়গা, এই নদীই দেখেছিলেন তিনি এবং সেকথা গুরুকে তিনি বলেছিলেন। তিনি বললেন, গুরুদেব, আপনার কাছে যে নদের কথা বলেছিলাম, এ সেই দামোদর নদ বলেই মনে হচ্ছে।

এরপর তাঁরা তিনজনে বেড়ুগাঁর সন্ধানে এগিয়ে চলেছেন। কিছুদূর যেতেই বেড়ুগাঁ চিনতে পারলেন লোকনাথ। বেড়ুগাঁর অশীতিপর বৃদ্ধেরা সীতানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে চিনতেন বললেন। তাঁরা সীতানাথের কথা যতই বলতে লাগলেন লোকনাথের সব কথা মনে পড়তে লাগল। এই বেড়ুগাঁয়ে পূর্বজন্মে তিনি সীতানাথরূপে যা যা করেছিলেন সারা জীবনে তার সবই স্মরণ হলো তাঁর। এর থেকে বোঝা গেল, মাসাহব্রত উদ্‌যাপনকালে তিনি যে দৃশ্য দেখেছিলেন তা অলীক স্বপ্নমাত্র নয়। তা তাঁর পূর্বজন্মের উন্মোচিত স্মৃতির চকিত বিকাশ।

সেখান থেকে আবার শুরু হলো পথ চলা। পথ চলতে চলতে এক গহন অরণ্যে পেঁছিতেই এক আশ্রমের সন্ধান পেয়ে সেখানেই কিছু দিন কাটাবার সংকল্প করলেন আচার্য ভগবান। কতরকমের কীটপতঙ্গ ও হিংস্র জন্তু জানোয়ারে পরিপূর্ণ জনকোলাহলশূন্য সেই বনপ্রদেশে প্রতিকূল পরিবেশে শিষ্যরা যাতে তাঁদের মনঃসংযম অটুট রেখে সাধনা করতে পারেন, তার জন্য সদাসতর্ক ও সচেষ্ট রইলেন আচার্য।

একদিন লোকনাথ বললেন, গুরুদেব, এবার প্রণবরূপী শব্দব্রহ্মসাধন বিষয়ে কিছু বলুন।

তা শুনে আচার্য ভগবান বললেন, মহাভারতে যুধিষ্ঠির বলেছেন, মানুষ জন্মকালে শূদ্রজাতি থাকে, যখন উপনয়নাদি সংস্কার হয় তখন তাকে দ্বিজ বলা হয়। পরে তিনি যখন বেদপাঠ করেন তখন তাঁকে বিপ্র বলা হয়। তারপর ব্রহ্ম অর্থাৎ প্রণবকে জানলে ব্রাহ্মণ হন।

ব্রহ্ম ওঙ্কারবাচক এই ওঙ্কার ব্রহ্মের শব্দপ্রতীক। ব্রহ্মের ধ্যেয়মূর্তি। কেন উপনিষদে আছে, আত্মাকে ওঙ্কাররূপে ধ্যান করবে। সত্ত্বপ্রধান ও মায়াবচ্ছিন্ন হয়ে 'ওঙ্কারবাচ্য ব্রহ্মাই আমি' এইভাবে ধ্যান করতে হবে। ব্রহ্মসূত্রে আছে, ওঙ্কার সহায়ে ব্রহ্মধ্যান করলে ক্রমমুক্তি হয় এবং ব্রহ্মলোক প্রাপ্তিদ্বারা বিদেহমুক্তি লাভ করা যায়। মুণ্ডক উপনিষদে আছে ওঙ্কারই ধনু আর জীবাত্মা শর। ব্রহ্ম ঐ শরের লক্ষ্য। প্রমাদশূন্য অর্থাৎ মায়া-বিবর্জিত হয়ে ঐ লক্ষ্যভেদ করতে হবে। তারপর ব্রহ্মরূপ লক্ষ্যের সঙ্গে অভিন্ন হতে হবে।

ব্রহ্ম দুপ্রকার—পরব্রহ্ম ও নির্গুণ ব্রহ্ম আর অপরব্রহ্ম বা সগুণব্রহ্ম। ব্রহ্ম যখন নির্গুণ ও নিষ্ক্রিয় থাকেন, যখন তিনি প্রকৃতিতে আরোপিত না হন, তখন তাঁকে পরব্রহ্ম বা পরপ্রণব বলা যায়। আর ব্রহ্ম যখন প্রকৃতিতে উপহিত বা প্রকৃতিস্বরূপ হয়ে সৃষ্টি করতে থাকেন, তখন তাঁকে অপরব্রহ্ম বা শব্দব্রহ্ম বলা হয়। এই দুইয়ের সমষ্টিকে মহাপ্রণব বলা হয়।

আচার্য ভগবান শিষ্যদুজনকে আরও বললেন, শোন বাবারা, এতদিন তোমরা প্রাণায়ামের সময় প্রণবের অর্থ না জেনেই প্রণব জপ করেছ। কিন্তু প্রণবমন্ত্রের অর্থ না জেনে ও মন্ত্রচৈতন্য অবগত না হয়ে শতলক্ষ জপ করলেও সাধক মন্ত্রসিদ্ধ হয় না। অ-উ-ম এই তিন বর্ণ মিলিত হয়ে ওঁ মন্ত্র হয়। অ-কারের অর্থ জগৎপিতা বা জগতের পালনকর্তা, উ-কারের অর্থ জগতের সংহারকর্তা আর ম-কারের অর্থ জগতের সৃষ্টিকর্তা। এখানে আত্মশক্তিযুক্ত চৈতন্যময় ব্রহ্মই প্রণবের সংজ্ঞা। ওঙ্কার শব্দে পরব্রহ্ম ও অপরব্রহ্ম দুই-ই বোঝায়।

ওই প্রণব বা ওঙ্কারের সপ্ত অঙ্গ, চতুষ্পাদ, ত্রিস্থান আর পঞ্চদেবতা আছে। সপ্ত অঙ্গ হলো, অ-কার, উ-কার, ম-কার, নাদ, বিন্দু, কলা বা মূল

প্রকৃতি ও কলাতীত। চতুষ্পাদ হলো স্থূল, সূক্ষ্ম, বীজ ও সাক্ষী। ত্রিস্থান হলো, জাগ্রত-অবস্থা, স্বপ্নাবস্থা ও সুষুপ্তি-অবস্থা। আর পঞ্চ-দেবতা হলেন, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, ঈশ্বর ও মহেশ্বর। এই অর্থ মেনে যিনি ওঙ্কার উপাসনা করেন, তিনি এই উপাসনার দ্বারা যে ফল ইচ্ছা করেন, তাই লাভ করেন।

পরের দিন আবার আচার্য আলোচনায় বসতেই লোকনাথ বললেন, প্রণব সম্বন্ধে আলোচনাকালে আপনি ষটচক্রভেদের কথা বলেছিলেন। আজ এই ষটচক্র সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করুন।

বেণীমাধবও এই কথায় সায় দিলেন।

আচার্য ভগবান বললেন, আমাদের শরীরের অভ্যন্তরে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়. পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়, পঞ্চপ্রাণ, মন ও বুদ্ধি এই সতেরটি পদার্থে গঠিত আর একটি শরীর আছে। চক্ষুদ্বারা একে দেখা যায় না বলে সূক্ষ্মশরীর বলা হয়। এই শরীরই হলো লিঙ্গশরীর। যোগীরা যোগবলে তা দেখতে পান। এই লিঙ্গশরীর শোধন করার নাম ভূতশুদ্ধি। এই ভূতশুদ্ধি একটি প্রধান যোগ। সূক্ষ্মশরীর বা লিঙ্গশরীরে অধিষ্ঠিত জীবাত্মাকে নিবাত নিষ্কম্প দীপশিখার মত চিন্তা করে সুষুম্মা পথে হৃদয় থেকে এনে তাকে মূলাধারে কুলকুণ্ডলিনীর সঙ্গে একীভূত করতে হবে। এই কুলকুণ্ডলিনী যতক্ষণ মূলাধার পদ্মে নিহিত থাকেন ততক্ষণ মন্ত্রসিদ্ধি হয় না। যোগের দ্বারাই তাঁকে জাগাতে হয়। এইকুণ্ডলিনী দেবী জাগরিত হলেই মন্ত্র অর্চনা ফলপ্রদ হয় এবং নানাবিধ বিভূতি বা ঐশ্বর্যলাভ হয়।

এর পর যোগের অন্যান্য করণীয়গুলি বুঝিয়ে দিলেন আচার্য। যোগের অভ্যাসকালে একাগ্রমনে আঙ্গুল নিয়ে ইন্দ্রিয়গুলিকে রুদ্ধ করতে হবে। দুটি অঙ্গুষ্ঠ নিয়ে দুটি কান, তর্জনী দুটি নিয়ে দুই চোখ, মধ্যমা দুটি নিয়ে দুই নাসারন্ধ্র আর বাকি আঙ্গুল নিয়ে মুখ দৃঢ়ভাবে রুদ্ধ করতে হবে। তারপর আত্মা, প্রাণ ও মনের একত্ব চিন্তা করতে করতে বায়ুধারণ করতে হবে।

এই যোগাভ্যাস করতে করতে মুখবিবর থেকে ক্রমে নানাবিধ ধ্বনি বার হবে। প্রথমে মত্ত ভ্রমরের ধ্বনি, পরে বাঁশি, কাঁসি বা বীণার মত ধ্বনি, তারপর ঘণ্টার মত ধ্বনি, শেষে জলপূর্ণ ঘন মেঘের ধ্বনি বার হতে থাকবে।

ভাগবতের মূলকথা এই যে, জীবের যখন সর্বভূতে আত্মদর্শন হয় এবং সর্বভূতরূপে ব্রহ্মদর্শন হয়, তখনই জীব ঈশ্বরের সমগ্র স্বরূপ অধিগত হয়। তখন তাতে পরাভক্তি জন্মে। তখন ভক্ত ও ভগবানের এক অচ্ছেদ্য নিত্য-মধুর সম্বন্ধ স্থাপিত হয়।

ওঁ

এবার আচার্য ঠিক করলেন, তাঁর শিষ্যদুজনকে হিমালয়ে নিয়ে যাবেন। কারণ তাঁরা চল্লিশ বছর ধরে ব্রহ্মচর্যাদি বহিরঙ্গ সাধনের অভ্যাস দ্বারা যোগের অন্তরঙ্গসাধন অর্থাৎ ধারণা, ধ্যান ও সমাধির উপযুক্ত হয়ে উঠেছেন। এবার সাধনতীর্থ হিমালয়ের পরিবেশে ধারণা, ধ্যানাদি দ্বারা ভগবদ্দর্শন ও ব্রহ্মপদ লাভ করতে পারবেন।

হিমালয়ে যাবার আগে আচার্য তাঁর শিষ্যদের বললেন, শোন তোমরা, ভক্তি বিনা কি কর্মযোগ, কি জ্ঞানযোগ, কোন যোগেই চিত্ত বিশুদ্ধ হয় না। কর্মযোগ ও জ্ঞানযোগের অনুষ্ঠানকালে হঠাৎ চিত্তবৈকল্য বা বাধা উপস্থিত হতে পারে। কিন্তু ভক্তিযোগে তার ভয় থাকে না। অনন্য ভক্তিযোগে তাঁর স্মরণ নিলে ঈশ্বরই গুরুরূপে ভক্তের হৃদয়ে থেকে জ্ঞানরূপ দীপ নিয়ে ভক্তের অজ্ঞান অন্ধকার দূর করে দেন। ধ্যানযোগ ভক্তি যোগেরই অঙ্গ। ধ্যানযোগেও জ্ঞানলাভ হয়। এই জ্ঞানলাভ হলে সর্বত্র ভগবৎ-দর্শন হয়। এই জন্যই ভক্তিকে ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চার পুরুষার্থের ঊর্ধ্বে পঞ্চম পুরুষার্থ বলা হয়েছে।

এবার লোকনাথ প্রশ্ন করলেন, গুরুদেব, ঈশ্বরই ত সকল যোগের সিদ্ধি দাতা। কত প্রকার সিদ্ধি যোগীরা লাভ করতে পারেন?

আচার্য বললেন, মুখ্য ও গৌণভেদে অষ্টাদশ প্রকার সিদ্ধি যোগীরা লাভ করতে পারেন। এর অষ্টপ্রকার সিদ্ধি মুখ্য সিদ্ধি আর বাকি দশটি গৌণ সিদ্ধি। প্রধান অষ্টসিদ্ধির দ্বারা ঈশ্বরের স্বারূপ্যের কিছু কম অবস্থা লাভ করা যায়। আর বাকি দশটি সিদ্ধির সত্ত্বগুণের উৎকর্ষ হয়।

প্রথমে অষ্ট সিদ্ধির কথা শোন। দেহকে অতিমাত্র সূক্ষ্ম করার নাম অনিমা সিদ্ধি। দেহকে বৃহৎ করার নাম মহিমা সিদ্ধি আর দেহকে খুব

বেশী লঘু করার নাম লঘিমা সিদ্ধি। সমস্ত প্রাণীদের ইন্দ্রিয়শক্তির সঙ্গে নিজের ইন্দ্রিয়শক্তির সম্বন্ধ স্থাপন করার নাম প্রাপ্তিসিদ্ধি। ঐহিক ও পারত্রিক সকল তত্ত্ব অবগত হওয়ার নাম প্রাকাম্য সিদ্ধি। কেমন করে ঈশ্বরের উপর মায়াশক্তি কাজ করে এই সৃষ্টি করে চলেছে, সেই তত্ত্ব জানার নাম ঈশিতা সিদ্ধি। সত্ত্বাদি গুণযুক্ত সকল প্রকার বিষয় ভোগকে বশীভূত করে স্বাধীন থাকার নাম বশিতা সিদ্ধি। ইচ্ছানুসারে সকল সুখ ও কামনা পূরণ করার নামই হলো অষ্টমী সিদ্ধি কামবসায়িত্ব।

ধারণা অবস্থায় ঈশ্বরকে ভাবনা করতে করতে যোগী ভক্তের এই আট-প্রকার স্বাভাবিক সিদ্ধি হয়। বাকি সিদ্ধিগুলিরও ধারণা অবস্থাতেই উদয় হয়।

বাকি দশটি সিদ্ধির মধ্যে প্রথমটির নাম অনূর্মিমত্ত্বা অর্থাৎ যে ছয়টি দেহতরঙ্গ আছে আমাদের মধ্যে, তা জয়। এই ছয়টি তরঙ্গ হলো, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, শোক, মোহ, জরা ও মৃত্যু। ক্ষুধা ও তৃষ্ণা প্রাণের তরঙ্গ, শোক ও মোহ মনের তরঙ্গ, জরা ও মৃত্যু বাহ্যদেশের তরঙ্গ। এই ছয়টি তরঙ্গই দেহকে ক্ষীণ ও বৃদ্ধিশীল করে।

দ্বিতীয় সিদ্ধিটির নাম দূরশ্রবণ ও দর্শন অর্থাৎ ত্রিভুবনের সকল শব্দ শ্রবণ ও অদৃশ্য দর্শন হয়। তৃতীয় সিদ্ধির নাম হলো মনোজব অর্থাৎ মন দ্বারা কামনামাত্র যেখানে খুশি গমন। চতুর্থ সিদ্ধির নাম কামরূপ অর্থাৎ ইচ্ছানুসারে যে কোন প্রাণী বা দেবমূর্তি ধারণ। পঞ্চম সিদ্ধির নাম পরকায় প্রবেশন অর্থাৎ ইচ্ছামত অন্যের দেহে প্রবেশ। ষষ্ঠ সিদ্ধির নাম ইচ্ছামৃত্যু বিনা ইচ্ছায় দৈব রোগাদিতে মৃত্যুহীন হওয়া। সপ্তম সিদ্ধির নাম দেবগণের সঙ্গে ক্রীড়াকরণ। অষ্টম সিদ্ধির নাম যথাসংকল্প সিদ্ধি অর্থাৎ সংকল্প মাত্রই মনোবাঞ্ছা পূরণ করা। নবম সিদ্ধির নাম অপ্রতিহতা আজ্ঞা অর্থাৎ যে আদেশ বা আজ্ঞা কারো লঙ্ঘন করার ক্ষমতা থাকে না। দশম সিদ্ধির নাম অপ্রতিহতা গতি অর্থাৎ যে গতি কোন উপায়ে রুদ্ধ হয় না। কিন্তু এই সব সিদ্ধি ঈশ্বরপ্রাপ্তি বা ঈশ্বরের প্রেমলাভের উপযুক্ত নয়।

এ ছাড়া ধারণাসম্পন্ন যোগীর আরো পাঁচটি সামান্য সিদ্ধি লাভ হয়ে থাকে। এই পাঁচটি সিদ্ধির প্রথম হলো ত্রিকালজ্ঞতা, দ্বিতীয় অদ্বন্দ্বত্ব বা শীতোষ্ণসহন, তৃতীয় পরচিত্তাভিজ্ঞতা অর্থাৎ পরের মনের কথা জানা,

চতুর্থ হলো স্তম্ভনকরণ অর্থাৎ অগ্নি, জল, সূর্য ও বিষাদিকে নিষ্ক্রিয় বা শক্তিহীন করা, আর পঞ্চম সিদ্ধির নাম হলো অপরাজয় অর্থাৎ কারো দ্বারা অভিভূত না হওয়া।

আচার্য ভগবান বললেন, যোগ ও ধারণাবলে যোগীগণ ঈশ্বরকে উপাস্য-রূপে অন্তরে ধারণা করলে অন্যান্য সিদ্ধির সঙ্গে আগে বর্ণিত সমস্ত সিদ্ধিই লাভ করে থাকেন। লোকনাথ, তুমি ও বেণীমাধব চল্লিশ বছর ধরে ঈশ্বরের জ্ঞানসকল গ্রহণ করবার জন্য ইন্দ্রিয়গুলিকে জয় করতে চেষ্টা করেছ। আসক্তিকে দমন ও শ্বাসাদিকে জয় করতে চেষ্টা করেছ। আমি জানি, তোমরা ঈশ্বরের ধারণাবলে এমন অবস্থা লাভ করতে পারবে ঐ সব সিদ্ধিগুলি অন্যের পক্ষে সুদুর্লভ হলেও তোমরা সহজেই ভোগ করতে পারবে।

তবে মনে রাখবে, যোগীগণ ঐ সব সিদ্ধিলাভ করলে তার দ্বারা শুধু কালজনিত কর্মফলভোগ থেকে স্বাধীন থাকা যায় মাত্র। তবে ভক্ত যোগী-গণের ঐ সব সিদ্ধির প্রতি বেশী দৃষ্টি থাকলে ঈশ্বরপ্রেমলাভ হয় না। সিদ্ধির অর্থ হলো যোগের দ্বারা কাল ও কর্মকে অধীন বা বশীভূত করার জন্য অভ্যাস। কিন্তু মনে রাখবে, একমাত্র ঈশ্বরই কাল, কর্ম ও সকল সিদ্ধির আশ্রয়। সুতরাং ঈশ্বরে ভক্তিযুক্ত হলেই ভক্তের সকল কামনা পূরণ হয়। দার্শনিক যোগী বা জ্ঞানী যোগী শুধু বিভূতিভোগই করে থাকেন। কিন্তু ভক্তযোগী বিভূতির সঙ্গে মুক্তি ইচ্ছা করলে ঈশ্বরের স্বারূপ্যাদি মুক্তিও লাভ করতে পারেন। তাই জ্ঞানীযোগী থেকে ভক্ত যোগী শ্রেষ্ঠ। আবার ভক্তযোগী থেকে কেবল ভগবৎ স্বরূপানন্দ ভোগকারী প্রেমিক ভক্ত শ্রেষ্ঠ। প্রেমিক ভক্তের কাছে এ সব বিভূতি বিঘ্নস্বরূপ। কারণ ঐ সব বিভূতির ফলভোগ মন ও চিত্ত মগ্ন থাকলে কিছুমাত্র প্রেমানন্দ অনুভব হতে পারে না। ভক্তি লাভ হলেই সমস্ত জ্ঞান ও সকল সাধনার শেষ হয়। ভগবৎ ভক্তিই জ্ঞান ও কর্মযোগাদি সমস্ত সিদ্ধির মূলস্বরূপ।

এইভাবে এই বিষয়ে উপদেশের উপসংহার করলেন। এর পর হিমালয়ে যাবার মনস্থ করলেন ভগবান আচার্য। সেখানেই সাধনার শেষস্তরে উপনীত হবেন তাঁর শিষ্যদ্বয়।

৬

দিনকতক পরই হিমালয়ের উদ্দেশে যাত্রা হলো শুরু। বহুদিন ধরে ক্রমাগত পথ চলার পর তাঁরা দেখতে পেলেন পর্বতরাজ হিমালয়ের চির-তুষারাবৃত শিখরদেশ। এই সেই তপোভূমি পবিত্র হিমালয় যার কন্দরে কন্দরে কত যোগী, কত সিদ্ধ সাধক সুদীর্ঘকালীন তপস্যায় মগ্ন হয়ে আছেন।

অধ্যাত্মসাধনার চূড়ান্ত সম্পদ অর্জন করার জন্য অক্লান্তভাবে এগিয়ে চলেছেন দুই সাধক লোকনাথ ও বেণীমাধব। সঙ্গে তাঁদের জ্ঞানদাতা ও দুর্গম অধ্যাত্মলোকের পথপ্রদর্শক গুরু। কত সিদ্ধযোগী মহাত্মাদের লীলা-ভূমি চিরপবিত্র হিমালয়ের আঁকাবাঁকা বনপথ দিয়ে পথ চলতে চলতে সেদিন সন্ধ্যা হয়ে এল। শেষ অপরাহ্নের অন্তরাগ এক অপরূপ সমারোহে যেন আলিম্পিত হয়ে আছে তুষারমৌলি উত্তুঙ্গ গিরিশৃঙ্গগুলিতে। সুবিশাল পর্বতমালার সেই সারি সারি শিখরদেশগুলি মাথায় তুষারমুকুট পরে উঠে গেছে দূর ঊর্ধ্বলোকে নীল আকাশের মহাশূন্যতায়। লোকনাথ ও বেণীমাধব আত্মবিস্মৃত হয়ে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন সেই অদৃষ্ট-পূর্ব মহান দৃশ্যের দিকে।

এমন সময় অকস্মাৎ সেই নির্জন নিস্তব্ধ পার্বত্যলোক কম্পিত করে ধ্বনিত হলো কার কণ্ঠস্বর, বাবা লোকনাথ, বাবা বেণীমাধব।

পরক্ষণেই তাঁরা দেখতে পেলেন অদূরে পর্বতগুহার দ্বারদেশে দাঁড়িয়ে আছেন তেজঃপুঞ্জকলেবর জটাজুটধারী দুই যোগী সন্ন্যাসী। মনে হলো, ঐ দুই সন্ন্যাসী যেন তাঁদেরই জন্য অপেক্ষা করছিলেন এতক্ষণ।

আচার্য ভগবানের ইঙ্গিতে লোকনাথ ও বেণীমাধব এগিয়ে গেলেন তাঁদের কাছে। ভক্তিভরে প্রণাম করলেন তাঁদের। ক্ষণকাল পরে সেই দুই সন্ন্যাসীর সঙ্গে আচার্য ভগবান তাঁর দুই শিষ্যকে নিয়ে এগিয়ে গেলেন সেই গুহার অভ্যন্তরে।

সেই দুজন যোগসিদ্ধ সন্ন্যাসীর কাছেই দিন কাটাতে লাগলেন লোকনাথ ও বেণীমাধব। তাঁদের একজনকে বড়ঠাকুর আর অন্যজনকে ছোট ঠাকুর বলে ডাকতেন তাঁরা। তাঁদের কাছে আবার নূতন করে যোগানুষ্ঠান শিখতে

লাগলেন লোকনাথ ও বেণীমাধব। একদিন তাঁরা বললেন, দেখ লোকনাথ, তোমাদের শরীরে রক্তকণিকা থাকবে না। তাতে তোমরা কিন্তু ভয় পাবে না।

এই কথা বলেই তাঁরা তখন বিদায় নিলেন।

সমানে চলতে লাগল যোগানুষ্ঠান। বিরামহীন ক্লান্তিবিহীন যোগসাধনা আর সুকঠোর কৃচ্ছ্রব্রতপালন। যোগাসনই হয়ে উঠল দুই যোগীর জীবনের একমাত্র অবলম্বন।

এই সাধনকালে কোন কোন দিন আহার জুটত না। কোন কোন দিন শুধু ফল ও কন্দমূল খেয়ে থাকতে হত। শরীরের উপর বরফ জমত। আবার সে বরফ গলে জল হয়ে যেত। এইভাবে দীর্ঘকাল প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরে কৃচ্ছ্রসাধনার কঠোরতার মধ্য দিয়ে দুই সমর্থ যোগী লোকনাথ ও বেণীমাধব এগিয়ে যেতে লাগলেন সিদ্ধিলাভের পথে। অবশেষে দুজনেই যখন সিদ্ধি লাভ করলেন, তখন দুজনেরই বয়স নব্বই বছর আর তাঁদের গুরু আচার্য ভগবানের বয়স দেড়শো বছর।

সিদ্ধিলাভের পর লোকনাথ বুঝলেন, তাঁর গুরু আচার্য ভগবান তখনো সিদ্ধিলাভ করতে পারেননি। যে গুরু নিজে কত দুঃখ কষ্ট সহ্য করে এমন কি নিজের জীবন তুচ্ছ করে তাঁকে এই সাধনমার্গের সর্বোচ্চ স্তরে উন্নীত করেছেন, যাঁর অশেষ স্নেহ ও কৃপাবলে তিনি আজ এই সিদ্ধিলাভ করতে সমর্থ হলেন, সেই গুরু আজও পড়ে রইলেন সাধনমার্গের নিম্নস্তরে।

গুরুর অবস্থা উপলব্ধি করে কাতর কণ্ঠে কাঁদতে কাঁদতে বললেন লোকনাথ, গুরুদেব, আপনি অসীম কষ্ট স্বীকার করে আমাকে পরিত্রাণ করলেন, অথচ আপনি নিজে এখনো সেই অবস্থাতেই পড়ে রয়েছেন। তা দেখে আমি যে আর ধৈর্যধারণ করতে পারছি না।

সিদ্ধযোগী সুযোগ্য শিষ্য লোকনাথের কথা শুনে আচার্য বললেন, বাবা লোকনাথ, আমি চিরকালই জ্ঞানমার্গাবলম্বী। কর্মমার্গ অবলম্বন করে কখনো সিদ্ধিলাভের চেষ্টা করিনি। এখন কর্মমার্গে এই অপার সিদ্ধি লাভ দেখে বিস্মিত হচ্ছি। আমি শীঘ্রই দেহত্যাগ করে আবার জন্ম গ্রহণ করব। তখন তুমি আমাকে কর্মমার্গে পরিচালিত করে আমার উদ্ধারের

বিধান করবে।

লোকনাথ একথা শুনে বললেন, তাই হবে গুরুদেব, আমি আপনার জন্য অপেক্ষা করব।

এই বলে গুরুর চরণে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করে যুক্তকরে দাঁড়িয়ে রইলেন লোকনাথ। এই অদ্ভুত গুরুশিষ্য-লীলা থেকে বোঝা যায়, গুরু অ-সিদ্ধ হলেও তিনি শিষ্যকে প্রকৃত সাধনমার্গ দেখিয়ে তাঁকে পরমপদ প্রাপ্তি বা যোগসিদ্ধিলাভের অধিকারী করে তুলতে পারেন। গুরু অ-সিদ্ধ হলেও তিনি ব্রহ্মের পরম পদ দেখিয়ে দেন। এই গুরু-ঋণ স্মরণপূর্ব্বক গুরু ভগবানের জন্মান্তরের ভার গ্রহণ করলেন লোকনাথ।

আচার্য ভগবান এবার বললেন, বাবা লোকনাথ, তোমাকে এবার সন্ন্যাস নিতে হবে।

একথা শুনে কিছুটা আশ্চর্য হলেন লোকনাথ। কিন্তু কিছু জিজ্ঞাসা করতে সাহস পেলেন না।

আচার্য আবার বলতে লাগলেন, বাবা লোকনাথ, তোমার জন্মদাতা পিতার অভিলাষ পূর্ণ করো এবার। এখন যৌগিক সাধনার শেষ হয়েছে তোমার। এবার প্রব্রজ্যা গ্রহণ করতে হবে অর্থাৎ সন্ন্যাস অবলম্বন করে পরিভ্রমণ করতে হবে। তোমার পিতা রামকানাই ঘোষালের অভিলাষ ছিল এই যে, তাঁর বংশের কেউ যদি সন্ন্যাসী হন, তাহলে তাঁর কুলের উদ্ধার সাধন হবে। আর এই জন্যই তিনি উপনয়নের পর দণ্ডীঘরেই তোমাকে বিদায় দিয়েছিলেন। তোমার পিতা আমার কাছে প্রায়ই উপনিষদের সেই শ্লোকটি উচ্চারণ করতেন।

ষষ্টিং কুলান্যতীতাতি ষষ্টিমাগামিকানি চ।
কুলানুদ্ধরতে প্রাজ্ঞ সন্ন্যাস্তমিতি যো বদেৎ॥

অর্থাৎ যে প্রাজ্ঞ বলেন, আমি বৈদিক সন্ন্যাস নিয়েছি, তিনি অতীত ষাটকুল ও আগামী ষাটকুল উদ্ধার করেন।

হিন্দুধর্মে বিবিধ রকমের সন্ন্যাস আছে। যেমন বৈদিক, তান্ত্রিক, বৈষ্ণব, উদাসী। এদের মধ্যে বৈদিক সন্ন্যাস সবচেয়ে প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ। উপনিষদে আছে, সূর্যদেব বৈদিক ব্রাহ্মণ সন্ন্যাসী দেখে পথ ছেড়ে দিয়ে বলেন, ইনি আমার মণ্ডল ভেদ করে পরব্রহ্মে মিলিত হবেন। শ্রীমদ্ভাগবতে

আছে, যে ব্রাহ্মণ ক্রমিক যোগসাধনার শেষে প্রব্রজ্যা অর্থাৎ সন্ন্যাস অবলম্বন করে পরিব্রাজন করেন, তিনি ইহলোকেই সমস্ত পাপ হতে বিমুক্ত হয়ে পরব্রহ্মে মিলিত হন।

পরিশেষে আচার্য ভগবান বললেন, যাই হোক, শোন লোকনাথ, আমি আগামী কালই তোমাকে সন্ন্যাস দীক্ষা দেব।

পরদিনই শুভ মুহূর্তে যথাশাস্ত্র বিরজাহোমে শিখাসূত্রের আহুতি দান করা হলো। সিদ্ধপুরুষ লোকনাথকে সন্ন্যাসাশ্রমে দীক্ষা দিলেন আচার্য ভগবান। নূতন নামকরণ হলো, লোকনাথ ব্রহ্মচারী।

দীক্ষাদানের পর আচার্য বললেন, শোন লোকনাথ, তুমি সিদ্ধিলাভ করেছ বটে, কিন্তু তোমার জীবনের প্রধান কর্ম ও মহৎ উদ্দেশ্য এখনো বাকি।

লোকনাথ তখন বললেন, বলুন গুরুদেব, কি সেই কর্ম ও মহৎ উদ্দেশ্য। আর তা কেমন করে আমি সাধন করব ?

আচার্য বললেন, সেই উদ্দেশ্য হলো লোকশিক্ষা। প্রায়ই দেখা যায়, মুনিরা নির্জনে মৌন অবলম্বন করে তপস্যা করেন। তাঁরা সাধারণ লোকের দিকে দৃষ্টি দেন না। তাঁরা পরার্থনিষ্ঠ নন, স্বার্থপর। গীতায় বলা হয়েছে, কর্মযোগের উদ্দেশ্য হলো, জীবলোককে ভাগবত জীবনের উদ্দেশ্য দেখিয়ে ভাগবতধর্মী করা। এই জন্যই অবতারগণ বা অবতারকল্প দেবমানবগণ যুগে যুগে অবতীর্ণ হন ইহলোকে। যাঁদের দ্বারা ঈশ্বর লোকশিক্ষা দিতে চান, তাঁদের সন্ন্যাসী হতে হয়।

ঈশ্বরকোটি ও জীবকোটি—এই দুই ধরণের সাধক আছেন। জীবকোটির সাধকেরা সাধনার দ্বারা ঈশ্বরলাভের পর আর সাধারণ মানুষের কাছে ফিরে আসেন না। কিন্তু ঈশ্বরকোটির সাধকেরা ঈশ্বরলাভের পরে স্বেচ্ছায় বা ঈশ্বরের আদেশে লোকশিক্ষার জন্য সাধারণ মানুষের কাছে নেমে আসেন।

ব্যাসপুত্র শুকদেব নির্বিকল্প সমাধিতে মগ্ন হয়ে ছিলেন জড়বস্তুর মত। ভগবান শুকদেবকে নিয়ে লোকশিক্ষা দেওয়ার জন্য নারদকে পাঠিয়ে দিলেন তাঁর কাছে। পরীক্ষিৎকে ভাগবত শোনাতে হবে। লোকশিক্ষা দিতে হবে। নারদ গিয়ে দেখলেন, শুকদেব আছেন বাহ্যজ্ঞানশূন্য অবস্থায়।

তিনি তখন বীণা বাজিয়ে শ্রীহরির রূপ চারটি শ্লোকে বর্ণনা করলেন। শুকদেবের সমাধি ভঙ্গ হলো। সমাধির পর হৃদয়মধ্যে দর্শন করলেন ভগবান শ্রীহরির চিন্ময় রূপ। শুকদেব ঈশ্বরকোটির সাধক। শংকরাচার্যও ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করার পর সুউচ্চ অধ্যাত্মলোক হতে লোকশিক্ষার জন্য নেমে এসেছিলেন।

তারপর ভগবান আচার্য আবার বললেন, বাবা লোকনাথ, তোমার মহৎ উদ্দেশ্য সাধন করতে হলে তোমাকে ভারতবর্ষের অধঃপতিত মানবজাতির সামনে পূর্ণত্বের আদর্শ তুলে ধরতে হবে। যে জাতির যে সমাজের কল্যাণে নিজেকে নিয়োজিত করবে, সেই জাতি ও সমাজের ধর্ম ও নীতিগত বিষয়-গুলির পূর্ণ জ্ঞানলাভ করতে হবে। এই ভারতভূমি হলো হিন্দু মুসল-মানের দেশ। সেজন্য হিন্দুধর্মের সঙ্গে সঙ্গে মুসলমানদের ধর্মগত বিষয়-গুলিও জানতে হবে তোমাকে। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তোমাকে আমার সঙ্গে কাবুল গিয়ে কোরাণ শরিফ শিখতে হবে।

এর পর আচার্য ভগবান তাঁর দুই শিষ্যকে নিয়ে কাবুল যাত্রা করলেন। কয়েকমাস পথ চলার পর কাবুলে গিয়ে বিখ্যাত পারসিক কবি মোল্লা সাদীর বাড়িতে উঠলেন।

মোল্লা সাদীর বাড়ি ছিল সিরাজনগরে। পুরো একটি বছর ধরে সেখানে কোরাণ শরিফ শিক্ষা চলল।

একদিন আচার্য ভগবান লোকনাথকে বললেন, শোন লোকনাথ, আমি শীঘ্রই দেহত্যাগ করব। তবে এখানে নয়।

কথাটা শুনে চমকে উঠলেন লোকনাথ। নিজেকে সামলে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, তবে কোথায় গুরুদেব ?

আচার্য বললেন, যে পুরী সুরপুরী থেকেও শ্রেষ্ঠ, যে মুক্তিক্ষেত্রে কৃমিকীটাদি পর্যন্ত প্রাণী দেহত্যাগমাত্রেই দুর্লভ মুক্তি লাভ করে, ভাগীরথীবিধৌত সেই পুণ্যভূমি শংকর-রাজধানী বারাণসীতেই দেহত্যাগ করব আমি।

ব্রহ্মচারী লোকনাথ বললেন, গুরুদেব, পুণ্যভূমি বারাণসী ও কাশী-ধামের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে আপনি কিছু বলুন।

আচার্য বললেন, অসি ও বরুণা নদীর সঙ্গম হওয়ায় কাশীপুরী

বারাণসী নামেও বিখ্যাত। এই কাশীতে চক্রসরোবরে, মণিকর্ণিকা ও সুরধুনী মিলিত হয়েছে। বরুণা, অসি ও স্বর্গনদী জাহ্নবীর সংসর্গে এই এই স্থান হয়ে উঠেছে সর্বসন্তাপসংহারিণী, সর্বদুঃখবিনাশিনী।

লোকনাথ এবার প্রশ্ন করলেন, গুরুদেব, কাশীধামের এত মহিমা কি জন্য? এই কাশীক্ষেত্র পৃথিবীতে কতকাল থেকে অতি বিখ্যাত হয়েছে? কেনই বা এর নাম অবিমুক্তধাম? কি জন্যই বা এক্ষেত্র মোক্ষপ্রদ? কেনই বা মণিকর্ণিকা ত্রিলোকপূজ্যা? স্বর্গনদী সুরধুনী গঙ্গাই বা কোন কাল থেকে অবস্থান করেছেন এখানে?

আচার্য ভগবান বললেন, যে প্রলয়কালে সমস্ত জগৎ জলপ্লাবিত হয়, সে সময়ে দেবাদিদেব মহাদেবের ত্রিশূলের উপর কাশীধাম অবস্থিত ছিল। মহাপ্রলয় শেষে মহাদেব তাঁর পদতল দ্বারা এই কাশীক্ষেত্রকে নির্মাণ করেন। পঞ্চক্রোশ পরিমিত এই কাশীধামে মহাদেব ও পার্বতী সর্বদাই বিহার করেন। প্রলয়কালেও তাঁরা কাশীধাম ত্যাগ করেন না। এই জন্যই পণ্ডিতগণ কাশীধামকে অধিমুক্তধাম বলে কীর্তন করেন।

এই আনন্দকাননে বিহার করার সময় হরপার্বতীর ইচ্ছা হলো অন্য আর কারোকে সৃষ্টি করার। মহাদেব তখন দেবী ভগবতীর সঙ্গে একবার বামভাগে কটাক্ষপাত করলেন। তাতে ত্রিলোকসুন্দর সত্ত্বগুণসম্পন্ন অপূর্ব এক পুরুষোত্তমের জন্ম হলো। সেই পুরুষোত্তমকে দর্শন করে মহাদেব বললেন, হে অচ্যুত, তুমি মহাবিষ্ণু হও।

তারপর সেই মহাবিষ্ণু তাঁর চক্রদ্বারা এক রমণীয় পুষ্করিণী খনন করে তা ধর্মরূপ সলিলে পূর্ণ করেন। তারপর সেই মহাবিষ্ণু চক্রপুষ্করিণীর তীরে পঞ্চাশ হাজার বছর ধরে কঠোর তপস্যা করলেন। তখন মহাদেব তপোতেজে প্রদীপ্ত মহাবিষ্ণুকে দেখে বললেন, হে বিষ্ণু, আর তপস্যা না করে এবার বর চাও।

চতুর্ভুজ বিষ্ণু বললেন, হে দেবাদিদেব মহেশ্বর, আমি ভবানীর সঙ্গে আপনাকে সর্বদা দেখতে অভিলাষ করি।

মহাদেব তাঁকে সেই বর দান করে বললেন, আমি আরো বর দিচ্ছি, তোমার তপস্যার আশ্চর্যজনক কঠোরতা দেখে আমি আমার অহিভূষিত মৌলিদেশ কম্পিত করেছিলাম। সেই কম্পনহেতু আমার কর্ণ থেকে

মণিকুণ্ডল পতিত হয়। সেই জন্য মণিখচিত এই রমণীয় স্থানের নাম হবে মণিকর্ণিকা। আর তুমি চক্রদ্বারা যে পুষ্করিণী খনন করেছ, তা চক্র-পুষ্করিণী নামে বিখ্যাত হবে।

তখন বিষ্ণু বললেন, হে পার্বতীনাথ, আপনার কর্ণ থেকে মণিকুণ্ডল পতিত হওয়ায় এই তীর্থ সকল তীর্থ থেকে শ্রেষ্ঠ ও মুক্তি ক্ষেত্র বলে বিখ্যাত হোক। এখানে বাক্যাতীত জ্যোতির্ময় ঈশ্বর প্রকাশিত আছেন, এ কারণে এই ক্ষেত্রের নাম কাশী। আমি আপনার কাছে এই বর প্রার্থনা করছি,—আব্রহ্ম স্তম্ব অর্থাৎ ব্রহ্ম থেকে তৃণগুচ্ছ পর্যন্ত যে কোন জীব এই কাশীধামে দেহত্যাগ করলে যেন তারা মুক্তি লাভ করে। হে জগদীশ্বর, কাশীক্ষেত্রে শ্রদ্ধাসহকারে যে কোন শুভকার্য করা হলে তা যেন ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষের হেতু হয়। এই কাশীধামে আত্মদর্শন অর্থাৎ জীব ও ব্রহ্মের ঐক্যানুসন্ধান, যোগ, ব্রত, তপস্যা, ধ্যান ছাড়াও যেন জীবের মুক্তি লাভ হয়। কাশীনিবাসী সাধুগণের পক্ষে সর্বদাই যেন এস্থানে সত্যযুগ হয়। সর্বদাই যেন উত্তরায়ণ, সর্বদাই যেন মহোদয় হয়। অষ্টাঙ্গ যোগাভ্যাস করলে যে পুণ্য হয়, শ্রদ্ধাসহকারে কাশীতে বাস করলে যেন তার থেকেও অধিক পুণ্য হয়

তখন দেবাদিদেব মহাদেব বিষ্ণুর এই প্রার্থিত বরের কথা শুনে খুশি হয়ে বললেন, হে মধুসূদন, তুমি যা প্রার্থনা করলে তাই হবে। তাছাড়া সমস্ত তীর্থে স্নান করলে যে পুণ্য হয়, মণিকর্ণিকায় যথাবিধি একবার স্নান করলেই সেই পুণ্য লাভ হবে। পঞ্চক্রোশ পরিমিত অবিমুক্ত ধাম মহাক্ষেত্র এই কাশীতে বিশ্বেশ্বর নামে যে এক শিবলিঙ্গ আছেন, তিনিই হলেন জ্যোতির্লিঙ্গ। জন্ম জন্মান্তরে যোগাভ্যাস করলে যে ফল লাভ হয়, কাশীতে দেহত্যাগ মাত্রেই সেই ফল লাভ হবে। যে ব্যক্তি কাশীমাহাত্ম্য জানে না, সে মহাপাপী, শ্রদ্ধাবিহীন,. যে কোন ব্যক্তি কাশীপ্রবেশমাত্র নিষ্পাপ হবে আর দেহাবসানে কালক্রমে মুক্তিলাভ করবে।

আচার্য ভগবান লোকনাথকে বললেন, কাশীধাম ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত হলেও ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যবর্তী নয়। কাশীর মধ্যে কোন স্থানেই যমদূতেরা

প্রবেশ করতে পারে না, কারণ রুদ্রগণ এই পুরীকে সদাসর্বদাই রক্ষা করে চলেন।

কাশীমাহাত্ম্য বর্ণনা করার পর আচার্য এবার বললেন, এবার শোন। কাশীধামের হিতলাল মিশ্র হচ্ছেন দেবকল্প মহাযোগী। আমি মনস্থ করেছি, ঐ মহাযোগীর হাতে তোমাকে ও বেণীমাধবকে সমর্পণ করে মণি-কর্ণিকার ঘাটে দেহ ত্যাগ করব যোগাসনে।

লোকনাথ প্রশ্ন করলেন, গুরুদেব, কে এই মহাযোগী হিতলাল মিশ্র ? তাঁর হাতেই বা কেন আমাদের সমর্পণ করবেন ?

আচার্য ভগবান বললেন, সতত ধ্যানগম্ভীর ইনি এক মহাযোগী। এই মহাযোগী হিতলাল প্রায় আশি বছর ধরে কাশীধামে বাস করছেন। তার বয়স দুশো পনের বছর। লোকে তাঁকে মানববিগ্রহ তৈলঙ্গ স্বামী ও সচল বিশ্বনাথ বলে অভিহিত করে। প্রতিদিন অজস্র ভক্ত ও মুমুক্ষু মানুষের দল গঙ্গায় স্নান করে পঞ্চগঙ্গার প্রাচীন ঘাটের উপর উঠে এসে এই মহা-যোগীর চরণে শ্রদ্ধাভরে প্রণত হয়। 'হর হর বম বম' বলে তারা তাঁর মাথায় পুষ্পাঞ্জলি গঙ্গাজল ঢেলে দেয়।

সুদীর্ঘকাল কঠোর তপস্যা করে অসামান্য ও অপরিমেয় যোগ বিভূতি লাভ করেছেন হিতলাল। কত আর্ত মানুষ চরম বিপদ আপদে পড়ে ছুটে আসে এই মহাত্মার কাছে। আর তিনিও উদার অকৃপণ হস্তে আর্ত ও মুক্তিকামী অসংখ্য মানুষের কল্যাণে তাঁর যোগ বিভূতির সম্পদ বিলিয়ে দিয়ে যাচ্ছেন। কত মৃত মানুষকে জীবন দান করেছেন, কত মানুষকে নিশ্চিত মৃত্যুর কবল থেকে উদ্ধার করেছেন, তার ইয়ত্তা নেই।

এই মহাশক্তিধর মহাপুরুষের কাছে তোমাদের যোগমার্গের নিগূঢ়তত্ত্ব-গুলি শিখতে হবে। তোমাকে ও বেণীমাধবকে ব্রহ্মজ্ঞ হতে হবে। আমি চাই তোমরা দুজনেই যোগমার্গের এমন সর্বোচ্চ স্তরে পেঁছে যাও. যে অবস্থায় যোগী ভগবানের নিত্যসঙ্গজনিত পরমানন্দ লাভ করে আর নির্বাণের আকাংক্ষা না করে ভগবানের অবতার স্বরূপ হয়ে সর্বভূতের কল্যাণসাধনে রত হয়। এই হলো গীতার জ্ঞান। জ্ঞান, কর্ম, যোগ ও ভক্তির চরম অবস্থা।

ওঁ

এবার কাবুল ত্যাগ করে আচার্য ভগবান দুই শিষ্যকে নিয়ে কাশীধামের পথে রওনা হলেন। দীর্ঘ পথ পরিক্রমার পর অবশেষে তাঁরা কাশীধামে পেঁছেই চললেন হিতলালের সন্ধানে।

মহাযোগী হিতলাল তখন মণিকর্ণিকার ঘাটে বসেছিলেন। সেখানে গিয়ে আচার্য ভগবান হিতলালকে বললেন, যোগেশ্বর হিতলাল, আমি এবার দেহত্যাগ করব। তাই আমার এই বালক দুটির ভার আপনার হাতে সমর্পণ করে যেতে চাই।

হিতলালও এই ভারগ্রহণে সম্মত হলেন। আচার্য ভগবান তখন নিশ্চিন্ত হয়ে মণিকর্ণিকার ঘাঠে যোগাসনে বসলেন। আর সেই যোগাসনে উপবিষ্ট অবস্থাতেই দেহত্যাগ করে নিত্যধামে গমন করলেন আচার্য ভগবান। তখন তাঁর বয়স দেড়শো বছর আর লোকনাথ ও বেণীমাধবের প্রত্যেকেরই বয়স নব্বই বছর।

গুরুদেবের লীলা সম্বরণের পর মহাযোগী হিতলালের আশ্রমে থেকে যোগসাধনা শিখতে লাগলেন লোকনাথ ও বেণীমাধব। কিছুকালের মধ্যেই হিতলালের অধ্যাত্মশক্তি সঞ্চারিত হলো তাঁদের মধ্যে। অপূর্ব যোগসামর্থ্য অর্জন করলেন তাঁরা। দীর্ঘ যোগসাধনার পর লোকনাথের উপর বর্ষিত হলো ঐশ্বরিক করুণার ধারা। তিনি নিজেকে ব্রহ্মজ্ঞ মহাপুরুষরূপে জানতে পারলেন।

এরপর লোকনাথ ব্রহ্মচারী একাই পরিব্রাজনে বেরিয়ে পড়লেন। প্রথমে তিনি আরবদেশের উদ্দেশে যাত্রা শুরু করলেন। পদব্রজে দীর্ঘকাল পথ চলার পর অবশেষে আরবদেশে পেঁছিলেন। প্রথমে গেলেন মুসলমানদের পবিত্র ও প্রধান তীর্থক্ষেত্রে হজরত মহম্মদের জন্মস্থান মক্কানগরীতে। সেখানে আব্দুল গফুর নামে এক সিদ্ধ যোগীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো তাঁর। এই ফকিরের তখন বয়স হয়েছিল চারশো বছর।

এই যোগসিদ্ধ ফকির লোকনাথকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কে ?

লোকনাথ ব্রহ্মচারী বিনীতভাবে উত্তর করলেন, আমি কে তা জানবার জন্যই ত আপনার কাছে এসেছি।

এই উত্তর শুনে ফকির এত খুশি হলেন যে, তিনি লোকনাথকে নিজের

বুকে টেনে নিয়ে আলিঙ্গন করলেন।

মক্কার মুসলমানেরা লোকনাথকে খুব আদর যত্ন করল। তারা তাঁকে বলল, বাবা, আপনি নিজের হাতে রসুই করে খেতে চান ত বলুন। তাহলে সিধে অর্থাৎ চাল ডাল শাকসব্জী সিদ্ধ করে খাবার যোগ্য দ্রব্যাদি গ্রহণ করুন। আর যদি আদেশ করেন ত আমরাই রসুই করে দিচ্ছি।

লোকনাথ বললেন, তোমাদের হাতের রান্না খেতে আমার কোন আপত্তি নেই।

একথা শুনে তারা বিস্মিত হলে আব্দুল গফুর তাদের বললেন, দেখ গো, এই ভারতীয় যোগী একজন খাঁটি মুসলমান। তোমরা হিন্দুদের বিধর্মী বলে, কাফের বলে ভুল করো। প্রকৃত পক্ষে হিন্দুদের মধ্যেও মুচ্ছলম ইমান অর্থাৎ ষোল আনা ধর্ম আছে এমন অনেক সাধু মহাপুরুষ আছেন। এই লোকনাথ ব্রহ্মচারী এমনই একজন মহাপুরুষ।

এই কথা শুনে মুসলমানেরা অতি পবিত্রভাবে কাপড় দিয়ে মুখ বেঁধে রান্না করে প্রতিদিনই লোকনাথকে খাওয়াতে লাগলেন।

মক্কা ছেড়ে মদিনা যাবার আগে লোকনাথ মক্কার মুসলমানদের বললেন, আমি তোমাদের এখানে আবার আসব। এই প্রকৃত ব্রাহ্মণ আব্দুল গফুরকে দেখতে আসব। আমি এত পাহাড় পর্বত ভ্রমণ করেছি, কিন্তু মাত্র তিনজন ছাড়া ব্রাহ্মণ দেখিনি। এই তিনজন হলেন, কাশীতে তৈলঙ্গস্বামী, মক্কায় এই আব্দুল গফুর আর…

এই কথা শুনে উপস্থিত মুসলমানেরা বিস্মিত হলেন। তাঁরা বললেন, আর একজন ব্রাহ্মণ কি আপনি স্বয়ং? তাই কি নাম করলেন না? তবে আমরা বিস্মিত হচ্ছি এই ভেবে যে, মুসলমান ফকির কি করে ব্রাহ্মণ হলেন?

লোকনাথ তখন মৃদু হেসে বললেন, তোমাদের সন্দেহ ও বিস্ময় নিরসন করো। শোন তোমরা। ব্রাহ্মণ কে? ব্রাহ্মণ হলেন ব্রহ্মের অবিকৃত রূপ। দেশ কালাতীত ব্রহ্মই পরমার্থিক নিত্য সত্তা। এই নিত্য সত্তাই দেশ কালে প্রকাশিত হন। যিনি ব্রহ্মজ্ঞ, তিনি নিজের আত্মাতে ব্রহ্মের উপাসনা করতে করতে ব্রহ্মের মত হয়ে যান। ব্রহ্মবিদ ব্রহ্মৈব ভবতি। তিনি সর্বত্রই ব্রহ্মকে দর্শন করেন। তাঁর কোন ভেদজ্ঞান থাকে না। ব্রহ্ম

ব্রাহ্মণের হৃৎ-পদ্মে সর্বদাই চৈতন্যরূপে অভিব্যক্ত আছেন। 'মুসলমান' কথাটির অর্থ তোমরা গফুর বাবার কাছে শুনেছ। ষোল আনা ধর্ম যাঁর মধ্যে আছে, তিনিই মুসলমান। আমি লক্ষ্য করেছি, প্রকৃত মুসলমানের মধ্যেও ব্রাহ্মণ অর্থাৎ মহাপুরুষ আছেন। আবদুল গফুর একজন ব্রহ্মজ্ঞ মহাপুরুষ। তাঁর হৃদয়মধ্যে ব্রহ্ম আনন্দরূপে সর্বত্র প্রকাশ পাচ্ছেন। ব্রহ্মকে আত্মরূপে দর্শন করার জন্য তাঁর অবিদ্যা-জনিত অহংজ্ঞান বিনষ্ট হয়েছে। সমস্ত সংশয় ছিন্ন হওয়ায় তিনি সমস্ত বন্ধন হতে মুক্ত হয়েছেন। সমস্ত ভেদাভেদ লোপ পাওয়ায় তিনি সাম্য প্রাপ্ত হয়েছেন.

লোকনাথ আরও বললেন, ব্রহ্ম সত্যস্বরূপ। তিনি সত্যের পরম আশ্রয়। ব্রহ্মকে পেতে হলে সত্যের পথে যেতে হয়। সত্যের উপলব্ধি ও অনুষ্ঠান করতে হয়। পূর্ণকাম সত্যদ্রষ্টা ঋষিগণ সত্যের পথেই সত্য-স্বরূপ ব্রহ্মকে লাভ করেন। তাই তো বলা যায় পরমাত্মাকে লাভ করবার দিব্য বা শ্রেষ্ঠ পথ সত্যের মধ্যেই নিহিত। এই সত্যই হলো ধর্ম। আর এই ষোল আনা ধর্ম যাঁর মধ্যে আছে তিনিই ব্রাহ্মণ, তিনিই মুসলমান।

এর পর মদিনায় গিয়ে উপস্থিত হলেন লোকনাথ ব্রহ্মচারী। মদিনায় যে ক'দিন ছিলেন, প্রতিদিনই তাঁর সাধন আসনের সামনে স্থানীয় ভক্ত মুসলমানগণ প্রচুর পরিমাণে লাড্ডু রেখে যেতেন। লোকনাথ দু একটি লাড্ডু গ্রহণ করলে ঐ ভক্তগণ সবাই মিলে বাকি লাড্ডু প্রসাদ হিসাবে গ্রহণ করতেন।

নিজের আচরণের মধ্য দিয়ে লোকনাথ ব্রহ্মচারী এই শিক্ষাই দিলেন যে, ধর্মের আদর্শে হিন্দু মুসলমানে কোন পার্থক্য নেই। তিনি হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোককেই শেখালেন, ধর্মের আদর্শের দিক থেকে তোমরা একে অপরকে ভাই বলে চিনতে শেখ। আচার নীতি বুঝে পরস্পরের প্রতি ঘৃণা পরিত্যাগ করো। তিনি দেখলেন, হিন্দু মুসলমান দু ভাই পরস্পরের এত ঘনিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও ধর্মগত ও সমাজগত বিদ্বেষে ভুগছে। কিন্তু এই দুই সম্প্রদায়ের মিলন ছাড়া ভারতীয় জাতির মঙ্গল সম্ভব নয়। ইসলাম ধর্মের চরম আদর্শ শিক্ষা করার উদ্দেশ্যেই তিনি মক্কা ও মদিনায় যান।

আরবদেশ থেকে ফিরে এসে লোকনাথ কিছুদিন হিমালয়ের কোলে

কাটিয়ে আবার আরবদেশে যান। আবার ফিরে আসেন হিমালয়ে। এর পর তৃতীয়বার যখন পদব্রজে আরব গেলেন তখন তাঁর সঙ্গী ছিলেন বেণীমাধব ও যোগীবর হিতলাল মিশ্র। আরব দেশে কিছুদিন কাটিয়ে তিন-জন এগিয়ে চললেন পশ্চিম দিকে। তারপর বিভিন্ন স্থান পরিভ্রমণ করতে করতে আটলাণ্টিক মহাসাগর পর্যন্ত অগ্রসর হন। তারপর আবার হিমাচলে ফিরে আসেন!

তাঁরা যখন হিমালয়ের তুষারাবৃত শিখরে অবস্থান করছিলেন তখন হঠাৎ একদিন মক্কা থেকে আব্দুল গফুরখান সেখানে এসে মিলিত হন তাঁদের সঙ্গে। এরপর সবাই মিলে ঠিক করলেন, তারা উত্তর দেশ ভ্রমণ করতে যাবেন।

আসলে সিদ্ধপুরুষ লোকনাথের সমতলভূমি পর্যটন আর ভাল লাগছিল না। মহাভারতের পঞ্চপাণ্ডব যে মহাপ্রস্থানের পথে গমন করেছিলেন, সেই পথে উত্তরমুখে গমন করতে করতে ইলাবৃতবর্ষস্থিত সুমেরু পর্বতে আরোহণ করতে হবে। সেখানে ইন্দ্রাদি দেবতার উদ্যান আছে। সেখানে গেলে স্বর্গদর্শন হতে পারে. এই আশায় দেহকে সেখানে যাবার উপযুক্ত করে তোলার জন্য যত্ন করতে লাগলেন। ক্রমাগত বরফের উপর দিয়ে অনাবৃত দেহে চলতে হবে।

এজন্য তারা যাবার আগে দুই এক বছর বদরিকাশ্রমে শীতগ্রীষ্ম উভয় ঋতুতে বাস করার মনস্থ করলেন। শীতঋতুতে সেখানে কেউ বাস করে না শীতের সময় কেদার. বদরী, ও গঙ্গোত্রী এই তিন তীর্থেই কোন মানুষ বাস করতে পারে না। কিন্তু এই যোগসিদ্ধ মহাপুরুষগণ শীতগ্রীষ্ম বার মাস চারদিকের বরফের মাঝে প্রচণ্ড হিমের মধ্যে বাস করতে লাগলেন।

এইভাবে দু তিন বছর ধরে অভ্যাস করে শরীরকে অনাবৃত রেখে বরফের উপর দিয়ে মহাপ্রস্থানের পথে চলবার উপযুক্ত করে নিলেন।

হিমালয়ের বরফের উপর দিয়ে দ্রৌপদীসহ পঞ্চপাণ্ডব যখন মহাপ্রস্থানের পথে ক্রমাগত পথ চলতে থাকেন, তখন প্রথমে দ্রৌপদী ও পরে একে একে যুধিষ্ঠির ছাড়া আর চার ভাই এর দেহপাত হয়। অসাধারণ পুণ্যবলে বলীয়ান ও সশরীরে স্বর্গে যাবার অধিকারী যুধিষ্ঠিরের মত তাঁরা সশরীরে স্বর্গে গমন করতে না পারলেও ঐ পথে আরও কিছুদূর যেতে পারতেন।

কিন্তু বরফের উপর দিয়ে পথ চলার অভ্যাস না থাকার জন্যই অকালে দেহপাত হয় তাঁদের। পথে তাঁদের দেহগুলি বরফগলা জলে ভাসিয়ে কেদারে আনীত হয়েছিল। যে পথ দিয়ে এই সব দেহগুলি আনীত হয়েছিল, সেই পথের নাম ভৃগুপন্থা। কেদারের পাণ্ডারা আজও সে পথ দেখিয়ে থাকে। এই ভৃগুপন্থা যে পথে পাণ্ডবেরা মহাপ্রস্থান করেছিলেন, তার পশ্চিমদিকে অবস্থিত।

তিন বছর পর এই চার মহাপুরুষ হিমালয়ের শৃঙ্গস্থিত বরফরাশির উপর আরোহণ করে মহাপ্রস্থানের পথে এগিয়ে যেতে লাগলেন।

পরবর্তীকালে এক শিষ্য লোকনাথ ব্রহ্মচারীকে এই মহাপ্রস্থানের পথের অভিজ্ঞতার কথা জিজ্ঞাসা করে। সে প্রশ্ন করে, আচ্ছা বাবা, কদাচিৎ ক্ষুধার উদ্রেক হলে কি করতেন?

তখন গুরুদেব ব্রহ্মচারীবাবা উত্তর করলেন, কখনো ক্ষুধার জন্য আমাদের কষ্ট পেতে হয়নি। আমরা যে পথে যাচ্ছিলাম সে পথের সবটুকু বরফে আচ্ছন্ন ছিল না। সে পথের মাঝে মাঝে প্রস্তরকঙ্করময় স্থান দেখা যেত। সেই সকল প্রস্তর ও কঙ্কররাশির মধ্যে কন্দমূল পাওয়া যেত। ক্ষুধার উদ্রেক হলে আমরা তাই খেয়ে ক্ষুধা নিবৃত্তি করতাম।

লোকনাথবাবা আরও বলেছিলেন, এই সময় আমাদের সঙ্গে কিছুমাত্র শীতবস্ত্র ছিল না। আমরা সম্পূর্ণরূপে উলঙ্গ ছিলাম। এইভাবে দীর্ঘকাল প্রচণ্ড হিমে নগ্ন অবস্থায় বরফের উপর দিয়ে চলার জন্য আমাদের শরীরের চামড়ার উপর শ্বেতবর্ণ এক চর্মচ্ছদ জন্মে। তার জন্য শীতজনিত কোন কষ্ট পেতে হত না আমাদের। এইভাবে চলতে চলতে মানস সরোবরে উপনীত হলাম আমরা।

এই মানসসরোবর তিব্বতের মানস সরোবর নয়, তা আরও সুদূরবর্তী 'উত্তরমানস' নামে কোন এক তীর্থ।

ব্রহ্মচারীবাবার কথায় জানা যায়, তাঁরা উত্তরাভিমুখে চলতে চলতে রাশিয়ার উত্তরভাগস্থ সাইবেরিয়া অতিক্রম করে উত্তর মহাসাগরের উত্তর দিকে দীর্ঘকাল ভ্রমণ করেছিলেন।

উত্তরদিকে চলতে চলতে তাঁরা এমন এক স্থানে উপস্থিত হন, যে দেশে সূর্য ওঠে না এবং যে দেশ চির অন্ধকারময়। সে দেশে কিছুকাল বাস

করার পর তাঁদের চোখের তারা পরিবর্তিত হয়ে রাত্রিকালে বিড়ালের চোখ যেমন হয়, সেই আকার ধারণ করল। তাঁরা অন্ধকারে বৈদ্যুতিক আলোর মত সব কিছু দর্শন করার ক্ষমতা পেলেন। তখন তাঁরা আরও অগ্রসর হতে লাগলেন।

এখানে ছাউনি করে থাকার সময় তাঁরা অদ্ভূত এক জাতীয় মানুষ দেখেছিলেন। সেই সব মানুষ উচ্চতায় এক হাত বা সওয়া হাতের বেশী নয়। তারা শ্বেতবর্ণ, উলঙ্গ হয়ে বিচরণ করে বরফরাশির উপর দিয়ে।

পরবর্তীকালে লোকনাথবাবা যা বলেছিলেন এ বিষয়ে তা থেকে বোঝা যায়, সেই সূর্যোদয়হীন দেশে দশ বছর ধরে সুমেরু পর্বতের দিকে ইলাবৃতবর্ষে অগ্রসর হয়েছিলেন এবং দশ বছর তাদের ফিরতে সময় লেগেছিল। তাঁরা উত্তরবর্তী কিম্পুরুষবর্ষ ও হরিবর্ষ পার হয়ে অবশেষে ইলাবৃতবর্ষে প্রবেশ করেছিলেন।

তাঁরা অন্ধকারের মধ্য দিয়ে পথ চলতে চলতে অবশেষে এক সময় এমন এক স্থানে উপস্থিত হলেন যেখান থেকে সমভাবে বা উপরের দিকে চলতে কোন পথ পেলেন না। ফলে তাঁরা নিম্নদিকে যেতে লাগলেন। এইভাবে অনেকটা যাওয়ার পর বুঝলেন, এ নিশ্চয় পাতালে যাবার পথ।

তাই তাঁরা আর সে পথে না গিয়ে যেখান থেকে এ পথে যাত্রা শুরু করেছিলেন সেইখানে ফিরে এলেন। তারপর আবার সুমেরুতে আরোহণ করার জন্য পথের সন্ধান করতে লাগলেন। কিন্তু দুই তিনটি স্তম্ভ ছাড়া আর কিছুই দেখতে পেলেন না। তখন সেই স্তম্ভের উপর ওঠার চেষ্টা করতে লাগলেন। বহু কষ্টে তাঁরা একটি স্তম্ভের মাথার উপর উঠলেন।

কিন্তু সুমেরু পাবার কোন সম্ভাবনা দেখলেন না। তখন তাঁরা অবতরণ করতে লাগলেন ধীরে ধীরে। তাঁরা লক্ষ্য করেন, সেই স্তম্ভের উপরে বায়ুস্তরে কোন হিল্লোল ছিল না। অদ্ভুত একটা নিস্তরঙ্গ ভাব।

এর পর গুরু হিতলাল মিশ্র লোকনাথকে বললেন, সুমেরু পর্বতে যাওয়া ঘটল না। আমি উদয়াচল দর্শন করার জন্য পূর্বদিকে যাব।

লোকনাথও বেণীমাধবসহ তাঁর অনুগমন করতে চাইলে হিতলাল তাঁকে বললেন, নিম্নভূমিতে তোমার কর্ম রয়েছে। অতএব আমার সঙ্গে আর যাওয়া তোমার উচিত হবে না। তুমি ফিরে যাও।

এই বলে উদয়াচলের উদ্দেশে পূর্বাভিমুখে চলতে লাগলেন হিতলাল।

ব্রহ্মদর্শনের পরেও এই সব ভ্রমণের এক বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল লোকনাথ ব্রহ্মচারীর। প্রায় শতাধিকবর্ষব্যাপী কঠোর ব্রহ্মচর্য, কৃচ্ছ্রসাধন, ভক্তি ও তপস্যার ফলে যে ভগবৎ দর্শন লাভ করেন, সেই ভগবানের অনন্ত লীলা-ক্ষেত্র পরমৈশ্বর্যময় ব্রহ্মাণ্ডের ভ্রমণের মাধ্যমে রসাস্বাদন করবার ইচ্ছা স্বাভাবিকভাবেই জেগেছিল তাঁর মধ্যে। তিনি দেখলেন অসীম ব্রহ্মাণ্ড ব্রহ্মময়। তাই এই ব্রহ্মাণ্ডময় ব্রহ্মমূর্তি দর্শন করে ব্রহ্মের অপূর্ব লীলা-রসামৃত আস্বাদন করবার জন্যই তদগতচিত্তে ব্রহ্মাণ্ডের বহুস্থান ঘুরে বেড়ালেন তিনি।

যোগগুরু হিতলাল মিশ্রের পর বেণীমাধবের কাছেও বিদায় নিলেন লোকনাথ। তারপর চন্দ্রনাথ পাহাড়ের শিখরদেশে গিয়ে কিছুদিনের জন্য অবস্থান করতে লাগলেন।

সেই সময় একদিন সহসা সেই পাহাড়সংলগ্ন বনে দাবানল জ্বলে ওঠে। তখন বাঘ, হাতি, মোষ প্রভৃতি বন্যজন্তুরা ভয়ে ব্যাকুল হয়ে ছোটাছুটি করতে লাগল। ভয়ার্ত কলরবে ও আর্তনাদে পর্বতমালা কাঁপিয়ে তুলল।

সেই সময় বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ঐ পাহাড়ের পাদদেশে ভ্রমণ করছিলেন। হঠাৎ গোস্বামীজী দেখলেন তাঁর চারদিকেই দাবানলের আগুন। জ্বলন্ত দাবানলের লেলিহান শিখার দ্বারা চারদিকেই এমনভাবে পরিবেষ্টিত হয়ে পড়েছেন যে, কোনদিকেই কোনক্রমে বেরিয়ে যাবার উপায় নেই। কোনভাবেই জীবন রক্ষা করা সম্ভব নয়। কিন্তু তখন এই ঘোর বিপদে অধৈর্য না হয়ে আসন পেতে বসে একাগ্রচিত্তে ঈশ্বরের ধ্যান করতে লাগলেন তিনি।

ঐদিকে যোগীবর লোকনাথ ব্রহ্মচারী পাহাড় থেকেই জানতে পারলেন, এক সাধক ঐ বনের এক জায়গায় দাবানলে আটকে পড়েছেন। বার হতে পারছেন না। জানতে পারার সঙ্গে সঙ্গেই মহাযোগী লোকনাথ বায়ুগতিতে সেখানে ছুটে গিয়ে গোঁসাইজীর বিশাল দেহটিকে শিশুর মত কোলে তুলে নিয়ে সেই ভীষণ দাবানলের ব্যূহ ভেদ করে এক নিরাপদ স্থানে তাঁকে রেখে আবার অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

গোঁসাইজী তখন বাহ্যজ্ঞানশূন্য ছিলেন বলে কিছুই জানতে পারলেন না। পরে জ্ঞান ফিরে এলে দেখলেন, এক নিরাপদ স্থানে বসে আছেন

পরে দাবানলের ধ্বংস লীলার কথা মনে করে বুঝতে পারলেন, ভগবৎ প্রেরিত এক শক্তিধর মহাপুরুষের প্রভাবেই তাঁর জীবন রক্ষা হয়েছে। কিন্তু অনেক অনুসন্ধান করেও সে মহাপুরুষের কোন সন্ধান পেলেন না বিজয়কৃষ্ণ।

লোকনাথ ব্রহ্মচারী যুক্তযোগী ছিলেন বলেই ভাব বা চেণ্টা ছাড়াই অথবা কারো কাছে কোন কিছু না শুনেই পাহাড়ের উপর বসে থাকাকালে গোস্বামীজীর বিপদের কথা জানতে পারেন। কিন্তু যুঞ্জানযোগী নামে আর এক শ্রেণীর যে যোগী আছেন তাঁরা ভাবনাদ্বারাই যোগযুক্ত হয়ে জ্ঞাতব্য বিষয়ের সব কিছু জানতে পারেন। বশিষ্ঠ ছিলেন এমনই এক যুঞ্জানযোগী। রাজা দিলীপ তাঁর কাছে তাঁর অপত্যহীনতার কারণ জানতে চাইলে বশিষ্ঠ কিছুক্ষণ চোখ মুদে ধ্যান করে জানতে পারলেন, স্বর্গীয় কাম ধেনুর অমর্যাদা করার অপরাধে রাজা পুত্রলাভে বঞ্চিত হয়েছেন। লোকনাথ ভাবনা ছাড়াই সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের খবর জানতে পারতেন; দূরের যে কোন ঘটনা প্রত্যক্ষ করতে পারতেন।

লোকনাথ শুধু যুক্তযোগী নন, তাঁকে যুক্ততম বা সর্বশ্রেষ্ঠ যোগীও বলা যায়। যে যোগী যোগসিদ্ধির ফলস্বরূপ ভগবৎ দর্শন করে ব্রহ্ম-স্বরূপতা প্রাপ্ত হন, তিনিই গীতার মতে সর্বশ্রেষ্ঠ যোগী বা মহাযোগী। এই অবস্থায় জ্ঞান, কর্ম, যোগ, ভক্তির অপূর্ব সমাবেশ দেখা যায়। লোকনাথ ব্রহ্মচারীরও তাই হয়েছিল।

যুক্ততম যোগী ভগবানের সাক্ষাৎকাররূপ পরম সুখ প্রাপ্ত হয়ে জীবমুক্ত হন। তিনি যোগদ্বারা সমাহিতচিত্ত ও সর্ববিষয়ে সমদর্শন হয়ে আত্মাকে সর্বভূতে দেখেন। সর্বভূতকে আত্মাতে অভেদরূপে দর্শন করেন। এই অবস্থায় যোগীর ব্রহ্মবস্তুর সঙ্গে পৃথক ভাব থাকে না। তখন তার সঙ্গে ঈশ্বরের একত্বরূপ পরমাদ্বৈত ভাবের বিকাশ হয়।

লোকনাথ ব্রহ্মচারী এবার চন্দ্রশেখর বা চন্দ্রনাথ পাহাড় ছেড়ে কামাখ্যা-তীর্থের পথে যাত্রা শুরু করলেন। এই কামাখ্যা তীর্থ আসামের গৌহাটির কাছে এক পর্বতবিশেষ। বাহান্ন মহাপীঠের অন্যতম কামাখ্যা হিন্দুদের এক প্রধান তীর্থ।

আসামের গৌহাটিতে পেঁছিলে লোকনাথকে পুলিশ ধরে গৌহাটির

ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে নিয়ে গেল। কারণ বেশ কিছুদিন হলো কয়েকজন সাধুর মাথার জটার ভিতরে মোহর পাওয়া গেছে। সেই সব সাধুদের চোর বলে জেলে আটক করে রাখা হয়েছে। তাই পুলিশের উপর হুকুম হয়েছে জটাধারী সাধু দেখলেই তাকে ধরে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে নিয়ে গিয়ে হাজির করতে হবে।

লোকনাথকে ধরে নিয়ে গেলে ম্যাজিস্ট্রেট তাঁকে নানারকম প্রশ্ন করলেন। কিন্তু কোন কথাই বার হলো না লোকনাথের মুখ থেকে। কারণ দীর্ঘকাল অনাহারে থেকে ক্রমাগত তরল খাদ্য খেয়ে লোকনাথের জিভের কোন ক্রিয়া-শক্তি ছিল না। বাকশক্তি না থাকায় কোন কথাই বলতে পারলেন না লোকনাথ।

ম্যাজিস্ট্রেট লোকনাথের স্থির, অপলক ও অলৌকিক চোখদুটির দিকে বেশ কিছুক্ষণ একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন। এক দিব্য জ্যোতি ঠিকরে বার হচ্ছিল তখন লোকনাথের চোখ থেকে। দেখতে দেখতে কেমন যেন তন্ময় হয়ে গেলেন ম্যাজিস্ট্রেট। লোকনাথ মুখে কোন কথা বলতে না পারলেও তাঁর বাঙময় অলৌকিক দৃষ্টি তাঁর মনের সব অব্যক্ত কথা যেন বলে দিল। ম্যাজিস্ট্রেট যেন সে সব কথা বুঝতে পারলেন। তাই তিনি তৎক্ষণাৎ লোকনাথকে ছেড়ে দেবার হুকুম দিলেন।

কিন্তু লোকনাথ তখন ইঙ্গিতে জানালেন, জেলে আটক অন্য সব সাধুদের ছেড়ে না দিলে তিনি যাবেন না, তিনিও জেলেই আটক থাকবেন। ম্যাজিস্ট্রেট লোকনাথের মনের কথা বুঝতে পারলেন। তিনি আরও বুঝলেন লোকনাথ একজন সাধারণ সাধু নন, তিনি এক যোগসিদ্ধ মহা-পুরুষ। তাই তাঁর মনস্তুষ্টির জন্য আটক অন্য সব সাধুদেরও ছেড়ে দেবার হুকুম দিলেন ম্যাজিস্ট্রেট।

তখন সেই সব ছাড়া পাওয়া সাধুরা কামাখ্যার পথে লোকনাথের সঙ্গী হলেন। কামাখ্যা তীর্থে কিছুদিন কাটিয়ে আবার সমতলভূমির পথে নামতে শুরু করলেন লোকনাথ। এবার তিনি একাই পথ হাঁটতে লাগলেন।

ঘুরতে ঘুরতে ত্রিপুরা জেলার অন্তর্গত দাউদকাঁদি গ্রামে এসে রাস্তার ধারে একটি গাছের তলায় বসে পড়লেন। সেই গাছতলায় অনাহারে দিন

কাটাতে লাগলেন। সেই গ্রামে ছিল মুসলমান চাষীদের বাস।

একদিন দশ বারো বছরের একটি মুসলমান মেয়ে লক্ষ্য করল, গাছ-তলায় একটি সন্ন্যাসী চুপচাপ বসে আছে, সে কিছুই খায় না। তা দেখে মেয়েটির দয়া হলো লোকনাথের উপর। সে তখন তার বাড়ি থেকে কিছু খাবার নিয়ে এসে তাঁকে খেতে দিল। কিন্তু দীর্ঘকাল কোন শক্ত খাবার না খেয়ে লোকনাথের এমন অবস্থা হয়েছিল যে শক্ত খাবার কোনক্রমেই খেতে পারলেন না। মেয়েটি তা লক্ষ্য করে বাড়ি থেকে গরম দুধ নিয়ে এসে চামচ দিয়ে নিজেই খাওয়াতে লাগল। একদিন সে সুজির পায়েস নিয়ে এসে লোকনাথকে তা খাওয়াল। লোকনাথের মুখ থেকে তখন দু চারটি কথা উচ্চারিত হলো। এইভাবে শক্ত খাবার খাওয়ার শক্তি জন্মাল তাঁর আর কথা বলার শক্তিও ফিরে পেলেন। তিনি লক্ষ্য করলেন, তাঁর রক্তের রং লাল হতে শুরু করেছে যা এতদিন ঘাসের রসের মত ছিল।

এরপর তিনি সেখানকার মুসলমান চাষীদের সঙ্গে মাঠে কাজ করতে লাগলেন। সারাদিন মাঠে ক্ষেতে নিড়ানোর কাজ করতেন আর রাত্রি-বেলায় লাঠি হাতে শুয়োর তাড়াতেন।

কিছুদিন পর হঠাৎ সেই গ্রাম ছেড়ে পথে বেরিয়ে পড়লেন লোকনাথ। পথ চলতে চলতে একদিন আবার পথের ধারে একটি গাছের নীচে আশ্রয় নিলেন।

একদিন একটি লোক সেই পথ দিয়ে যাবার সময় গাছতলায় এক উলঙ্গ সন্ন্যাসীকে দেখতে পেয়ে এগিয়ে গেল তাঁর দিকে। লোকনাথের দিব্য অঙ্গকান্তি দেখে ভক্তিভাব জাগল তাঁর প্রতি। সে তখন লোকনাথ ব্রহ্মচারীর কৃপাপ্রার্থী হয়ে বলল, সাধুবাবা, আমার নাম ভেঙু কর্মকার। ঢাকা জেলার নারায়ণগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত বারদী গ্রামে আমার নিবাস। বর্তমানে আমি দাউদকাঁদি গ্রামে বিষয়কর্ম দেখাশোনার কাজ করছি। আমি এখন এক ফৌজদারী মামলার আসামী। কয়েকজন শত্রু মিথ্যা করে আমায় এই মামলায় ফাঁসিয়ে দিয়েছে। আমি এখন দারুণ বিপদের মধ্যে দিন কাটাচ্ছি। এই মামলায় আমার কমপক্ষে ছয় মাসের সশ্রম কারাদণ্ড হবে, আবার তার বেশীও হতে পারে। দয়া করুন সাধুবাবা। জেলটা রদ করতে না পারলে আমার পরিবার ছারখারে যাবে।

সব কথা শুনে লোকনাথ তাকে অভয় দিয়ে বললেন, তুই বাড়ি ফিরে যা। তোর কোন ভয় নেই। তুই যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই খালাস পাবি।

একথা শুনে ভেঙু কর্মকার তখনি বাড়ি ফিরে গেল। তারপর সত্যি সত্যিই সেই ফৌজদারী মোকদ্দমায় বেকসুর খালাস পেয়ে গেল। বিচারের রায় বার হলে তার আনন্দ আর ধরে না। তখন সন্ন্যাসীর প্রতি ভক্তি তার দারুণ বেড়ে গেল। সে বুঝতে পারল ঐ উলঙ্গ সন্ন্যাসী এক অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষ। সে তখন ছুটে এসে লোকনাথ বাবার চরণ ধরে শ্রদ্ধা নিবেদন করল। তারপর কাতর প্রার্থনা জানাল, আমার বারদী গ্রামে আপনাকে যেতে হবে বাবা। আমি কিছুতেই ছাড়ব না।

লোকনাথও কি ভেবে রাজী হয়ে গেলেন। হয়ত ঈশ্বরের এক অমোঘ ইচ্ছাশক্তির প্রভাবেই তিনি সম্মত হলেন বারদী গ্রামে যেতে।

লোকনাথের এই বারদী আগমনের পিছনে রহস্যময় উদ্দেশ্য এক ছিল। তাঁর আচার্য ভগবান গাঙ্গুলী সুদীর্ঘকাল ধরে অনেক কষ্ট স্বীকার করে তাঁকে ব্রহ্ম লাভ করিয়ে নিজে অসিদ্ধ অবস্থায় দেহত্যাগ করেছেন। গুরুর দেহত্যাগের আগে কৃতী শিষ্য লোকনাথ গুরুর জন্মান্তরের ভার গ্রহণ করেন। বহু বছর পর আজ সেই ঋণ পরিশোধ ও গুরুকে যে কথা দিয়েছিলেন সেই কথা রক্ষার সময় এসেছে। মহাযোগী লোকনাথ যোগবলে নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন তাঁর পরমগুরু আচার্য ভগবান কোথায় কিভাবে অবস্থান করছেন বর্তমানে। ব্রহ্মজ্ঞানে যিনি ব্রহ্মলোকের অধিকারী, সেই ব্রহ্মভূত লোকনাথ জন্মান্তরের অসিদ্ধ গুরুর আকর্ষণে বিচলিত না হয়ে পারলেন না।

আচার্য ভগবানেরও এখন হয়ত সেই শুভ সময় এসে উপস্থিত। পূর্বজন্মে তিনি জ্ঞানমার্গালম্বী ছিলেন বলে সিদ্ধিলাভ করে যেতে পারেননি। এ জন্মে তিনি কর্মমার্গ অবলম্বন করে সাধনপথে চলতে চলতে মহাপুরুষের সঙ্গলাভের জন্য প্রস্তুত হয়ে উঠেছেন। এই জন্যই হয়তো মহাযোগী লোকনাথ গুরুদেব ভগবানের সাধুসঙ্গ লাভের উপযুক্ত সময়ের প্রতীক্ষা করছিলেন। এই মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই তিনি বারদীতে এসে ব্রুত কষ্ট সহ্য করতে লাগলেন।

ওঁ

ঢাকা জেলার মেঘনা নদীর তীরে নারায়ণগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত বারদী গ্রাম। ব্রহ্মপুত্র নদের পূর্বতীরে প্রাচীন হিন্দু রাজাদের রাজধানী প্রসিদ্ধ সুবর্ণগ্রাম নামে এই সকল স্থান পরিচিত। নয়াবাদের জমিদার নাগবাবুদের নিবাস ছিল এই বারদী গ্রামে।

বাংলা ১২৭০ সনে বা তার কিছু আগে বা পরে ত্রিপুরা হতে ভেঙু কর্মকারের সঙ্গে বারদী গ্রামে এসে উপস্থিত হন যোগসিদ্ধ মহাপুরুষ লোকনাথ ব্রহ্মচারী। তখন সম্পূর্ণ উলঙ্গ অবস্থায় ছিলেন। দীর্ঘকাল বরফের দেশে অবস্থান করার জন্য সমস্ত শরীরে শ্বেতবর্ণের একরকম চর্মচ্ছদ জন্মেছিল। তার উপর ছিল ভূতলস্পর্শী বিশাল জটাজাল। তাঁকে দেখে তখন অদ্ভুত এক অভিনব জীব বলে মনে হত। অনেকে পাগল বলে মনে করত। এই অবস্থায় একদিন ভেঙু কর্মকারের সঙ্গে নৌকা-যোগে বারদী গ্রামে এসে ওঠেন লোকনাথ।

ততদিনে তাঁর শ্বেতবর্ণের চর্মচ্ছদটি মিলিয়ে যেতে শুরু করেছে। তাঁর উলঙ্গ মূর্তি দেখে গ্রামের ছেলেরা দল বেঁধে তাঁকে তাড়া করত। কেউ কেউ ঢিল ছুঁড়ত। এইভাবে ছেলেরা নানাভাবে উৎপাত করত। বয়স্ক লোকেরাও পাগল বলে উপেক্ষা করত। কিন্তু গ্রামবাসীদের এই উপেক্ষাভাব দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়নি।

একদিন এই উলঙ্গ মহাযোগী লোকনাথ বারদীর এক রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ এক জায়গায় থমকে দাঁড়ালেন। সেখানে বসে দু তিনজন ব্রাহ্মণ যজ্ঞসূত্র বা পৈতাগ্রন্থি দিচ্ছিলেন। পৈতেটি এমনভাবে জড়িয়ে গিয়েছিল যে, তাঁরা কিছুতেই তার প্যাঁচ খুলতে পারছিলেন না। এই নিয়ে তাঁদের নিজেদের মধ্যে বচসা ও তর্কাতর্কি শুরু হয়।

এমন সময় তাঁরা তাঁদের সামনে আচারবিচারহীন এক উলঙ্গ পাগলকে দেখে চিৎকার করে উঠলেন, কি সর্বনাশ! পাগলটা বুঝি আমাদের ছুঁয়ে ফেলে। এই পালা বলছি এখান থেকে।

পাগলের প্রকৃত পরিচয় তাঁদের জানা ছিল না বলে তাঁরা ঘৃণাভরে তাড়িয়ে দিচ্ছিলেন তাঁকে। পাগল তখন হাসতে হাসতে তাঁদের বললেন ভয় নেই, আমি তোমাদের ছোঁব না। কিন্তু এই সামান্য ব্যাপারে তোমরা

ঝগড়া করছ কেন ? পৈতের প্যাঁচ কেমন করে খুলতে হয় তা তোমরা জান না ? তোমরা কেমনতর বামুন গো ?

উলঙ্গ পাগলের মুখে একথা শুনে ব্রাহ্মণগণ বিস্মিত হয়ে গেলেন। তাঁরা বললেন, আমরা জানি কি করে পৈতের প্যাঁচ খুলতে হয়। গায়ত্রী জপ করলেই যজ্ঞসূত্র সরল হয়, প্যাঁচ খুলে যায়। কিন্তু এই পৈতেটি এমন ভাবে জড়িয়ে গেছে যে কিছুতেই খুলছে না। কতবার ত গায়ত্রী জপ করলাম।

তা শুনে পাগল শুধু বললেন, আমি কিন্তু পৈতের প্যাঁচ খুলে দিতে পারি।

ব্রাহ্মণদের মধ্যে একজন বললেন, পৈতেটা যখন কিছুতেই খোলা যাচ্ছে না, তখন পাগলটাকে দিয়ে দেখা যাক ও খুলতে পারে কি না। কার মধ্যে কি বস্তু লুকিয়ে আছে কে জানে ?

তখন তাঁরা একমত হয়ে জট পাকানো পৈতেটা পাগল সাধুর হাতে দিলেন।

পাগল সাধুবাবা প্রথমে যজ্ঞসূত্রটি হাতে নিয়ে গায়ত্রী জপ করলেন। তারপর হাততালি দিয়ে সুতোর দুই প্রান্ত ধরে সজোরে টেনে দিলেন। আর অমনি সঙ্গে সঙ্গে পৈতের প্যাঁচ খুলে গেল।

এ যেন অদ্ভুত এক কাণ্ড। পাগল সাধুর ক্ষমতা দেখে বিস্ময়ে হত-বাক হয়ে গেলেন ব্রাহ্মণেরা। তাঁরা বুঝলেন, ইনি পাগল বা সাধারণ সাধু নন, ইনি একজন অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষ। এই বুঝে তাঁরা তৎক্ষণাৎ বিনীতভাবে তাঁর চরণে প্রণত হলেন।

এই ঘটনার কথা গ্রামের সর্বত্র প্রচারিত হলো। তখন গ্রামের সকলেই তাঁর শক্তির কথা জানতে পারেন। অনেকে দেখতে এল তাঁকে।

লোকনাথ ভেঙু কর্মকারের বাড়িতেই থাকতেন। তিনি আসার পর থেকে কর্মকার বাড়িতে আয় উন্নতি হতে থাকে। ধনে জনে বাড়ি ভরে যায়।

বারদী গ্রামে লোকনাথ ব্রহ্মচারী আসার পর গ্রামেরও উন্নতি হতে থাকে। তিনি আসার আগে গ্রামে প্রতি বছর কলেরা বসন্ত প্রভৃতি মহামারীতে বহু লোক অকালে মারা যেত। কিন্তু তাঁর আসার পর সে মহামারী বা মড়ক

বন্ধ হয়ে যায়। ক্ষেতে নিয়মিত ফসল ফলতে থাকে। দৈব দুর্বিপাক বন্ধ হয়ে যায়। বৃক্ষেরা ফল দান করতে থাকে ঠিকমত। গাভীরা দুগ্ধ দান করতে থাকে। জেলেরা তাঁকে স্মরণ করে মাছ ধরতে গিয়ে প্রচুর মাছ পেতে থাকে। তাই গ্রামের লোকেরা তাঁকে দেবতাজ্ঞানে প্রায়ই পুজো দিয়ে যেত। নানারকম মানত করত তাঁকে স্মরণ করে আর তা সিদ্ধও হত।

এই সময় নীলকর ওয়াইজ সাহেবের নীলের কুঠি নিয়ে জমিদার নাগবাবুদের সঙ্গে জোর দাঙ্গাহাঙ্গামা বাধে। নাগবাবুরা লোকনাথবাবার শরণাপন্ন হলে তিনি তাঁদের অভয় দান করেন। তখন জমিদারদের জয় হয় এবং ওয়াইজ সাহেবের নীলের কারবার উঠে যায়। এই ঘটনার পর লোকনাথ বাবার উপর জমিদার নাগবাবুর ভক্তিশ্রদ্ধা অনেক বেড়ে যায়।

এর পর ভেঙু কর্মকারের মৃত্যু হওয়ায় তাদের বাড়ির একজন লোকনাথ বাবাকে তাদের বাড়ি থেকে অন্যত্র উঠে যেতে বলে। মেয়েদের অসুবিধা হচ্ছে বলে অজুহাত দেখায়।

তখন লোকনাথবাবা বললেন, আমি সন্ন্যাসী। এ বাড়ি ছেড়ে দিতে আমার কোন আপত্তি নেই। তবে তুমি তোমাদের কিসে ভাল হয়, কিসে মঙ্গল হয় তা বোঝনি।

লোকনাথ ব্রহ্মচারী কর্মকার বাড়ি ছেড়ে দিচ্ছেন একথা জানতে পেরে বারদী গ্রামের জমিদার নাগবাবুরা তাঁদের জায়গায় একটি আশ্রম গড়ে তুলে সেখানে থাকার জন্য প্রার্থনা জানালেন লোকনাথের কাছে। কিন্তু লোকনাথ বললেন, যদি তোমরা আমাকে এমন একটু জায়গা দিতে পার, যার জন্য কোন খাজনা দিতে হবে না, তবে আমি সেখানে আশ্রম করে থাকতে পারি।

বারদী গ্রামের পূর্ব দিকে একটা পতিত জায়গা ছিল। সেখানে শবদাহ হত বলে তার কোন খাজনা ছিল না। নাগবাবুরা সে জায়গা ছেড়ে দিলে লোকনাথ সেখানে আশ্রম তৈরি করে অবস্থান করতে লাগলেন।

ঈশ্বরকোটি ছাড়া অন্য কোন যুক্তযোগী মহাপুরুষ লোকালয়ে এসে বাস করেন না। ঠাকুর রামকৃষ্ণ ঈশ্বরকোটি ও জীবকোটি সাধকদের সম্বন্ধে বলতেন, কূপ খোঁড়ার কাজ হয়ে গেলে কেউ কেউ ঝুড়ি, কোদাল বিদেয় দেয়। আবার কেউ কেউ সে সব রেখে দেয় এই ভেবে, যদি পাড়ার কারো কখনো দরকার হয়। ঈশ্বরকোটি সাধকেরা স্বার্থপর নন। তাঁরা

জীবের দুঃখে কাতর হন। নিজেদের ব্রহ্মজ্ঞান হলেও এঁরা লোকশিক্ষার জন্য শরীরকে ধরে রাখেন, ব্রহ্মে লীন হন না। এঁরা যেন বাহাদুরী কাঠ। এ কাঠ নিজেও ভেসে যায়, আবার তার উপর কত মানুষ, গরু, হাতি পর্যন্ত বয়ে নিয়ে যেতে পারে।

ব্রহ্মভূত ষড়ৈশ্বর্যময় লোকনাথ ব্রহ্মচারী এই শ্রেণীর ঈশ্বরকোটি মহাপুরুষ। সুযোগ বুঝে আত্মপ্রকাশ করার জন্যই তিনি বারদী গ্রামে লীলা করতে আসেন। তবে লোকশিক্ষার জন্য লোকালয়ে এসেও তিনি ইচ্ছে করে ধরা না দিলে কারো সাধ্য নেই যে তাঁকে চিনতে পারে।

বারদীর ভক্তদের লোকনাথ একদিন বলেন, আমি ধরা না দিলে আমায় ধরতে পারে কার বাপের সাধ্যি।'

এদিকে লোকনাথবাবা ভেঙু কর্মকারের বাড়ি ছেড়ে দিয়ে আশ্রমে এসে বাস করতে থাকলে নানা বিপর্যয় দেখা দেয় কর্মকার বাড়িতে। তাদের ধন জন সব নষ্ট হয়ে যায় একে একে। বাড়িতে মাত্র দুজন লোক অবশিষ্ট থাকে। তার উপর আয় উপায়ের কোন সংস্থান নেই। তখন তারা নিরুপায় হয়ে বাড়ি ছেড়ে অন্যত্র চলে যায়।

ওঁ

লোকনাথ পশুপাখির ভাষা বুঝতেন এবং তাদের সঙ্গে আলাপ করতেন। বারদীর আশ্রমে অনেক পশুপাখি এমন কি কীটপতঙ্গের সঙ্গেও এক সহজ হৃদ্যতা গড়ে উঠেছিল তাঁর। কারণ তাঁর হিংসাবৃত্তি স্থির ছিল। হিংসাবৃত্তি স্থির হলে যোগীর সঙ্গে সমস্ত প্রাণীরই বন্ধুত্ব হয়। হিংসাবৃত্তি স্থির হওয়ার অর্থ হলো, যে কোন সময়ে যে কোন অবস্থায় যে কোন জায়গায় যে কোন প্রাণীর প্রতি কোন হিংসাভাব মনে উদয় না হওয়া। এই হিংসাবৃত্তি স্থির থাকার জন্যই লোকনাথের সঙ্গে বাঘ, সাপ প্রভৃতি হিংস্র প্রাণীরও অদ্ভুত বন্ধুত্ব হয়।

সমতলভূমিতে অবতরণ করার কিছুদিন আগে লোকনাথ ব্রহ্মচারী যখন জনমানবহীন চন্দ্রশেখর পাহাড়ে অবস্থান করছিলেন, তখন সেই দুর্গম পার্বত্য অরণ্যে একটি গুহাতে বসে প্রায়ই তিনি ধ্যানে মগ্ন হয়ে থাকতেন।

একদিন লোকনাথ যখন ধ্যানাবিষ্ট হয়ে ছিলেন তখন সহসা এক হিংস্র বাঘিনী ক্রুদ্ধভাবে গর্জন করতে করতে চারদিক কাঁপিয়ে তুলল। বাঘিনীটি তাঁরই অদূরে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে ছিল।

লোকনাথ চোখ খুলে দেখলেন, বাঘিণীর সামনে সদ্যোজাত তিনটি শাবক রয়েছে। লোকনাথ তা থেকে বুঝতে পারলেন, বাঘিনীটি মানুষ দেখে ভয় পেয়েছে, পাছে তার শাবকগুলি কেউ চুরি করে নিয়ে যায়।

লোকনাথ বাঘিনীর মনের ভাব বুঝতে পেরে আসন ছেড়ে তার কাছে গিয়ে বললেন, মা, তোমার কোনরকম ভয়ের কারণ নেই। তুমি তোমার শাবকদের নিয়ে এখানে স্বচ্ছন্দে ঘুমিয়ে পড়তে পার। আমি সাধু, তোমার কোন ক্ষতি করব না।

কি আশ্চর্যের ব্যাপার! বাঘিনীটিও লোকনাথের প্রেম ও মমতাপূর্ণ কথার মানে বুঝতে পারল। সে তার সব হিংস্রতা বা হিংসাভাব ভুলে গিয়ে গর্জন থামিয়ে শান্ত হলো। তারপর সেইখানেই তার শাবকদের নিয়ে ঘুমিয়ে পড়ল শান্ত মনে।

পরদিন সকালে উঠে আবার তেমনিভাবে গর্জন করতে শুরু করল বাঘিনী। এবারেও তার মনের কথা বুঝতে পারলেন মহাযোগী লোকনাথ। তিনি বুঝতে পারলেন, বাঘিনী আহার সংগ্রহের জন্য শিকারে যাবে। কিন্তু সদ্যোজাত এই শাবকরা তার সঙ্গে যেতে পারবে না। তাই কোথায় কার কাছে রেখে যাবে, কে তাদের দেখবে এই ভেবে দুশ্চিন্তায় গর্জন করছে সে।

তখন লোকনাথ করুণায় বিগলিতচিত্ত হয়ে বাঘিনীর কাছে গিয়ে বললেন, মা, তুমি নিশ্চিন্ত মনে শিকার করতে যেতে পার। তোমার শাবকদের জন্য চিন্তা করতে হবে না। আমি তাদের দেখব।

বাঘিনী এবারেও লোকনাথের কথা বুঝল। তাই সে শান্ত মনে তার বাচ্চাদের লোকনাথের সামনে রেখে শিকার করতে চলে গেল। কয়েক ঘণ্টা পরে বাঘিনী ফিরে এসে আবার গর্জন করতে লাগল। লোকনাথ বুঝলেন, বাঘিনী বলতে চাইছে, ও এসে গেছে। এবার সে তার বাচ্চাদের দেখাশোনা করবে ও স্তন্যপান করাবে। লোকনাথের এখন ছুটি।

দিন সাতেক এই একইভাবে কাটল। তারপর একদিন লোকনাথ

বাঘিনীর মন পরীক্ষা করার জন্য নির্দিষ্ট সময়ে বাঘিনীর কাছে না গিয়ে ধ্যানে বসলেন। ধ্যান ভঙ্গ হলে তিনি লক্ষ্য করলেন, বাঘিনী তার বাচ্চাদের অনিষ্ট আশঙ্কা করে আজ শিকারে যায়নি, এক পাও সেখান থেকে নড়েনি। কারণ আজ লোকনাথ তাকে অন্যদিনকার মত কোন অভয় বা আশ্বাস দেননি। তাই আজ সে শিকারে যাবার মনস্থ করেনি। শুধু কাতর চোখে লোকনাথের দিকে তাকিয়ে চুপচাপ বসেছিল।

পরদিন লোকনাথ বাঘিনীর কাছে গিয়ে বললেন, মাগো, গতকাল তোমার আহার হয়নি। আর দেরি না করে শিকার করতে যাও। আমি ওদের দেখব।

এ কথা শোনার পর বাঘিনী নিশ্চিন্ত হয়ে শিকার করতে চলে গেল।

এমনি করে মাসখানেক চলল। তারপর লোকনাথ একদিন ঠিক করলেন, সেই জায়গা থেকে আসন উঠিয়ে অন্য কোথাও চলে যাবেন।

এই ভেবে লোকনাথ সেখান থেকে এগিয়ে চললেন। কিন্তু কিছুদূর যাবার পর সেই বাঘিনীর গর্জন শুনতে পেলেন। সমস্ত বনভূমি কাঁপিয়ে বাঘিনী তাঁরই উদ্দেশে বারবার গর্জন করে চলেছে।

বাঘিনীর মনের কথা বুঝতে পেরে করুণায় বিগলিত হলো লোকনাথের অন্তর। তিনি আর যেতে পারলেন না। তিনি তখন বাঘিনীর কাছে ফিরে গিয়ে তাকে বললেন, মাগো, তুমি চুপ করো। আমি যাব না। যতদিন তোমার বাচ্চারা তোমার সঙ্গে শিকারে বার হবার উপযুক্ত না হয়, ততদিন আমি এখানেই থাকব।

লোকনাথের কাছ থেকে এই আশ্বাস পেয়ে খুশী হয়ে গর্জন থামাল বাঘিনী। সে নিশ্চিন্ত মনে শিকারে গেল লোকনাথের কাছে তার বাচ্চাদের রেখে। আনন্দের ঢেউ খেলে যেতে লাগল তার চোখে মুখে।

লোকনাথ তাঁর সত্যরক্ষা করলেন। তিনি সেই পার্বত্য অরণ্যের আস্তানায় আরও বেশ কিছুদিন রয়ে গেলেন। তারপর একদিন লক্ষ্য করলেন, বাঘিনী এবার তার বাচ্চাদের সঙ্গে নিয়ে শিকারে যাচ্ছে। লোকনাথের দিকে নীরব চোখে তাকিয়ে যেন বলতে চাইছে, এবার তার বাচ্চারা শিকারে যাবার উপযুক্ত হয়েছে। সুতরাং লোকনাথকে আর দেখাশোনা করতে হবে না তাদের।

সেইদিনই সে জায়গা ছেড়ে চলে গেলেন লোকনাথ।

যে যোগী সিদ্ধির চরম অবস্থা লাভ করে ঈশ্বরকে দর্শন করেন, তাঁর তখন সমস্ত জীবজগতে ঈশ্বর সত্তা উপলব্ধি হয়। সে কারণে হিংস্র প্রাণীরাও তাঁর কাছে বৈরীভাব ত্যাগ করে।

গীতায় বলা হয়েছে, যোগাভ্যাসদ্বারা যুক্তাত্মা সমাহিত চিত্ত যোগী সর্বত্র সমান ব্রহ্মকে দর্শন করেন। একেই সমদর্শন বলা হয়। যিনি পরমেশ্বরকে ভূত বা প্রাণীমাত্রে আর প্রাণীমাত্রকে পরমেশ্বরে দর্শন করেন, পরমেশ্বর তাঁর কখনো অদৃশ্য হন না আর তিনিও কখনো পরমেশ্বরের অদৃশ্য হন না। ঈশ্বর সর্বভূতাত্মা। ঈশ্বরকে সর্বভূতাত্মারূপে উপাসনা করলে সর্বত্র সমদর্শনরূপ আত্মজ্ঞানের উদয় হয়।

পাতঞ্জলও বলেছেন, অহিংসাবৃত্তি সমক্যকরূপে স্থির হলে সেই যোগীর কাছে অন্য সব হিংস্র জন্তুর প্রতি তাঁর হিংসাবৃত্তি থাকে না। তাঁকে তারা তাদের আপন জন বলে দেখতে থাকে। চন্দ্রনাথ পাহাড়ের বাঘিনী যেমন তার হিংসাবৃত্তি ভুলে অহিংসাবৃত্তিপরায়ণ যোগী লোকনাথ ব্রহ্মচারীকে তার আপন জন ভেবে তাঁর কাছে তার সদ্যোজাত বাচ্চাদের রেখে নিশ্চিন্ত মনে শিকারে চলে যেত দিনের পর দিন।

সমদর্শী মহাযোগী লোকনাথ ব্রহ্মচারীর অন্তরে ছিল অপরিসীম করুণা। এই অন্তহীন করুণার অমৃত ধারা মানুষ, পশুপাখি, কীটপতঙ্গ প্রভৃতি সকল প্রাণীর উপর দিয়ে সমানভাবে বয়ে চলত। তাদের সকলকে কৃতার্থ করত।

বারদীর আশ্রমে প্রতিদিন আহারের সময় লোকনাথ বাবা আয় আয় বলে ডাক দেন আর সঙ্গে সঙ্গে কত পশুপাখি ও কীটপতঙ্গ এসে হাজির হয়। আশ্রমের গাছের ডালে কত রকমের পাখি উড়ে আসে। কখনো তাঁর জটাজালে, কখনো তাঁর কাঁধে, আবার কখনো বা তাঁর কোলে এসে বসে। লোকনাথ নিজের হাতে তাদের খাইয়ে দেন। ছোট ছোট সারবদ্ধ পিঁপড়ের সামনে মিছরির গুঁড়ো ছড়িয়ে দেন! যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তা খেয়ে নিরাপদে সরে না পড়ে ততক্ষণ কাছে বসে থাকেন।

আশ্রমের দক্ষিণ দিকে একটা খোলা মাঠ ছিল। ঐ মাঠ থেকে প্রতিদিন একটি ষাঁড় লোকনাথের কাছে এসে কিছু না কিছু খেয়ে যায়

লোকনাথ তাকে কালাচাঁদ বলে ডাকেন। তাকে সন্তানের মত স্নেহ করেন।

সেদিন বারদী গ্রামের এক ভক্ত চাষী এক কাঁদি মর্তমান কলা নিয়ে আশ্রমে এসে হাজির হলো। লোকনাথ বাবার ঘরের সামনে কাঁদিটি রেখে বাবার উদ্দেশে প্রণাম জানিয়ে চলে গেল চাষীটি। বাবার ঘরের দরজা তখন বন্ধ ছিল।

ঐ সময় ঘরের বারান্দায় আশ্রমের ভৃত্য ও বাবার সেবক হিন্দুস্থানী ভজলেরাম আর একজন ভক্ত বসে ছিল। এমন সময় মাঠ থেকে 'হাম্বা হাম্বা' রব করতে করতে কালাচাঁদ এসে হাজির হলো। এসেই বাবার ঘরের দিকে একবার তাকিয়ে সে কাঁদি থেকে কলাগুলো খেতে লাগল। তা দেখে ভজলেরাম চেঁচামিচি শুরু করে দিল। ভক্তটি তখন ব্যস্ত হয়ে কাঁদিতে যে তিন চারটি কলা অবশিষ্ট ছিল তা সরিয়ে নিয়ে গেল। এমন সময় বন্ধ ঘরে ভিতর থেকে অন্তর্যামী সমদর্শী লোকনাথের কণ্ঠস্বর শোনা গেল। তিনি বললেন, ওর গ্রাসের কলা নিলি কেন?

ভক্তটি বলল, না বাবা, আমি ওর গ্রাসের কলা নিইনি। কাঁদিতে যা পড়ে ছিল, তাই সরিয়ে রেখেছি।

এই বলে ভক্ত সেই কলা ক'টি হাতে ধরে কালাচাঁদকে খাইয়ে দিল। লোকনাথও সন্তুষ্ট হয়ে চুপ করে রইলেন। তিনি তাঁর এই সমদর্শী আচরণের দ্বারা এই শিক্ষা ভক্তদের দিলেন যে, আশ্রমের যে কোন জিনিসের উপর সকল জীবের সমান অধিকার আছে।

তখন বারদীর জমিদার ছিলেন অরুণকান্তি নাগ। একদিন নাগ মশায় লোকনাথের আশ্রমে এসে উপস্থিত হলেন। তিনি সোজা বাবার ঘরের দিকে এগিয়ে গেলেন। কিন্তু ঘরের দরজার কাছে পা রাখতেই ঘরের ভিতর থেকে বাবা বলে উঠলেন, বাবা অরুণ, এখন ঘরের ভিতর আসবি নে। আমার পরিবার খাচ্ছে। খাওয়া হয়ে গেলে ঢুকবি।

নাগবাবু বাবার কথার মানে বুঝতে না পেরে ভাবলেন, হয়ত কোন কুলবধূ বাবাকে দর্শন করতে এসে এখন বাবার প্রসাদ পাচ্ছেন। তাই তিনি বাবার আদেশমত ঘরের বারান্দায় বসে অপেক্ষা করতে লাগলেন। দেখতে দেখতে পাকা দুঘণ্টা কেটে গেল। কিন্তু তবু ঘরের দরজা খুলল না দেখে

তিনি বাতার বেড়ার ফাঁক দিয়ে ঘরের ভিতরে উঁকি মেরে দেখলেন : কিন্তু ঘরের মধ্যে কোন লোককে দেখতে পেলেন না।

এমন সময় বাবা ঘরের দরজা খুলে দিয়ে বললেন, বাবা অরুণ, এবার তুই ঘরের ভিতরে আসতে পারিস।

নাগবাবু তখন ঘরে ঢুকে বাবাকে প্রণাম নিবেদন করে বললেন, ব্রহ্মচারী বাবা, আপনি তখন বললেন, আপনার পরিবার খাচ্ছে। কিন্তু কই ঘরে ত কাউকে দেখতে পাচ্ছি না।

একথা শুনে বাবা বললেন, ঐ দেখ, আমার পরিবার কেমন খেয়ে খুশি মনে চলে যাচ্ছে।

বাবার কথা শুনে নাগ মশায় তাকিয়ে দেখলেন, একদল পিঁপড়ে সার বেঁধে ঘরের ভিতর থেকে সৈন্যদলের মত চলে যাচ্ছে। নাগবাবু এবার বুঝতে পারলেন, মহানপ্রাণ লোকনাথ বাবা নির্জন ঘরের মধ্যে নিজের হাতে মিছরির গুঁড়ো ছড়িয়ে পিঁপড়ের দলকে খাওয়াচ্ছিলেন। যতক্ষণ তাদের খাওয়া শেষ না হয়, ততক্ষণ একমনে তাদের কাছে বসেছিলেন। তাদের খাওয়ার সময় কেউ ঘরে ঢুকলে বহু পিপড়ে পদদলিত হয়ে মারা যেত। তাই কাউকে তখন ঘরে ঢুকতে দেননি। খাওয়া শেষ করে তারা সরে যেতেই নাগমশায়কে ঘরে ঢুকতে বলেন বাবা।

নাগবাবু আশ্চর্য হয়ে ভাবতে লাগলেন, সকল জীব এমন কী পিঁপড়ের মত ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র প্রাণীর প্রতিও কী অপরিসীম করুণা ও মমতা লোকনাথ বাবার! হিংসা ত্যাগ করে ভালবাসা দিয়ে কিভাবে সব প্রাণীকে আপন করে নেওয়া যায়, এই শিক্ষাই তিনি পেলেন সেদিন বাবার কাছে।

আর একদিন লোকনাথবাবা আশ্রমে বসে ভক্তদের উপদেশ দিচ্ছিলেন, এমন সময় এক মহিলা বাবার আহারের জন্য এক বাটি গরম দুধ ও সর নিয়ে এসে বাবার সামনে তা রেখে প্রণাম জানিয়ে চলে গেলেন।

দুধ ঠাণ্ডা হয়ে গেলেও বাবার সেদিকে খেয়াল নেই। কিছুক্ষণ পর তিনি 'আয় আয়' বলে কাকে ডাকতে লাগলেন। কিন্তু কাকে ডাকছেন তা কেউ বুঝতে পারল না। উপস্থিত ভক্তদের মধ্যে সেদিন ভোলানন্দ গিরির শিষ্য পশ্চিমবাংলার বর্ধমান নিবাসী পুলিস সাব ইনস্পেক্টর গৌরগোপাল রায় ছিলেন সেখানে।

কিছুক্ষণ সকলে ভীত ও আশ্চর্য হয়ে দেখল, প্রকাণ্ড এক কেউটে সাপ দুধের বাটির দিকে এগিয়ে আসছে। দুধ খাওয়ার জন্য বাবা এতক্ষণ একেই ডাকছিলেন। গৌরগোপালবাবু সাপটিকে দেখে ভয়ে চিৎকার করে উঠলেন। তিনি বাবার কাছে ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে বসে রইলেন।

সাপটি লোকনাথবাবার কাছে গিয়েই তার ফণা বিস্তার করল। লোকনাথবাবা তখন সেই ফণাটি ধরে দুধের বাটির মধ্যে ডুবিয়ে দিলেন। বাটির সব দুধ পান করে সাপটি তার ফণাটি আবার তুলতেই বাবা তাকে বললেন, এখন চলে যা।

এই কথা বলামাত্র সাপটি ফণা নামিয়ে ধীরে ধীরে যেখান থেকে এসে-ছিল সেইখানে চলে গেল।

এতক্ষণ উপস্থিত সকলে স্তব্ধ হয়ে এই অলৌকিক কাণ্ড দেখছিলেন। এর পর বাবা সেই দুধের বাটি থেকে খানিকটা সর নিজের মুখে পুরে গৌরবাবুকে বললেন, নে, প্রসাদ নে!

গৌরবাবু সেই সর বিষাক্ত সাপের উচ্ছিষ্ট ভেবে তা নিতে ইতস্ততঃ করছিলেন। তা দেখে বাবা বললেন, ইতস্তত করছিস কেন? নে না, কোন ভয় নেই।

গৌরবাবু তখন মন থেকে সব দ্বিধা ঝেড়ে ফেলে মহাপুরুষের প্রসাদ অমৃত মনে করে তা পরম ভক্তিভরে গ্রহণ করলেন।

সকল প্রাণীর প্রতি বাবার কী অলৌকিক অহিংসা, মৈত্রী ও করুণা! যাকে লোকে সাক্ষাৎ যম ভাবে, সেই বিষধর কেউটে সাপের সঙ্গেও তাঁর কি অপূর্ব সখ্যতা! আর সেই বিষধর সাপও তার স্বভাবজাত সব হিংস্রতা ভুলে তাঁর সব আদেশ মেনে চলে আপন জনের মত।

সেদিন রাতে বাবার এক শিষ্য বাবার ঘরের দক্ষিণের বারান্দায় কম্বল বিছিয়ে বসে জপ করতে যাবেন, এমন সময় একটা ঘেয়ো কুকুর এসে তাঁর কাছে বসে গা চুলকাতে লাগল। কুকুরটির গা থেকে দুর্গন্ধ বার হচ্ছিল। শিষ্যটি তখন সেখান থেকে উঠে পূব দিকের বারান্দায় চলে গেলেন। কিন্তু কুকুরটিও তাঁর কাছে গিয়ে তেমনি করে গা চুলকাতে লাগল। এর পর শিষ্য আর এক জায়গায় গেলে কুকুরটিও তাঁর কাছে গেল। বাবা তখন ঘরের ভিতরে ছিলেন শিষ্যটি চেঁচামিচি করতে পারলেন না। তবে বাবার

উপর রাগ করে মনে মনে বললেন, বাবা, এভাবে আমায় কুকুর দিয়ে বিরক্ত করছেন।

সঙ্গে সঙ্গে কুকুরটি আপনা থেকে উঠে সেখান থেকে চলে গেল। শিষ্যটি এবার জপ করতে বসলেন। কিন্তু কিছুতেই মনস্থির করতে পারলেন না। সারারাত অস্থিরতার মধ্য দিয়েই কেটে গেল।

পরদিন ভোরবেলায় বাবা দরজা খুলে শিষ্যটিকে বললেন, রাতে তোকে মশা কামড়াচ্ছিল না কিরে?

শিষ্যটি বললেন, না বাবা, মশা নয়। গত রাতে একটি ঘেয়ো কুকুর বড় জ্বালাতন করেছে। বারবার আমার গা ঘেঁষে বসে গা চুলকিয়েছে। তার শরীরের দুর্গন্ধে আমি খুবই বিরক্ত বোধ করছিলাম।

একথা শুনে বাবা বললেন, তুই কেন তার গায়ে আঘাত করেছিস? তাকে মারবার অধিকার তোর নেই। তাড়িয়ে দিবি। যদি সে না যায় তবে তোকেই সরে যেতে হবে। আমার কথা মনে রাখিস।

সামান্য এক ঘেয়ো কুকুরের প্রতি বাবার এই অসীম করুণা দেখে আশ্চর্য হয়ে গেলেন শিষ্যটি। বাবা তাঁকে এই শিক্ষাই দিলেন যে, তুমি বিরক্ত হলেও তোমার থাকবার মত অনেক জায়গা জুটবে। কিন্তু ঐ নিরাশ্রয় ঘেয়ো কুকুরটির থাকবার মত জায়গা জুটবে না। যদি সে থাকার জায়গা পায়, তবে সে নিশ্চয়ই চলে যাবে। আর যদি তা না পায়, তবে তোমারই উচিত হবে তাকে ঐ জায়গা ছেড়ে দিয়ে অন্যত্র চলে যাওয়া।

আশ্রমে একটি বিড়াল ছিল। লোকনাথ বাবা তাকে আদুরী বলে ডাকতেন। তাকে সন্তানের মত স্নেহ করতেন। একদিন বিড়ালটির প্রসব বেদনা উঠলে সে বাবার ঘরের বারান্দার এক কোণে প্রসবের জায়গা বেছে নেয়। তখন আশ্রমের ভৃত্য ভজলেরাম বারান্দার শুচিতা নষ্ট হবার ভয়ে লাঠি নিয়ে তাড়া করে বিড়ালটিকে।

প্রসব বেদনায় অস্থির হয়ে বিড়ালটি যেখানেই যেতে লাগল সেখানেই তাড়া খেতে লাগল। অবশেষে সে নিরুপায় হয়ে বাবার ঘরের বন্ধ দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে কাতর প্রাণে ডাকতে লাগল। সে ডাক শুনে পরম করুণাময় বাবার অন্তর বিগলিত হলো। তিনি সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে দিলেন। বিড়ালটি নির্ভয়ে তার কাছে গেলে তিনি তাকে নিজের কোলে তুলে নিয়ে

বললেন, মা আদুরী, আর তোর কোন ভয় নেই। তুই শান্ত হয়ে থাক।

বিড়ালটি তখন তাঁর কোলের মধ্যে প্রসব করল। ফলে তাঁর পরনের কাপড় ও বসার বালাপোষখানি নষ্ট হয়ে গেল। কিন্তু কোনরূপ বিরক্ত বোধ করলেন না তিনি। কারণ তিনি তাকে যথার্থই সন্তানের মত জ্ঞান করতেন।

গোয়ালাদের এক মহিলা আশ্রমে কাজ করত। তাকে সবাই বলত গোয়ালিনী মা। তার উপর আশ্রমের অতিথিসেবা, প্রসাদ বিতরণ ও রোগীদের পরিচর্যা করার ভার দেওয়া ছিল।

একদিন একটি ব্যাধিগ্রস্ত কুকুর মুমূর্ষু অবস্থায় কোথা থেকে এসে লোকনাথবাবার ঘরের বাইরে এক পাশে শুয়ে রোগ যন্ত্রণায় ছটফট করতে লাগল। গোয়ালিনী মা তাকে প্রথম দেখতে পায়।

গোয়ালিনী মা তখন লোকনাথ বাবাকে বললেন, বাবা তুমি ত কত জীবকে কৃপা করছ। আশ্রমে একটি ব্যাধিগ্রস্ত কুকুর এসে শুয়ে পড়েছে। যন্ত্রণায় এমন ছটফট করছে যে, চোখে দেখা যায় না। হে করুণাময়, কুকুরটার একটা গতি করে দাও। আমি যে আর সইতে পারছি না।

গোয়ালিনী মায়ের এই কাতর আবেদন শুনে মহাযোগী লোকনাথ ব্রহ্মচারী ঘরের বাইরে এসে সেই রোগযন্ত্রণাকাতর কুকুরটির কাছে গেলেন। তারপর কুকুরটির ভূরুর মাঝখানে ডান হাতটা ছোঁয়ালেন।

সকলে আশ্চর্য হয়ে দেখল, কুকুরটি তৎক্ষণাৎ সমস্ত রোগ যন্ত্রণা হতে মুক্তি পেয়ে সুস্থ হয়ে উঠল। সে উঠে দাঁড়িয়ে শান্ত ভাবে লোকনাথবাবার মুখের দিকে কৃতজ্ঞতার দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।

এইভাবে আর্ত জীবের দুঃখে দুঃখবোধ করে সে দুঃখ দূর করতেন ব্রহ্মভূত মহাযোগী লোকনাথ।

মিরপুর গ্রামনিবাসী বারদী স্কুলের পণ্ডিত বিপিনবিহারী সরকার একদিন বাবা লোকনাথ ব্রহ্মচারীকে দর্শন করতে আসেন। তিনি এসে ব্রহ্মচারী বাবার সঙ্গে কথাবার্তা বলতে লাগলেন। এমন সময় আশ্রমের এক গাছের ডালে বসে একটা কাক কর্কশ স্বরে ডাকতে লাগল।

আলাপে ব্যাঘাত ঘটায় পণ্ডিত মশায় একটা ঢিল ছুঁড়ে তাড়িয়ে দিয়ে আবার আলাপ করতে লাগলেন। কিন্তু কাকটা আবার সেইখানে এসে বসে

তেমনি করে ডাকতে লাগল। পণ্ডিত আবার ঢিল ছুঁড়ে কাকটাকে তাড়িয়ে দিলেন।

তা দেখে বাবা লোকনাথ পণ্ডিত মশায়কে বললেন, কাকের রব তোর কাছে কর্কশ লাগছে, তুই ওকে বারবার তাড়িয়ে দিচ্ছিস। কিন্তু দেখ, তোর কথা আমার কাছে কর্কশ ও বিকৃত লাগলেও আমি তোকে তাড়িয়ে দিচ্ছি না।

এই কথা শুনে পণ্ডিত মশায় লজ্জিত হয়ে নিজের ভুল বুঝতে পারেন। তিনি বুঝতে পারলেন সমদর্শী ব্রহ্মজ্ঞানী লোকনাথবাবা তাঁর এই কথার মধ্য দিয়ে এই শিক্ষাই দিলেন যে, সংসারে যে সব মানুষ ও জীবজন্তু আমাদের অপ্রিয় ও কুৎসিত, তাদের তাড়িয়ে দেবার অধিকার আমাদের নেই। সৃষ্টির কোন বস্তুকে ঘৃণা বা অনাদর করা মহাপাপ।

পণ্ডিত মশায় আরও বুঝলেন, সংসারী লোকের কথাবার্তা স্বার্থযুক্ত এবং কামনা বাসনায় ভরা বলে যোগসিদ্ধ মহাপুরুষদের ভাল লাগে না। তবু তাঁরা তাদের ঘৃণা করে তাড়িয়ে দেন না। গীতায় আছে, সাধারণ প্রাণীর যেখানে রাত্রি, সিদ্ধ সাধকেরা যেখানে জাগ্রত থাকেন। আবার যেখানে সাধারণ প্রাণীরা জাগ্রত থাকে, সাধকেরা সেখানে নিদ্রিত থাকেন। অর্থাৎ যে সব ভোগ্য বিষয়ের প্রতি সাধারণ মানুষ সদাজাগ্রত ও সচেতন, সাধকেরা সে বিষয়ে সদা উদাসীন। আবার যে সব আধ্যাত্মিক বা পারমার্থিক বিষয়ে সাধারণ মানুষ উদাসীন, সাধুরা সে বিষয়ে সদা সচেতন বা সদাজাগ্রত।

লোকনাথবাবার একবার চাষ করার সখ হয়। বারদীর জমিদার নাগবাবুরা বাবার অনুগত ভক্ত। তাঁরা চাষের জন্য ক্ষেত ও লোকজনের ব্যবস্থা করে দিলেন। চাষের সব ব্যবস্থা হয়ে গেল। যথাসময়ে বর্ষাকালে ধান রোপন করা হলো। শীতকালে ধান পাকল। এমন সময় রোজ রাতে বুনো শুয়োরের পাল ক্ষেতে এসে ধান নষ্ট করে দিতে লাগল। আশ্রমবাসীরা প্রথমে বুঝতে পারেনি। পরে রাতে পাহারা দিয়ে তারা লক্ষ্য করল, রোজ রাতে শুয়োরগুলো আসে। কিন্তু তারা লাঠি হাতে ক্ষেতে পেঁছিবার আগেই শুয়োরগুলো পালিয়ে গেল।

এই ভাবে পরপর কয়েকরাতে যথাসময়ে লাঠিহাতে ক্ষেতে পেঁছানোর আগেই শুয়োরগুলো পালিয়ে যেতে লাগল। এক দিনও তারা ফসলনষ্ট

কারী শুয়োরগুলোকে ধরতে বা মারতে পারল না। ফলে শুয়োরদের হাত থেকে ধান রক্ষা করা গেল না। ব্যাপারটা অনেকটা রহস্যময় বোধ হলো আশ্রমবাসীদের কাছে।

অবশেষে এক ভক্ত সে রহস্য ভেদ করলেন। তিনি বললেন, বাবা বন্ধ ঘরের ভিতরে থাকলেও যোগবলে ক্ষেতে কে কখন আসছে না আসছে সব দেখতে পান। একদিন আমি নিজের কানে শুনলাম, বাবা ঘরের ভিতর থেকে শুয়োরগুলোর উদ্দেশ্যে বলছেন, ওরে তোরা তাড়াতাড়ি কাজ সেরে সরে পড়। ঐ দেখ, লাঠি নিয়ে ওরা মারতে আসছে তোদের। বাবা এতদূরে থেকে একথা বললেও বাবার অলৌকিক শক্তি বলে শুয়োরগুলো সে কথা বুঝতে পারে এবং তারা ঠিক সময়ে সরে পড়ে।

সকল জীবের প্রতিই লোকনাথ বাবার এমনি করুণা। আশ্রমবাসীরা লোকনাথ বাবার মুখ থেকেই আসল ব্যাপারটা শুনতে চাইল।

লোকনাথ বাবা তখন স্বীকার করলেন, তিনিই রোজ রাতে সতর্ক করে দেন শুয়োরগুলোকে।

আশ্রমবাসীরা পরে বুঝল, এই ঘটনার দ্বারা লোকনাথবাবা এই শিক্ষা দিলেন যে, এই জগতের সব বস্তুই ঈশ্বরের। তাতে কোন মানুষের ব্যক্তিগত অধিকার নেই। আবার এই জগতের সকল জীবও ঈশ্বরের সৃষ্টি; সুতরাং ঈশ্বরের সব বস্তুতে তাঁরই সৃষ্ট সব জীবের সমান অধিকার আছে।

ওঁ

লোকনাথ ব্রহ্মচারী এমনই সিদ্ধ মহাপুরুষ ছিলেন যে, কোন জায়গায় সে যত দূরেই হোক, যে কোন মানুষ ভক্তিভরে একাগ্রচিত্তে তাঁকে স্মরণ করলে তিনি বুঝতে পারতেন। তাঁর হৃদয়তন্ত্রীতে সেই স্মরণকারী ব্যক্তির মনের কথা সব অনুরণিত হত। তার ছবি ভেসে উঠত তাঁর মানসনেত্রে। সে ব্যক্তি যদি আর্ত বা বিপদাপন্ন হত, তাহলে তিনি সূক্ষ্ম শরীরে তৎক্ষণাৎ তার কাছে আবির্ভূত হয়ে তাকে উদ্ধার করতেন।

দার্জিলিং-এর ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট একবার এক দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হন। বড় বড় ডাক্তারেরা যথাসাধ্য চিকিৎসা করতে লাগলেন। কিন্তু শত চেষ্টা সত্ত্বেও রোগ কমল না, বরং রোগীর অবস্থা ক্রমশই খারাপ

হতে লাগল। সকলেই হতাশ হয়ে পড়ল!

দৈবক্রমে একদিন পার্বতীবাবুর এক বন্ধু তাঁকে দেখতে এলেন তাঁর বাড়িতে। বন্ধুটি বারদীর ব্রহ্মচারী লোকনাথ বাবার পরম ভক্ত ছিলেন। তিনি বললেন, পার্বতীচরণ, তুমি কিছুমাত্র ভেবো না। তুমি এক মনে লোকনাথ ব্রহ্মচারীকে স্মরণ করো। তাহলেই রোগমুক্ত হবে।

বন্ধুর কথামত পার্বতীবাবু একমনে ব্রহ্মচারী লোকনাথবাবাকে মনে মনে ডাকতে লাগলেন।

সেদিন রাতেই এক অলৌকিক ব্যাপার ঘটল। তন্দ্রাবিষ্ট অবস্থায় পার্বতীবাবু দেখলেন, জটাজুটমণ্ডিত এক মহাপুরুষ তাঁর শিয়রে বসে তাঁর মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন। তন্দ্রাভাব কেটে গেলে বাড়ির লোক-জনদের ডেকে পার্বতীবাবু জিজ্ঞাসা করলেন তারা সেই মহাপুরুষকে দেখেছে কিনা। সেই মহাপুরুষের চেহারার বর্ণনা শুনে সকলেই বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে গেল।

পরের দিন পার্বতীবাবুর সেই বন্ধুটি এ রহস্য ভেদ করলেন। তিনি বুঝিয়ে দিলেন, সেই মহাপুরুষই লোকনাথ ব্রহ্মচারী। তাঁর চেহারা এই রকম। তুমি তাঁকেই দেখছ। যে কোন আর্ত ব্যক্তি তাঁকে একমনে ডাকলে তিনি এইভাবে সাড়া দেন তার ডাকে। তিনি অগতির গতি। যে কোন শরণাগত ব্যক্তিকে এইভাবে তাঁর লীলাবিভূতি প্রদর্শন করেন। দু তিন বছর পর একদিন পার্বতীচরণ বারদীর আশ্রমে লোকনাথ ব্রহ্মচারীকে দর্শন করতে এলেন। বাবাকে দর্শন করার পর পার্বতীবাবু অন্তরের কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বললেন, আপনার জন্যই আমি এ জীবন ফিরে পেয়েছি। এখন আদেশ করুন, আমি কিভাবে আপনার এই মানবসেবাব্রতে সাহায্য করতে পারি।

বাবা লোকনাথ একথা শুনে কোন উত্তর না দিয়ে শুধু একটু হাসলেন। পার্বতীবাবু সকৃতজ্ঞচিত্তে নিজেকে লোকনাথবাবার কাজে লাগাতে চাইলেও বাবার কাছ থেকে কোন নির্দেশ না পেয়ে চলে গেলেন।

সর্বত্যাগী ব্রহ্মচারী হয়েও লোকনাথ সমাজের কথা ভাবতেন। সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষের মঙ্গলচিন্তা করতেন। বিশেষ দুস্থ ও দুর্গত মানুষদের দুঃখে তাঁর প্রাণ কাঁদত। যথাসাধ্য তাদের দুঃখমোচনের চেষ্টা

না করে পারতেন না।

পার্বতীবাবু আশ্রম থেকে চলে যাবার বেশ কিছুদিন পর এক সময় লোকনাথবাবা তাঁর শিষ্য রজনী চক্রবর্তীকে বললেন, রজনী, পার্বতীচরণ আমাকে বলেছিল, আমার আদেশ পেলে সে আমার যে কোন কাজ করে দেবে। দেখ, ইংরেজ সরকার যে আয়কর বসিয়েছে, তা এ দেশের বহু লোকের পক্ষে পীড়াদায়ক বলে মনে হচ্ছে। পার্বতীচরণ কি চেষ্টা করে এর কোন প্রতিবিধান করতে পারে না?

রজনীবাবু বললেন, না, পার্বতীবাবু তা করতে পারেন না। কারণ যে আইনসভায় আইন পাশ হয়, তাতে পার্বতীবাবুর কোন হাত নেই।

সে সময় লোকনাথবাবার আর এক ভক্ত ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট চন্দ্রকুমার-বাবু সেখানে ছিলেন। তাঁকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করতে তিনিও বললেন, রজনীবাবু ঠিকই বলেছেন, এতে পার্বতীবাবুর কোন হাত নেই।

একথা শুনে লোকনাথবাবা বললেন, তাহলে পর্বতীচরণকে দিয়ে আর কি কাজ করাব?

পরার্থপর মহাপ্রাণ লোকনাথ ব্রহ্মচারী তখন আয়কর নিয়ে এত যে মাথা ঘামাচ্ছিলেন তার কারণ ছিল। কারণ তাঁর মনে হয়েছিল, এই আয়কর সার্বজনীন ও বাধ্যতামূলক হওয়ায় সাধারণ মানুষের পক্ষে এটা খুবই কষ্টকর হবে। যারা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খেটে দু চার পয়সা রোজগার করে কোন রকমে সংসার চালায়, পরিবার-বর্গের ভরণ পোষণ করে, তাদের পক্ষে এই কর দেওয়া খুবই কষ্টসাধ্য ব্যাপার। তাই তাদের দুঃখের কথা ভেবেই পরম করুণাময় লোকনাথ বাবার প্রাণ কাঁদত। হৃদয় বিগলিত হত।

এই করনিবারণের জন্য কাউকে কোন চেষ্টা করতে হয়নি। ব্রহ্মজ্ঞানী মহাপুরুষ লোকনাথ বাবার প্রবল ইচ্ছাশক্তির প্রভাবেই সেই বছর আয়কর সংক্রান্ত আইন পরিবর্তিত হয়।

সেদিন বারদী গ্রামের কয়েকজন কর্মকার বাবা লোকনাথের কাছে এসে বলল, বাবা, আসছে মাসে আমাদের ছেলের বিয়ে দিতে চাই। আপনি এই শুভকাজের জন্য দয়া করে একটা ফর্দ করে দিন।

লোকনাথ বাবা গ্রামবাসীদের নানা রকমের অনুরোধ রক্ষা করে থাকেন।

তাই কর্মকারদের এ অনুরোধও প্রত্যাখ্যান করতে পারলেন না। তাই তাদের অনুরোধে তখনি একটা ফর্দ করে দিলেন।

সেই ফর্দ পড়ে কর্মকারদের একজন বলল, বাবা, আপনি ফর্দে আতসবাজির কথা লিখেছেন। কিন্তু আমাদের বাজিতে দরকার নেই। কারণ আমাদের এক শরিকের ছেলের বিয়েতে বাজি পোড়ানোর সময় আগুন লেগে গাঁয়ের বিশেষ ক্ষতি হয়েছিল।

একথা শুনে লোকনাথ বাবা বললেন, বেশ ত, বিয়ের দিন বাজিগুলো এনে এই আশ্রমের সামনে পোড়াবি। তাহলে ত আর গাঁয়ের কোন ক্ষতি হবে না।

ফর্দতে বাজনা ধরা হয়েছিল। তা দেখে কর্মকারদের আর একজন বলল, আমাদের এক শরিকের বিয়েতে ইংরিজি বাজনা আনা হয়েছিল। আমাদেরও খুব ইচ্ছে এই বিয়েতে ইংরিজি বাজনা আনার।

শুনে লোকনাথবাবা বললেন, ইংরিজি বাজনা আনার কোন প্রয়োজন দেখছি না। যদি একান্তই ইংরিজি বাজনা আনতে হয়, তাহলে বারদী গ্রামের যে কয়েকঘর গরীব ব্রাহ্মণ ও দুঃখী আছে তাদের ভোজনের ব্যবস্থা করতে হবে। তাদের প্রত্যেকের ঘরে চাল, ডাল, মাছ, পান ও দই পাঠাতে হবে।

কর্মকারগণ বাবার এই প্রস্তাবে রাজী হলে বিয়েতে ইংরিজি বাজনাও ধরা হলো।

বিয়ের ফর্দ থেকে বাজি উঠিয়ে দিলে যারা বাজি তৈরি করে জীবিকা নির্বাহ করে তাদের ক্ষতি হবে মনে করেই বাবা লোকনাথ বিয়ের ফর্দতে বাজির কথা নিয়ে এত আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। তিনি আরও মনে করে-ছিলেন, ইংরিজি বাজনায় খরচ না করে গ্রামের গরীব ব্রাহ্মণ ও দুঃখীদের ভোজন করানো অনেক বেশী মঙ্গলজনক। যে সব গরীব ব্রাহ্মণ অনাসক্ত হয়ে ধর্মাচরণ করছেন তাঁদের দান করলে তাঁদের আশীর্বাদে স্বয়ং ভগবান ঐ দাতাদের উপকার করবেন। ভক্তকে সাহায্য করলে ভক্তবৎসল ভক্তানুগত ভগবান সাহায্যকারীদের অবশ্যই পুণ্যফল দান করেন। এই জন্যই তিনি এ ব্যাপারে জেদ ধরেছিলেন।

তাঁর জেদের মধ্য দিয়ে আর একটি শিক্ষা দিতে চেয়েছিলেন সিদ্ধ

মহাপুরুষ লোকনাথ। তিনি বলতে চেয়েছেন সমাজে বিভিন্ন শ্রেণীর লোক বাস করে। সকল শ্রেণীর মানুষই পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। তাই কোন বিয়ে বা পারিবারিক উৎসবে বিভিন্ন শ্রেণীর লোক যোগদানের মাধ্যমে আনন্দলাভ করতে গেলে তাতে সমাজের মধ্যে শ্রেণীগত ঐক্য ও সংহতি বজায় থাকবে। শ্রেণীবৈষম্য প্রকট হয়ে উঠবে না।

একদিন বিক্রমপুরের এক ছুতোর মিস্ত্রী বাবা লোকনাথের কাছে এসে বলল, বাবা, আজ আমি বড় বিপদে পড়ে আপনার কাছে এসেছি। আপনি আমাকে এই বিপদ থেকে রক্ষা করুন।

তা শুনে বাবা লোকনাথ বললেন, কিন্তু বিপদটা কি তা না বললে কি করে রক্ষা করব?

মিস্ত্রী বলল, আমি আমার এক ছেলেকে সার্ভে স্কুলে ভর্তি করেছি। কিন্তু এখন আর খরচ চালাতে পারছি না।

লোকনাথবাবা তখন প্রশ্ন করে তার আর্থিক অবস্থার কথা জেনে নিয়ে বললেন, তোর ছেলেকে স্কুল ছাড়িয়ে দে। তোর ছেলেকে কোন জমিদারি সেরেস্তায় কাজ শেখার জন্য রাখার ব্যবস্থা কর।

মিস্ত্রী এই কথা মেনে নিয়ে বলল, তাই হবে।

সর্বত্যাগী ও সংসারে অনভিজ্ঞ হলেও সমাজের স্থান কাল ও পাত্রের দিকে প্রখর দৃষ্টি ছিল লোকনাথবাবার। তাঁর মতে যারা সমাজের কাল ও অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা না করে, তারা মিস্ত্রীর মত জীবন সংগ্রামে হেরে যায়, আর্থিক অনটনকে ডেকে আনে। মিস্ত্রীর সাংসারিক অবস্থা ভাল নয়। অথচ ছেলের পিছনে খরচ করছে। এই সময় ছেলে যদি কিছু রোজগার করে তাকে সাহায্য করে, তাহলে তাঁর সংসারে কিছুটা সুরাহা হয়।

আর একদিন এক মুমুক্ষু ব্যক্তি বাবার আশ্রমে এসে উপস্থিত হয়ে বলল, বাবা, আমি আপনার কৃপাপ্রার্থী। আমাকে আশ্রয় দিয়ে আমার মনের অভিলাষ পূরণ করুন।

অন্তর্যামী মহাপুরুষ লোকনাথ রুষ্টভাবে গম্ভীরভাবে বললেন, তুই তোর নিজের স্ত্রীকেই ভালবাসতে পারিস না, আমাকে ভালবাসবি কিকরে? তুই এখান থেকে এখনি চলে যা। যেদিন তোর ঐ লক্ষ্মী স্ত্রীকে ভালবাসতে পারবি, স্ত্রীর সঙ্গে অসদ্ব্যবহার করবি না, সেদিন আমার কাছে আসবি।

লোকটির শত অনুনয় বিনয় সত্ত্বেও সেদিন কোন কাজ হলো না। অগত্যা তাকে চলে যেতে হলো। সে সময়ে আশ্রমে যে সব ভক্ত উপস্থিত ছিল তাঁরা ঐ লোকটির কাছে গিয়ে নানা প্রশ্ন করে জানলেন, বাবা লোকনাথের কথা সত্যি। লোকটি সত্যিই তার স্ত্রীর সঙ্গে অসদ্ব্যবহার করে।

আশ্রমের এক ভক্ত তখন লোকনাথবাবাকে প্রশ্ন করলেন, আজ্ঞে স্ত্রীর সঙ্গে অসদ্ব্যবহার কি অধ্যাত্মপথে চলার অন্তরায় ?

তা শুনে লোকনাথবাবা বললেন, যে লোক তার পরিবারের লোকদের ভালবাসতে জানে না, সে কখনো ভগবানকে ভালবাসতে পারে না। ঈশ্বরে সত্ত্বগুণ না জন্মালে ভগবদ্ভক্তি হয় না। সত্ত্বগুণ জন্মালে হৃদয় কোমল হয়, মন শান্ত হয়। কামক্রোধাদি রিপুগুলি তখন বশীভূত থাকে।

বাবার এই অমূল্য উপদেশ প্রতিটি সংসারী লোকের পক্ষেই অবশ্য পালনীয়। তিনি বলতে চেয়েছেন, যার হৃদয়ে সত্ত্বগুণের যে পরিমাণ অভাব থাকে, সে সেই পরিমাণে অসদ্ব্যবহার করে তার অধীনস্থ লোকদের উপর। কিন্তু সত্ত্বগুণের প্রভাবে তার হৃদয়ে ভগদ্ভক্তির উদয় হলেই যে সকলকে স্নেহ ও করুণার চোখে দেখতে পারবে।

ওঁ

লোকনাথবাবা ভক্তদের একটি কথা প্রায়ই বলতেন, ধার্মিক হতে চাইলে প্রতিদিন রাতে শোবার সময় সারাদিনের কাজের হিসেব নিকেশ করবি। অর্থাৎ ভাল কাজ কি কি করেছিস আর মন্দ কাজ কি কি করেছিস, তা মনে মনে চিন্তা করে বিচার করে দেখবি। তারপর খারাপ কাজ আর যাতে করতে না হয় সেজন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হবি।

একদিন লোকনাথবাবা আশ্রমে বসে উপস্থিত ভক্তদের নানা বিষয়ে উপদেশ দিচ্ছিলেন। এমন সময় একজন ভক্ত প্রশ্ন করলেন, আচ্ছা বাবা, আমাদের কেমন ভাবে চলা উচিত ?

বাবা তার উত্তরে বললেন, যা মনে হবে তাই করবি আর বিচার করবি।

উপস্থিত ভক্তদের মধ্যে একজন উকীল ছিলেন। তিনি বললেন, বাবা, আপনার কথার কোন মানে কিছু বুঝতে পারলাম না। যা মনে আসবে

তাই করব ? আমার যদি মনে হয় একজনকে লাঠি দিয়ে মারি, সেটা কি ভাল কাজ হবে ?

লোকনাথবাবা বললেন, লাঠি মারলেই হলো ! ঐ যে বললাম, বিচার করবি। বিচার করলেই ত আটকাবে। তখন আর মারতে পারবি না।

একথা শুনে উকীলবাবু লজ্জিত হয়ে চুপ করে গেলেন।

এই কথার মাধ্যমে লোকনাথবাবা সমাজের দু শ্রেণীর লোকদের উপদেশ দিয়েছিলেন যারা কোন কাজ করার আগে বিচার করবার ক্ষমতা রাখে, তারা কখনো কুকাজ করতে পারে না। আর যারা অস্থিরমতি, কাজ করার আগে যাদের বিচার করার শক্তি থাকে না, তারা কুকাজ করে ফেলার পর যদি বিচার করে দেখে, কি কাজ করল, তাহলে আর কখনো কুকাজ করতে পারবে না বিচার করবার সঙ্গে সঙ্গে ভবিষ্যতের জন্য সাবধান হয়ে যাবে।

বারদীর এক মুচি যুবক প্রায়ই আশ্রমে আসত। যুবকটি ছিল একে অন্ধ, তার উপর আবার কুঁজো। আশ্রমে মুচিদের একটি মেয়েও প্রায়ই আসত। মেয়েটি বয়সে যুবতী হলেও তার তেমন জ্ঞানবুদ্ধি ছিল না। গভীর অন্তর্দৃষ্টির দ্বারা লোকনাথবাবা বুঝলেন, জ্ঞান-বুদ্ধিহীনা এই যুবতীটির চরিত্র অচিরে কলুষিত হতে পারে। তাকে কেন্দ্র করে সমাজে একটা কেলেঙ্কারী কাণ্ড ঘটে যেতে পারে। দিব্যদর্শী লোকনাথ তাই ভাবলেন, এই সময় মেয়েটির বিয়ে হয়ে গেলে ভাবী মহাপাপ হতে সে নিস্তার পাবে।

এই ভেবে তিনি ঐ মুচি যুবকটির সঙ্গেই মেয়েটির বিয়ের ব্যবস্থা করলেন। এই বিয়ে উপলক্ষে যে সব আনুষ্ঠানিক ক্রিয়া কর্মের প্রয়োজন, তা তিনি নিজ অর্থব্যয়ে সব করলেন।

বিয়ের পর একদিন যুবকটি এসে বলল, তাদের সমাজের সমাজপতিরা সামাজিক ভোজ চাইছে এই বিয়ের জন্য।

একথা শুনে মহাপ্রাণ লোকনাথবাবা বললেন, তা ত চাইতেই পারে।

এই বলে তৎক্ষণাৎ বেশ কিছু টাকার একটা ফর্দ করে আশ্রমের দোকানদারকে আদেশ করলেন, ঐ ফর্দের সব জিনিস যেন মুচিপাড়ার সমাজপতিদের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

এই বিয়ের দ্বারা লোকনাথবাবা ঐ যুবতীটির মধ্যে এক অদ্ভুত স্ত্রীধর্ম সঞ্চার করলেন। তাঁর অপার মহিমাবলে ঐ যুবতী বিয়ের পর পরমা সাধ্বী স্ত্রীর মত তার অন্ধ কুঁজো স্বামীর সঙ্গে ঘর করতে লাগল।

ঢাকা কলেজের কিছু ছাত্র বারদীর আশ্রমে লোকনাথ ব্রহ্মচারীকে দর্শন করতে আসে। তারা এসে বাবাকে বলল, বাবা, আমরা আপনার কৃপাপ্রার্থী। আমরা আপনার কাছে ব্রহ্মসম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করতে এসেছি। দয়া করে ব্রহ্ম সম্বন্ধে কিছু তত্ত্বোপদেশ দান করুন।

তাদের কথা শুনে ব্রহ্মচারীবাবা মোটেই খুশী হলেন না। তিনি তাদের নিয়ে মনের আনন্দে রহস্যালাপ করতে লাগলেন। তারপর কথাপ্রসঙ্গে বললেন, বাবাজীরা তোরা জানিস ত, যা দিয়ে সমস্ত চরাচর ব্যাপ্ত হয়ে আছে, এ হেন ব্রহ্মাকে যিনি দেখিয়ে দেন সেই গুরুকে নমস্কার করি। বাবাজীরা, তোদের ব্রহ্মবস্তু কি তা জানিস ?

ছাত্রেরা একবাক্যে বলল, না বাবা, তা জানি না। তা জানতেই ত আপনার কাছে এসেছি।

লোকনাথবাবা তখন বললেন, তাহলে শোন। তোদের ব্রহ্মবস্তু হচ্ছে টাকা। লক্ষ্য করেছিস, টাকার মুদ্রাগুলি অখণ্ড মণ্ডলাকার। এ জগতে টাকার প্রভাবেই সমস্ত জিনিস ব্যাপ্ত হয়ে আছে। টাকারই প্রতিপত্তি চলছে সর্বত্র। তোরা কলেজে ভর্তি হয়েছিস অর্থাৎ দীক্ষা নিয়েছিস কেন জানিস ? এই টাকারূপ ব্রহ্মের সাক্ষাৎলাভের জন্য।

এইসব কথা শুনে ছাত্রেরা বলল, বাবা, আপনার কথার মানে বুঝতে পারলাম না। আপনি বললেন, দীক্ষা নিয়েছিস,—এর মানে কি ?

বাবা বললেন, তোদের কলেজের অধ্যাপকগণ হচ্ছেন তোদের সেই গুরু। তাঁরাই ঐ টাকারূপ ব্রহ্মের দর্শন লাভে তোদের সাহায্য করবেন। এখানে এখন সময় নষ্ট করে কাজ নেই। ফিরে গিয়ে ঐ অধ্যাপক গুরুদের উপদেশ অনুসারে কাজ করে যা। তারপর ঐ টাকা ব্রহ্মকে লাভ করে দেশের সেবা কর। দেশের সেবাকার্য শেষ হলে তোদের কেউ যদি ঐ টাকা ব্রহ্মকে ত্যাগ করে আসল ব্রহ্মকে দর্শন করতে অভিলাষী হয়, তখন তাকে আমার কাছে পাঠাবি। আমি তখনই তাকে ব্রহ্মজ্ঞানের উপদেশ দেব।

লোকনাথ ব্রহ্মচারী ভাবলেন, এতগুলি যুবকের কাছে দেশ সমাজ ও

তাদের পিতামাতা কত কিছুই না প্রত্যাশা করছে। এই যুবশক্তিকে দেশের কাজে সমাজের কাজে লাগানো উচিত। আবার দেশ ও সমাজের সেবা করতে হলে আর্থিক সঙ্গতি ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী চাই। তাই এক অভিনব উপায়ে ছাত্রদের ব্রহ্মজ্ঞান লাভের বাসনা থেকে নিবৃত্ত করলেন।

ছাত্রেরাও লোকনাথবাবার উপদেশের গুরুত্ব বুঝতে পেরে চলে গেল।

দিব্যজ্ঞানসম্পন্ন মহাযোগী লোকনাথবাবা আশ্রমে যে লোক আসত তাদের দেখার সঙ্গে সঙ্গে অথবা দেখার আগেই তাদের মনের কথা জানতে পারতেন। তাদের কারো মধ্যে মানবতা ও সততার অভাব দেখলেই তাদের গালাগালি করে তাড়িয়ে দিতেন। এই সব গালাগালি বা রূঢ় বাক্যবাণে কাজও হত। সেই সব লোক তাদের ভুল বুঝতে পেরে নিজেদের সংশোধন করে নিত। তাদের মধ্যে নীতিবোধ জাগ্রত হত।

একদিন আশ্রমে ভক্ত ও শিষ্যগণ লোকনাথ বাবার চারদিকে বসে তাঁর উপদেশ শুনছিলেন। বাবা তন্ময় হয়ে তাদের উপদেশ দান করছিলেন নানা বিষয়ে। তখন সহসা লোকনাথ যেন কাকে উদ্দেশ্য করে কঠোর ভাষায় গালিগালাজ করতে লাগলেন। কিন্তু ভক্তগণ বুঝতে পারলেন না বাবা কার উদ্দেশ্যে এই সব কটু কথা বলছেন। বাবা লোকনাথ আবার বললেন, তোর শালা আজ আমি মাথা ভেঙ্গে দেব।

কিছুক্ষণ পরেই এক অপরিচিত ব্রাহ্মণ আশ্রমে এসে উপস্থিত হলো। বারদীতে তাকে আগে কেউ দেখে নি। তাকে দেখেই রাগের আগুনে জ্বলে উঠলেন বাবা। নানা কটু কথা বলে তিরষ্কার করতে লাগলেন।

দীর্ঘ পথ হেঁটে এসে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল ব্রাহ্মণ। তার উপর বাবার এই তীব্র ভর্ৎসনার কথা শুনে একই সঙ্গে বিস্মিত ও দুঃখিত হলো সে। তাকে যিনি চেনেন না, তার কোন কথা যিনি এখনো পর্যন্ত শোনেননি, তিনি কেন তাকে এত ভর্ৎসনা করছেন? এই ভর্ৎসনার কোন কারণ সে মোটেই বুঝতে পারল না আর বাবাও কিছুই বললেন না। তিনি শুধু সমানে গালি দিয়ে যাচ্ছেন। অবশেষে তা আর সহ্য করতে না পেরে ক্ষুন্ন মনে মাথা হেঁট করে আশ্রম থেকে বেরিয়ে গেল ব্রাহ্মণ।

এই ঘটনায় আশ্রমে উপস্থিত ভক্ত-শিষ্যরাও আশ্চর্য হয়ে গেলেন সকলে। তবে তাঁরা একটা জিনিস বুঝতে পারলেন। তাঁরা আপাততঃ এই

ভর্ৎসনার কোন কারণ না দেখতে পেলেও মহাযোগী বাবা তাঁর দিব্যদৃষ্টিবলে নিশ্চয় ব্রাহ্মণের কোন দোষ ত্রুটি দেখতে পেয়েছেন। তাই সে আশ্রমে ঢোকার আগেই তাকে চোখে না দেখে তার উদ্দেশে গাল পাড়তে শুরু করেছেন।

ব্রাহ্মণ আশ্রম থেকে বেরিয়ে গেলে বাবা নিজেই সে কারণের কথাটা বললেন। তিনি ভক্তদের বললেন, তোরা এ সব শুনে হয়ত মনে খুব কষ্ট পেলি। কিন্তু এ ছাড়া আমার করার কিছু ছিল না। ওই ব্রাহ্মণটা আসলে নরমাংস বিক্রেতা একটা কশাই। ওর এক বিবাহযোগ্যা কন্যা আছে। ব্যাটা বরপক্ষের কাছ থেকে মোটা পণ নিয়ে মেয়ের বিয়ে দিতে চাইছে। ও শুধু পণের টাকার অঙ্কটা বাড়িয়ে চলেছে। যে বেশী পণ দেবে ও তার সঙ্গেই মেয়ের বিয়ে দেবে। মেয়ে সুপাত্রে পড়ল কি অপাত্রে পড়ল সেদিকে ওর নজর নেই। সে বিষয়ে কোন মাথা ব্যথা নেই। তাই ত আমি ওকে অমন করে তাড়িয়ে দিলুম।

একজন ভক্ত কৌতূহলবশতঃ সেই ব্রাহ্মণের কাছে গিয়ে বাবার কথা জানালেন। তা শুনে ব্রাহ্মণ মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করল, সত্যিই তার এক বিবাহযোগ্যা কন্যা আছে। একাধিক বরপক্ষের কাছে তার পণের দাবি বাড়াতে বাড়াতে কয়েকশো টাকায় উঠেছে। মেয়ের ভবিষ্যতের দিকে আমার লক্ষ্য নেই। বাবার কথা সর্বাংশে সত্য। এই পণের টাকা আরো বাড়বে কিনা এই কথা জানতেই আমি এই আশ্রমে বাবার কাছে এসেছিলাম।

ব্রাহ্মণ এবার বুঝতে পারল করুণাময় বাবা লোকনাথ তার মেয়ের মঙ্গল কামনায় তাকে কটু কথা বলে এত তিরষ্কার করেছেন। এই ভেবে সে লজ্জিত ও অনুতপ্ত হলো। সে আশ্রমে ফিরে এসে তার দোষ সকলের কাছে স্বীকার করে প্রতিশ্রুতি দিল, সে এবার পণের দাবি ছেড়ে মেয়ের জন্য সৎপাত্রের সন্ধান করবে। মেয়ের ভবিষ্যৎ ও সুখশান্তির দিকে লক্ষ্য রেখেই তার বিয়ে দেবে। তার আজ উচিত শিক্ষা হয়েছে।

একদিন বিক্রমপুর ষোলআনা নিবাসী মদন মোহন চক্রবর্তী নামে এক ব্রাহ্মণ তাঁর গর্ভধারিণী মাকে সঙ্গে করে আশ্রমে উপস্থিত হলেন। তিনি লোকনাথ বাবাকে দর্শন ও প্রণাম করার পর বললেন, বাবা, আমি প্রতিদিন ফুল বেলপাতা ও পবিত্র জল দিয়ে আমার মায়ের চরণ পূজা করি। তাঁর পায়ের যে জায়গাটায় ফুল বেলপাতা ও জল দেওয়া হয় সেই জায়গাটা

কিছুদিন হলো কালো হয়ে গিয়েছে। তাতে পচন ধরেছে। তার উপর তাঁর জ্বর হয়েছে। এর কোন কারণ আমরা বুঝতে পারছি না। কি কারণে এমন হলো এবং কিভাবে এটা সারবে, তা জানতেই আপনার কাছে এসেছি।

চক্রবর্তী মশায়ের কথা শুনে লোকনাথ বাবা বললেন, আশ্রমের আঙ্গিনায় ঐ যে বেলগাছটা রয়েছে, তার তলায় তোর মায়ের থাকার জন্য একটা চালা করে দে। তোর মাকে বলবি, তার যখন যা খেতে ইচ্ছা হয় এবং যতবার খেতে ইচ্ছা হয় তা যেন কুণ্ঠা বা দ্বিধা না করে সঙ্গে সঙ্গে জানায়। তুই সব সময় মার কাছে কাছে থেকে নজর রাখবি। তোর মা যখন যা খেতে চাইবে সঙ্গে সঙ্গে আমাকে জানাবি। আমি তার ব্যবস্থা করে দেব। আমার আশ্রমে কোন কিছুরই অভাব নেই।

এই নির্দেশমত মদনমোহনবাবু বেলতলায় তাঁর মার থাকার জায়গা করে দিয়ে প্রতিদিন মার ইচ্ছা পূরণ করে যেতে লাগলেন। এইভাবে কিছুদিন চলার পর তিনি দেখলেন, তাঁর মায়ের পায়ের ঘাটা সম্পূর্ণ সেরে গেছে। পায়ের উপর সেই কালো দাগটা আর নেই। তাঁর জ্বরও সেরে গেছে।

মদন মোহনবাবু আশ্চর্য হয়ে লোকনাথবাবাকে তা জানালেন। বাবা বললেন, এবার তোর মাকে বাড়ি নিয়ে যা। যথাসাধ্য মার ইচ্ছা পূরণ করবি আর তাঁর আদেশ পালন করে চলবি। তাহলেই তার পূজা করা হবে।

এই ঘটনার দ্বারা লোকনাথ বাবা মদনবাবুকে এই শিক্ষাই দিতে চাইলেন যে, লোক দেখানো মায়ের চরণ পূজাটাই বড় কথা নয়, নির্বিবাদে মার ইচ্ছা পূরণ আর আদেশ পালনই হলো প্রকৃত মাতৃপূজা। মাতৃভক্ত পুত্রের এটাই হলো সবচেয়ে বড় কর্ত্তব্য। এতে মা সবচেয়ে বেশী সন্তুষ্ট হন।

এই লীলানুষ্ঠানের দ্বারা বাবা লোকনাথ তাঁর ভক্ত ও শিষ্যদের এই শিক্ষা দিলেন যে, মার আদেশ পালনই পুত্রের কর্তব্য এবং এটাই হলো মাতৃ ভক্তির সর্বশেষ্ঠ নিদর্শন।

ব্রহ্মজ্ঞানী মহাপুরুষ লোকনাথবাবা ব্রহ্মলাভ করেও সমাজ সম্বন্ধে কত চিন্তা করতেন, সমাজের নানা অশান্তি দূর করবার জন্য কত অমূল্য উপদেশ দিতেন তার ইয়ত্তা নেই।

মানুষ বৃদ্ধ হলে তার বুদ্ধিভ্রংশ হয়। যুবকেরা যেমন শারীরিক ও

মানসিক শক্তি ও সামর্থ্যবলে বিভিন্ন প্রবৃত্তিগুলিকে দমন করতে পারে, তাদের স্বভাব নিরোধের ক্ষমতা থাকে, বৃদ্ধগণ তেমন পারেন না, তাঁদের সে ক্ষমতা থাকে না। বৃদ্ধ পিতামাতারা তখন শিশুর মত হয়ে যান। শিশুর যেমন স্বভাব নিরোধের ক্ষমতা থাকে না, খাওয়া দাওয়া, শোয়া, ঘুম, যখন যা মনে জাগে তাই পূরণ করবার জন্য অস্থির হয়ে ওঠে, তেমনি পিতামাতা বৃদ্ধ হলে তাঁদেরও ঐ সব বাসনা দমন করবার শক্তি থাকে না। ঐ সব প্রবৃত্তিগুলি কোনভাবে বাধা পেলে বৃদ্ধরা অসহিষ্ণু হয়ে পড়েন। এইজন্য বৃদ্ধ পিতামাতাকে অনেক লাঞ্ছনা গঞ্জনা ভোগ করতে হয়। এই কারণে সংসারে অশান্তি দেখা দেয়। সংসারে বৃদ্ধ পিতা মাতা সন্তানদের কাছে বিরক্তিকর ও যন্ত্রণাস্বরূপ বলে মনে হয়।

তাই পরম করুণাময় ও মঙ্গলময় লোকনাথবাবা গৃহী মানুষদের নানা উপদেশ দিয়ে এই সামাজিক ও সাংসারিক অশান্তি দূর করবার চেষ্টা করতেন।

সেদিন বারদীর আশ্রমে এক ভদ্রলোক এলেন। বাবাকে দর্শন করে কথাপ্রসঙ্গে বললেন, বাবা, আমাদের শাস্ত্রে আছে,

জীবতো বাক্যপালঞ্চ মৃতাহে ভূরি ভোজনম্
গয়ায়াং পিণ্ডদানঞ্চ ত্রিভি পুত্রেন পুত্রতা।

এই শ্লোকটির তাৎপর্য কি ?

তা শুনে লোকনাথ বাবা বললেন, তুই এই শ্লোকটির কি মানে বুঝেছিস তা বল।

ভদ্রলোক বললেন, আমার মনে হয় জীবিতকালে অর্থাৎ পিতামাতা যত-দিন বেঁচে থাকবেন ততদিন তাঁদের বাক্যপালন করবে। তাঁরা মারা গেলে মৃত্যুর পর বহু লোকজন খাওয়াবে। তারপর গয়ায় পিণ্ডদান করবে। যে পুত্র এই তিনটি কাজ করতে পারে সে-ই প্রকৃত পুত্র।

তখন বাবা লোকনাথ বললেন, তাহলে ত তুই মানে ঠিকই বুঝেছিস ? আবার কি জানতে চাইছিস ?

ভদ্রলোক বললেন, বাবা, আমি যা বললাম, তা শ্লোকটির পুরনো ব্যাখ্যা - আমি আপনার কাছে শ্লোকটির নতুন ব্যাখ্যা শুনতে চাইছি।

বাবা লোকনাথ তখন বললেন, তাহলে শোন। জীবতো বাক্যপালঞ্চ—

এর তাৎপর্য হলো এই যে, পুত্র যখন তার শৈশব অবস্থায় এক কথা বারবার পিতামাতাকে জিজ্ঞাসা করে, কোন সুন্দর জিনিস দেখলে কিনে দেবার জন্য বায়না করে, পিতামাতা তখন পুত্রকে খুশি করার জন্য বিরক্ত না হয়ে তার প্রশ্নের উত্তর দেয়। আর সুন্দর জিনিস পরে নষ্ট করে দেবে জেনেও তা কিনে দেয়। ঠিক তেমনি পিতামাতা বৃদ্ধ হলে যে পুত্র পিতামাতা বারবার কোন কথা জিজ্ঞাসা করলে বিরক্ত না হয়ে তার উত্তর দেয়, আর কারণ জিজ্ঞাসা না করে পিতামাতার ইচ্ছাপূরণ করে, সেই পুত্রই প্রকৃত পুত্র।

এবার শোন মৃতাহে ভূরি ভোজনম্—এই কথাটির তাৎপর্য। মৃতবৎ অর্থাৎ মুমূর্ষু অবস্থায় পিতামাতা যা খেতে চান তা যে পুত্র যোগাড় করে দেয় সে-ই প্রকৃত পুত্র। মদনমোহন চক্রবর্তী তার মায়ের জন্য যেমন যোগাড় করে দিয়েছিল ঠিক তেমনি দিতে হবে।

আর গয়ায়াং পিণ্ডদানঞ্চ—এই কথাটির তাৎপর্য এই যে, গয়াসুরকে পিণ্ড না দিলে ক্ষেপে ওঠে। গয়াসুরকে থামাবার শক্তি কারো নেই। সে শক্তি যদি কারো থাকে ত তা ঐ পিণ্ডের। আচ্ছা বল ত, তোর মধ্যে যে একটা গয়াসুর আছে তাকে পিণ্ড বা খাদ্য না দিলে তা ক্ষেপে ওঠে কিনা?

ভদ্রলোক বললেন, তা ক্ষেপে ওঠে বৈকি। দারুণ ক্ষেপে ওঠে।

বাবা লোকনাথ বললেন, তাহলে মনে রাখিস, বহুসংখ্যক গয়াসুর বিশিষ্ট লোককে যে পুত্র পিণ্ডদান করে অর্থাৎ বহু ক্ষুধার্ত লোককে যে পুত্র খাওয়ায়, সে-ই হলো প্রকৃত পুত্র।

বাবার এই ব্যাখ্যা শুনে সন্তুষ্ট হলেন ভদ্রলোক।

বাবা লোকনাথ প্রায়ই উপদেশ দিতেন, যদি পিতৃপুরুষকে সন্তুষ্ট করতে চাও ত গরীবদের দুঃখ দূর করো। ক্ষুধার্তকে অন্ন দাও।

বাবা লোকনাথের আশ্রমে কোন গরীব দুঃখী এসে কিছু চাইলে তাকে বিমুখ করা হত না। আমাদের দেশের ধনীলোকেরা আমোদ প্রমোদের জন্য অথবা নিজেদের সুখ্যাতি প্রচারের জন্য অথবা ধর্মের নামে কতই না খরচ করে। কিন্তু সমাজে যে সব ক্ষুধার্ত ও আর্তলোক আহার ও পথ্যের অভাবে কতই না কষ্ট পাচ্ছে, তাদের জন্য কে ভাবে? বাবা লোকনাথের করুণায় বিগলিত মহান প্রাণ তাদের দুঃখে কাঁদত।

গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, আমার ভক্তের বিনাশ নেই, আমার প্রসাদে তারা ভবসাগর হতে উত্তীর্ণ হবেই। আমি তোমাদের সব পাপ থেকে মুক্ত করব। দুঃখ করো না।

বাবা লোকনাথও তেমনি আগত অনাগত, চেনা অচেনা সমস্ত দেশের সমস্ত কালের মানুষদের উদ্দেশ্যে বলতেন, আমি শতাধিক বছর ধরে কত পাহাড় পর্বত পরিভ্রমণ করে বড় রকমের একটা ধন কামাই করেছি। তোরা বসে বসে খাবি। রণে, বনে, জলে, জঙ্গলে যখনি বিপদে পড়বি, আমাকে স্মরণ করবি। তার পরের ভার আমার।

আমাকে জানতে চাসনি, বুঝতে চাসনি,—কেবল একটু আকুল প্রাণে তোর কথাটি জানাবি আমাকে। তাহলেই আমি তোদের দুঃখের প্রতিকার করব। আমি ধরা না দিলে আমাকে ধরতে পারে, কার বাপের সাধ্য! তবু আমি স্বেচ্ছায় ধরা দিই। আমি যা ইচ্ছা তাই করতে পারি; তোদের বিশ্বাস নেই, তাই প্রার্থিত ফল পাস না। যারা আমাকে লক্ষ্য করে এসে আমার আশ্রয় গ্রহণ করে, তাদের দুঃখ দেখলেই আর্দ্র হয় আমার হৃদয়। এই আর্দ্রতাই আমার দয়া। এই দয়ায় আমার শক্তি তাদের উপর প্রবাহিত হয় এবং তাতেই তাদের দুঃখ দূর হয়ে যায়।

ওঁ

তখন বিভূপদ কীর্তি নামে এক রেলকর্মচারী উত্তরবঙ্গের পার্বতীপুর ষ্টেশানে কাজ করতেন। দুর্যোগঘন কোন এক সন্ধ্যায় তিনি ষ্টেশানের বিশ্রামাগারে ঘটনাচক্রে এমন দুইজন ভাগ্যবান ব্যক্তির সান্নিধ্যে আসেন যাঁরা পরম পুরুষ লোকনাথের পবিত্র সঙ্গ ও কৃপালাভ করেছেন, যাঁরা বহু বিপদে আপদে তাঁর অভয় আশ্রয় পেয়ে ধন্য হয়েছেন এবং বাবার চরণে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের দ্বারা ধন্য হয়েছেন। বিভূপদ তখন শুধু বারদীর ব্রহ্মচারী লোকনাথ বাবার নাম শুনেছেন, কিন্তু তাঁর দর্শন লাভ করেননি।

সেদিন সন্ধ্যায় দুর্যোগের জন্য ষ্টেশানের বিশ্রামাগারে ঢুকতেই বিভূপদ বাবু দেখলেন, ষ্ট্রেচারবাহিত সৌম্যমূর্তি এক বৃদ্ধের পাশে এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক বসে আছেন। দুজনকেই তখন খুব চিন্তান্বিত দেখাচ্ছিল। তাঁদের মুখপানে তাকাতেই সেই প্রৌঢ় ভদ্রলোক বিভূপদবাবুকে কাছে ডেকে

বললেন, আপনি কি এখানেই থাকেন ?

বিভূপদবাবু যখন উত্তরে জানালেন, তিনি এখানেই চাকরি করেন। তখন ভদ্রলোক খুশি হয়ে বললেন, বড় মুস্কিলে পড়েছি বলেই আপনার একটু সাহায্য চাই। ইনি আমার বাবা, পক্ষাঘাতে অক্ষম হয়ে পড়েছেন। গরম জলের ব্যাগ ছাড়া একদণ্ড চলে না। হঠাৎ দেখছি ব্যাগটা ফুটো হয়ে গেছে। আমরা আসছি জলপাইগুড়ি চা-বাগান থেকে। যাব ঢাকা শহর হয়ে বারদী গ্রামে। সঙ্গে লোকজন অবশ্য আছে, কিন্তু এখানকার কিছুই ত তারা চেনে না। তাছাড়া গরম জলের ব্যাগ এখানে পাবেই বা কোথায় ! গোটা দুই বোতল হলেও কাজ চলে যেত।

একথা শুনে বিভূপদবাবু বললেন, সে ব্যবস্থা হবে। ব্যাগই পাওয়া যাবে। কারণ এখানকার হাসপাতালের চার্জে আমার বাবা আছেন। ষ্টেশানের একটি লোককে পাঠিয়ে এখনি আমি ব্যাগ আনিয়ে দিচ্ছি।

বৃদ্ধ এবার বিভূপদবাবুকে বললেন, তুমি কি বাবা, রোজই এই সময় এই ষ্টেশানের ওয়েটিংরুমে আস ?

বিভূপদ বললেন, কোনদিনই আসি না। ষ্টেশানের ওভারব্রিজের উপর দিয়ে চলে যাই। আজ হঠাৎ ঝড়বৃষ্টি শুরু হওয়ায় এখানে এসেছি।

বৃদ্ধ কম্পিত হাতে চোখের জল মুছতে মুছতে বললেন, ঝড়বৃষ্টির কোন লক্ষণ কি আগে দেখেছিলে বাবা ?

বিভূপদ বিস্মিত হয়ে বললেন, একটু আগে পর্যন্ত কোন চিহ্নই দেখিনি। হঠাৎ ঝড়বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল।

বৃদ্ধ এবার শিশুর মত কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন। অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলতে লাগলেন, হঠাৎ নয় বাবা, এও আমার সেই দয়াল গোঁসাইয়ের কাণ্ড। কারোর কোন কষ্ট যে তিনি সহ্য করতে পারেন না। তাই যখন তখন অঘটন ঘটিয়ে বসেন। সন্ধ্যাবেলায় ঝড়বৃষ্টি না এলে তুমি ত এখানে আসতে না। তাই হঠাৎ ঝড়বৃষ্টির আয়োজন করে পথ থেকে তোমায় টেনে এনেছেন। আমার কাছে এ খেলা নতুন নয়। আমি যে কতভাবে তাঁর কৃপা পেয়েছি, পদে পদে কত রূপে তাঁকে দেখেছি তার শেষ নেই। দেহে থেকেও তিনি ধরা ছোঁয়ার বাইরে। ধরা যে দেবে না তাকে ধরবে কে ? এই যে আমার রোগ, এ রোগ কে দিয়েছে সে কি জানি না ? ডাক্তার বদ্যির

সাধ্য কি যে এ রোগ সারাবে ? আমার ছেলেমেয়েরা সে কথা জানতে বা বুঝতে চায় না, তাই জেদাজেদি করে।

কতদিন বাবার মুখে শুনেছি, ও রে তোরা রোগে ভুগিস সেটা কি আমি চাই ? কি করি বল, দুষ্কর্মের বোঝা জমিয়ে রেখেছিস জন্ম জন্মান্তর ধরে। রোগ না হলে সারবে কি করে ? যখন দেখি রোগের যন্ত্রণা আর তোরা সইতে পারছিস না তখনই আমি তোদের কষ্ট আর দেখতে পারি না। তবে বেশ বুঝি, তোদের রোগমুক্ত করে তোদের প্রশ্রয় দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু নিষ্ক্রিয় হয়ে চুপচাপ বসে থাকতে পারি কই ? তখন নিজের মনকে ধমকে দিয়ে বলি, বেশ করছি, আমার সন্তানদের না সারালে সারাবে কে ? আমি তাদের যখন খুশি মারব ধরব. আবার তাদের আদর করে ধুলো ঝেড়ে কোলে তুলে নেব। কোন বিধিনিষেধের আমি তোয়াক্কা রাখি না। কারণ আমি ইচ্ছাময়, আমার ইচ্ছা যা হবে, আমি তাই করব।

এই বলে বৃদ্ধ চুপ করলেন। বিভূপদবাবু বিহ্বল হয়ে তাকিয়ে রইলেন তাঁর দিকে। দেখলেন, তিনি চোখ বন্ধ করে স্থির হয়ে শুয়ে আছেন।

বৃদ্ধের পুত্র সেই প্রৌঢ় এবার বললেন, আপনি বোধহয় অস্বস্তিবোধ করছেন। গোঁসাইয়ের কথা মনে হলে বাবা আর স্থির থাকতে পারেন না। এই দেখুন না, উনি একফোঁটা ওষুধ খাবেন না। ওঁর ধারণা রোগ সারাবার চেষ্টা করলে গোঁসাই সরে যাবেন ওঁর কাছ থেকে। এ অবস্থায় আমরা কি করতে পারি বলতে পারেন ?

বিভূপদবাবু এবার বললেন, কিন্তু উনি গোঁসাই বলতে কার কথা বলছেন বুঝতে পারছি না। আপনারা বারদী যাচ্ছেন তাই শুনলাম।

পুত্র তখন বিস্মিত হয়ে বললেন, বারদীর ব্রহ্মচারীর নাম আপনি শোনেননি ? তাঁরই আশ্রমে আমরা চলেছি।

বিভুপদ বাবু বললেন, তাঁর নাম অবশ্য শুনেছি। তবে তিনি কি এখনো দেহে আছেন ?

একথা শুনে বৃদ্ধ বললেন, দেহে থাকুন বা নাই থাকুন, তাঁকে দেখা যায়, তাঁর সঙ্গে কথা বলা যায়। প্রত্যক্ষদর্শী রূপে আমি এই কথা বলছি। এইমাত্র তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে। এইমাত্র তোমরা যখন কথা বল-ছিলে, তিনি আমাকে দেখা দিয়ে বলে গেলেন তোমরা যাকে ব্যাগ আনতে

পাঠিয়েছ, সে শূন্য হাতে ফিরে আসছে, কারণ হাসপাতাল বন্ধ হয়ে গেছে। তবে তোমাকে সেজন্য ব্যস্ত হতে হবে না। ফুটো ব্যাগের ছিদ্র বন্ধ করে দিয়েছি। ঢাকা পেঁছানো পর্যন্ত ওতেই কাজ চলে যাবে।

এর পর তিনি তাঁর পুত্রকে গরম জলের ব্যাগটি আনতে বললেন। তা আনলে দেখা গেল, আর তাতে ফুটো নেই !

এতবড় আশ্চর্যজনক ব্যাপার জীবনে কখনো দেখেননি বিভূপদবাবু। তিনি বুঝতে পারলেন, এ নিশ্চয় বারদীর ব্রহ্মচারী নামে খ্যাত সেই অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষের কাণ্ড। তিনিই তাঁর ভক্ত এই বৃদ্ধের সামনে সূক্ষ্মশরীরে কিছুক্ষণ আগে আবির্ভূত হয়ে ব্যাগের ফুটো বন্ধ করে দিয়ে গেছেন।

কিছুক্ষণের মধ্যে হাসপাতাল থেকে লোকটি শূন্য হাতে ফিরে এসে জানাল হাসপাতাল বন্ধ হয়ে গেছে। অর্থাৎ অন্তর্যামী মহাপুরুষ যা বলেছিলেন, তা সত্য হলো।

বিভূপদবাবু এবার বুঝতে পারলেন, বৃদ্ধ কেন কোন ডাক্তারী ওষুধ খেতে চান না। তাঁর এবার বিশ্বাস হলো, যে মহাযোগী মহাপুরুষ এতদূর থেকে সূক্ষ্মশরীর যোগে এই অলৌকিক অভাবনীয় কাণ্ড ঘটাতে পারেন, তিনি নিশ্চয়ই ইচ্ছা করলেই এই দুরারোগ্য পক্ষাঘাতরোগ সারিয়ে দিতে পারবেন। বৃদ্ধের কর্মফলভোগ পূর্ণ না হওয়ার জন্যই হয়ত এতদিন তা সারাননি। সময় হলেই তিনি অবশ্যই তা সারাবেন।

এবার বৃদ্ধ বিভূপদবাবুকে কিভাবে তিনি প্রথম বারদীর ব্রহ্মচারী লোকনাথবাবার সংস্পর্শে ও সান্নিধ্যে আসেন, সেই পূর্ববৃত্তান্ত শোনাতে লাগলেন। তিনি বলতে লাগলেন, তখন আমার জোয়ান বয়স। গায়ে অসুরের শক্তি। আমি তখন দোর্দণ্ডপ্রতাপ এক জমিদার। সেই সময় কর্মদোষে এমন একটা মোকদ্দমায় জড়িয়ে পড়লাম যাতে হার হলে সর্বস্বান্ত হতে হবে ! ব্রহ্মচারীবাবার নামডাক শুনে এই অবস্থায় তাঁর শরণাপন্ন হলাম।

আমি আশ্রমে গেলে তিনি আমাকে দেখে অতি সমাদরে গ্রহণ করলেন। তারপর তিনি তাঁর দুটি চোখের অন্তর্ভেদী দৃষ্টি মেলে তাকালেন আমার পানে। সঙ্গে সঙ্গে আমার অন্তরে জাগল অভূতপূর্ব এক আলোড়ন ;

প্রসন্ন মুখে মৃদুকণ্ঠে বললেন, যে জন্য এসেছিস আমি জানি। রিক্তহাতে তোকে ফিরতে হবে না। কিন্তু তার বিনিময়ে তোকে কিছু দিতে হবে।

আমি তখন বললাম, সাধ্য থাকলে অবশ্যই দেব। কি দিতে হবে বলুন।

তিনি বললেন, যদি বলি তোর সর্বস্ব দিতে হবে।

আমি বললাম, সর্বস্ব ত আমার যেতেই বসেছে। সে আর এমন কি দেওয়া হলো ?

তিনি বললেন, সর্বস্ব বজায় রেখে কি কিছু তোর দেবার মত নেই ?

আমি আবিষ্টের মত বলে উঠলাম, আর আছে আমার এই কলঙ্কিত দেহমন। তা যদি তোমার কাজে লাগে ত তা দিতে আমার কোন আপত্তি নেই।

মনে হলো, আমার উত্তর শুনে তিনি খুশী হলেন। বললেন, তাই হবে। ভোগ করে করে তোর অরুচি ধরে গেছে বলেই আজ তোর আসবার সময় হয়েছে আমার কাছে। তুই এখানে আসবার তিনদিন আগে তোর আপীলের রায় আমি নিজে লিখিয়ে দিয়ে এসেছি। পড়ে দেখিস, তাতে লেখা আছে, তুই বেকসুর খালাস পেয়েছিস। ক্ষতিপূরণ বাবদ দশহাজার টাকা পাবি। কাল আদালতে গেলেই হাকিম রায় দেবে। আমি যখন তোকে আশ্রয় দিয়েছি, কারোর সাধ্য নেই যে তোর অনিষ্ট করে। আমার শর্ত আমি পালন করেছি। এবার তোর পালা। তিন বছর তোকে সময় দিলাম। আমাকে দেওয়া তোর দেহমন নিয়ে এর মধ্যে যা খুশি করে নে। এই তিন বছরের মধ্যে আমি তোর মুখ দেখতে চাই না। আমি ডেকে না পাঠালে আমার ত্রিসীমানায় আসা চলবে না। তিন বছর বাদে এই দিনটিতে লোকের কাঁধে চেপে তুই এখানে আসবি—এই কথাটা মনে রাখিস।

কাঁধে চেপে আসার কথা শুনে ভয় পেয়েছিলাম। অন্তর্যামী বাবা তা বুঝতে পেরে সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন, আমি যার রক্ষাকর্তা তাকে মারে কে! কমপক্ষে নব্বই বছর তোর পরমায়ু। এখন নির্ভয়ে নিশ্চিন্ত মনে চলে যা।

আমি বাড়ি চলে গেলাম। পরদিনই আদালতের রায় বার হলো। ধনে প্রাণে আমি রক্ষা পেলাম। বাবার কথা সব অক্ষরে অক্ষরে ফলল। স্বাভাবিকভাবেই আমি আনন্দে অভিভূত হয়ে উঠলাম। কিন্তু আনন্দের

উত্তেজনার পরক্ষণেই এল নিদারুণ এক অবসাদ। বাবার সেই নিষেধাজ্ঞার বোঝা চেপে বসল আমার সমস্ত মন জুড়ে। আমার তখনকার মনের অবস্থা আমি বোঝাতে পারব না। কেবলি ইচ্ছা করে তাঁর কাছে ছুটে চলে যাই। বিরহের এই জ্বালা এতখানি মর্মবেদনা জীবনে কখনো অনুভব করিনি আমি। আমার কেবলি মনে হতে লাগল আমি যেন এক চরম নির্বাসনদণ্ড ভোগ করছি। এ দণ্ড আমি কেমন করে সইব তা জানি না।

আমি কয়েকবার লোক পাঠিয়ে তাঁর কাছে অনুমতি প্রার্থনা করলাম। কিন্তু কোনক্রমেই তাঁর সেই অমোঘ নিষেধাজ্ঞা শিথিল করাতে পারলাম না একটুও। আমার তখন মনে হতে লাগল এই ভয়ংকর নিষেধাজ্ঞার থেকে সর্বস্বান্ত হওয়াও অনেক ভাল ছিল।

বছরখানেক এই দুঃসহ অবস্থার মধ্য দিয়ে দিন কাটতে লাগল আমার। আমার জমিদারির আয় কমতে লাগল দিনে দিনে। ঠিকমত নজর দিতে না পারায় ব্যবসা বাণিজ্য যা গড়ে তুলে ছিলাম তা পাঁচভূতে লুটেপুটে খেতে লাগল। আমার এই একমাত্র ছেলের বয়স তখন মাত্র কুড়ি একুশ বছর। ও তখন কাজ কারবারের কিছুই জানে না।

বছরখানেক এইভাবে যাবার পর আবার এক আশ্চর্য ভাবান্তর এল আমার মনে। ব্রহ্মচারীবাবার প্রতি আমার সেই অবুঝ উন্মত্ত অনুরাগ পরিণত হলো চরম বিরাগ ও বিতৃষ্ণায়। অকথ্য ভাষায় তাঁকে গালাগালি করে একখানি চিঠি লিখে আমার ছেলেকে পাঠিয়ে দিলাম তাঁর কাছে। এর পর কি হলো, আমার ছেলেই তা ভাল বলতে পারবে।

এই বলে বৃদ্ধ তাঁর পুত্রের মুখপানে তাকাতেই পুত্র বললেন, এবার আমিই বলছি শুনুন। আমিই বাবার চিঠি নিয়ে আশ্রমে গিয়েছিলাম। চিঠিতে কি লেখা ছিল আমি তা জানতাম না। আশ্রমে গিয়ে দেখি, ব্রহ্মচারী বাবা যেন আমারই জন্য অপেক্ষা করছিলেন। তিনি তখন উঠোনের বেলগাছতলায় দাঁড়িয়ে ছিলেন। আমাকে দেখেই বললেন, কি চিঠি এনেছিস, তুই পড় আমি শুনি। কোন কথা বাদ দিবি না। গালাগালির ভাষা যত কুৎসিত হয় ততই ভাল।

চিঠির প্রথম কয়েকছত্রে চোখ বুলিয়েই আমার বিস্ময় চরমে উঠল! বুঝলাম, ব্রহ্মচারীবাবা সর্বজ্ঞ অন্তর্যামী। তিনি আমাকে দেখেই

বুঝেছেন, আমি বাবার চিঠি নিয়ে এসেছি। তিনি আরও বুঝতে পেরেছেন, সে চিঠিতে অনেক গালাগালি আছে। আমি ইতস্তত করতে লাগলাম। কুৎসিত গালাগালিতে ভরা এ চিঠি কিকরে পড়ে তাঁকে শোনাব তা বুঝতে পারলাম না।

আমি পড়তে কুণ্ঠাবোধ করছি দেখে তিনি ধমক দিয়ে বললেন, ওরে হাঁদা, আমি চিঠির প্রত্যেকটি শব্দ নিজে হাতে ধরে তোর বাবাকে দিয়ে লিখিয়েছি। তুই পড়তে না পারিস ত মিলিয়ে দেখ। আমি ঠক, জুয়াচোর আমি ভণ্ড, পাষণ্ড, আমি বিশ্বাসঘাতক, মিথ্যাবাদী, আমি নরাধম। আমি তার সর্বনাশ করেছি—এই সব লেখা আছে চিঠিতে। তা তুই কুণ্ঠিত হচ্ছিস কেন? এই ত আসল প্রেমপত্র। তুই ছেলেমানুষ, এর কি বুঝবি? তোর বাবাকে বলবি, আমি খুব খুশী হয়েছি। আর বলবি, আমি নিজের মুখে এর উত্তর দেব। একথাও বলবি, এবার থেকে তোদের সংসারের রথ গড়গড় করে আগের থেকে আরো জোরে চলবে। আমার সত্যরক্ষা হয়ে গেলে তার সত্যরক্ষার পালা। কষ্ট দিতে কি আমি চাই? কিন্তু কষ্ট থেকে বাঁচতে গেলে কষ্ট ত একটু করতেই হবে। তবে আমি ত আছি, ভাবনা কি!

আমার বিস্ময় এবার চরমে উঠল। তাঁর আপাত কঠোরতার অন্তরালে যে এমন এক স্নেহস্নিগ্ধ অন্তর, এত বড় একটা সংবেদনশীল নরম মন লুকিয়ে আছে, আমি তা ঘুনাক্ষরেও ভাবতে পারিনি। সে অন্তর, যে মনের প্রত্যক্ষ পরিচয় পেয়ে আমি বিস্মিত না হয়ে পারলাম না। যাঁর উপর রাগ করে যাঁকে ভুল বুঝে বাবা কুৎসিত ভাষায় এত সব গালাগালি করে এই চিঠি লিখেছেন, সেই সর্বজ্ঞ সমদর্শী ও সতত ক্ষমা-শীল মহাপুরুষ ক্রুদ্ধ হওয়া ত দূরের কথা, প্রসন্নচিত্তে বাবার সব অপরাধ ক্ষমা করে তাঁরই সংসারের উন্নতির কথা মঙ্গলের কথা চিন্তা করছেন। এ কি কোন মানুষের পক্ষে সম্ভব? বুঝলাম, ব্রহ্মচারীবাবা ত সাধারণ মানুষ নয়, তিনি মহামানব, মহাপুরুষ। তাঁর পক্ষে সবই সম্ভব।

তিনি এবার প্রসন্ন দৃষ্টিতে আমার মুখপানে তাকালেন। আমি সে দৃষ্টির সামনে কেমন বিমূঢ় ও বিমোহিত হয়ে গেলাম। আমার বহ্যজ্ঞান যেনলুপ্ত হয়ে গেল।

কতক্ষণ এভাবে ছিলাম তা বলতে পারব না। সহসা ব্রহ্মচারী বাবার ডাক শুনে আমার সব আবেশ কেটে গেল। আমি বাহ্যজ্ঞান ফিরে পেলাম। আশ্রমের ভৃত্য ভজলেরামকে ডেকে তিনি বললেন, এখন ছেলেটার খাবার ব্যবস্থা কর। ফজলি আম আর নলেন গুড়ের সন্দেশ।

ভজলেরাম অপ্রস্তুত হয়ে বলল, এখন ত আমের সময় নয়। আর নলেন গুড়ের সন্দেশও আশ্রমে নেই। তবে বাবার যখন ইচ্ছে, তখন সব ঠিক হয়ে যাবে।

সর্বজ্ঞ বাবা স্মিত হাসি হেসে বললেন, বড় জোর পাঁচ সাত মাইল দূরে। ছাগল-বাঘিনীর স্রোতে পানসী চেপে নারায়ণগঞ্জ হতে ওরা আসছে। আধ ঘন্টার মধ্যেই এসে পড়বে। ততক্ষণে কিছু প্রসাদ থাকে ত এনে দে।

ভজলেরাম জানাল যেটুকু প্রসাদ আছে তা ওর নিজের জন্য। তা দিতে ও রাজী নয়। এদিকে আমাকে তাড়াতাড়ি ফিরে যেতে হবে বলে ক্রমে অধৈর্য হয়ে পড়ছিলাম আমি। ব্রহ্মচারী বাবার অমূল্য সান্নিধ্য আমার খুবই ভাললাগলেও আমি বেশীক্ষণ থাকতে পারব না।

অন্তর্যামী বাবা তা বুঝতে পেরে বললেন, সে ব্যবস্থা না করে কি আর তোকে আটকে রেখেছি রে হাঁদা। এর মধ্যে আমি নিজে গিয়ে তোর বাবাকে যা বলার বলে এসেছি। কলকাতার পথে তাকে রওনা করে দিয়ে এসেছি। তা নইলে যে তোদের সেখানকার গদী লাটে উঠত। কোন ভয় নেই, এবার সব ঠিক হয়ে যাবে।

কিন্তু এর মধ্যে তিনি কিকরে এতদূরে বাবার কাছে গেলেন, এত কাণ্ড কিকরে এত অল্প সময়ে কেমন করে হয়ে গেল, তা বুঝতে পারলাম না আমি। কিন্তু মুখে কিছু আমি না বললেও সর্বজ্ঞ অন্তর্যামী বাবা আমার মনের কথা বুঝতে পেরে বললেন, হ্যাঁ রে হ্যাঁ। আমি এখানেও ছিলাম, সেখানেও ছিলাম। একই সময়ে আমি কত জায়গায় গিয়ে কত কাজ করে আসি, তা তোর মগজে ঢুকবে না। আজ সোমবার। এর পরের সোমবার সন্ধ্যা সাতটায় তোর বাবা কলকাতা থেকে ফিরলে তার মুখ থেকেই সব শুনবি।

এমন সময় নারায়ণগঞ্জ থেকে সেই দর্শনার্থীরা এসে গেল। তারা

বাবাকে প্রণাম করতেই বাবা তাদের একজনকে বললেন, হ্যাঁরে, এই অসময়ে ফজলি আম কোথায় পেলি ?

লোকটি উত্তর করল, আমার বারমেসে ফজলি গাছের প্রথম ফলগুলি বাড়ির লোকদের না বলে লুকিয়ে আশ্রমের জন্য এনেছি। কিন্তু সে ত বাক্সবন্দী হয়ে কুলির মাথায় চড়ে আসছে। সে খবর তুমি পেলে কিকরে ?

বাবা তখন হাসিমুখে বললেন, শুধু তাই নয়, কোন দোকান থেকে কত দাম দিয়ে নতুন গুড়ের সন্দেশ কিনে এনেছিস তাও আমি জানি! এখন যা এনেছিস তাড়াতাড়ি বার করে দে আমি প্রসাদ করে দিলে সবাই প্রসাদ পাবে।

কিছুক্ষণ পরে ভজলেরাম একটা বড় ধামায় করে প্রচুর আম ও সন্দেশ বাবার সামনে রাখলে তিনি প্রসাদ করে দিতেই ভজলেরাম সব আম ও মিষ্টি উপস্থিত সকলের হাতে হাতে বিতরণ করে দিল। বাবা তখন 'কালাচাঁদ কালাচাঁদ' বলে ডাকতেই একটি ষাঁড় গজেন্দ্র গমনে এসে ধামায় মুখ দিয়ে আম খেতে লাগল। আশ্রমচারী একপাল কুকুর এসে চারদিকে ভিড় করে যে যার পাওনা আদায় করে নিল। আশ্রমের মানুষ পশু নির্বিশেষে সবাই যেন এক পরিবারের লোক। কোন ক্ষেত্রেই ছোট বড় বড়, ইতর বিশেষ নেই।

আমি এই সব দেখছিলাম আর আনমনে কত কি ভাবছিলাম। হঠাৎ ব্রহ্মচারী বাবার ডাকে আমার চমক ভাঙ্গল। আমাকে তিনি বললেন, তোকে সকালে যেতে দিইনি। বিকালেও যেতে দেব না। সন্ধ্যেবেলায় আজ দারুণ ঝড়বৃষ্টি হবে। কত নৌকা নদীর জলে তলিয়ে যাবে। আমি তার কি করব ? তোর যাতে বিপদ না হয় সেটা তো আমায় দেখতে হবে। দু একটা দিন থেকে যা।

যা কিছু দেখবি শুনবি সব লিখে রাখবি। ভবিষ্যতে এতে তোর ও অনেকের কল্যাণ হবে। কিন্তু সাবধান, সে সব আমার দেহথাকাকালে বলবি না,—এই আমার আদেশ। এক বিজয়কৃষ্ণের জ্বালাতেই আমি জ্বলে মরছি। তার উপর যদি আরো কথা ছড়ায় তাহলে আমি আর টিকতে পারব না। শ্রেষ্ঠ পুরুষ, শ্রেষ্ঠ পুরুষ করে আমায় অতিষ্ঠ করে তুলছে।

কথা বলতে বলতে থেমে গেলেন। তারপর আবার বলতে লাগলেন, আমি নিজেই বকে মরি। কে আমার কথা বোঝে, কে বুঝতে চায়। কেউ

আসে রোগের ধান্দায়, কেউ আসে মামলা মোকদ্দমার তদ্বিরে। আরে, আমি ডাক্তার না উকীল? আমি যে কি, তা কেউ মানতে চায় না। ভব রোগের বৈদ্য আমি—সে রোগ নিয়ে কেউ আসে না।

লোকে আমার নামে মানত করে, আমার কাছে কেঁদে পড়ে। তারা ভাবে আমিই বুঝি তাদের বাঁচিয়ে দিলাম। আমি বলি, তা নয়। আমি ইচ্ছা করে কিছু করি না। যেমন করে হোক, আমার মধ্যে একটা করুণার ভাব এসে গেলেই যে যার প্রার্থিত বস্তু পেয়ে যায়। কিন্তু কি করলে আমি তুষ্ট হই, আমি তার কিছুই জানি না। এই দয়ার ভিতর দিয়েই দেখি আমার শক্তি কাজ করে।

বাবার মুখে আর কথা নেই। পলকহীন চোখ দুটির দৃষ্টি যেন কোন অতলে তলিয়ে গেছে। মনে হলো এ যেন পাথরের মূর্তির কপালে খোদাই করা দুটি আশ্চর্য আকর্ণবিস্তৃত চোখ। সে চোখের তারা দুটি অতি অস্বাভাবিকভাবে নাসিকার মূলে এসে ঠেকেছে। তাঁর স্থাণুর মত নিষ্পন্দ দেহটির দিকে চেয়ে বেশ মনে হলো, জড়দেহটা ফেলে রেখে তিনি যেন কোন অজ্ঞাত লোকে চলে গেছেন। তাঁর নিস্তব্ধ নিষ্পন্দ দীর্ঘ দেহটি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে নিরীক্ষণ করতে করতে কি যেন একটা অনির্বচনীয় ভাবে অভিভূত হয়েছিলাম। কোন দিকে আমার খেয়াল ছিল না। তাঁর দেহটি যে প্রাণহীন সে বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ ছিল না। অথচ চোখদুটি খোলা। বুকের ওঠানামা নেই, প্রাণের কোন লক্ষণই নেই।

সহসা সেই নিষ্প্রাণ দেহে প্রাণের লক্ষণ ফিরে এল। সহজ স্বাভাবিক স্বরে পূর্ব প্রসঙ্গের জের টেনে বলতে লাগলেন, তোরা কি শুধু নিজের প্রয়োজনে আসিস? আমারও যে প্রয়োজন আছে তোদের। সত্য মিথ্যা উচিত অনুচিত কিছু মানি না। কার কি পাওনা আছে বা নেই, তা মনে স্থান দিই না। আমি ঋষি নই, মুনি নই যে দুনিয়া জ্বলে পুড়ে গেলেও গ্রাহ্য করব না। তোদের সুখ দুঃখই আমার সুখ দুঃখ। তোদের ছাড়া যে আমার চলবে না। তাই প্রাণের টানে তোদের মনস্তুষ্টির সাধনা নিয়ে আছি। মারি, ধরি, আদর করি। কিন্তু কাউকে ফেলতে ত পারি না।

তাই যদি পারব, তবে একশো সওয়াশো বছর পরে হিমালয়ের নির্জন

গুহা ছেড়ে তোদের এই হট্টগোলের মাঝখানে শ্মশান ভূমিতে কোন দুঃখে এমন করে আছি। তোদের জন্যে আমার প্রাণটা যখন কেমন করে ওঠে তখন ইচ্ছা করে তোরা যে যেখানে আছিস সবাইকে এই বুকের মধ্যে ভরে রাখি।

তোরা ত আমার অন্তরের ভাব বুঝতে পারিস না। তাই এখানে পরের মত আসিস ও সেই ভাবে ব্যবহার করিস। বাবার কাছে ছেলে যেমন দ্বিধাহীন হয়ে আসে, তেমন করে তোরা আসতে পারিস কই ?

আগন্তুকদের মধ্যে একজন বলল, তুমি ত আমাদের মনের মত করে নিতে পার বাবা। তোমার ইচ্ছা হলে হতে পারে না, এমন কিছু ত ত্রিসংসারে নেই।

বাবা বললেন, সে তোদের মনের ভুল। যা কিছু হয়, সে তোদের নিজেদের ইচ্ছায়। তোদের ইচ্ছা হলেই আমার ইচ্ছা হয়। তোদের ইচ্ছাটি যখন আমার উপর ক্রিয়া করে, তখন কি যেন একটা ভিতর থেকে আলগা হয়ে যায় আর সঙ্গে সঙ্গে কোথাও কিছু একটা হয়ে যায়।

দোষ তোদের নয়, দোষ আমার। প্রথম প্রথম সাধ হয়েছিল, সত্যি ব্রাহ্মণ হয়েছি কি না পরখ করে দেখব। ব্রহ্মকে জানলে সে না কি ব্রহ্ম হয়ে যায়। তার বাক্য অমোঘ হয়, তার কথায় মৃতও জীবন পায়। খেলার মত করে সেইটা নিজের সম্বন্ধে যাচাই করতে গিয়ে সেই ঝোঁকটা পেয়ে বসেছিল। নিজের সেই দোষে আর তোদের অত্যাচারে এখন সবাই ছিঁড়ে খায়। এসে বলে, এ করে দাও, ও করে দাও। পরমায়ু দাও, সুখ দাও, ঐশ্বর্য দাও। কিন্তু যা পেলে সব চাওয়া মিটে যায় সেই আসল ধনটি বিলিয়ে দেবার জন্য পথ চেয়ে এত বছর বসে আছি। কেউ তা চায় না রে, কেউ চায় না।

ভক্তদের মধ্যে একজন বলল, সেই জন্যই ত বলি গোঁসাই তুমি তাদের চোখ ফুটিয়ে চাইয়ে নিলেই ত পার। সত্যি করে বল দেখি, সে কি তোমার অসাধ্য ?

বাবা বললেন, আমার অসাধ্য অবশ্য কিছু নেই। কিন্তু সে-আমি এ আমি নয়। সেটা কিন্তু হাড়মাসের খাঁচাটা যা তোরা চোখে দেখছিস, তা নয়। সবাইকে যদি আমিই চাইয়ে নিই তাহলে খেলার মজাটাই যে চলে যায়। প্রকৃতির এই লীলাই যে বন্ধ হয়ে যায়। একটু তোরা চাইলি, বাকিটা

আমি করিয়ে নিলাম—তাহলেই খেলাটা জমে। নইলে সবটা হয়ে যায় একেবারে একতরফা।

এবার তিনি হঠাৎ আমাকে লক্ষ্য করে বললেন, ওরে তুই কি জানিস, কেন তুই আজ তোর বাবার চিঠি নিয়ে এসেছিস ? এর আগে ত কতবার সে চিঠি পাঠিয়েছে অন্যের হাত দিয়ে। চিঠির পাহাড় লিখেছে, পড়েই ছিঁড়ে দিয়েছি, কখনো বা একটু চোখ বুলিয়ে ফেলে দিয়েছি। কারণ যখনি সে চিঠি লিখতে বসেছে, তখনি সব জেনেছি। সে চিঠিও আমার পড়া হয়ে গেছে। এবার যে আমি তোকে পাঠাবার আদেশ দিয়েছি, আমার ইচ্ছা হয়েছে বলেই আদেশ দিয়েছি। কেন দিয়েছি, সেও একদিন নিজেই বুঝতে পারবি।

বুঝি, সবাই স্বার্থ নিয়ে আসে, অনেকে মিথ্যা কথায় ধোঁকা দেবার চেষ্টা করে। কিন্তু সব জেনেও চোখ বুজে থাকি। কারণ যে যখন আসে সে ত আমারই এক রূপ। সবাইকার মধ্যেই ত আমি ছড়িয়ে আছি।

বলতে বলতে আবার তিনি হঠাৎ চুপ করে গেলেন। বেশ মনে হলো তিনি আর এ দেহের মধ্যে নেই। গোমুখাসনে ভাবে স্তব্ধ হয়ে আছেন। কিন্তু সেই স্থির দেহের মধ্যে কোন কম্পন নেই। ঋজু দীর্ঘ দেহ যেন প্রস্তর মূর্তির মত স্তব্ধ। সুগৌর মুখমণ্ডলে শুভ্র জ্যোতির মত একটা উজ্জ্বল আভা ফুটে উঠেছে। কঙ্কালসার দেহে এক আশ্চর্য অপূর্ব কমনীয়তা। বিশাল ললাটে বয়সের কোন ছাপ নেই। হাতের চেটো, পায়ের পাতা যে এমন রক্তাভ হয়, তা আমার জানা ছিল না। বিস্ফারিত দুটি চোখের দৃষ্টি যে কোথায় নিবদ্ধ হয়ে আছে কে জানে।

তাঁর সেই নিষ্পন্দ মূর্তির পানে চেয়ে কত কথাই আমার মনে হচ্ছিল। সে সব কথা এখন আমার মনে নেই। তবে একটা কথা বেশ মনে আছে। মনে হচ্ছিল যা কিছু দেখছি, তা একটা অভিনয় ছাড়া কিছু নয়। এই দেহটা তাঁর একটা ছদ্মবেশ। এর সঙ্গে তাঁর নিজের কোন সম্বন্ধ নেই। এত লোকের মাঝখানে সবাইকার সঙ্গে এমনভাবে জড়িয়ে থেকেও ইনি এদের কেউ নন। এই আশ্রম, এই গাছপালা, এই ঘরবাড়ি, এই মানুষের সমাজের সঙ্গে এই একক নিঃসঙ্গ মানুষটির কোন রকম যোগসূত্র নেই। ইনি এখানকার মানুষই নন, নিজের কক্ষপথ ছেড়ে কি একটা অজ্ঞাত কারণে

সবাইকার সঙ্গে সম্বন্ধ পাতিয়ে বসে বসে কি একটা খেলার অভিনয় করছেন মাত্র। যে কোন মুহূর্তে এই সাজানো খেলাঘর ভেঙ্গে দিয়ে সব অভিনয় ছেড়ে এই নিঃসঙ্গ পুরুষ স্বস্থানে ফিরে যাবেন।

এর পর আগন্তুকদের মধ্যে একজনকে বললেন, তোর অবস্থা ত বিশেষ সুবিধার মনে হচ্ছে না। সংসার ছাড়ব মনে করলেই কি আর তা করা যায় রে পাগল। কাজকর্মে ঢিলে দিয়েছিস, আখড়ায় আখড়ায় ঘোরাঘুরি করছিস। ভাবছিস বুঝি, এমনি করেই পালিয়ে যাবার পথ খুঁজে পাবি। আমার কথা যদি শুনিস, আবার একটা বিয়ে করে নতুন করে সংসার পাত। আর মনপ্রাণ দিয়ে সংসারের সেবায় লেগে যা। মনেও ভাবিসনি যে সংসার ছাড়লেই সংসার তোকে ছাড়বে। সেটি হবার যো নেই। আমার কথা মেনে সংসারকে আঁকড়ে ধরলেই দেখবি তারই মাঝখান দিয়ে তোর পথ পরিষ্কার হয়ে যাবে।

লোকটি তখন বলল, আমার এ প্রাণ ত তোমারি দেওয়া। আমি ত একরকম মরেই গিয়েছিলাম। কবিরাজ জবাব দিয়ে গিয়েছিল। খবর পেয়ে তুমি বললে, যেমন অবস্থায় আছে তুলে নিয়ে আয় আমার কাছে। আমি বলছি ও এখনো বহুদিন বাঁচবে। আমি যাকে আশ্রয় দিলাম, যমের সাধ্য কি যে তাকে নিয়ে যায়। মাকে বলে দে ওর জন্য ফ্যানে ভাতে চাড়িয়ে দিক।

তোমার আদেশ আমি মাথা পেতে নেব। তবু তোমাকে নিবেদন করছি, বিয়েতে আমার রুচি নেই। আর সংসারে জড়িয়ে পড়তে ভাল লাগে না।

বাবা তখন ধমক দিয়ে বললেন, বাজে কথা রাখ। তিনি কি সংসার ছাড়া নাকি? মাগ ছেলেকে যে ভালবাসতে পারে না, সে আমাকে ভালবাসবে কি করে? সারা মনপ্রাণ দিয়ে সংসারকে জড়িয়ে ধরলে দেখবি আমিও ধরা পড়ে গেছি সেই ফাঁকে। ভালবাসাও ত একটা শ্রেষ্ঠ সাধনা। নিজেকে ভুলে গিয়ে নিজেকে যতই বিলিয়ে দিবি ততই দেখবি ঋণে বাঁধা পড়ে গেছি তোর কাছে। এখন যে আমাকে ভালবাসিস, এটা মেকি ভালবাসা। আসল বস্তু পেতে হলে ভালবেসে বেসে ভালবাসার তপস্যা করতে হয়। আমি বলছি আবার বিয়ে কর, তোর যা কিছু অভাব সব মিটে যাবে।

সারা দুপুর ধরে কত লোক এল, কত কথা হলো, কত আরজি, আবেদন নিবেদন জমা হলো। বাবার কিন্তু ক্লান্তির চিহ্নমাত্র নেই দেহেমনে।

যেমন গোমুখাসনে বসে ছিলেন, তেমনি একভাবে বসে রইলেন। একটি-বারও হাই তুললেন না, আসন বদলালেন না, বা চোখ দুটি বন্ধ করলেন না। তুচ্ছ বলে কারো কথা উড়িয়ে দিলেন না।

অসীম ধৈর্য্যে, অনন্ত মমতায় প্রত্যেকের প্রতিটি কথা শুনলেন। প্রতিটি প্রার্থনা মঞ্জুর করলেন। কিছু উপদেশ দিলেন। মাঝে মাঝে এক আধটু তিরস্কার যা করলেন, তার মধ্যে ফুটে উঠল এক মমতামধুর ও ক্ষমাসুন্দর মনোভাব। ভক্ত ও শরণার্থীদের প্রশ্নগুলি বাদ দিয়ে উত্তরগুলি লিখে রেখেছি। এর দ্বারা বোঝা যাবে বাবা লোকনাথকে প্রতিদিন নানা সমস্যায় জর্জরিত কত শরণার্থীর কত সমস্যার সমাধান করতে হত।

বলিস কি রে, পাঁচ বছরের আমগাছে ফল ধরেনি? আমার আশ্রমের একটু মাটি গাছটার গোড়ায় ছড়িয়ে দে। এ বছর গাছে ফল ধরবে।

ছেলেটা এবারেও ফেল করল? আগে বলিসনি কেন? এখান থেকে একটু প্রসাদ নিয়ে যা। রোজ একটু করে খাওয়ালেই দেখবি এবার পাস করবে। আর রোজ একটা করে পয়সা আশ্রমের নামে মানত করে রাখিস। তাহলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। তবে বলে দিস, একটু সময় করে যেন পড়াশুনো করে।

দু দুবার মরা সন্তান প্রসব করেছে ত আগে আসতে কি হয়েছিল? ডাক্তারি করিয়েছিলি ত তাই করাগে যা। বিশ্বাস কি আর সহজে হয় রে। অবিশ্বাস করেই না হয় একবার বলে দেখতিস। যা, এই ঝরা বেলপাতাটা নিয়ে যা। প্রসব বেদনা উঠলেই আমার নাম করে বেঁটে খাইয়ে দিবি। সে সময় আর কোন ওষুধ খাওয়াবি না। তাহলে কোন ফল হবে না।

এবারেও তোর মেয়ের বিয়ে হলো না? অপ্সরা কিন্নরী না হলে বুঝি তাদের মন ওঠে না? পাত্রপক্ষকে গিয়ে আর একবার দেখতে বল। সেই সঙ্গে বলে আয়, দানসামগ্রী কিছুই দিতে পারবি না। তাহলে দেখতেই আসবে না, ভাবছিস? অত ভাবনার তোর দরকার কি, যা বলছি তাই কর। আমার আদেশ সেখানে পেঁছে গেছে। ঠিক আসবে। ওখানেই বিয়ে হবে।

তোর ব্যবসায় মন্দা পড়েছে বলে সংসার অচল হয়ে আসছে। আমি তার কি করতে পারি? তিন মাস আগে বলেছি, রোজ একটা করে পয়সা আশ্রমের নামে রেখে দিবি। তাতেও তোর কৃপণতা? হিসাব করে এই

তিনমাসের পয়সা মায়ের হাতে দিলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

তোরা মোকদ্দমায় হারবি না ত কি? ভেজাল দেওয়া, ওজন কম দেওয়া আজ থেকে বন্ধ করে দে। তুই নিজে অন্যায় করবি ত জমিদার মিথ্যা মোকদ্দমা করবে না কেন বলতে পারিস? লোককে যত ঠকাবি, নিজে তত ঠকবি। যা করেছিস, সব মাপ করে দিলাম। এ মোকদ্দমায় তোর জিত হবে। তবে আশ্রমে পুজো দিতে ভুলিসনি।

কিরে, তুই কি ভেবেছিস? বাবা মায়ের বারণ অমান্য করে আমার কাছে এসেছিস আশীর্বাদ চাইতে? ঘরের ভগবান রইল পড়ে, আর তুই বাইরে গিয়ে ভগবানকে খুঁজে পাবি? যদি ভাল চাস ত এসব দুর্মতি ছেড়ে দে। তা নইলে তোর একুল ওকুল দুকুল যাবে। শেষ পর্যন্ত ভণ্ড সন্ন্যাসী সেজে ভিক্ষে করে খেতে হবে।

কারো গাছে ফল ধরে না, কারো ছেলে পরীক্ষায় পাস করতে পারেনি, কারো স্ত্রী বারবার মৃত সন্তান প্রসব করে, কারো মেয়ের বিয়ে হচ্ছে না, কারো ব্যবসা অচল হয়ে পড়েছে, কেউ মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে পড়েছে, কেউ বাবা মার নিষেধ অমান্য করে সংসার ছেড়ে ধর্ম করতে যাচ্ছে—সংসারী লোকদের এই ধরনের কত সব সমস্যার কথা বাবাকে ধৈর্য ধরে শুনতে হত আর তার প্রতিকার করতে হত তার শেষ নেই।

এর পর বাবা লোকনাথ একসময় বললেন,কত লোক আমাকে জিজ্ঞাসা করে, সংসারে কিভাবে চলা উচিত। আমি ত বলি, যা মনে আসে করবি আর বিচার করবি। চলবি স্বাধীনভাবে। তা হলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। বললে কি হবে? আমার কথার প্রথম অংশটি মনের মত হয় বলে শুধু সেইটুকুই নেয়, বাকি অংশটা আর মনে রাখে না। বিশ্বাস না থাকে, বিচার করতে না পারিস ত বিশ্বাস কর। কিন্তু দুটোর কোনটাই করবে না, শেষকালে কেঁদে এসে পড়বে। তাই কি প্রাণ খুলে কাঁদতে পারে? সেখানেও ফাঁকি। কিন্তু তবু তাদের ফিরিয়ে দিতে পারি না। রাগ করতে গিয়ে দেখি রাগ নেই। ক্ষমা না করে দয়া না করে আর করি কি?

একবার বাবার এক ভক্ত তার মেয়ের বিয়েতে বাবাকে নিমন্ত্রণ করে। বাবা বলেন, তিনি আশ্রমে থেকেই মেয়ে জামাইকে আশীর্বাদ করবেন। কিন্তু লোকটি কিছুতেই ছাড়বে না। বাবাকে যেতেই হবে। অগত্যা

বাবা যেতে রাজী হন। কিন্তু জীবই হেয় নয়, সব জীবের মধ্যেই তিনি আছেন, এক আত্মা বিরাজ করে সব জীবের মধ্যে—লোকটিকে এই শিক্ষা দেবার জন্য এবং লোকটির জীবপ্রেম পরীক্ষা করার জন্য বাবা একটি কালো কুকুরের রূপ ধরে গিয়েছিলেন বিয়ে বাড়িতে। লোকটি চিনতে না পেরে চেলা কাঠ দিয়ে মেরে তাড়িয়ে দেয় কুকুরটিকে। পরে লোকটি বাবাকে আবার নিমন্ত্রণ করতে আসে।

তাকে দেখেই বাবা বলেন, কিরে, আবার আজ কিসের নেমন্তন্ন করতে এসেছিস ? অতিথিকে খাতির যত্ন নাই করতে পারিস, তাবলে তার পিঠে চেলাকাঠ দিয়ে মারবি ? কত করে বললাম, আমি এখান থেকে তোর জামাইকে আশীর্বাদ করব। সে কথা তোর মনে ধরল না। তাই বাধ্য হয়ে কথা দিলাম, যাব। মিছে কথা আমি বলতে পারি না। তাই আমি আমার কথা রেখেছি। তুই যদি চিনতে না পারিস ত আমার দোষ কি ? কিন্তু বিনা কারণে কেলে কুকুরটাকে চেলাকাঠ ছুড়ে মারলি কেন ? শুভ কর্মে এ আচরণ কি তোর ভাল হয়েছে ? এই দেখ, ডান হাতটা এখনো ভাল করে নাড়তে পারছি না। নিরপরাধীকে মারলে তার আঘাত আমার গায়েও লাগে।

নাই বা চিনতে পারলি ; কিন্তু মারবি কেন ? তোর যেমন প্রাণ, তারও ত তেমনি প্রাণ। বিশ্বভুবনে আমি ছাড়া ত আর কেউ কোথাও নেই। তোরা যে ভগবানের নাম করিস, সেও ত আমি ছাড়া আর কেউ নয়। একশো বছর ধরে কত অরণ্যে পর্বতে ঘুরেছি, এ শরীরে কতবার বরফের স্তূপ জমে গেছে, আবার গলে গেছে। কিন্তু ঈশ্বরের সঙ্গে আমার দেখা সাক্ষাৎ হয়নি। আমি দেখেছি কেবল আমাকে, আর বুঝেছি যেখানে যা আছে তা সব আমারই বিভিন্ন রূপের বিচিত্র প্রকাশ।

এর দ্বারা বাবা এই শিক্ষাই দিতে চেয়েছেন যে ঈশ্বরকে আপন আত্মা ও এই বিশ্বচরাচর থেকে পৃথক করে দেখে খুঁজলে ঈশ্বরকে কখনই পাওয়া যাবে না। ঈশ্বরকে আপন আত্মার মধ্যে এবং সেই আত্মাকে সর্বভূতের মধ্যে বিচিত্ররূপে দেখাই হলো প্রকৃত ঈশ্বরদর্শন, প্রকৃত ঈশ্বরপ্রাপ্তি। এই জ্ঞানই প্রকৃত জ্ঞান, শ্রেষ্ঠ বিদ্যা। বাকি সব অবিদ্যা।

এতক্ষণ ধরে বৃদ্ধের সেই পুত্র তন্ময় হয়ে লোকনাথ বাবা ও তাঁর আশ্রম

সম্বন্ধে তাঁর অভিজ্ঞতার কথা বলে গেলেন।

বিভূপদবাবু একটা জিনিস লক্ষ্য করে আশ্চর্য হয়ে গেলেন যে, এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে কত মেল এক্সপ্রেস ট্রেন এল গেল অথচ কোন যাত্রী সেই ওয়েটিংরুমে একবার ঢুকল না। কথা বলার সময় কোনদিক থেকে কোন ব্যাঘাত সৃষ্ট হলো না। তাই আলোচনার স্রোত অব্যাহত গতিতে বয়ে চলে এসেছে এতক্ষণ।

বৃদ্ধ এবার বললেন, রাত বোধ হয় অনেক হয়ে গেল। ওঁর হয়ত অসুবিধা হচ্ছে। আমাদের ট্রেন ত সেই ভোরে। সারা রাত্রি এখানেই কাটাতে হবে।

বিভূপদবাবু বললেন, মূল ঘটনাটির এখনো কিছুটা বাকি আছে। আমি শেষ পর্যন্ত শুনতে চাই। তাতে যদি সারারাত কেটে যায়, তাতেও আমার আপত্তি নেই।

বৃদ্ধের পুত্র তখন পূর্ব প্রসঙ্গের জের টেনে বলতে লাগলেন, সেদিন বিকালের আগেই ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা দেখে দর্শনার্থীরা যে যার স্থানে চলে গিয়েছিল। আমি আশ্রমের বেলতলায় বাবার মুখপানে তাকাতেই তাঁর অন্তর্ভেদী দৃষ্টি যেন আমার সমগ্র আত্মসত্তাকে গ্রাস করে ফেলল। আমি যেন সব ভুলে গেলাম, নিজেকে হারিয়ে ফেললাম একেবারে। মুহূর্তে আমার আজীবন সঞ্চিত সব পাপ সব মালিন্য মুছে গেল।

সহসা বজ্রপাতের কান-ফাটানো শব্দে চমক ভাঙ্গল আমার। দেখলাম, আকাশ জুড়ে শুরু হয়েছে ঝড়ের তাণ্ডব। চারদিকের সমস্ত গাছপালা সেই ঝড়ের আঘাতে প্রচণ্ডভাবে আলোড়িত হচ্ছে। অথচ আশ্রমের যে বেলগাছতলায় আমরা বসেছিলাম তার শাখা প্রশাখায় কোন চাঞ্চল্য নেই। ইতিমধ্যে বাবা উঠে কখন ঘরে চলে গেছেন। আমি বিস্মিত হয়ে গেলাম। বুঝলাম, বাবার অলৌকিক প্রভাবে ঝড়ের সমস্ত তাণ্ডব আশ্রমের সীমানার মধ্যে এসে স্তব্ধ হয়ে গেছে। ঝড়ের পরই বৃষ্টি এল। বুঝলাম, বিকালে ঝড়বৃষ্টি হবে বলেই সর্বজ্ঞ বাবা আমাকে যেতে নিষেধ করেছিলেন।

বৃষ্টি আসতেই আমি ছুটে গিয়ে আশ্রমের দাওয়ায় উঠে আশ্রয় নিলাম। হঠাৎ বৃদ্ধা আশ্রমপালিকা এসে আমাকে বললেন, এখন জামাটা ছেড়ে ফেল। ঠাণ্ডা লেগে অসুখ করলে বাবা আমাকে আস্ত রাখবে না। ছিলাম

গোয়ালিনী, এখন হয়েছি সবার মা। বাবাও আমায় মা বলে ডাকে।

আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, এই দুর্যোগের সন্ধ্যায় বাবা এখন কোথায়?

বৃদ্ধা বললেন, কোথায় তিনি আছেন আর কোথায় যে তিনি নেই, তা কে বলতে পারে? ঝড় বৃষ্টি যখন শুরু হলো, তখন তাঁকে ঘরে দেখেছি। এখন ঘর শূন্য, আসন শূন্য, শুধু খড়মজোড়াটি পড়ে আছে। এসব দেখে এখন বিস্মিত হই না। কখনো দেখি দেহটা আছে, দেহের মালিক নেই, কখনো দেখি দেহ সমেত তিনি নেই। আবার এমনও দেখছি, এখানেও আছেন, আর একই সঙ্গে অন্যত্রও আছেন। এই যে তোমার সঙ্গে এত কথা বলছি, হয়ত তিনি সব শুনছেন। মনে যে গোপন চিন্তাটি এসেছে তাও তিনি অন্তরে বসে জেনে নিয়েছেন। কখনো প্রকাশ করেন, কখনো করেন না। এখন বুঝেছি ভাল মন্দ চিন্তা যিনি ধরতে পারেন, বুঝতে পারেন, তিনি সর্বান্তর্যামী ছাড়া আর কেউ নয়। আগে আগে ভয়ে ভয়ে থাকতাম, মনে হত, এই বুঝি ধরা পড়ে গেলাম। কিন্তু এখন আর ভয় করে না। নিজের মনের কাছে কারো কোন সঙ্কোচ বা দ্বিধা থাকে না। এখন সব কিছু তাঁর উপর ছেড়ে দিয়ে মনের দিক থেকে ছুটি পেয়ে গেছি।

সেদিন বৃদ্ধার কাছে বাবার বিস্ময়কর জীবনের কত কথাই যে শুনেছিলাম, দুঃখের বিষয় সে সব লিখে রাখিনি। যা মনে আছে তাই বললাম। এবার আমার কথা শেষ। এবার বাবার মুখে শুনুন বাকি কথা।

এই বলে বক্তা চুপ করতে বৃদ্ধ বলতে লাগলেন, বাছা বাছা দুর্বাক্যভরা চিঠি লিখে ছেলেকে বাবার কাছে পাঠিয়েছিলাম—সে কথা তোমায় বলেছি। কিন্তু কেন যে এসব লিখেছিলাম তা আমি বলতে পারব না। তখন আমার কেবলি মনে হত, বিষয় সম্পত্তি সব ফিরে পেয়ে কি আমার লাভ হলো? তাঁর সান্নিধ্য হতে বঞ্চিত হয়ে সবটাই আমার বিগড়ে গেল। এর থেকে সর্বস্বান্ত হয়ে পথের ভিখারী হওয়াও ভাল ছিল।

চিঠি দিয়ে ছেলেকে বারদী পাঠিয়ে আমি শোবার ঘরে চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে রইলাম। তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে সহসা দেখলাম, তিনি আমার সামনে জ্যোতির্ময় আনন্দঘন মূর্তিতে দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি মধুর কণ্ঠে আমাকে বললেন, আমি এলাম। তোর যেতে বারণ, কিন্তু আমার ত আর

আসতে বারণ নেই। প্রারব্ধ ভোগ এবার তোর কেটে গেল। এবার তোকে নতুন করে কাজকর্মে মন দিতে হবে। ব্যবসা বাণিজ্য, ধন সম্পত্তি, দেহ মন সব আমাকে উৎসর্গ করেছিস। আমিও সর্বস্ব গ্রহণ করেছি। আমাকে ত আর ফাঁকি দেওয়া চলবে না। এবার আমার কাজ মনে করে সব তোকে করতে হবে। তোর প্রজারা ত তোর প্রজা নয়, আমার। ধন সম্পত্তি সব তোর নয়, আমার। আমি যেমন চালাব, তেমনি তুই চলবি।

এখনি উঠে তুই কলকাতায় চলে যা। স্টেশান থেকে সোজা গদীতে গিয়ে ম্যানেজারকে বরখাস্ত করবি। কোন কৈফিয়ৎ চাইবার দরকার নেই। যা যাবার গেছে। তা যাক। পুরুষসিংহের মত কাজ করে যাবি। ভাল মন্দ নিয়ে মাথা ঘামাবি না। কিভাবে কি করতে হবে আমিই বলে দেব। প্রাণপণে কর্তব্য করে যাবি, কিন্তু কোন কিছুতে জড়িয়ে পড়বি না। যখনি ভাববি এটা যখন করছি, এই ফল হতে বাধ্য, তখনি তুই নিজের এলাকা ছাড়িয়ে নির্বোধের মত আহাম্মকির পথে পা বাড়াবি। আমার ব্যবসার ভাল ক্ষতি আমার উপর ছেড়ে দিয়ে শুধু কর্তব্যবোধে কাজ করে যাবি।

তোর ছেলেকে কাজকর্ম শিখিয়ে দিয়ে তার উপর ব্যবসার ভার দে। জমিদারির ভার তুই নে। আমার জমিদারির প্রজারা যাতে সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে থাকে, তার ভার রইল তোর উপর। প্রয়োজনবোধে যখন আমায় ডাকবি, তখনি সাড়া পাবি। তোর মাথার বালিশের তলায় তিনটি বিল্বপত্র রইল। আমি যে এসেছিলাম তার নিদর্শন।

তখনি বিছানা ছেড়ে উঠে পড়লাম। তন্দ্রার ঘোর কেটে গেল। দেখলাম বালিশের তলায় ঠিকই তিনটি বিল্বপত্র রয়েছে। সেই তিনটি পাতা আজও তাবিজে ভরে রেখেছি। এই দেখ আমার বুকের কাছটিতে তা রয়েছে। আমার মনের এতদিনের সব ক্লান্তি সব অবসাদ বিষাদ মুহূর্তে কোথায় যেন উবে গেল। আমি হয়ে উঠলাম যেন সম্পূর্ণ নতুন মানুষ। তৎক্ষণাৎ সরকার মশাইকে ডেকে সব ব্যবস্থা করে কলকাতা রওনা হয়ে গেলাম।

অচল চাকা কিকরে আবার বেগবান হয়ে উঠল তা জানি না। জলের স্রোতের মত অর্থাগম হতে লাগল। জলের স্রোতের মত অর্থব্যয় হতে লাগল। জনহিতকর প্রতিষ্ঠানগুলি সেই অর্থে পরিপুষ্ট হতে লাগল। দু হাতে তাঁরই দান তাঁরই নামে বিলিয়ে দিয়েছি। কিন্তু এত অর্থ ব্যয়

করেও কোন ঘাটতি পড়েনি, অর্থাভাব হয়নি। বরং অজস্র ধারায় অপ্রত্যাশিতভাবে নতুন পথ দিয়ে অর্থাগম হয়েছে। আয়ের অঙ্ক বেড়ে গেছে।

নিজের হাতে জমিদারির সমস্ত কাজকর্ম তুলে নিয়ে নায়েব গোমস্তাদের চিরাচরিত পদ্ধতি বাতিল করে দিলাম। পূর্বপুরুষদের আশ্রিত বেতনভোগী চার পাঁচশো লাঠিয়ালকে আমার খাস জমিতে কৃষিকার্যে লাগিয়ে দিলাম। এতে কর্মচারীরা প্রমাদ গুনল। তারা আড়ালে আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে লাগল। এর পর প্রকাশ্যে তারা আমার কার্যকলাপের প্রতিবাদ জানিয়ে বলল, এভাবে জমিদারি রক্ষা করা যায় না। ধন মান ত যাবেই, প্রাণ পর্যন্ত ঠেকানো শক্ত হবে।

আমি তাদের বলেছিলাম, এ জমিদারি আমার নিজের অর্জিত নয়। সঙ্গে করে আনিনি, সঙ্গে নিয়েও যাব না।

আমার জমিদারিতে স্কুল কলেজ, হাসপাতাল, লাইব্রেরী, হরিসভা, মন্দির, মসজিদ, গির্জা, নতুন নতুন পথঘাট, দীঘি, পুষ্করিণী বাঁধ যা কিছু গড়ে উঠল, এ সবের পিছনেই ছিল বাবার সদাজাগ্রত প্রেরণা ও সুস্পষ্ট আদেশ। কিন্তু বাবার কোন কথা কারো কাছে বলা নিষেধ ছিল বলে আমি তা বলতাম না। সবাই ভাবত, জমিদার হিসাবে যাই হই, আমি মানুষটা বোকা আর ভাল মানুষ।

বাবার আদেশে আমার কাজকর্মের ও আয় ব্যয়ের প্রতিটি হিসাব বাবাকে পাঠিয়ে দিয়েছি। হিসাবে কোন গোলযোগ থাকলে সঙ্গে সঙ্গে সতর্ক করে দিয়েছেন। সংসার খরচে মাত্রাধিক্য ঘটলে প্রতিবাদ করে পত্রাঘাত করতে ছাড়েননি। বেশ বুঝিয়ে দিয়েছেন, কোন কিছুই তাঁর দৃষ্টি এড়ায় না। এতটুকু অন্যায় অবিচার হচ্ছে বুঝলেই ধমক দিয়েছেন। মনে কোন অসঙ্গত ইচ্ছা বা বাসনা জাগলে প্রতিনিবৃত্ত করেছেন। একবার কামনা হয়েছিল, আশ্রমের জমিতে বাবার নামে একটা মন্দির স্থাপন করি। সে কথা জানতে পেরে তিনি লিখলেন, মন্দিরে কার কি উপকার হবে? নামের মোহ ছাড়তে হবে। প্রজার অর্থে নিজের মহিমা বাড়ানোর ইচ্ছা আমি শাসনযোগ্য বলে মনে করি।

এই রকমের তাঁর নিজের হাতে লেখা কয়েকখানি চিঠি আছে। সেগুলো পড়লে বুঝতে পারবে কিভাবে তিনি আমার প্রতিটি গতিবিধি

নিমন্ত্রিত করেছেন।

দেখতে দেখতে দু বছর কেটে গেল। বাবার কৃপায় জমিদারির কাজকর্ম ও ব্যবসা ভালভাবেই চলছিল, সেকথা আগেই বলেছি। ইতিমধ্যে ব্রহ্মচারী বাবার নির্দেশে আমি গেন্ডারিয়ার আশ্রমে গিয়ে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীজীর কাছে দীক্ষা নিয়ে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করি।

একদিন গুরুজী আমাকে ডেকে বললেন, তোমার সামনে এক মহা-পরীক্ষা আসছে। আশীর্বাদ করি, তুমি ব্রহ্মচারীবাবার কৃপায় এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হও। মাসখানেকের জন্য আমাকে ঢাকা ছেড়ে চলে যেতে হবে। কিন্তু সেজন্য অসহায় বোধ করো না। ব্রহ্মচারী বাবা এতক্ষণ বিদেহ অবস্থায় আমার সঙ্গে ছিলেন। তিনি তোমার সব ভার নিয়েছেন। তাঁর উপর তোমার দায়িত্ব দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত হলাম। আমি যেমন তোমার গুরু, তেমনি মনে রাখবে তিনিও তোমার গুরু। আমি আর ব্রহ্মচারীবাবা অভিন্ন। কোন অবস্থাতেই তাঁর প্রতি তোমার ভক্তি বিশ্বাস হারাবে না।

গুরুদেব গোঁসাইজী সেইদিনই আশ্রম ছেড়ে চলে গেলেন। আমি ভারাক্রান্ত মনে বাড়ি ফিরে এলাম। আমার সামনে কি মহাপরীক্ষা তা বুঝতে পারলাম না। ব্রহ্মচারীবাবার কাছে চিঠি লিখে লোক পাঠিয়েও কোন উত্তর পেলাম না। ছেলেটাকে আসতে চিঠি লিখে লোক পাঠিয়ে দিলাম। মহা দুশ্চিন্তার মধ্যে দু'দিন কাটল।

সেদিন রাতে আলো নিবিয়ে দিয়ে শুয়ে পড়লাম। ঘুম আসছিল না। অনেকক্ষণ পর একটু তন্দ্রার ঘোর আসতেই হঠাৎ একটা বিকট শব্দে চমকে উঠলাম। সামনের খোলা জানালা দিয়ে অনেকগুলি মশালের আলো দেখতে পেলাম। বহুকণ্ঠের উচ্চ কোলাহলে বুঝলাম আমার কাছারি ঘরে ডাকাত দল হানা দিয়েছে। অন্ধকার ঘরের দরজা খুলে বেরিয়ে আসতেই আমার মাথার উপর জোর লাঠির আঘাত এসে পড়ল। সিঁড়ি দিয়ে গড়াতে গড়াতে আমি কোথায় এসে পড়লাম এবং তারপর কি হলো, কিছুই জানি না।

তিন দিন পর যখন জ্ঞান ফিরে এল তখন আমি পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়েছি। পাশ ফিরে শোবার ক্ষমতা পর্যন্ত নেই। আমার মাথায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধা, সেখানে অসহ্য যন্ত্রণা। পাঁজরার তিনটে হাড় ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেছে। একটা হাঁটু ভেঙ্গে গেছে। মাথা ফেটে গেছে। দুটো কবজির হাড়

সরে গেছে। মাথার গোড়ায় ছেলেকে দেখে কথা বলার চেষ্টা করলাম। কিন্তু কথা বার হলো না। সাহেব ডাক্তার কি একটা ইনজেকশান করতেই আমি ঘুমিয়ে পড়লাম।

তারপর ঊনিশটি দিন যে আমার কিভাবে কেটেছে, আমি তার কিছুই জানি না। এর পর হঠাৎ একদিন আমার আচ্ছন্ন ভাবটি কেটে গেল। আমার গলা দিয়ে স্বাভাবিক স্বর বার হলো। আমার ছেলেকে আমি তখন জিজ্ঞাসা করলাম, আজ কত তারিখ ?

আমার ছেলে বলল, বাবা, তুমি ব্রহ্মচারীবাবার কৃপায় ভাল হয়ে গেছ। তাঁর কৃপায় তুমি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠবে।

আমি বললাম, তিনি কোথায় ?

ছেলে বলল, তা ত জানি না। তবে প্রতি রাতেই তিনি ছায়ার মত আসেন, আবার ছায়ার মতই সরে যান। আমি তাঁকে দেখতে পেয়েই ঘর ছেড়ে চলে যাই।

এর পর আমি বিছানায় উঠে বসার চেষ্টা করলাম। কিন্তু পারলাম না। উঠে বসা দূরে থাক, হাতটি পর্যন্ত তোলবার শক্তি নেই। হঠাৎ মনে পড়ে গেল, তিন বছর আগে ঠিক এই দিনটিতে সর্বজ্ঞ বাবা বলেছিলেন, 'আজ হতে তিন বছর পর তোকে এই দিনে লোকের কাঁধের উপর ভর দিয়ে আসতে হবে।' এই কথা ভেবে ভেবে আমি ঠিক করলাম, আজ যেমন করে হোক, এই ভগ্ন দেহটাকে ব্রহ্মচারীবাবার পদপ্রান্তে হাজির করে দিতেই হবে।

আমি ছেলেকে ডেকে একথা বলতেই প্রবল আপত্তি করল সে। তার আপত্তির কারণও ছিল। প্রথমতঃ দেহের ভাঙ্গা হাড়গুলো জোড়া লাগেনি এখনো। তার উপর আমার হার্ট দুর্বল। কিন্তু তার সে আপত্তি না মেনে আমি তাকে উকীল বাড়ি পাঠিয়ে দিলাম। আর আমি সরকার মশাইকে ডেকে পালকি বেয়ারার ব্যবস্থা করতে বললাম। তারপর পালকিতে করে একজন ভৃত্যকে সঙ্গে নিয়ে বারদীর আশ্রমে যাবার জন্য রওনা হয়ে পড়লাম।

কিন্তু আশ্রমে গিয়ে বাবার দেখা পেলাম না। তিনি আগের দিন কোথায় চলে গেছেন এবং কখন আসবেন তা কেউ বলতে পারল না। পালকির মধ্যে, শুয়ে অসহ্য গরমে সারাদিন কেটে গেল আমার। সন্ধ্যা হতেই আমার

ছেলে লোকজন, ডাক্তার, উকীল, ওষুধপত্র নিয়ে হাজির হলো সেখানে। সবাই আমাকে বাড়ি ফিরে যাবার জন্য অনুরোধ করল। কিন্তু আমি বললাম, ব্রহ্মচারীবাবার সঙ্গে দেখা না করে আমি যাব না। আশ্রমবাসীরা তখন আমাকে আশ্রমের ঘরে রাত্রিবাস করার জন্য অনুরোধ করল। কিন্তু সে সব অনুরোধে কান না দিয়ে আশ্রমের বাইরে সেই গাছতলাতেই থাকার জন্য জেদ ধরলাম। তখন আমার লোকজনেরা সেই গাছতলাতেই মশারি টাঙ্গিয়ে একটা বিছানা করে দিল। আমার অনুরোধে আমার ছেলে সবাইকে নিয়ে বাড়ি ফিরে গেল। ওষুধ পথ্য যা এনেছিল সব তারই সঙ্গে ফিরিয়ে দিলাম। কারণ আমি প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, ব্রহ্মচারীবাবার সঙ্গে দেখা না হওয়া পর্যন্ত ওষুধ পথ্য কোন কিছুই খাব না আমি।

এইভাবে তিন দিন তিন রাত্রি কেটে গেল। সবাই ভাবল, আমি খুব কষ্টে আছি। কিন্তু সত্যি কথা বলছি, রাজশয্যায় শুয়ে আমি এত আরাম কখনো পাইনি। সেখানকার মাটিতে, আলো হাওয়ায় ও আকাশে কি ছিল জানি না। কষ্ট ত দূরের কথা, প্রতিটি মুহূর্ত আমার মনে হয়েছে মধুময়। পক্ষাঘাত রোগগ্রস্ত দেহের সব ব্যথা বেদনা ভুলে গেলাম আমি। ভুলে গেলাম ক্ষুধাতৃষ্ণার যন্ত্রণা। রাত্রিবেলায় মশারির ভিতর থেকে আকাশভরা তারা দেখতে দেখতে ঘুমিয়ে পড়েছি। ভোরবেলায় পাখির ডাক শুনতে শুনতে জেগে উঠেছি। সারাদিন একভাবে শুয়ে থাকতে থাকতে পেয়েছি মাটির নিবিড় স্পর্শ, দুচোখ ভরে দেখেছি আদিগন্ত আকাশের মহিমা যা আগে কখনো লক্ষ্য করিনি। আমার যত সব মান-অপমান, অভিযোগ, অনুযোগ ও অভিমানের তিক্ততা কোথায় যেন উবে গেল। পরমাশ্চর্য এক আত্মিক তৃপ্তির অতলে আমার সব দেহচেতনা যেন তলিয়ে গেল। অতীতের ভাবনা, ভবিষ্যতের চিন্তা, বর্তমানের কামনা বাসনা সব যেন কোন যাদুমন্ত্রে অন্তর্হিত হয়ে গেল। ডাকাতিতে কি ক্ষতি হলো, জমিদারি ও ব্যবসার কাজকর্ম কিভাবে চলছে—সে সব জানবার কিছুমাত্র কৌতূহল হলো না আমার।

চতুর্থ দিন আমার ছেলে এসে আমাকে জানাল, ব্রহ্মচারীবাবা আশ্রমে এসে গেছেন। আমি তাঁর কাছে তোমার সব কথা জানালাম। কিন্তু তিনি আমার কোন কথা গ্রাহ্যই করলেন না। আমি বললাম, আপনি এক-

বার গিয়ে বাবার সঙ্গে দেখা করুন, আপনি না গেলে তিনি জলস্পর্শ করবেন না, তাঁর হার্ট দুর্বল। এতে আরো খারাপ হবে। আপনি না বললে তিনি আশ্রমের ভিতরে এসে বাস করবেন না।

তার উত্তরে তিনি কড়া ভাষায় বললেন, দেশ দেশান্তর থেকে কত রোগী কত লোক আসে, আমি কি তাদের ডেকে আনি? তোর বাবা জমিদার বলে কি তাকে খাতির করে ডেকে আনতে হবে? খাওয়া না খাওয়া, এখানে আসা, না আসা তার ইচ্ছা। আমি কেন বলতে যাব? এ আশ্রম আমার জমিদারি নয়, ইচ্ছামত মানুষ আসে, চলে যায়। ওর গুরু ত গোঁসাই। আদেশ নিতে হলে তার কাছে যেতে পারতিস। গুরু অক্ষম হয়ে আমার কাছে পাঠিয়ে দিলে আলাদা কথা। গুরু বুঝি ওকে তাড়িয়ে দিয়েছে তাই ও আমার এখানে এসে হত্যে দিয়ে পড়ে আছে।

এর পরেও কি তুমি এখানে থাকতে চাও?

ছেলের সব কথা শুনে শান্তভাবে আমি বললাম, যাব বলে ত আসিনি। সমাদর পাবার আশা নিয়েও আমি আসিনি। যে জন্য আমি এসেছি, তা আমি পেয়ে গেছি। প্রতি মুহূর্তেই নতুন করে পাচ্ছি। আমার অন্তরে অভিমান ছিল, রাগ, দ্বেষ, হিংসা, কামনা, অনুশোচনা, চাওয়া পাওয়ার কত আবর্জনা ছিল। আশা নিরাশার দ্বন্দ্ব ছিল। অভিযোগের পাহাড় ছিল আমার বুকে। সে সব আর নেই। গতকাল রাত্রে আমার মশারির গা ঘেঁষে একটা নোংরা দুর্গন্ধময় ঘায়ে ভর্তি কুকুর এসে শুল। কিন্তু তাকে তাড়িয়ে দেবার ইচ্ছা হলো না আমার। উল্টে মশারির বাইরে হাত বাড়িয়ে আমার কম্বলের একটা অংশ তার গায়ের উপর চাপিয়ে দিলাম। এক অব্যক্ত আনন্দে আমার প্রাণ ভরে গেল। তখন কুকুরটির গায়ে দুর্গন্ধের বদলে কোথা হতে কি করে চন্দনের গন্ধ এল তা জানি না। কিন্তু কথাটা যে মিথ্যে নয়, তার প্রমাণ আমার কম্বলটায় এখনো আছে। আসল কথা আমি সেই কুকুরটার স্পর্শে দয়াল ব্রহ্মচারী বাবার স্পর্শই পেয়েছি। আমার মত কত পথের কুকুরকে তিনি আশ্রয় দিয়েছেন—আমি তা স্বচক্ষে দেখেছি।

এর পর আমার ছেলে একদিন আমায় বলল, ডাক্তার বলেছে আর দেরি করলে তোমার বুকের হাড় জোড়া লাগবে না। মাথার ক্ষতস্থান বিষিয়ে গেলে প্রাণসংশয় হয়ে উঠবে। এখনো সময় আছে। ব্রহ্মচারী বাবার দর্শন

পেলেই তুমি ফিরে চল। তিনি যদি তোমার কাছে না আসতে চান, তবে আমিই একজন লোকের সাহায্যে তোমাকে নিয়ে যাব।

আমি বললাম, আমাকে নিয়ে যাবার চেষ্টা করো না। সময় হলে আমি নিজেই বাড়ি ফিরে যাব। আপাততঃ আমি এখানে থাকব বলেই এসেছি। দর্শনের প্রার্থনা আমি করি না। দর্শন দেবার হয় তিনি দেবেন, না দেবার হয় না দেবেন।

আমার ছেলে তখন বলল, তাহলে তোমার রোগ সারবে না।

আমি বললাম, সারবার না হলে সারবে না। আমি এখানে আসবার আগেই জেনে এসেছি এ রোগ সারবার নয়। আমার যেদিন জ্ঞান ফিরে আসে, তোমার আনানো তিনজন বিশেষজ্ঞ বড় ডাক্তারের অভিমত আমি নিজের কানে শুনেছি। তাঁরা বলাবলি করছিলেন, আমার মস্তিষ্কের যে অংশটি চূর্ণ হয়ে গেছে, তা আর সারবে না। জ্ঞান ফিরবে ঐ পর্যন্ত। কথা বলতে ও বুঝতে পারব। কিন্তু যতদিন বাঁচব চলৎশক্তিহীন হয়ে শুয়ে কাটাতে হবে।

এইভাবে আরও সাতদিন কেটে গেল। ইতিমধ্যে বিপুল সম্পত্তির উত্তরাধিকারী বাবার ঠিকমত চিকিৎসা করাচ্ছে না বলে আমার ছেলের নামে নিন্দাবাদ রটতে লাগল। আত্মীয় বন্ধু, পাড়া প্রতিবেশী, চেনা অচেনা সকলেই প্রকাশ্যে তার মুখের সামনে তার নিন্দা করতে লাগল। সে তখন অতিষ্ঠ হয়ে একদিন ব্রহ্মচারী বাবার কাছে গিয়ে দেখা করল তাঁর সঙ্গে। তিনি যাতে এসে আমার সঙ্গে দেখা করেন এজন্য তাঁকে অনেক অনুরোধ করল। কিন্তু বাবা তাঁকে বললেন, তুই ত জানিস এ রোগ সারবে না। পৃথিবীর দূর প্রান্ত থেকে সবচেয়ে বড় ডাক্তার আনলেও এ রোগ সারবে না। এ রোগ শিবের অসাধ্য।

আমার ছেলে তখন অধৈর্য হয়ে বলেছিল, তাহলে আমি এখন কি করব তা বলুন।

তিনি বলেছিলেন, তুই কিছুই করবি না।

তারপর তিনি আমার ছেলের সঙ্গে আমার কাছে এসেছিলেন।

এবার বৃদ্ধের ছেলে নিজে বলতে লাগলো, তিনি যখন আশ্রম থেকে আমার সঙ্গে বাবার কাছে যাচ্ছিলেন, তখনকার তাঁর সেই চলার মহিমান্বিত

ভঙ্গীটি আজও আমার মনে আছে। মুনি ঋষিদের চোখে দেখিনি, তাঁদের কথা বইয়ে পড়েছি। দেখলাম, তাঁর আরক্ত পদতল মাটির উপর দিয়ে হাঁটছে বলে মনে হচ্ছে না।

ব্রহ্মচারীবাবা এইভাবে আমার বাবার বিছানার পাশে এসে নীরবে দাঁড়ালেন। তারপর ডান হাতটি বাড়িয়ে দিয়ে বাবার মাথা স্পর্শ করে বললেন, আর তোকে শুয়ে থাকতে হবে না, উঠে বস। তোর সমস্ত ব্যাধি সেরে গেছে। কোন ওষুধপত্রের দরকার হবে না। উঠে দাঁড়াতে একটু কষ্ট হবে। তা হোক। আমার হাত শক্ত করে ধরে আমার সঙ্গে বেলতলা পর্যন্ত আয়।

যন্ত্রচালিতের মত বাবা উঠে বসলেন। এতদিন নির্জলা উপবাস করে শরীর অত্যন্ত দুর্বল ছিল। কিন্তু কে বলবে তখন যিনি পক্ষাঘাতগ্রস্ত রোগী। প্রথমে ব্রহ্মচারীবাবার চরণে লুটিয়ে পড়ে প্রণাম করলেন। তারপর উঠে তাঁর হাত ধরে হাঁটতে লাগলেন।

আমার মনের মধ্যে ঝড় বইতে লাগল। স্বচক্ষে ব্যাপারটা না দেখলে এ ঘটনা যে ঘটা সম্ভব তা বিশ্বাস করতে পারতাম না। বিজ্ঞানের যুগের মানুষ আমরা, অধ্যাত্ম, বিজ্ঞানের কিছুই জানি না। তাই যা কিছু আমাদের সীমাবদ্ধ বুদ্ধি দিয়ে বুঝতে পারি না, তা অবিশ্বাস করি। বিজ্ঞানের ঊর্ধ্বে যে এক বৃহত্তর শক্তি ও মহত্তর বিজ্ঞান আছে যার মধ্যে নিহিত আছে সৃষ্টি তত্ত্বের মূল রহস্য তা স্বীকার করতে আমাদের বাধে। জাগতিক ও মানবিক সব শক্তির কেন্দ্রস্থিত যে অনন্ত শক্তির লীলা বিশ্বপ্রকৃতির বুকে লীলায়িত হয়ে চলেছে তা আমরা বুঝতে পারি না।

এই বলে বক্তব্য শেষ করলেন বৃদ্ধের ছেলে। তখন ভোর হয়ে এসেছে। ওঁদের ট্রেন আসতে আর বেশী দেরি নেই। বিভূপদবাবু বললেন, এখনো ত শোনার কিছু বাকি আছে। তখন ত আপনি সুস্থ হয়ে উঠেছিলেন। তবে কেন আবার এ রোগ হলো? তাছাড়া যাঁর কৃপায় আপনি সেরে উঠে-ছিলেন, তিনি ত এখন আর নেই।

বৃদ্ধ বললেন, এই ঘটনার পরে মাত্র কয়েকদিন ব্রহ্মচারীবাবা নরদেহে ছিলেন। এরই মধ্যে একদিন আমাকে ডেকে বলেছিলেন, তোর প্রারব্ধ

কেটে গেছে। তবে এইখানেই শেষ নয়। দীর্ঘদিন পরে এই রোগ আবার হবে। তখন বিচলিত না হয়ে এইখানে এসে এমনি করে দিনকতক অবস্থান করবি। তাতেই তোর সঞ্চিত কর্মের ভোগ কেটে যাবে।

আমার দেড়শো বছরের দেহটাকে আমি এবার ত্যাগ করব। কিন্তু আমি ছিলাম, আমি আছি, আমি থাকব। যখনই ডাকবি তখনই আমার সাড়া পাবি। আমি যে নেই, একথাটা মনে আমল দিবি না। আশ্রমের ভূমি-শয্যায় তোকে যে ভাবটি দিয়েছিলাম সেটি স্মরণ করবি তখন। দেহমন যখন আমাকে সমর্পণ করেছিস, তখন পাপপুণ্যের কোন বোধ মনে আসতে দিবি না।

বৃদ্ধ তাঁর কথা শেষ করতেই ওঁদের ট্রেন এসে গেল।

ওঁ

গীতায় শ্রীভগবান বলেছেন, আকাশের বায়ু আকাশকে আশ্রয় করে প্রবাহিত হয়। অথচ মনে হয় সে যেন আকাশের কেউ নয়। আকাশের সঙ্গে যেন তার কোন সম্পর্কই নেই। ঠিক এমনি করেই আমার মধ্যে থেকেও আমার সঙ্গে তার একাত্মতার কথাটি বুঝতে পারে না। আমাকে আশ্রয় করে যারা থাকে তারা যে আমার মধ্যেই আছে তা ধারণায় আনতে পারে না, কারণ আমি যে দেহ পরিগ্রহ করে বসেছি, সেই টুকু দেখেই নিছক দেহসীমার মধ্যে আবদ্ধ হয়ে থাকে। আমার দেহাতিরিক্ত আত্মাকে তারা পরমাত্মা বলে গ্রহণ করতে পারে না। তাদের দৃষ্টি দেহকে অতিক্রম করে দেহাতীতের স্তরে উঠতে পারে না। তাই আমাকে আর আমি বলে চিনতে পারে না।

মহাযোগী পরম পুরুষ লোকনাথবাবার কাছে যারা যেত, তারাও তাঁকে মরদেহের সীমার মধ্যে আবদ্ধ দেখত। তারা ভাবতে পারত না, এই মরদেহ ত্যাগ করার পরেও তিনি থাকবেন। তাঁর দেহাতীত অমর আত্মা চিরকাল ধরে ব্যাপ্ত হয়ে থাকবে এই পৃথিবীতে। তাই তিনি ভক্তদের বলতেন, আমি ছিলাম, আমি আছি, আমি থাকব।

ভগবান অর্জুনকে বলেছিলেন, আমি নিজেকে জানি বলেই জন্ম-জন্মান্তরের সংবাদ সব আমার জানা। অনন্তকাল ধরে তুমিও আছ, আমিও

আছি। কিভাবে কোথায় আমরা ছিলাম তা সব আমি জানি। কারণ যা কিছু হয়েছে সব আমার মধ্যেই হয়েছে। তুমি সে সব কিছু জান না। আমার কাছে স্থানকালের ব্যবধান কিছু নেই। জন্মমৃত্যুর আড়াল কিছু নেই। যতবার যত রূপে আমি এসেছি সব আমি জানি। তুমি এ সব কিছু জান না।

লোকনাথবাবা ছিলেন মুক্তপুরুষ। পূর্ব পূর্ব জন্মের স্মৃতি জেগে উঠত তাঁর মনে। কিন্তু কোন জন্মের প্রতিই মমত্ববোধ ছিল না তাঁর মনে। বর্তমানে যে দেহ আশ্রয় করেছিলেন সেটার প্রতি যেমন কোন আগ্রহ ছিল না, তেমনি যে দেহে আগে ছিলেন তার প্রতিও কোন আগ্রহ ছিল না।

পূর্ব পূর্ব জন্মের যে সব ছবি ভেসে উঠত তাঁর স্মৃতিপটে, তার কথা মাঝে মাঝে নির্বিকার নৈর্ব্যক্তিকভাবে ভক্তদের মাঝে বলতেন। কৌতূহলী হয়ে অনেকে অনুসন্ধান করে দেখেছে তাঁর বিবরণ ঠিক ঠিক মিলে গেছে।

তা শুনে হাসতে হাসতে লোকনাথবাবা বলেছেন, আমি কখনো ভুল দেখি না। যা ঘটেছে, যা দেখেছি তাই বলেছি। এ সবের মধ্যে নূতনত্ব কি আছে ?

দীর্ঘকালের কঠোর সাধনায় ব্রহ্মচারীবাবা কর্মযোগে পরমতম সিদ্ধি লাভ করেন। একটির পর একটি ভূমি অতিক্রম করে বহুবিধ অধ্যাত্মস্তর পার হয়ে এমন একটি অনির্বচণীয় অবস্থায় উন্নীত হলেন যার তুলনা নেই। সেই পরমতম মোক্ষপ্রাপ্তির অবস্থা লাভ করেছিলেন তিনি যে অবস্থায় সাধক নিজের মধ্যে নিজে তৃপ্ত, নিজেকে নিয়ে নিজে সতত সন্তুষ্ট, নিজের বাইরে আর কোন কিছুর অস্তিত্ব দেখতে পান না, কারণ তখন নিজের মধ্যে বিশ্বের সব কিছুকে দেখতে পান।

কথাপ্রসঙ্গে একদিন এক ভক্তকে নির্জনে বলেছিলেন লোকনাথবাবা, ইচ্ছা ত করে সেই অনুভূতির কথা সবাইকে শুনিয়ে দিই। কিন্তু ভাষা সে ভাবকে প্রকাশ করতে পারে না। আবার সেই ভাবটির কথা একটু ভাবতে গেলেই দেহ থেকে আলগা হয়ে যাই। তার পরে যে কি হয় তা আর বলা যায় না। সব কিছু যা যেখানে আছে, সব দেখি আমার মধ্যেই আছে। আবার আমিই সব কিছুর মধ্যে জড়িয়ে গিয়ে কি একটা অসীম অব্যক্তভাবে বিরাজ করছি। সে যে কি অদ্ভুত অবর্ণনীয় ভাব তা আমার বলার সাধ্য

নেই। তাই চুপ করে থাকি। যখন সজ্ঞানে থাকি, তখনো সেই ভাবের ক্রিয়া সমভাবে না হলেও চলতেই থাকে। লোকের কথা শুনি, লোকের সঙ্গে কথা বলি, আলাপ আলোচনা সবই করি। তাই আমার ভাবটি কেউ বুঝতে পারে না। লোকে ভাবে আমি তাদের মতই একজন।

ওঁ

নারিশাবাবার মত এক চরিত্রহীন লম্পট ও ভণ্ড সাধুর রূপান্তর লোকনাথবাবার অপূর্ব এক কীর্তি। লোকনাথ ব্রহ্মচারী যে অসাধারণ শক্তি সম্পন্ন এক মহাযোগী সে বিষয়ে কারো কোন সন্দেহ ছিল না। কিন্তু তিনি যে সর্বশক্তিমান সে বিষয়ে দুই একজন ভক্তের মনে দ্বিধা ছিল। তাই একদিন এক কৌতূহলী ভক্ত নারিশাবাবার কাছে লোকনাথবাবার জীবন কাহিনী প্রসঙ্গে এ বিষয়ে জানতে চান।

নারিশাবাবা তখন আগের সেই ভণ্ড সাধু আর নেই। লোকনাথবাবার সংস্পর্শে এসে এবং বিশ বাইশ বছর তাঁর সান্নিধ্যে কাটিয়ে তিনি হয়ে উঠেছেন পরম জ্ঞানী ও সিদ্ধ পুরুষ। নারিশাবাবা সেই ভক্তের কথা শুনে বললেন, এ বিষয়ে তোমার দ্বিধা হওয়া স্বাভাবিক, কিন্তু আমার মনে কোন দ্বিধা নেই। আমার নিজের অভিজ্ঞতা দিয়েই শুরু করি। তখন আমার চেলাগিরি শেষ হয়েছে। সে গুরুভার ঝেড়ে ফেলে নিজেই দু একটা চেলা বানিয়ে সাধু বনে গেছি। তখন আমার বয়স ষাট সত্তর হলে হবে কি, বেশ ষণ্ডামার্কা চেহারা, পরিধানে কৌপীন, ভস্মমাখা দেহ, মাথা জোড়া আজানুলম্বিত জটা, বগলে বাঘছাল, সঙ্গে আজ্ঞাবাহী চেলা, কণ্ঠে 'ব্যোম ভোলানাথ' গগনভেদী হুংকার—আর কি চাই। যে পথ দিয়ে আমি যাই, ধর্মান্ধ পাগলের দল আমার পায়ে এসে পড়ে। সঙ্গে নিয়ে আসে খাদ্য, পানীয়, গাঁজা ভাঙের সিধে। প্রণামীর বিনিময়ে মাদুলী তাবিজ বিলি করি। যা চাই তাই জুটে যায় বলে চাওয়াগুলো ন্যায়সঙ্গত হচ্ছে কি না তা ভাবতাম না। এইভাবে এক গ্রাম হতে অন্য গ্রামে সরে পড়ি। ফলে ধরা পড়ার ভয় থাকে না। তা ছাড়া যথেষ্ট পরিমাণে নারীঘটিত দুর্বলতা ছিল বলে এক জায়গায় বেশী দিন থাকা নিরাপদ ছিল না।

ভাবতে পার, আমার মত এক চরিত্রহীন লম্পট যার জীবনের আগা-

গোড়া সবটাই পঙ্কিল, যে লোক এমন কোন কুকর্ম নেই যা করেনি, তার পক্ষে রাতারাতি বদলে যাওয়া সম্ভব ? বিশ্বাস করো, এমনি একটা অসম্ভব সম্ভব হলো আমার জীবনে। যাঁর কৃপায় যাঁর পলকের দৃষ্টিপাতে এমন অঘটন ঘটে যেতে পারে, তিনি সর্বশক্তিমান ছাড়া আর কি বলব ? লোকে বলে ঈশ্বর সর্বশক্তিমান। নিশ্চয়ই তিনি তাই। ঈশ্বরের কাছে রক্ষা করার প্রার্থনা করে আগুনে ঝাঁপ দিলে তিনি রক্ষা নাও করতে পারেন। কিন্তু এক্ষেত্রে আমাকে প্রার্থনা করতেও হলো না। না চাইতেই সব ঘটে গেল। কি করে কি হলো তাই বলছি শোন।

জন দুই চেলা আর পাঁচ সাতটি উমেদার সঙ্গে নিয়ে শুধু পেটের ধান্ধায় ত্রিপুরা জেলার গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম। সঙ্গে ছিল তিনটে ঘোড়ার পিঠে বোঝাই করা তাঁবু, বিছানাপত্র, প্রচুর খাদ্যদ্রব্য আর সিদ্ধি গাঁজা ভাঙের ভাণ্ডার। সঙ্গে বেশ কিছু টাকা পয়সাও ছিল। উপার্জনের কোন ভাবনা ছিল না। ছাউনি ফেলে ধুনি জ্বালিয়ে বসে গেলেই হলো। টাকাটা সিধেটা অনবরত পায়ের কাছে এসে পড়ত। ভিক্ষার কাজের জন্য ছিল চেলারা। চোখ বুজে ধুনির সামনে বসে থেকে মাঝে মাঝে মিটমিট করে তাকানো রপ্ত হয়ে গিয়ে ছিল আমার। মাঝে মাঝে আবার কারো পানে প্রসন্ন দৃষ্টিতে এক মুঠো ভস্ম বা কিছু দিতেই আবার পদধূলির জন্য কাড়াকাড়ি পড়ে যেত ভক্তদের মধ্যে। এ ছাড়া সিদ্ধি গাঁজা বেচেও কিছু উপার্জন হত। রাত্রিতে গ্রামাঞ্চল নিস্তব্ধ নিশুতি হয়ে গেলে আমাদের চলত ভোগসুখের সমারোহ। বহুদিনের এই অভ্যস্ত জীবনধারা যা আমার অস্থি-মজ্জায় মিশে গিয়েছিল তাকে যে কোনদিন ছাড়তে পারব তা ভাবতে পারিনি কখনো।

অন্যদিনকার মত সেদিনও এক গাছের তলায় ধুনি জ্বালিয়ে আসর জমিয়ে চোখ বুজে লোকজনের আসার অপেক্ষায় বসেছিলাম। মাঝে মাঝে চোখ খুলে প্রণামীর টাকা হিসেব করে দেখছিলাম। হঠাৎ কার পদধ্বনি শুনে চোখ বন্ধ করে বসে আছি, এমন সময় কে আমার সংসারজীবনের বিস্মৃতপ্রায় নাম ধরে ডাকল। তারপর বলল, কিরে, বেশ ত ব্যবসা ফেঁদে জমিয়ে বসেছিস দেখছি। এই জন্যই বুঝি বাবা মাকে কাঁদিয়ে বাড়ি ছেড়ে বেরিয়েছিলি। বাবা মরে বেঁচেছে আর বুড়ো মা অন্ধ হয়ে দ্বারে

দ্বারে ভিক্ষা করে বেড়াচ্ছে। মানুষের চামড়া যে তোর গায়ে আছে তাও ত মনে হয় না। এতখানি বয়সে তুই নির্লজ্জের মত যে কি করে বেড়াচ্ছিস তা আর কেউ না জানুক, আমি ভাল করেই জানি। বেশ করে ভেবে বল দেখি, কি শাস্তি হলে তোর ঠিক উপযুক্ত হয়?

এই কথা শুনে বিস্মিত হয়ে আমি মুখ তুলে তাকালাম। কিন্তু তাঁর চোখে চোখ পড়তেই আমি নিজেকে হারিয়ে ফেললাম। তাঁর সর্বগ্রাসী দৃষ্টি নিঃশেষে গ্রাস করে নিয়েছিল আমাকে যেন। আমার সারা দেহ থরথর করে কাঁপতে লাগল। আমার বুকের মধ্যে কান্নার একটা রেশ ঠেলে ঠেলে উঠতে লাগল। আমার এতদিনের পরিচিত সত্তাটা কোথায় যেন হারিয়ে ফেললাম আমি। অথচ এটাই যেন আমি সজ্ঞানে না হলেও চাইছিলাম। এক ক্লান্ত অবসন্ন নদীর মত বহু পথ পার হয়ে অবশেষে যেন আমার ঈপ্সিত সাগরসঙ্গমে এসে পড়েছি।

আমি তাঁর সেসব প্রশ্নের উত্তর দিলাম না। সে উত্তর আমার জানা ছিল না। আমার দেহটি শুধু নীরবে লুটিয়ে পড়ল তাঁর চরণে। আর সঙ্গে সঙ্গে তিনি আমাকে বুকে টেনে নিলেন। মা যেমন ধুলোকাদামাখা ছেলেকে দ্বিধাহীন চিত্তে বুকে তুলে নেন, ঠিক তেমনি পরম স্নেহে ও করুণায় তাঁর বুকে স্থান দিলেন আমাকে। তারপর পিঠ চাপড়ে মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, দোষ আমারই। তুই অবোধ হয়েছিলি, কারণ আমি যে পাহাড়ে পর্বতে আটকে থেকে অনেক দেরি করে ফিরলাম। যতদিন আছি ততদিন আমি আর তোকে ছেড়ে দেব না। আমারও ত সেবকের দরকার। তোর কোন ভাবনা নেই। এখন আমি যখন এসে গেছি, তখন তোর সব ভার আমার। এখান থেকে গজারিয়া হয়ে আমি বারদী গ্রামে যাব। ছাগলবাঘিনী ঘাটের কাছে মেঘনা নদীর তীরে শ্মশানভূমিতে আমার স্থান নির্দিষ্ট হয়ে আছে। সেইখানে সন্ধান করলে আমাকে পাবি। তার আগে জননীর প্রতি শেষ কর্তব্যটা করে আয়। আগামী পূর্ণিমার দিন তোর মা দেহ রাখবেন। তাঁর সেবা করবার অন্ততঃ দিন দশেক সময় পাবি। নানাভাবে এতদিন ধরে যা জমিয়েছিস এই সুযোগে তা সমস্ত ব্যয় করে হালকা হয়ে তুই আমার কাছে ফিরে যাবি।

সেইদিনই তৎক্ষণাৎ ট্রেনে চেপে গ্রামে গিয়ে মাকে খুঁজে বার করে

কয়েকদিন ধরে প্রাণপণে তাঁর সেবা করলাম। তাঁর দেহত্যাগের পর শ্রাদ্ধ-শান্তিতে সমস্ত কিছু ব্যয় করে কেবল পাথেয় সম্বল করে রিক্ত হস্তে বাবার কাছে গিয়ে হাজির হলাম। তারপর থেকে বাবা যতদিন দেহে ছিলেন তাঁর কাছ ছাড়া হইনি। এখনো তিনি আছেন। তাঁকে সঙ্গে করেই ত ঘুরে বেড়াই।

ওঁ

গীতায় ভগবান অর্জুনকে বলেছেন, হে পার্থ, যে আমাকে যে ভাবে দেখে, সে সেইভাবে আমার ভজনা করে। সকল মানুষই আমার পথে চলে। সকলকে আমি যেভাবে চালাই, সে সেই ভাবে চলে। আমি যাকে যেমন করে চাওয়াই, সে আমাকে ঠিক তেমনি করেই চায়।

সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান লোকনাথবাবাও তাই বলতেন। ভাল মন্দ যা কিছু যে করে, সব আমার করানো। কিন্তু মনগড়া একটা আমিত্ব খাড়া করে সে হয়ত মনে করে সব চাওয়া তার নিজের। কিন্তু সে জানে না মানুষের ইচ্ছায় সব কিছু হয় না।

সবাইকার অন্তরে বসে এই খেলাটি আমি খেলছি। কখনো চাওয়াচ্ছি, কখনো ভোলাচ্ছি, আর চাইয়ে চাইয়ে, ভুলিয়ে ভুলিয়ে সবাইকার পথ দিয়ে সবাইকে নিজের কাছে টেনে আনছি। যাকে যে ফল দিতে ইচ্ছা করি, তাকে দিয়ে সে ফল আমি চাওয়াই। আবার যে ফল দিতে ইচ্ছা করে না, তাকে দিয়েও তা চাওয়াই নিজের খেয়াল খুশিতে। যে ফল পায় সে আনন্দ করে তা নেয়। সেই আনন্দটুকু আমি ভোগ করি। আর যে পায় না, সে বেদনা পায়, সেই বেদনা আমি আনন্দের সঙ্গে ভোগ করি। তারা যেমন করে আমার ভজনা করে, আমার তৃপ্তিবিধান করে, আমিও তেমনি করে তাদের ভজনা করি, তাদের তৃপ্ত ও কৃতার্থ করবার চেষ্টা করি।

লোকনাথবাবা আরো বলতেন, যা দেখি তাই ভাল লাগে। মনে হয় এ ছাড়া আর অন্য কিছু হতে পারত না। সত্য মিথ্যা, ভাল মন্দ ত কথার কথা। আপেক্ষিক কথা। তুই যাকে ভাল বলিস, আর একজন তাকে ভাল বলে না। তোর কাছে যেটা সত্য, অন্যের কাছে তা মিথ্যা মনে

হতে পারে। যার মধ্যে সে ভাবটি ফুটে ওঠে সে ভাবটিই সত্য।

একবার আশ্রমে এক নবদম্পতি এসে বাবার সঙ্গে দেখা করতে চাইল। তাদের দেখে মনে হলো তারা নববিবাহিত। মেয়েটির কপালে সিঁদুর জ্বলজ্বল করছিল। কিন্তু তার মুখটা বড় করুণ দেখাচ্ছিল।

নারিশা বাবা তখন আশ্রমের বাগানে কাজ করছিলেন। তাঁকে বলতে তিনি তাদের আসার কথা বাবাকে গিয়ে জানালেন। বাবা সামান্য কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, ছেলেটিকে বাইরে বসিয়ে রেখে মেয়েটিকে ঘরে পাঠিয়ে দাও।

মেয়েটি বাবার ঘরে গিয়ে ঢুকলে বাবা নারিশাকে ডেকে পাঠালেন। নারিশা গিয়ে দেখলেন, মেয়েটি নতমস্তকে বাবার কাছে বসে রয়েছে। তার দুচোখ বেয়ে জল ঝরে পড়ছিল।

বাবা লোকনাথ নারিশাবাবাকে বললেন, তুই বস।

বাবা এবার মেয়েটির দিকে ফিরে বললেন, বল মা, কিসের দুঃখ তোমার। কোন সংকোচ করো না। আমার কাছে কোন লজ্জা নেই। আগাগোড়া সমস্ত বিবরণ আমি জানি।

অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে মেয়েটি বলল, তবে কেন আমাকে বলতে বলছেন ?

বাবা বললেন, অতীতের কথা কিছু বলতে হবে না। আমি জানি, যা কিছু ঘটে গেছে তাতে তোমার কোন হাত ছিল না। কোন অপরাধ তুমি করনি।

মেয়েটি আশ্চর্য হয়ে বলল, আপনি বলছেন ?

বাবা বললেন, হ্যাঁ, আমি বলছি।

মেয়েটি তখন বলল, তবে কেন আমি মনে শান্তি পাচ্ছিনা ? কেন আমার কেবলি মনে হচ্ছে আমার অপরাধের সীমা নেই, দিনের পর দিন কেবল মিথ্যাচারের বোঝা বাড়িয়ে চলেছি। সরল বিশ্বাসের অপমান করছি। তাই মনে করে আমার অন্তর দিনরাত্রি জ্বলে যাচ্ছে।

বাবা বললেন, মিথ্যেই তুমি কষ্ট পাচ্ছ। তোমার মনের খবর তুমি জান না, কিন্তু আমি জানি। অতীতের কোন সংস্কারই এখন তোমার মনে নেই। অথচ তোমার ধারণা অতীতের ছাপ এখনো তোমার মনে আছে। এ তোমার মিথ্যা সংকোচ, মিথ্যা অনুশোচনা।

মেয়েটি বলল, কিন্তু আমার স্বামী ত এসব কথা কিছুই জানেন না। তাই আমার ভাবান্তরের কারণ বুঝতে না পেরে প্রতিনিয়ত ব্যথা পাচ্ছেন মনে। তিনি হয়ত ভাবছেন, এ বিয়েতে আমি সুখী হইনি। তাই ভেবে তিনি কষ্ট পান আর সেটা অসহ্য লাগে আমার। তবু কিছুতেই সহজ হতে পারছি না। এক একসময় মনে হয় সব কিছু খোলাখুলি বলে দিই।

বাবা বললেন, তাই দিলেই ত পার।

মেয়েটি বলল, আপনি যদি বলেন তাই না হয় বলব। তার পরিণাম যা হয় হবে। আবার না হয় সেই আগের মত নিরাশ্রয় হয়ে যাব। কিন্তু কোনমতেই আর সে জীবনে ফিরে যেতে পারব না। কিছু না থাকে নদীতে ত জল আছে। আমি আর ভাবতে পারি না। কি করব আপনি বলে দিন।

বাবা বললেন, কিছুই করতে হবে না। যা করবার আমি করেছি। তোমার স্বামীকে সব কথা আমি বলেছি। তার মনে এতটুকু গ্লানি নেই। সে চায় তুমি সুখী হও, আনন্দে থাক। আমি বলছি তোমাদের সব ভার আমি নিয়েছি।

মেয়েটি তবু বলল, কিন্তু বাবা, আমি যে আপনার কাছে মিথ্যা কথা বলেছি। আমার কোন দোষ ছিল না এমন ভান করেছি।

বাবা আবার তাকে আশ্বাস দিয়ে বললেন, ছিল নাই ত। কি আর এমন তুই করেছিস ? গো-হত্যা ব্রহ্ম হত্যা, করেছিস ? তা হলেও বলতাম তোর তাতে কোন হাত ছিল না।

মেয়েটি জিজ্ঞাসা করল, ইচ্ছা করলেও কোন দোষ হয় না ?

বাবা বললেন, কি করে হবে ? ইচ্ছাটা ত আর তোর নয়। দোষ হলে যার ইচ্ছা তার হয়েছে। তোর ইচ্ছার কোন পাপ তোকে স্পর্শ করবে কেন? তিনি যেমন চালিয়েছেন তুই তেমনি চলেছিস। ন্যায় অন্যায়ের, পাপ পুণ্যের দায় সব জেনে তোকে দোষ দেব কিকরে ?

মেয়েটি আবার জিজ্ঞাসা করল, এতে আপনার কোন দোষ হবে না বাবা? আপনি তো কিছুর মধ্যেই নেই।

বাবা বললেন, ওরে না না। সে তুই বুঝবি না। কারণ যে বুকের মধ্যে বসে সব কিছু করায়, সে আর আমি এক। তোর মধ্যেও যে আমার মধ্যেও সে, তোর স্বামীর মধ্যেও সে। তবে কে কার দোষ দেখবে, তুই বল। তোর

স্বামীর মধ্যে যে আমি আছি, সে সব জেনেছে। সব খুশি মনে মেনে নিয়েছে। তার মধ্যে কোন ক্ষোভ বা দুঃখ নেই। পাছে তুই আমার কথা বিশ্বাস করতে না পারিস, তাই একজন সাক্ষী এখানে রেখে দিয়েছি। ও এখানকার আপন জন, ওকে তুই বিশ্বাস করতে পারিস। আমার কথা মিথ্যা হয় না, হতে পারে না। এখন থেকে দেখবি তোদের জীবনের সব মেঘ কেটে গেছে। তোদের জীবনে সুখশান্তি ফিরে এসেছে।

মেয়েটি বলল, তোমার ঋণ কিকরে শোধ করব বাবা ?

আরে সে ত সোজা কথা। একদিন নিজের হাতে খিঁচুড়ি রেঁধে দুজনে এসে আমাকে খাইয়ে যাবি।

মেয়েটি আশ্চর্য হয়ে বলল, আমার মত অভাগিনীর প্রতি তোমার এত দয়া কেন বাবা !

বাবা বললেন, এই ত মা ভুল করলি। আমার উপর আমি আর দয়া করব কিকরে ? দুজন যেখানে থাকে, সেখানেই দয়ার কথা ওঠে। সারা জগৎটা ঘুরে বেড়িয়ে আমার বাইরে আর কিছুই ত খুঁজে পাইনি। সে কথা থাক। তুই এসব কথা বুঝবি না। যা বুঝবি তাই বলি। আশীর্বাদ করি তোরা সুখে থাক।

মেয়েটির সরল বিশ্বাস ছিল বলে বাবা তাকে উদ্ধার করেন তার বিপদ থেকে। কিন্তু এক ভদ্রলোকের মনে অকুণ্ঠ বিশ্বাস না থাকায় তিনি তাঁর অপরাধের কথা স্বীকার করতে পারেননি লোকনাথবাবার কাছে। বাবা তাই তাঁকে উদ্ধার করতে পারেননি।

সেই ভদ্রলোক একদিন আশ্রমে এলে তাঁর কথা উঠলে বাবা এক ভক্তকে বলেন, অমুকবাবু এসেছে, ভাল কথা। কি উদ্দেশ্যে এসেছে তা আমার অজানা নেই। সরল বিশ্বাসে ও যদি সব কথা স্বীকার করে, তাহলে ওর গুরুতর অপরাধ মাপ করে দিতে পারি। শাস্তি দিতেও আমি আর ক্ষমা করতেও আমি। সেকথা ও মুখে বলে, কিন্তু তা স্বীকার করে না। চোখে আঙ্গুল দিয়ে কতবার দেখিয়ে দিলাম, তবু চোখ মেলে দেখবে না। আমাকে ও বিশ্বাস করে না, একথা যদি সরলভাবে বলে, তাহলে আমি খুশি হই। কিন্তু এমনই গ্রহের ফের যে ওর মন হতে দ্বিধা যায় না। ফলে কিছু দিতে ইচ্ছা হলেও দিতে পারি না। যার শ্রদ্ধা বিশ্বাস নেই, যার সরলতা নেই, তার প্রার্থনা পূরণ হবে কিকরে ?

ওঁ

লোকনাথবাবা প্রায়ই বলতেন, কেউ যদি অন্যায় কাজ করে অকপটচিত্তে আমার কাছে প্রকাশ করে, তবে আমি তার উচিত শাস্তি বিধান করি। আমার উপর শাস্তা কে আছে রে ?

বাবা লোকনাথের শিক্ষার আদর্শটি বড় অভিনব। পাপীকে ঘৃণা করা সহজ কাজ। কিন্তু তাকে পাপপথ ও পাপকাজ থেকে টেনে এনে নিবৃত্তি-মার্গে চালনা করা বড় কঠিন কাজ। যিনি পাপীকে নিবৃত্তিমার্গে চালনা করতে পারেন, তিনিই প্রকৃত গুরু, প্রকৃত শিক্ষক। এজন্যই ঈশ্বরকে পতিতপাবন বলা হয়। লোকনাথ বাবা তাই পাপীকে কখনো ঘৃণা করতেন না। পাপীকে নিজের কোলে স্থান দিয়ে যে অলৌকিক উপায়ে তাকে পাপ-পথ থেকে নিবৃত্ত করতেন, তা সত্যিই এ যুগে দুর্লভ।

বারদী গ্রামের হিন্দু মুসলমান দুই সম্প্রদায়ের লোকই লোকনাথ বাবাকে বিশেষ ভক্তি ও সম্মান করত। চাষীদের মধ্যে কোন ঝগড়াঝাঁটি হলেই তারা বাবার কাছে ছুটে আসত সুবিচারের আশায়। বাবা আনন্দের সঙ্গে তাদের ঝগড়া বিবাদ মিটিয়ে দিতেন। তিনি যাকে যে শাস্তি দেন, তা তারা নির্বিবাদে মেনে নেয়। এমন কি বারদীর জমিদারেরাও নিজেদের মধ্যে কোন ঝগড়া বিবাদ হলে লোকনাথবাবার কাছে এসে তাঁর মধ্যস্থতা মেনে নিতেন।

একদিন নাগ জমিদারদের পাঁচজন বাবু একই অপরাধে অপরাধী হয়ে মীমাংসার জন্য হাজির হলেন লোকনাথবাবার কাছে। বাবা তাদের অপরাধের কথা শুনে তাদের ষাট টাকা জরিমানা করলেন। জমিদারবাবুরা ঐ জরিমানার টাকা এনে বাবার কাছে জমা দিলেন। বাবা লোকনাথ তখন তাদের বললেন, এর পর যদি তোরা আবার কোন পাপকাজ করিস তাহলে বাধ্য হয়ে আমি তোদের কঠোর শাস্তি দেব।

সকলের জন্য সব ব্যবস্থা উপযুক্ত হতে পারে না। যে যেমন লোক, তার জন্য সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন মহাপুরুষ বাবা লোকনাথ সেই ব্যবস্থাই করতেন। একবার কলকাতা থেকে এক কুলীন ব্রাহ্মণ যুবক এসে বারদীর আশ্রমে উপস্থিত হলো। যুবক বাবা লোকনাথকে দর্শন ও প্রণাম করার পর বলল, বাবা আমি আপনার শরণাগত। আমি নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী

হতে চাই। কিন্তু বাড়ির লোকেরা বিয়ে করবার জন্য আমাকে পীড়াপীড়ি করছে। আমি আপনার কাছে জানতে এসেছি, আমার কি করা কর্তব্য।

বাবা লোকনাথ শাস্ত্রীয় প্রমাণ ও যুক্তিদ্বারা যুবকটিকে বুঝিয়ে দিলেন, তার বিয়ে করাই কর্তব্য। এই কথায় যুবকটি বিয়ে করতে রাজী হয়ে কলকাতায় ফিরে গেল।

বাবা লোকনাথ তাঁর অন্তর্দৃষ্টির দ্বারা বুঝতে পারতেন কার ভিতরে কতটা শক্তি আছে এবং কার দ্বারা কি কাজ হবে। এই যোগ্যতা অনুসারেই তার উপযুক্ত ব্যবস্থা করতেন। তিনি যুবকটিকে দেখে বুঝতে পারলেন, এর পক্ষে বিয়ে করাই সঙ্গত। তিনি আরও বুঝলেন, যুবকটি যদি বিয়ে না করে, তবে পরিণামে সংযমের অভাবে তার গার্হস্থ্য ও ব্রহ্মচর্য দুটি জীবনই নষ্ট হবে। কিন্তু এখন বিয়ে করলে অন্ততঃ একটা দিক রক্ষা হবে।

/ একদিন ফরিদপুরের অন্তর্গত কার্তিকপুর নিবাসী রজনীকান্ত সেন একটা আলখাল্লা পরে মাথায় পাগড়ির মত একটা কাপড় বেঁধে পাগলের বেশে আশ্রমে এসে উপস্থিত হলেন। তিনি বাবা লোকনাথের কাছে শান্ত হয়ে বসে তাঁর চোখদুটির পানে তাকিয়ে রইলেন। এমন সময় বাবা হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলেন, তুই এখান থেকে চলে যা। যা শিগ্‌গির পালা। তোর সেই ক্রোধান্বিত ছবিটা আমার চোখের সামনে ভেসে উঠছে।

উপস্থিত ভক্তেরা বাবার কথার মানে বুঝতে না পেরে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইলেন। এদিকে রজনীবাবু তখন ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়ালেন।

বাবা লোকনাথ বললেন, রজনী, তুই যে অপকর্ম করেছিস, তার জন্য তোর কঠোর শাস্তি পাওয়া উচিত। মনে আছে কি সেই সুতীক্ষ্ম তরবারির কথা? যদি সমাজে বাস করতে চাস ত দেরি না করে কুল-গুরুর কাছে দীক্ষা নিয়ে লোকহিতকর কাজ করে যা।

বাবার কথা শুনে আশ্চর্য হয়ে গেলেন রজনীবাবু। তাঁর জীবনের কোন কিছুই অজানা নেই সর্বজ্ঞ বাবা লোকনাথের।

রজনীবাবু পরম বিস্ময়ের সঙ্গে বললেন, কী আশ্চর্য! আমার সব কিছুই আপনি জানতে পেরেছেন। আমি আগরতলার মহারাজার বডি-গার্ড ছিলাম। সেখানে থাকার সময় আমি মাঝে মাঝে অপকর্ম করতাম।

একদিন হাতে-নাতে ধরা পড়লাম। মহারাজ আমার এই সব অপকর্মের জন্য আমার উপর এত রেগে গিয়েছিলেন যে তিনি তাঁর সুতীক্ষ্ণ তরবারি খাপ থেকে বার করে আমাকে হত্যা করতে উদ্যত হলেন। এমন সময় আমি আপনাকে স্মরণ করলাম। মনে মনে আমার প্রাণরক্ষার জন্য কাতর প্রার্থনা জানালাম। এই প্রার্থনার ফলও পেলাম সঙ্গে সঙ্গে। মহারাজা হঠাৎ কি মনে করে খাপে ঢুকিয়ে রাখলেন তাঁর তরবারি। আমাকে হত্যা না করে ছেড়ে দিলেন। তিনি আমায় ক্ষমা করলেন। কিন্তু তারপরও আমি শোধরাতে পারিনি নিজেকে। তাই ত আপনার কাছে ছুটে এসেছি। আজ আমি সত্যিই আমার সারা জীবনের যত সব অকর্ম কুকর্মের কথা ভেবে অনুতপ্ত হচ্ছি। কেবলি ভাবছি কেন করেছিলাম ওসব কাজ।

সেদিনকার মত তখনি আশ্রম থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন রজনীবাবু। বাবা লোকনাথ তাঁকে দীক্ষা নেবার যে উপদেশ দিয়েছেন তা তিনি ভুললেন না।

দিন কতক পর আবার আশ্রমে এসে হাজির হলেন রজনীবাবু। লোকনাথবাবাকে প্রণাম করে জানালেন যে, তাঁর কুলগুরুদের মধ্যে শিষ্য নিয়ে গোলযোগ বাধায় তাঁরা কেউই এখন তাঁকে দীক্ষা দিতে চাইছেন না। তিনি বাবাকে বললেন, বাবা, তাহলে আমার কি করণীয় ?

বাবা তা শুনে বললেন, তুই তোর গুরুদের বলগে যা, আপনারা শিষ্যসমন্ধীয় গোলমাল মীমাংসা করে আমাকে দীক্ষা দিন। যদি আপনারা গোলমাল না মেটাতে পারেন এবং আমাকে দীক্ষা দিতে না পারেন, তাহলে আমি বারদীতে গিয়ে ব্রহ্মচারীবাবার কাছেই দীক্ষা নেব। দেখবি, এই কথা শুনলেই তাদের কেউ না কেউ তোকে দীক্ষা দেবে।

লোকহিতৈষী ও সমাজহিতৈষী মহাপুরুষ বাবা লোকনাথ যে যতই অপরাধী হোক, অভয়বাণীতে পাপীকে সান্ত্বনা দিতেন। তার উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করতেন। তিনি রজনীবাবুকে এমনভাবে উপদেশ দিলেন যাতে গুরু কি শিষ্য কেউই যেন তাঁদের পারস্পরিক সম্পর্ক বা কর্তব্যকে সামান্য খেলার জিনিস বলে মনে না করেন। স্বেচ্ছাচারিতা দোষে তাঁদের কেউই যেন আদর্শচ্যুত না হন।

সামাজিক গুরুগণ অনেক সময় মনে করেন, শিষ্যগণকে তাঁরা মন্ত্রদীক্ষা

দিন না দিন, তারা গুরুকে ত্যাগ করবে না। গুরুদের আত্মকলহ অনেক সময় শিষ্যদের বিশ্বাসের মূলে আঘাত দেয়। এই কুপ্রথা দূর করবার জন্য মঙ্গলময় বাবা লোকনাথ এই ইঙ্গিত দান করেন। এই সব গুরুদের বুঝিয়ে দেওয়া উচিত শিষ্যকুল তাঁদের কেনা সম্পত্তি নয়। দীক্ষা না দিলে তারা অন্যত্র দীক্ষা নেবে। একথা তাঁরা বুঝলে তাঁরা তখনি তাঁদের কলহ মীমাংসা করবেন। আবার শিষ্যগণকেও সাবধান করে দিতেন, তারা যেন গুরুদের অযথা দোষ খুঁজে গুরুকুল পরিত্যাগ না করে। কারণ তারা তা করলে সমাজবন্ধন শিথিল হয়ে যাবে।

যে কাজে জগতের সাধারণ মানুষের মঙ্গল হবে তা জানতে পারলে সে কাজ করতে বিশেষ উৎসাহবোধ করতেন বাবা লোকনাথ।

একদিন ভাওয়ালের রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ হাতির পিঠে চড়ে বারদীর আশ্রমে উপস্থিত হলেন। তিনি বাবাকে দর্শন করার পর বললেন, বাবা, আজ আমি আপনার একটি ছবি তুলে নিয়ে যাবার জন্য এসেছি।

রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ ভাওয়াল থেকে এসেছেন তাঁরই কেনা একটি লঞ্চে করে। ছবি তোলার জন্য অনেক খুঁজে কলকাতা থেকে নামজাদা ফটো-গ্রাফারকেও সঙ্গে এনেছেন। সেই সঙ্গে ফটো তোলার ক্যামেরা। বারদীর কাছেই মেঘনা নদীতে লঞ্চ রেখে হাতির পিঠে চড়ে আশ্রমে এসেছেন রাজেন্দ্রনারায়ণ।

রাজার কথা শুনে বাবা লোকনাথ বললেন, আমার ছবি তুলে তোমার কি লাভ হবে?

এর উত্তরে রাজাবাহাদুর বললেন, মহাপুরুষদের ছবি আমি আমার বাড়িতে রেখে থাকি। এতে সাধারণের মঙ্গল হবে বলে আমার বিশ্বাস। তাছাড়া এই ছবি তুলে কোন ফটোগ্রাফার ব্যবসা করে কিছু পয়সা রোজগার করতে পারবে।

বাবা লোকনাথ তখন বললেন, যদি সাধারণের মঙ্গল হয় তবে অবশ্যই তা তুলতে পার। আমি আসন ছেড়ে উঠে যাচ্ছি। তুমি ফটোগ্রাফারকে ডাকতে পার।

এই বলে বাবা তৎক্ষণাৎ বাইরে এলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ছবি তোলা হলো।

ওঁ

গীতায় বলা হয়েছে, সিদ্ধি দু রকমের—সংসিদ্ধি ও নৈষ্কর্ম্য সিদ্ধি। ব্রাহ্মণাদি চার বর্ণের লোক আপন আপন জাতীয় ধর্ম ও কর্মের অনুষ্ঠান করলে সংসিদ্ধি লাভ করতে পারে। শঙ্করাচার্য এই সংসিদ্ধিকে জ্ঞান-প্রাপ্তির যোগ্যতালাভ বলতেন। আর কর্ম সন্ন্যাসদ্বারা নৈষ্কর্ম্য সিদ্ধি লাভ করা যায়। অর্থাৎ ব্রহ্ম কিরূপ, তাঁর স্বরূপ কি, সে বিষয়ে জ্ঞানলাভ হয়।

লোকনাথ ব্রহ্মচারী কর্মসন্ন্যাস ও কর্মযোগের দ্বারা এই নৈষ্কর্ম্য সিদ্ধি লাভ করেছিলেন। এই সিদ্ধিলাভের জন্য হিমালয়ে গিয়ে দীর্ঘকাল তপস্যা ও যোগসাধনা করতে হয়েছিল। হিমালয়ে যাবার আগেকার একটি অভিজ্ঞতা তিনি ভক্তদের কাছে বলেন।

তিনি বলেন, হিমালয়ে যাবার আগে আমরা কিছুদিন বর্ধমানে অবস্থান করেছিলাম। সেখানকার কোন এক কালীদেবীর পূজারী দেবতাসিদ্ধি লাভ করেছিলেন বলে প্রচারিত ছিল। তিনি মলত্যাগ করে জলশৌচ না করেই কালীদেবীর পূজা করতেন। আমি তার মর্ম জানার জন্য তাঁকে ধরলাম। কিন্তু তিনি কিছুতেই তা প্রকাশ করতে চাইলেন না। আমিও ছাড়ব না। অনেক অনুনয় বিনয়ের পর অবশেষে তিনি বশীভূত হলেন। তারপর তিনি আমার বাসনা পূরণ করলেন। তিনি বললেন, কোন দেবতা তুষ্ট হয়ে তাঁকে রোজ আট আনা করে দান করেন এবং কোন বিষয়ে প্রশ্ন করলে উত্তর দান করেন।

আমি তখন কৌতূহলবশে আমার পক্ষ থেকে দেবতাকে একটি প্রশ্ন করতে তাঁকে অনুরোধ করলাম। তিনি তাতে রাজী হলে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, আমি হিমালয়ে থাকব। সেখানকার দারুণ শীত আমার সহ্য হবে কি না ?

আমার সামনেই প্রশ্ন করা হলো এবং সঙ্গে সঙ্গে উত্তর পাওয়া গেল, শীত সহ্য হবে।

এই উত্তরটি আমিও শুনতে পেলাম। আমি তখন পূজরীকে বললাম, এবার আমি নিজে একটি প্রশ্ন করব। এই বলে আমি প্রশ্ন করলাম, হিমালয়ে আমার সিদ্ধিলাভ ঘটবে কি না।

কিন্তু এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া গেল না। তখন বুঝলাম, পূজারী

ছাড়া আর কারো প্রশ্নের উত্তর দেবতা দেন না। এর পর আমার অনুরোধে পূজারী সে প্রশ্ন করতেই উত্তর পাওয়া গেল, হ্যাঁ, সিদ্ধিলাভ ঘটবে।

আমি তখন আশ্বস্ত হয়ে সেখান থেকে প্রস্থান করলাম।

তারপর হিমালয়ে গিয়ে দীর্ঘকাল যোগসাধনায় সিদ্ধিলাভ করেন। এই সিদ্ধিকালে ব্রহ্মচারী লোকনাথবাবা পূর্বজন্মের কথা স্মরণ করতে পারতেন। দেহ ছেড়ে বাইরে যেতে পারতেন। তিনি বছরের ছয় মাস বরফে ঢাকা হয়ে থাকতেন। এবং বাকি ছয় মাস বরফগলা জলে ভাসতেন। উত্তরমেরুতে যেখানে বছরের মধ্যে ছয় মাস রাত্রি আর ছয় মাস দিন, সেখানেও তিনি অন্ধকারের মধ্যে অবলীলাক্রমে অবস্থান করেছেন। আবার যেখানে বারো মাসই অন্ধকার, সেখানে তিনি বরফ জমা আর বরফ গলা দেখে একটি বছর অনুমান করতেন। পশুপাখিহীন বরফাবৃত স্থানে বিচরণ করতেন। যে হিম ও বরফের রাজ্যে কোন মানুষ বা কোন জীব বাস করতে পারে না, যে সমস্ত স্থান আজও অনাবিষ্কৃত রয়ে গেছে, সেই সব স্থানে তিনি বছরেরপর বছর নগ্নদেহে কিভাবে বাস করতেন তা কল্পনার অতীত। এই সব সিদ্ধির মধ্য দিয়েই তিনি তাঁর অভিপ্রেত সিদ্ধি অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান এবং পরমার্থ লাভ করেছিলেন। এই জ্ঞানের বলেই তিনি জীব ও ব্রহ্মের যে অভেদভাব, সেই অভেদভাবাত্মক আত্মার স্বরূপ সম্বন্ধে নির্দেশ দিতেন। তিনি হয়ে উঠেছিলেন ব্রহ্মস্বরূপ পরমাত্মা।

তাই তিনি প্রায়ই বলতেন, সর্বরূপে যে আমি-ই। সারা বিশ্বে যে আমারই অবস্থান। এই বিশ্বে কারণরূপে যে সত্য চিরপ্রতিষ্ঠিত, যার অস্তিত্ব চিরস্থায়ী, তাও আমি-ই, আবার কার্যরূপেও আমি-ই। বর্তমান, ভূত, ভবিষ্যৎ অর্থাৎ যা ত্রিকালের অতীত তাও আমি। আমি জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি অবস্থার অতীত। আমি স্থূল সূক্ষ্ম দেহের অতীত। আমি সৎ, চিদ ও আনন্দস্বরূপ। আমি পরমহংসগণের গতি আশ্রয় বা স্থান।

তোদের ধারণা আমি শুধু উপাধিধারী জীবদেহে অবস্থিত জীবমাত্র। পঞ্চভূতগণের সমবায়ে গঠিত দেহ ধারণ করে রয়েছি সত্য, কিন্তু শুধু জীবমাত্র নই।

তিনি ছিলেন সত্যিকারের জ্ঞানগুরু, জগতের গুরু। সমস্ত তত্ত্বজ্ঞান যিনি বিশ্ববাসীকে দান করতে পারতেন, তিনি ছিলেন সেই গুরু যিনি ভক্তকে ভববন্ধন হতে মুক্তির সন্ধান দিতে পারতেন, যিনি অন্ধকারাচ্ছন্ন সংসারে আবদ্ধ জীবকে বদ্ধাবস্থা হতে মুক্তাবস্থায় উপনীত করতে পারতেন।

বিশ্ববাসী তাঁকে বাবা বলে ডাকত। কিন্তু এর কারণ কি? জাগতিক পরিচিতিতে পিতা জন্মদাতা। তাঁর দ্বারাই আমরা পৃথিবীর মুখ দর্শন করি। কিন্তু এ দর্শন অজ্ঞান দর্শন। এই অজ্ঞান দর্শনের জন্মদাতা পিতা হলেন জাগতিক বাবা। কিন্তু জীব যখন জ্ঞান রাজ্যে প্রবেশ করতে আগ্রহী হয়, যখন জ্ঞানদাতা ব্রহ্মজ্ঞ গুরুর সন্ধান পায়, তখন সে জাগতিক বাবাকে অতিক্রম করে সেই গুরুকেই বাবা বলে ডাকে, তাঁর চরণে আশ্রয় নেয়। তখন সেই জ্ঞানময় গুরুর কাছে তার হয় নবজন্ম।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, অবতারগণ সুন্দরী কাঠ। জীবের খণ্ডিত জ্ঞানরাশিকে যিনি এক অদ্বিতীয় জ্ঞানে রূপান্তরিত করেন, তিনিই অবতার। যে ব্রহ্মশক্তি বিরাট বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিচক্রের অন্তরালে থেকে সৃষ্টিকার্য পরিচালনা করেন, যুগে যুগে সেই শক্তিই জীবজগতের ভালবাসায় আকৃষ্ট হয়ে জীবের দুঃখ নিরসনের জন্য মর্ত্যে অবতরণ করেন। যে মায়াশক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে জীব বারবার জন্মমৃত্যুর বন্ধনে আবদ্ধ থাকে, সেই মায়াশক্তির গণ্ডী ভেদ করে জীব যাতে ব্রহ্মানন্দ লাভ করতে পারে, সেই জন্যই ব্রহ্মশক্তি যুগাবতাররূপে অবতরণ করেন মর্ত্যধামে। লোকনাথ ছিলেন সেই ব্রহ্মশক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষ, সেই ব্রহ্মশক্তির মূর্ত প্রতীক, অবতার।

ঈশোপনিষদে আছে, বিশ্বের সমস্ত বস্তুকে যিনি জ্ঞানের মাধ্যমে নিজ আত্মায় দর্শন করেন এবং নিজেকে বিশ্বের সমস্ত অণু পরমাণুতে বিজড়িত অবস্থায় স্থিতিবান দর্শন করেন, তিনিই পূর্ণ জ্ঞানী। সেই সমদর্শীর শোক, মোহ কি থাকতে পারে? তিনি সব কিছুকেই এক আত্মায় পরিব্যাপ্ত দেখেন।

বাবা লোকনাথ ছিলেন সেই পূর্ণজ্ঞানী। তিনি ছিলেন সেই পরমাত্মা,

কারণ তাঁর কাছে সবই ছিল আত্মময়। তিনি ছিলেন সেই ব্রহ্মস্বরূপ যিনি এক জায়গায় অবস্থান করে সর্বত্র বিচরণশীল। তিনি চলনশীল, আবার তিনি চলৎ-শক্তিরহিত। বাবা লোকনাথ বারদী আশ্রমে যোগাসনে উপবিষ্ট থাকতেন, কতকটা লৌকিক দর্শন। তিনি যোগাসনে উপবিষ্ট থেকেও দেহ ছেড়ে মাঝে মাঝে কোথায় চলে যেতেন তা কেউ বুঝতে পারত না।

তিনি অনেক সময় বলতেন, দেহটা একটা পাখির খাঁচা। যতক্ষণ দেহ থেকে আলগা থাকি, ততক্ষণ ভাল থাকি। দেহে ফিরে আসতে খুবই কষ্ট হয়।

একদিন বারদীর আশ্রমে ভক্তদের কাছে বাবা লোকনাথ বসে আছেন, এমন সময় দেখা গেল, তিনি ডান হাতটি ঊর্ধ্বে উঠিয়ে সঞ্চালন করলেন। ভক্তদের মধ্যে একজন জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি এ রকম করলেন কেন ?

ব্রহ্মচারী লোকনাথ বাবা বললেন, আমার এক ভক্ত শুলুককে করে নদী-পথে কক্সবাজার যাবে। সামুদ্রিক ঝড়ে তার শুলুকটি সমুদ্রগর্ভে ডুবে যাওয়ার উপক্রম হতে সে বিপদে পড়ে আমায় ডাকল। সেইজন্য সামুদ্রিক ঝড়টাকে অনেক দূর দিয়ে পাঠিয়ে দিলাম। শুলুকটি রক্ষা পেল।

এমন ঘটনা প্রতিদিন কত ঘটত। এই ঘটনার তিন দিন পর সেই ভক্ত আশ্রমে এসে সেই ঘটনার কথা সব বলল। তারপর বাবার চরণ ধরে আকুল ভাবে কাঁদতে কাঁদতে বলল, বাবা তুমি সত্যিই সর্বব্যাপী।

এই ভক্তের নাম বিহারীলাল মুখোপাধ্যায়। ঢাকা জজকোর্টের উকীল।

একবার বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় দ্বারভাঙ্গায় গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাঁর প্রাণ সংশয় হয়ে উঠল। বাঁচার কোন আশা নেই। গোস্বামী মহাশয়ের শিষ্য শ্যামাচরণ বক্সী নিরুপায় হয়ে বারদী চলে এলেন। ব্রহ্মচারী লোকনাথবাবার চরণ ধরে এইবারের মত গোস্বামী মহাশয়ের প্রাণভিক্ষা প্রার্থনা করলেন।

প্রথমে লোকনাথবাবা প্রাণভিক্ষা দিতে চাইলেন না। বললেন, কত আয়ু আর তাকে দেব ?

এই কথা শুনে শ্যামাচরণ বাবার চরণ ধরে নিজের আয়ুর বিনিময়ে গুরুর প্রাণভিক্ষা চাইলেন। তখন শ্যামাচরণবাবুর গুরুভক্তির কথা চিন্তা

করে বাবা গোস্বামী মহাশয়ের রোগ নিরাময়ের ভরসা দিলেন। গোস্বামী-জীকে দ্বারভাঙ্গা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল।

বাবা বললেন, শ্যামাচরণ, তুই ঢাকায় চলে যা। আমি দ্বারভাঙ্গা হাস-পাতালে যাচ্ছি।

এই বলে তিনি ঘরে গিয়ে ঘরের দরজা বন্ধ করে আসনে বসলেন। বললেন, আমি যতক্ষণ ঘরের দরজা না খুলি ততক্ষণ বন্ধ দরজায় কেউ যেন ঘা না দেয়।

দুদিন আগে ঢাকায় বিজয়কৃষ্ণ আশ্রমে গোস্বামীজীর অসুস্থতার খবর তাঁর শ্বাশুড়ী মাতার কাছে টেলিগ্রামযোগে পেঁছেছিল। তার পেয়ে শ্বাশুড়ী মাতা জামাতার আসন্ন মৃত্যুকালে শেষ দর্শনের জন্য ঢাকা থেকে কলকাতা হয়ে দ্বারভাঙ্গা যাবার জন্য রওনা হন। গোয়ালন্দ মেলে বসে তিনি যখন জামাতার আসন্ন মৃত্যুর কথা চিন্তা করছিলেন বিষন্ন মনে, তখন সহসা ট্রেনের জানালা দিয়ে আকাশের দিকে নজর পড়তেই দেখলেন, লোকনাথ ব্রহ্মচারী আকাশপথে তড়িৎ বেগে চলেছেন।

এদিকে লোকনাথবাবা মুহূর্তমধ্যে দ্বারভাঙ্গা হাসপাতালে পেঁছেই দেখলেন, বিজয়কৃষ্ণ অন্তিম শয্যায় শায়িত আর ভক্তগণ চারদিকে বসে তাঁকে নাম শোনাচ্ছেন। ঠিক সেই মুহূর্তে লোকনাথবাবা 'বিজয়কৃষ্ণ, এই দেখ, আমি এসেছি' বলে তাঁর হাত ধরে এক হেঁচকা টানে তাকে বিছানায় বসিয়ে দিলেন। বললেন, তুই ওঠ, তুই ভাল হয়ে গিয়েছিস।

এই বলেই তিনি অন্তর্হিত হলেন। বিজয়কৃষ্ণ নবজীবন লাভ করে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠলেন। এইভাবে যখনই যেখানে কোন আর্ত বা বিপদাপন্ন ভক্ত লোকনাথবাবাকে মনে প্রাণে স্মরণ করে তাঁকে আকুলভাবে ডাকত, তখনই সেখানে সূক্ষ্মদেহে তিনি উপস্থিত হয়ে তাঁর অভয় হস্ত বাড়িয়ে দিতেন। তাকে বিপদ হতে উদ্ধার করতেন।

ঙ

একবার ঢাকা জগন্নাথ কলেজের একদল চপলমতি ছাত্র লোকনাথবাবাকে পরীক্ষা করবার জন্য বারদীর আশ্রমে আসে। তারা একে একে নানা প্রশ্ন করে বেকায়দায় ফেলতে না পেরে শেষে বলে, বেলা এখন দুপুর। এখনি

আমাদের ঢাকা হোস্টেলে ফিরে যেতে হবে। কিন্তু এই প্রচণ্ড রোদে এই বিরাট মাঠ পার হয়ে কিকরে যাব ? বাবা, আপনি যদি দয়া করেন—

তারা এই কথা বলতেই বাবা বললেন, তোরা বেরিয়ে যা। মাঠে তোদের রোদ লাগবে না।

ব্রহ্মচারীবাবার কথার সত্যতা পরীক্ষা করার জন্য তারা মাঠে বেরিয়ে পড়ল। তারা মাঠে নামতেই দেখা গেল, এক খণ্ড মেঘ হঠাৎ কোথা থেকে উদয় হয়ে সূর্যকে আড়াল করে রাখল। ছাত্রেরা পথে রোদের কোন উত্তাপ অনুভব করল না। তারা মাঠ পার হতেই সেই মেঘখণ্ডটি সূর্যের উপর থেকে সরে গেল।

এবার ছাত্রেরা বুঝতে পারল, লোকনাথবাবা একজন সাধারণ বা সামান্য সাধু নন। তিনি যে একজন ব্রহ্মজ্ঞ মহাপুরুষ এ বিষয়ে আর কোন সন্দেহ রইল না তাদের মনে।

ছাত্রেরা তখন আবার আশ্রমে ফিরে গিয়ে বাবাকে বলল, আমরা আগে শুধু মাঠ পার হবার কথা বলেছিলাম। মাঠ পার হতে আমাদের কোন কষ্ট হয়নি আপনার দয়ায়। কিন্তু মাঠ পার হতেই আবার প্রচণ্ড রোদের তাপ পেলাম। ঢাকার আগে দয়াগঞ্জ পর্যন্ত আমরা যাতে ঠাণ্ডায় ঠাণ্ডায় যেতে পারি, আপনি যদি কৃপা করে তার ব্যবস্থা করে দেন ত বড় ভাল হয়।

অন্তর্যামী বাবা তাদের মনের কথা আগেই জানতে পেরেছিলেন। তিনি বললেন, দয়াগঞ্জ পর্যন্ত তোরা কোন রোদের তাপ পাবি না। সেখান থেকে ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া করে ঢাকায় যাবি।

একথা শুনে ছাত্রের দল খুশি হয়ে বাবাকে প্রণাম করে বিদায় নিল। যতক্ষণ তারা দয়াগঞ্জ না পেঁছাল ততক্ষণ আবার একখণ্ড মেঘ সূর্যকে আগের মত ঢেকে রাখল।

এইভাবে তাঁর অমিত যোগশক্তিবলে প্রকৃতি জগৎকেও প্রভাবিত করতে পারতেন পরমযোগী লোকনাথবাবা। হংস যেমন জলমিশ্রিত দুগ্ধ হতে দুগ্ধের সার অংশটুকু গ্রহণ করে, তেমনি তিনি জীবের কর্মফলদ্বারা রচিত সুখদুঃখ মায়ায় ভরা এই জ্বালাময় সংসার হতে দুঃখের অবসান ঘটিয়ে সুখের অংশটুকু দান করতেন ভক্ত হৃদয়ে। লোকনাথবাবা ছিলেন সেই হংস। ভক্তদের হৃদয়পদ্মে সর্বক্ষণ বিচরণ করতেন বলে তিনি ছিলেন শুচিষ্যৎ।

সমস্ত বিশ্বের অনু-পরমাণুতে তিনি বিজড়িত ছিলেন বলে তিনি ছিলেন বসু। সমস্ত বিশ্বে বায়ুরূপে অর্থাৎ শ্বাস প্রশ্বাসরূপে জীব জগতের প্রাণস্বরূপ থাকতেন বলে তিনি ছিলেন অন্তরীক্ষ সৎ। জীব জগৎকে তিনি সর্বক্ষণ আহুতি হতে রক্ষা করে হোতার পদে উন্নীত করেন বলে তিনি ছিলেন বেদীসৎ। আবার অতিথি যেমন ভাল দিনক্ষণের বা তিথি নক্ষত্রের বিচার না করে গৃহস্থের বাড়িতে উপস্থিত হয়, তেমনি তিনি ভক্তের আহ্বানে যে কোন সময়ে ভক্তহৃদয়ে প্রকাশমান হতেন বলে তিনি ছিলেন দুরোনসৎ। ঋতং বৃহৎ যে ব্রহ্ম সর্বস্থানে চির প্রকাশিত লোকনাথবাবা ছিলেন সেই সৎ স্বরূপ সত্য জ্ঞানানন্দময় ব্রহ্ম।

লোকনাথবাবা ছিলেন উপনিষদের সেই ভূমা অর্থাৎ বিরাট। উপনিষদে বলেছে ভূমাই সুখ। অল্পে সুখ নেই। তিনি সর্বক্ষণ সুখের সাগরে অবস্থান করতেন বলে তিনি ছিলেন সুখের আধার। তাঁর মধ্যে খণ্ডজ্ঞানের কোন স্থান ছিল না বলে তিনি ছিলেন সতত পূর্ণ।

সাধারণ মানুষের সঙ্গে তাঁর পার্থক্যটি তিনি নিজেই বলে গেছেন। তিনি বলতেন, তোরা যে সংসারসমুদ্রে পড়ে ক্ষুধা তৃষ্ণায় কত অশান্তি ভোগ করছিস, সে ত তোদের মনের ধর্ম। শোক, মোহ, অবিদ্যাজনিত যত কর্ম তার মূলে আছে মন। এগুলি তোদের মনের ধর্ম। জরা, ব্যাধি, মৃত্যু—এ যে তোদের দেহের ধর্ম। আমি ত প্রথমেই বলেছি, আমি গীতায় বর্ণিত পরমাত্মা। আত্মা কখনই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়। শরীর, মন, প্রাণের ধর্ম আত্মাকে কখনো স্পর্শ করতে পারে না। তোদের সমস্ত কর্ম আমার দ্বারা বিধৃত থাকা সত্ত্বেও আমি নির্লিপ্ত। আমি মুক্ত পুরুষ। যেহেতু আমি পরমপুরুষ। তোরা আমাকে নানা উপাধিতে ভূষিত করে তোদের সামিল করে নিয়েছিস।

কঠোপনিষদে যে পুরুষের কথা বলা হয়েছে, সেই পুরুষই সবার প্রধান। সেই পুরুষই পরম পুরুষ সর্বশক্তিমান। সেই পুরুষের জন্ম মৃত্যু নেই। যেহেতু জ্ঞানের জন্ম মৃত্যু নেই, সেই পুরুষ জ্ঞানময় পুরুষ বলে তারও জন্ম মৃত্যু নেই। সেই জ্ঞানময় পুরুষ নিজেও নিজের কারণ নন। তিনি অজ, নিত্য, শাশ্বত পুরাণ। সব কিছু বিনষ্ট হলেও তার বিনাশ নেই।

ওঁ

শাস্ত্রে বলা হয়েছে, মহাপুরুষদের অবস্থানের দ্বারা যে স্থান পবিত্র হয় তাকেই তীর্থ বলে। শিবের বিবাহ উপলক্ষে সপ্তর্ষি অর্থাৎ ভৃগু, মরীচি, অত্রি, পুলহ, অঙ্গিরা, ক্রতু ও পুলস্ত্য হিমালয়ের উপস্থিত হলে হিমালয় নিজেকে কৃতার্থ মনে করলেন। তিনি বললেন, হে ঋষিগণ, আপনাদের অধিষ্ঠানহেতু এই স্থান মহাতীর্থে পরিণত হলো। এখন থেকে লোকে শুদ্ধ হবার জন্য এখানেই আসবে।

মহাযোগী লোকনাথ বাবার আগমনে বারদী মহাতীর্থে পরিণত হয়েছে। বারদী হিন্দুতীর্থ ব্রহ্মপুত্র নদের খুব কাছে। যে সব তীর্থযাত্রী ব্রহ্মপুত্রে স্নান করতে যান অর্থাৎ নারায়ণগঞ্জের কাছে লাঙ্গলবন্দে আসেন, তাঁরা তীর্থকর্ম শেষে বারদী গিয়ে মহাপুরুষ লোকনাথ বাবাকে দর্শন করেন।

সমস্তপঞ্চকতীর্থে সমাগত সকলের উদ্দেশে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছিলেন, দেখুন, সাধুগণের তুলনায় জলময়ী তীর্থসকল কিংবা মৃত্তিকাশিলা বা ধাতুময়ী দেবমূর্তি সকল কখনো শ্রেষ্ঠ বা সমান হতে পারে না। কেন না তীর্থাদি ও দেবতাদিকে বহুকাল সেবা করলে তবে সাধকের চিত্তশুদ্ধি ঘটে, কিন্তু সাধুগণ দর্শনমাত্রেই অনুগত জনগণকে পবিত্র করতে পারেন। তাছাড়া উপাসনাকালে যদি কোন উপাসকের ভেদবুদ্ধি আসে তাহলে কোন দেবতাই সেই উপাসকের বুদ্ধি থেকে অজ্ঞানতাকে নাশ করতে পারেন না। কিন্তু ঐ ভেদবুদ্ধিমান উপাসক যদি মুহূর্তমাত্র সাধুসেবা করেন, তাহলে নিমেষে অজ্ঞানতাকে ভক্তিবলে নাশ করতে পারেন।

বারদী আশ্রমে অন্নসত্র খোলা হয়। শত সহস্র ব্যাধিগ্রস্ত নরনারী বাবা লোকনাথের মহাপ্রসাদ খেয়ে দুরারোগ্য ব্যাধি থেকে মুক্তিলাভ করতে থাকে। বাবার অসীম করুণায় কত অন্ধ ফিরে পায় তার দৃষ্টিশক্তি, কত কালা বোবা খুঁজে পায় শ্রবণশক্তি ও বাকশক্তি। শোকতাপক্লিষ্ট সাধারণ মানুষের তিনিই একমাত্র আশ্রয়দাতা, অভয়দাতা। যাঁর অন্তরে ভগবানের সকল মহিমা অনুভূত হয়েছে, অগ্নিদগ্ধ লোহার মত যিনি ভগবদ্‌গুণ লাভ করেছেন, তিনিই সাধু। সাধু নামের এত মহিমা যে ভগবানের অবতীর্ণ বা প্রকটিত মূর্তি ও ভগবদ্ভক্ত ছাড়া আর কাউকে সাধু বলা

যায় না

এই সাধু সম্বন্ধে তাই ভগবান বলেছেন, কি যোগ, কি সাংখ্য বা তত্ত্ব-জ্ঞান, কি ধর্মানুষ্ঠান বা বেদাধ্যয়ন, কি তপস্যা বা ব্রতাচরণ, কি বৈরাগ্য বা অগ্নিহোত্র, কি যজ্ঞ বা তীর্থদর্শন—এরা কেউই সাধুসঙ্গের চেয়ে শীঘ্র চিত্তকে বিশুদ্ধ করতে পারে না।

ভগবৎতনু সাধু ও সদগুরু লোকনাথ বাবা বারদী এসেছেন বটে, কিন্তু দীর্ঘদিন পর্যন্ত প্রকৃত ধর্মপিপাসু ও ঈশ্বরবিশ্বাসী কোন লোকই তাঁর কাছে আসেননি। বস্তুতঃ সংসারাসক্ত লোকদের সাধুদর্শনের জন্য যে ব্যগ্রতা তা ক্ষণিক ও স্বার্থদুষ্ট। কেউ সাংসারিক বা পারিবারিক বিপর্যয়ে ব্যাকুল হয়ে শান্তির আশায় মহাপুরুষদের কৃপা প্রার্থনা করে। কেউ বা দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে তাঁদের শরণাপন্ন হয়। কিন্তু প্রকৃত ধর্মপিপাসু হয়ে পরমার্থ লাভের জন্য খুব কম লোকই তাঁদের কাছে আসে।

প্রকৃত ভক্ত বারদী আশ্রমে না আসায় লোকনাথবাবা একদিন বললেন, জানিস, বাড়ির গরু বাড়ির ঘাস খায় না।

এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। মহাত্মা বসুদেব একদিন সমস্তপঞ্চক-তীর্থে উপস্থিত মুনিগণকে বলেছিলেন, আমি শুনেছি, ইহাকালের কর্মের দ্বারা পূর্বকালের কর্মকে ক্ষয় করা যায়। দয়া করে আপনারা এ বিষয়ের তাৎপর্য বুঝিয়ে দিন।

একথা শুনে দেবর্ষি নারদ ছাড়া অন্যান্য মুনিগণ বিস্মিত হলে নারদ তাঁদের বললেন, শ্রীমান বসুদেব পরমাত্মা কৃষ্ণকে নিজের পুত্র মনে করে তাঁর কাছে এ বিষয়ের তাৎপর্য জানতে না চেয়ে আমাদের জিজ্ঞাসা করছেন। এতে বিস্মিত হবেন না। এটা এমন বিচিত্র নয়। দেখুন, সন্নিকর্ষ থাকলে অজ্ঞানী মানুষেরা দুর্লভ বস্তুকেও সমাদর করেন না। যেমন গঙ্গাতীরবাসী লোকেরা গঙ্গাকে ত্রিভুবন পবিত্রকারিণী মনে না করে তার জলকে মলিন বিবেচনা করে কুয়ো পুকুর ইত্যাদির জলকে নির্মল দেখে তা দিয়েই দেহ ও দ্রব্যাদি ধৌত ও পরিশুদ্ধ করে থাকে। তেমনি সন্নিকর্ষ বা নিকটে অবস্থানহেতু অজ্ঞ বসুদেব শ্রীকৃষ্ণের মহিমা বুঝতে পারেন নি।

দেবর্ষি নারদ আরও বললেন, কালক্রমে এই বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় ঘটে বলে অজ্ঞ লোকেরা কালকেই এই বিশ্বের কর্তা বিবেচনা করে থাকে। তেমনি বহুরূপী পরমাত্মা জীবের কাছাকাছি থাকলেও অবিদ্যার দ্বারা আবৃত অজ্ঞানী লোকেরা তাঁকে বুঝতে পারে না।

তেমনি ব্রহ্মভূত ব্রহ্মস্বরূপ ষড়ৈশ্বর্যময় ভগবান লোকনাথ যিনি রাগ, দ্বেষ, অভিনিবেশাদি পঞ্চক্লেশ, সুখদুঃখাত্মক কোন কর্মফল, সত্ত্ব প্রভৃতি গুণত্রয় ক্ষুধাতৃষ্ণাদি বা জন্মমরণাদি কোন প্রাণস্বভাবে অভিভূত হন না। তিনি এখন মানবদেহ ধারণ করে আছেন বলে সাধারণ লোকে তাঁকে বুঝতে পারে না।

একদিন লোকনাথবাবা বললেন, দুশো বছরের যোগীও যদি আমার কাছে আসেন আর তিনি যদি আমার স্বদেশী না হন, তবে অবশ্য তাঁকে ছেলেমানুষ বলব।

এই ইঙ্গিতময় কথাটিতে বোঝা যায়, লোকনাথবাবা কর্মযোগের চরম সিদ্ধি লাভ করেছেন। দুশো বছর যোগসাধন করেও যদি কোন যোগী লোকনাথের স্বদেশী না হন অর্থাৎ লোকনাথের মত কর্মযোগদ্বারা ভগবদ্দর্শন করে ব্রহ্মপদের অধিকারী না হন, তবে তিনি লোকনাথের সমান আসনে বসবার যোগ্য নন।

তাই ত লোকনাথ তাঁর দু একজন অন্তরঙ্গ ভক্তকে প্রায়ই বলতেন, আমি ধরা দিই বলে আমাকে ধরতে পারিস, নইলে কার বাপের সাধ্য আমার কাছে ঘেঁষে।

তাঁর এই কথার সপক্ষে তিনি প্রায় দিনই ভক্ত রামপ্রসাদের একটি গান গাইতেন।

কে জানে রে কালী কেমন, যাঁরে ষড়দর্শন পায় না দরশন।

পরমাত্মারূপিণী যে কালী ইচ্ছাময়ীরূপে ঘটে ঘটে বিরাজ করেন, যাঁর উদরে প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ড ভাণ্ড বিরাজিত, যে কালীর মর্ম একমাত্র মহাকালই জেনেছেন, যোগীগণ মূলাধারে সহস্রারে মন রেখে শত যোগসাধনা করলেও সেই কালীর তত্ত্ব বুঝতে পারেন না। তিনি দয়া করে ভক্তহৃদয়ে ধরা না দিলে কেউ তাঁকে ধরতে পারে না। তেমনি ভক্ত ও ভগবান অভিন্ন হলেও ভগবানকে জানবার শক্তি কারো নেই। তবে তিনি যদি নিজে থেকে কোন

ভক্তের কাছে নিজেকে প্রকাশিত করেন, তাহলেই সেই ভাগ্যবান তাঁকে বুঝতে পারেন।

মহাযোগী লোকনাথবাবার অসাধারণ যোগশক্তির কথা লোকের মুখে মুখে দিকে দিকে প্রচারিত হয়ে পড়ে। সেই কথা শুনে অসংখ্য সংসারী মানুষ নানা কামনা বাসনা পূরণের জন্য বারদীর আশ্রমে এসে ভিড় করতে থাকে। যথাসম্ভব তাদের মনস্কাম পূর্ণ করেন বাবা। অনেক পাপী তাপী উদ্ধার পায় তাঁর কৃপায়। তাদের কাতর প্রার্থনায় দয়া জাগে তাঁর অন্তরে। সেই দয়ার মাধ্যমে তাঁর অধ্যাত্মশক্তি নেমে এসে অসাধ্য সাধন করে। কিন্তু লোকনাথবাবার এতে মন ভরে না। তিনি বুঝতে পারেন, এতে তাঁর মহৎ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে না। তিনি তাদের অনেক উপদেশ দেন। কিন্তু উপযুক্ত আধার না হলে উপদেশ কার্যকরী বা ফলপ্রসূ হবার সম্ভাবনা থাকে না। অবশেষে তাঁর অমোঘ ইচ্ছাশক্তিবলে এক শক্তিমান সাধকের আবির্ভাব ঘটে তাঁর আশ্রমে।

ওঁ

সেদিন ঢাকার গেন্ডারিয়া আশ্রমে প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর হঠাৎ সমাধিভঙ্গ হলো। গোস্বামীজী তাঁর শ্বশ্রূমাতা মুক্তকেশী দেবীকে ডেকে বললেন, দেখলাম, এক মহাযোগী বারদী গ্রামে আত্মগোপন করে আছেন। আমাকে দেখা দিলেন, এক দীর্ঘকায় জটাজুটমণ্ডিত মহাপুরুষ। নয়নযুগলে পলক নেই, স্থির ও অলৌকিক দৃষ্টি। আমায় বললেন, শ্রীনন্দের নন্দন, আমি তোর পিতামহের খুড়ো।

আমি তখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনার বয়স কত ?

তিনি বললেন, একশো ছাপান্ন বছর।

মহাপুরুষ আরও বললেন, জীবনকৃষ্ণ, আমি যে তোরই জন্য এখানে অপেক্ষা করে আছি। তুই যে আমার জীবন্ত কৃষ্ণ। তোর বিজয় দিক দিগন্তে এগিয়ে চলেছে। আয় একবার বারদীতে। আমাকেও জয় করে যা। ওরে, তোরে দেখতে বড় ইচ্ছে হয়।

বারদীর ব্রহ্মচারীকে একবার দেখে আসার বড় সাধ হলো গোঁসাইজীর। ব্রহ্মচারীবাবা তাঁকে দেখতে চেয়েছেন। তাই যাবার সব ঠিক করে

ফেললেন।

অবশেষে একদিন সহধর্মিণী যোগমায়া দেবী, শ্বশ্রুমাতা মুক্তকেশী দেবী ও জনকতক অন্তরঙ্গ ভক্তকে সঙ্গে নিয়ে বারদীর পথে রওনা হলেন গোঁসাইজী। নৌকায় করে চললেন ব্রহ্মপুত্র নদের উপর দিয়ে।

বাংলার ধর্ম ও সমাজজীবনের সন্ধিক্ষণে প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর আবির্ভাব হয়। আপন সাধন ভজন, সিদ্ধি ও আত্মিক আদর্শ প্রচারের দ্বারা প্রভাবিত করার চেষ্টা করেন বর্তমান সমাজকে। বাংলার ক্ষয়িষ্ণু ভক্তি-আন্দোলনে জাগিয়ে তোলেন এক নতুন প্রাণস্পন্দন। মহাপ্রভু গৌরাঙ্গদেবের প্রেমধর্মের এক প্রধান ধারক ও বাহকরূপে চিহ্নিত হয়ে ওঠেন।

সংস্কারপন্থী ব্রাহ্ম আন্দোলনের পর গোঁসাইজী প্রথমে যোগীশ্রেষ্ঠ তৈলঙ্গস্বামী ও পরে যোগীবর পরমহংসজীর কাছে দীক্ষা গ্রহণ করে কাশীর হরিহরানন্দের কাছে সন্ন্যাস নেন। দুশ্চর তপস্যায় ব্রতী হয়ে অষ্ট সিদ্ধ লাভ করেন। কঠোর তপস্যার ফলে দিব্য জীবনের এক পরম জ্যোতি স্ফুরিত হয় তাঁর জীবনে। পূর্ব বাংলার ঢাকার গেন্ডারিয়া আশ্রমে বসে তিনি সিদ্ধকাম হন অর্থাৎ ভগবৎ দর্শন লাভ করেন।

গুরু পরমহংসজী তাঁকে আদেশ করেন, বিজয়, তুমি সংসার ত্যাগ করো না। গৃহাশ্রমে থাক। জীবের কল্যাণের জন্যই তোমাকে সংসারে থাকতে হবে।

গোঁসাইজীর জীবনের গতিপথ বড় বিচিত্র। ছিলেন হিন্দু, পরে ব্রাহ্ম হলেন, তার পরে সন্ন্যাসী আর এখন তিনি বৈষ্ণব। তবু গৈরিক বসন ও কমণ্ডলু ধারণ করেছেন। মাথায় জটা রেখেছেন। তাঁর গলায় আছে তুলসী আর রুদ্রাক্ষের মালা। কপালে তিলক। বিভিন্ন মত ও পথের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়ে তাঁর অধ্যাত্মজীবনধারা শেষে এক দিব্যচেতনায় উদ্ভাসিত হয়ে ভক্তির মধ্যেই মুক্তিকে খুঁজে পেয়েছে। গুরুর আদেশে মহাপ্রেমিক এক বৈষ্ণবাচার্যরূপে উদার হস্তে বিতরণ করে চলেছেন তাঁর অমিত অধ্যাত্ম সম্পদ।

সারা ভারতের উচ্চ কোটির সাধু সন্ন্যাসীরা গোঁসাইজীর মর্ম অবগত হয়ে, এক শক্তিধর সাধকরূপে স্বীকার করেছেন। অমরেশ্বরানন্দ পুরী বলেছেন, গোঁসাই যে বেশ ধারণ করেছেন, শাস্ত্রে তার উল্লেখ আছে, এর

নাম অবধূতবেশ। পদ্মপুরাণেও আছে তুলসী আর রুদ্রাক্ষের সহাবস্থানের কথা।

ভোলানন্দ গিরি বলেছেন, গোঁসাইজী সমর্থতম পুরুষ, সাক্ষাৎ শিবচ্ছবি। গোঁসাইজী অহর্নিশি সমাধিমগ্ন। যিনি জীবন্মুক্ত, তিনি সব বিধিনিষেধের অতীত।

স্বামী বিশুদ্ধানন্দ সরস্বতী বলেছেন, আমি অনেক সাধুসন্ত দেখেছি; কিন্তু গোঁসাইজীর মত সাধু খুব কম দেখেছি।

রামদাস কাঠিয়াবাবা বলেছেন, গোঁসাইজী এক মহাসমর্থ পুরুষ, সাক্ষাৎ মহেশ্বর। যেমন তেজস্বী, তেমনি প্রেমিক।

হাজার হাজার ভক্ত গোঁসাইজীকে গুরুরূপে বরণ করে নিয়েছেন। নাম কীর্তন আর উদ্দণ্ড নৃত্য ও তার ভক্তি-উজ্জ্বল ভাবতন্ময় রূপ বাংলার সর্বত্র প্রেমভক্তির বন্যা এনেছে। মহাভাবে মাতোয়ারা গোঁসাইজীর অঙ্গে দেখা যায় অশ্রু, পুলক, স্বেদ, কম্প ইত্যাদি অষ্ট সাত্ত্বিক ভাবের প্রকাশ। চোখে মুখে ফুটে ওঠে দিব্য জ্যোতির আভা। তাঁর এই দেবোপম মূর্তি দেখার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন মহাযোগী ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ বারদীর ব্রহ্মচারী। তাই আজ গোঁসাইজী চলেছেন পরমপুরুষের সেই ইচ্ছা পূরণ করতে।

তখন পৌষ মাস। দারুণ শীত। সেদিন বাবা লোকনাথ ভোরবেলায় হঠাৎ ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দায় দাঁড়ালেন। সেখানে গোঁসাইজীর ভক্ত কামিনীকুমার নাগ তখন বসে ছিলেন। কামিনীবাবু বারদীর আশ্রমে লোকনাথবাবার কাছে তাঁর কৃপা লাভের জন্য প্রায়ই আসতেন। কিন্তু তিনি এত ভোরে কোনদিন বাবাকে ঘর হতে বেরোতে দেখেননি। আজ তাই একটু বিস্মিত হলেন।

বাবা লোকনাথ কামিনীবাবুকে ডেকে বললেন, ওরে কামিনী, আজ আমার বড় আনন্দের দিন। আজ আমার জীবনকৃষ্ণ এখানে আসছে।

কথাটা শুনে বিস্ময়ে অবাক হলেন কামিনীবাবু। কারণ তাঁর গুরুদেব আসছেন, অথচ তিনি কোন খবর পেলেন না। তাই তিনি কিছুটা সংশয়ের সঙ্গে বললেন, আজ্ঞে আমরা কিছুই জানলাম না, আর আপনি বলছেন তিনি আসছেন।

কিন্তু পর মুহূর্তেই নিজের ভুল বুঝতে পারলেন তিনি। বুঝলেন,

সর্বজ্ঞ অন্তর্যামী মহাপুরুষের কথায় অবিশ্বাস করে তিনি অন্যায় করেছেন। বাবার পক্ষে সবই সম্ভব। তিনি একজায়গায় বসে দূরের সব কিছুতে প্রত্যক্ষ করতে পারেন, সব ঘটনার কথাই জানতে পারেন অবলীলাক্রমে।

তাই এবার তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, আচ্ছা বাবা, আমাদের গোঁসাইজী মেঘনা না ব্রহ্মপুত্র দিয়ে আসছেন ?

বাবা বললেন, তোরা জানিস না, আমি জানি।

কিছুক্ষণ পর বাবা লোকনাথ শিশুর মত হাত তুলে উল্লাস করে বলে উঠলেন, ঘাটে তার নৌকা ভিড়েছে। ওর সঙ্গে আসছে আমার মা আর দিদিমা। জীবনকৃষ্ণ ব্রহ্মপুত্র দিয়ে আসছে। এখুনি যা, তোরা তাকে নিয়ে আয়। চামার বাড়ির কাছে তার নৌকো চড়ায় আটকে গেছে।

কামিনীবাবু ও তাঁর ভাইঝির স্বামী হরিশচন্দ্র রায় কয়েকজন লোক নিয়ে ঘাটের দিকে রওনা হলেন। চামার বাড়ির কাছে পেঁছেই দেখতে পেলেন, গোঁসাইজীর নৌকো সত্যিই চড়ার মাটিতে আটকে গেছে। তখন সবাই মিলে তাঁর নৌকোটিকে ধরে জলে নামিয়ে দিলেন। নৌকোটি এবার ধীরে ধীরে ঘাটের কাছে এসে ভিড়ল। ইতিমধ্যে গোসাইজীর অনেক ভক্ত খবর পেয়ে আশ্রমের ঘাটে এসে উপস্থিত হয়েছেন। কামিনীবাবু গোঁসাইজীকে পথ দেখিয়ে আশ্রমে নিয়ে গেলেন।

গোঁসাইজী লোকনাথবাবার ঘরের বারান্দায় উঠে দাঁড়িয়ে আশ্চর্য হয়ে বলতে লাগলেন, কী এক স্বর্গীয় দৃশ্য দেখছি কামিনী। চার দিকেই দেবদেবী, দেবদেবী ঘরের সব জায়গায়। মহাপুরুষের গায়ে ও গায়ের কাপড়েও দেবদেবী। দেখছি, তাঁর দেহের প্রতি রোমকূপ হতে আগুনের শিখা বেরোচ্ছে আর তার মধ্যে কোষে কোষে বসে আছেন দেবদেবী।

কামিনীবাবু এ কথার মর্ম বুঝতে না পেরে নিশ্চল নিষ্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। মহাযোগী মহাপুরুষের যে মহিমা অচিন্ত্যনীয় ও অলৌকিক, যা সাধারণ মানুষের পক্ষে দুরধিগম্য, সে মহিমা তাঁর গুরুদেব স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছেন। এক অপরিসীম ভক্তিভাবে বিহ্বল ও আত্মহারা হয়ে উঠলেন কামিনীবাবু। তাঁর দুচোখ হতে অশ্রু ঝরে পড়তে লাগল। এক বিস্ময়ান্বিত পুলকের রোমাঞ্চ জাগল সারা দেহে। হঠাৎ সম্বিৎ ফিরে পেয়ে কামিনীবাবু দেখতে পেলেন, বাবা লোকনাথের প্রদীপ্ত নয়নযুগল

হতে এক দিব্য জ্যোতিপ্রবাহ বেরিয়ে এসে গোঁসাইজীর শরীরে প্রবেশ করছে।

বাবা লোকনাথ এবার দু বাহু প্রসারিত করে গোঁসাইজীকে তাঁর বুকে চেপে ধরলেন। সঙ্গে সঙ্গে গোঁসাইজী বাবার চরণতলে লুটিয়ে পড়লেন। পুত্রবৎসল পিতার মত বাবা লোকনাথ গোঁসাইজীকে আবার তাঁর বুকে টেনে নিলেন।

এরপর কাহিনীবাবু দেখতে পেলেন, লোকনাথবাবার শরীর থেকে বেরিয়ে আসা এক তড়িৎশিখার স্পর্শে গোসাইজীর বিরাট বপুটি বেতস-লতার মত কাঁপছে। আর এক অদ্ভুত অস্পষ্ট ধ্বনি কোথা থেকে বার হয়ে ঘরের ভিতটাকে পর্যন্ত প্রবলভাবে কাঁপিয়ে তুলছে। মনে হলো সব ভেঙ্গে যাবে এখনি।

কিছুক্ষণ পর গোঁসাইজীকে ছেড়ে দিলেন বাবা লোকনাথ। মহাপুরুষের শক্তি তাঁর মধ্যে সঞ্চালিত হওয়ায় তার বেগ সইতে না পেরে কাঁপতে কাঁপতে পড়ে যাচ্ছিলেন গোঁসাইজী। তা দেখে আশ্রমের এক ভক্ত তাঁকে ধরে একটি কম্বলের আসন পেতে বসিয়ে দিলেন।

আশ্রমে উপস্থিত ভক্তদের মধ্যে কানাই কবরেজকে ডেকে বাবা লোকনাথ বললেন, কানাই, একটি ছেলে আমার জন্য একটি পাকা বেল নিয়ে আশ্রমের দিকে আসছে। যা, দৌড়ে গিয়ে বেলটা নিয়ে আয়। আমি খাব।

একথা শুনে কানাইবাবু বিস্মিত হয়ে বললেন, আজ্ঞে আপনি খাবেন? কিছু বুঝতে পারলাম না। আপনি রোজ দিনের শেষ বেলায় একাহার করেন, আর আজ কি না সকাল বেলায় আপনার ক্ষিদে পেল?

বাবা বললেন, হ্যাঁরে, সত্যিই আমার ক্ষিদে পেয়েছে, তর সইছে না।

অগত্যা কানাইবাবু দৌড়ে গিয়ে ছেলেটির হাত থেকে বেলটি নিয়ে তা এনে বাবার হাতে দিলেন।

লোকনাথবাবা বেলটি নিয়ে নিজেই তা ভেঙ্গে কিছুটা নিজের জিভে ঠেকিয়ে গোটা বেলটাই একটু একটু করে খাইয়ে দিলেন গোঁসাইজীকে।

এর কিছুক্ষণ পরে আশ্রমের অশীতিপরা গোয়ালিনী মা স্নান করে এসে বাবাকে প্রণাম করলেন। গোঁসাইজীকে দেখে বাবাকে জিজ্ঞাসা করলেন

এটি কে বাবা ?

বাবার মুখে ফুটে উঠল স্নেহের হাসি। হাসিমুখেই বললেন, এটি ঘরের ছেলে। তোমার শিশু সন্তান।

আশ্রমজননী গোয়ালিনী ছিলেন সবার মা। তাঁর বয়স আশী বছর পার হয়ে গেলেও তিনি ছিলেন সুস্থ ও কর্মঠ। বার্ধক্যের জন্য তাঁর স্বাস্থ্যের যেমন কোন হানি হয়নি, তেমনি তাঁর তেজস্বিতাও কিছুমাত্র কমেনি। বাবার মুখ থেকে কথাটা শোনা মাত্র তিনি বিরাটবপু গোঁসাই-জীকে আপনশিশুর মত কোলে তুলে নিয়ে তাঁকে স্তন্যপান করালেন। আর গোঁসাইজীও শিশুর মত চোঁ চোঁ শব্দে স্তন্যপান করতে লাগলেন।

এই অকল্পনীয় অলৌকিক দৃশ্য দেখে কামিনীবাবু ও উপস্থিত ভক্তেরা একইসঙ্গে বিস্ময়ে ও আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে ওঠেন।

গোঁসাইজী এবার উঠে বসলেন। তিনি বাবার দিকে তাকিয়ে দেখলেন, মহিমময় ভাস্বর মূর্তিতে চারপাশে অঙ্গজ্যোতি বিচ্ছুরিত করে বসে আছেন বাবা লোকনাথ।

সহসা চেঁচিয়ে উঠলেন গোঁসাইজী, এ কি দেখছি আমি! ব্রহ্মজ্যোতি স্বরূপ মহাপুরুষের দিব্য দেহে অসংখ্য দেবদেবী বিরাজ করছে। উনি কখনো চতুর্ভুজ মূর্তি, কখনো করালবদনা কালী, আবার কখনো দেবা-দিদেব মহেশ্বর।

বাবা লোকনাথ বললেন, ওরে শ্রীনন্দের নন্দন, তুই চুপ কর। এতদিন এখানে বেশ ছিলাম। শান্তিতে ছিলাম। তুই আজ হাটে হাঁড়ি ভেঙ্গে দিলি। গোপনে আর থাকতে দিলি না। সবার সামনে প্রকাশ করে ফেললি।

গোঁসাইজী তখন অভিমানের সুরে বললেন, এতদিন তাহলে আমার উপর দয়া করেননি কেন ?

তেমনি অভিমানের সুরে বাবা লোকনাথও বললেন, তুইও ত সমান পাষাণ।

এরপর দুজনে অন্তরঙ্গ আলাপ করতে বসলেন। সে আলাপ যেমন গভীর, তেমনি দুরূহ আধ্যাত্মিক তাৎপর্যে ভরা।

এক সময় লোকনাথবাবা বললেন, জীবনকৃষ্ণ, চন্দ্রশেখর পাহাড়ের দাবা-

নলের কথা তোর মনে পড়ে কি ?

চমকে উঠলেন গোঁসাইজী কথাটা শুনে। তাঁর স্মৃতিপটে ভেসে উঠল সেদিনকার সেই দাবানলের কথা। সেদিন চন্দ্রশেখর পর্বতে যেন এক মহাপ্রলয় চলছে। এক ভীষণ দাবানলে দাউ দাউ করে জ্বলছে পর্বত সংলগ্ন সমস্ত বন। গোঁসাইজীর চারদিকেই আগুন। কোনদিকে পালাবার পথ নেই। কোনরকমে জীবনরক্ষার কোন উপায় নেই। কোথাও কোন নিরাপদ স্থান পাবার সম্ভাবনা নেই।

তখন সর্ববিঘ্ননাশক শ্রীমধুসূদনকে একমনে ডাকতে লাগলেন গোঁসাইজী। ঠিক সেই মুহূর্তে কোথা থেকে এক মহাশক্তিধর মহাপুরুষ বায়ুগতিতে আবির্ভূত হলেন। তারপর গোঁসাইজীর বিরাট বপুটিকে কোলে তুলে নিয়ে সেই অগ্নিব্যূহ ভেদ করে এক নিরাপদ স্থানে গিয়ে তাঁকে রেখেই অদৃশ্য হয়ে গেলেন। ঐ মহাপুরুষের প্রভাবে সেই জ্বলন্ত অগ্নিব্যূহ শীতলস্পর্শ বলে মনে হলো গোঁসাইজীর কাছে। পরে গোঁসাইজী অনেক অনুসন্ধান করেও কোন সন্ধান পাননি সেই মহাপুরুষের। আজ এখন বুঝতে পারলেন, বারদীর বাবা লোকনাথ ব্রহ্মচারীই সেই মহাপুরুষ যিনি সেদিন সেই অগ্নিব্যূহ থেকে উদ্ধার করেছিলেন তাঁকে।

গোঁসাইজীর এবার মনে পড়ল আর একটি ঘটনার কথা। তিনি হিমালয় শিখরে ভ্রমণ করছিলেন। ভ্রমণ করতে করতে মানস সরোবরের কাছে উপস্থিত। সেখানে কয়েকজন শক্তিমান সাধককে ধ্যানস্থ দেখতে পেলেন। তাঁদের দেখে গোঁসাইজী সেখানে এসে ভক্তিযুক্ত চিত্তে দাঁড়িয়ে রইলেন। সহসা তাঁদের মধ্যে একজন চোখ খুলে গোঁসাইজীকে দেখতে পেয়ে তাঁকে নিরীক্ষণ করে বললেন, তুই এখানে এসেছিস কেন ? ঢাকায় তোর গেণ্ডারিয়া আশ্রমের কাছেই আমাদের চেয়েও বড় এক মহাযোগী আছেন। তুই তাঁর কাছে যা। তাহলেই তোর অভিলাষ পূরণ হবে।

গোঁসাইজী তখন জানতেন না যে ঢাকার কাছেই লোকনাথ ব্রহ্মচারীর মত এক মহাপুরুষ অবস্থান করছেন।

আজ বারদীতে এসে ব্রহ্মচারীবাবার সঙ্গলাভ করে হিমালয়ের সেই মহাপুরুষদের কথার সার্থকতা বুঝতে পারলেন।

তাঁর আরও মনে পড়ল এই মহাপুরুই দ্বারভাঙ্গা হাসপাতালে আকাশ-

মার্গে উড়ে গিয়ে আসন্ন মৃত্যুর কবল থেকে তাঁর প্রাণ রক্ষা করেন।

গোঁসাইজীর সহধর্মিণী যোগমায়া দেবী একখানি গরদের কাপড় বাবাকে দেবার জন্য এগিয়ে এলেন। তিনি বাবার পায়ের উপর কাপড়খানি রেখে বাবাকে প্রণাম করলেন।

বাবা বললেন, একি এটা পরতে হবে না কি?

এই বলে তিনি কাপড়খানা তুলে নিয়ে ফালা দিয়ে চার টুকরো করলেন। এক খণ্ড মাথায় বাঁধলেন, আর একখণ্ড কৌপীন করলেন। বাকি দু খণ্ড ভক্তদের দান করে দিলেন।

এরপর বাবা গোঁসাইজীর শ্বশ্রূঠাকুরাণী মুক্তকেশী দেবীকে জিজ্ঞাসা করলেন, মেয়ের নাম কি রেখেছ গো?

মুক্তকেশী দেবী বললেন, যোগমায়া।

তা শুনে বাবা বললেন, বাঃ চমৎকার! যোগমায়া শব্দের অর্থ জান কি? শোন, বলছি। যে অপ্রাকৃত মায়াকে আশ্রয় করে কৃষ্ণ বৃন্দাবনে লীলা করেছিলেন, তাই হচ্ছে যোগমায়া। ঠিক নামই রেখেছ।

হঠাৎ যোগমায়া দেবীকে লক্ষ্য করে বললেন, মা, আজ তুই আমাকে নিজের হাতে রান্না করে খাওয়াতে পারবি?

যোগমায়া দেবী বললেন, কেন পারব না? দিচ্ছি রান্না করে।

রান্না শেষ হলে বাবা লোকনাথ বললেন, মা, আমাকে নিজের হাতে খাইয়ে দিবি ত?

একথা শুনে যোগমায়া দেবী ইতস্ততঃ করছেন দেখে গোঁসাইজী বললেন, দাও না খাইয়ে।

তখন লোকনাথের থালার পাশে বসলেন যোগমায়া দেবী।

লোকনাথবাবা বললেন, মা বাঁ হাতে আমার ঘাড় ধরে ডান হাত দিয়ে আমায় খাইয়ে দে। যেমন ছোট্ট ছেলেকে খাইয়ে দেয় তার মা। আর বলবি, বাছা খেয়ে নে, নইলে মারব। তবেই তোর হাতে খাব।

বাবা যেভাবে বললেন যোগমায়া দেবী ঠিক সেইভাবেই খাইয়ে দিলেন। খেতে খেতে বাবা বললেন, আমিও খাই তুইও খা।

যোগমায়া দেবী থালা থেকে দু এক গ্রাস নিজেয় মুখে তুললেন। কিছুক্ষণ খাবার পর বাবার খেয়াল হলো এবার তিনি নিজেই খাবেন। বললেন, বেশ,

এবার আমি নিজেই খাচ্ছি।

তারপর যোগমায়া দেবীকে বললেন, মা, খানিকক্ষণ খাবার পর তুই আমার হাত চেপে ধরে বলবি, বাবা আর খাসনে, অসুখ করবে।

আরো দু চার গ্রাস খাবার পর যোগমায়া দেবী বাবার হাত চেপে ধরে বললেন, বাবা, আর খাসনে, অসুখ করবে।

কথাগুলি শেখানো এবং সাজানো হলেও যোগমায়া দেবী সাক্ষাৎ মায়ের মত এমন অকৃত্রিম ও স্নেহমধুর কণ্ঠে বললেন, যে, তা শুনে বাবা লোকনাথ মুগ্ধ হয়ে 'অহো অহো' বলে বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে ফেললেন। একেবারে সমাধিস্থ হয়ে পড়লেন।

কিছুক্ষণ পর বাহ্যজ্ঞান ফিরে পেয়ে উপস্থিত ভক্তদের বললেন, বলতে পারিস, যোগমায়াকে এত ভালবাসি কেন ?

তা শুনে একজন ভক্ত বললেন, পৃথিবীসুদ্ধ লোকে যে তাঁকে ভালবাসে তাই।

বাবা বললেন, ঠিক বলেছিস। সবাই যাকে ভালবাসে সে-ই ত জগতের মা। যেন রাধাঠাকুরাণী।

রাধার ধ্যানে বলা হয়েছে, শ্রীরাধা জগজ্জননী হ্লাদিনী শক্তি। তিনি দেবতাদের রতিরসরসিকা। তিনি রম্যা, সৌম্যা, মনোজ্ঞা ত্রিভুবন-জননী। তিনি কৃষ্ণকর্তৃক সংস্তূয়মানা।

গোঁসাইজী দেখলেন, অদ্ভুতদর্শনের পর চোখ থেকে যেন এক দিব্য আনন্দজ্যোতি বার হয়, বাবার চোখের তেমনি ভাব। মুখে হাসি। শূন্য দৃষ্টি।

গোঁসাইজীর মনে পড়ল ঠাকুর রামকৃষ্ণের কথা। ঠাকুর একদিন বলেছিলেন, মন থেকে ক্ষোভ বাসনা গেলেই এমন পরমহংস অবস্থা হয়। আমি মাকে বললাম, মা পরমহংস ত বালক, বালকের মা চাইনা ? তাই এ বাসনাটুকু যেন না যায়। তাই তুমি আমার মা, আমি তোমার ছেলে। মার ছেলে মাকে ছেড়ে কেমন করে থাকবে ?

খাওয়া দাওয়া শেষ হলে বাবা লোকনাথ গোঁসাইজীকে বললেন, শ্রীনন্দের নন্দন, তুই ত আমার একা নস। তোকে দেখার জন্য বারদীর

সকলেই উদ্‌গ্রীব হয়ে আছে। যা, তুই তাদের কাছে যা।

তখন গোঁসাইজী কামিনীবাবুকে সঙ্গে নিয়ে ভক্তদের বাড়ি চলে গেলেন।

কামিনীবাবু পথে গোঁসাইজীকে জিজ্ঞাসা করলেন, ঠাকুর, ব্রহ্মচারী-বাবার মধ্যে কি দেখতে পেলেন ?

গোঁসাইজী বললেন, আমার কথা কি তুমি বিশ্বাস করবে কামিনী ?

কামিনীবাবু বললেন, ঠাকুর, ছোট বয়স থেকে আপনার অনেক সদুপদেশ পেয়েছি। আপনার কথা বিশ্বাস করব না কেন ?

তখন গোঁসাইজী বললেন, দেখ কামিনী, আমি বহু সাধু সন্ন্যাসীর আশ্রমে গেছি। কোন আশ্রমে কিছুই দেখিনি। কোন কোন আশ্রমে কিছু কিছু দেখেছি। আবার এমনও হয়েছে, যতক্ষণ সে আশ্রমে থেকেছি ততক্ষণই সেই সাধুর প্রভাব বুঝেছি। কিন্তু আশ্রম থেকে বার হয়েই সব ফাঁকা মনে হয়েছে। কিন্তু যা শুনে এই বারদীর আশ্রমে এসেছি তার চেয়েও অনেক বেশী এখানে দেখতে পেয়েছি।

ধর্মের নিগূঢ়তত্ত্ব জানবার জন্য বহু দেশ পর্যটন করেছি। বহু পাহাড় পর্বত ও তীর্থ পরিভ্রমণ করেছি। বহু সাধু মহাত্মা দর্শন করেছি। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের অসংখ্য সাধু মহাপুরুষদের সঙ্গ ও কৃপা লাভ করেছি। কিন্তু বারদীর ব্রহ্মচারীর মত এমন মহাশক্তিধর মহাপুরুষের কোথাও দর্শন পাইনি। সমস্ত ভারতবর্ষে এখন এমন উঁচু অবস্থার মহাপুরুষ আর নেই।

ব্রহ্মচারীবাবার সর্বাঙ্গ দেবদেবীময়। গাত্রবস্ত্র দেবময়। তাঁর বাসগৃহ পর্যন্ত দেবদেবীময়। তাঁর প্রতি রোমকুপেই দেবতা বিদ্যমান।

গোঁসাইজী আরও বললেন, কামিনী, ব্রহ্মচারীবাবার দেহকান্তি, ললাট, দৃষ্টি, ভ্রূযুগল সব কিছুই অনন্যসাধারণ। তাঁর অলৌকিকত্ব বোঝার সাধ্য নেই। তাঁর শরীরে মাংস নেই, কিন্তু তাঁর চর্মাবৃত অস্থিরাশি অপরূপ প্রভাদীপ্ত আর নবনীতে ভরপুর। শতাধিক বছর ধরে কঠোর তপশ্চর্যাও তাঁর হাত পায়ের কোমলতা নষ্ট করতে পারেনি। তাঁর হাত-পায়ের কোমলতা ও স্নিগ্ধতা প্রস্ফুটিত পদ্মরাগকেও হার মানায়। তিনি আজন্ম সন্ন্যাসী। চিরকাল পাহাড়ে পর্বতে অরণ্যে ভ্রমণ করেছেন। তবু মনে হলো তাঁর শ্রীচরণসেবী ভক্তগণের মনোরঞ্জনের জন্যই যেন তিনি তাঁর চরণযুগলের কোমলতাকে রক্ষা করেছেন। মানুষের শরীরের তিলচিহ্ন কৃষ্ণ-

বর্ণ হয়, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এই ব্রহ্মচারীবাবার তিলচিহ্নগুলি লোহিতবর্ণ।

সবচেয়ে অলৌকিকত্ব তাঁর অপার্থিব দৃষ্টিতে। তাঁর নয়নের দৃষ্টিতে কোন পলক নেই। দৃষ্টি সর্বদাই স্থির ও অবিকৃত। ঐ অপার্থিব অলৌকিক দৃষ্টিযুগলের বৈশিষ্ট্য হলো এই যে, সামনে শত শত ভক্ত বসে থাকলেও প্রত্যেকের মনে হবে, তিনি যেন তারই দিকে তাকিয়ে রয়েছেন।

ব্রহ্মচারী বাবার দিব্যদেহে শারীরিক ধর্ম কিছুই দেখতে পেলাম না। নিদ্রা, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, হিক্কা, হাই প্রভৃতি দেহধর্মগুলিকে তিনি যেন জয় করেছেন। অগ্নিতে এ দেহ দগ্ধ হবার নয়। বরফেও বিকৃত হয়নি বা হবে না। যে সমস্ত প্রাকৃতিক কারণে আমাদের পঞ্চভৌতিক দেহ গলিত স্খলিত ও বিকৃত হয়, এই সিদ্ধপুরুষ মহাযোগবলে সেই সমস্ত প্রাকৃতিক কারণ ও নিয়মগুলিকে পরাস্ত করেছেন। তাঁর শরীরের এই দিব্য ভাব দেখে আমার মনে হলো, ব্রহ্মচারীবাবা ইচ্ছা করলে এখনি দেহত্যাগ করতে পারেন, আবার অনন্তকাল দেহধারণ করেও থাকতে পারেন।

ব্রহ্মচারীবাবা নিত্য যোগস্থ মহাপুরুষ। যখন তিনি কথা বলছিলেন, কোন অবস্থার ব্যতিক্রম ঘটতে দেখলাম না। কখনো লৌকিক দৃষ্টির আবির্ভাব হয়নি তাঁর নয়নে। নয়নযুগল সর্বদাই অন্তর্নিহিত আর সমাধি-মগ্ন। দেহটি সর্বদাই অসার ও নিষ্পন্দ মনে হলো। কোন কোন সময়ে মৃতবৎ ও প্রাণহীন বোধ হলো। আমার সঙ্গে কথা বলতে বলতে হঠাৎ থেমে যাচ্ছিলেন। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় যে, আসনের উপর দেহটির মধ্যে যখন মনে হচ্ছিল তিনি এখন নেই, তখন কিন্তু তার চোখদুটি নিমীলিত হয়নি।

যিনি অখণ্ড চৈতন্যস্বরূপ, নিরুপাধি নিত্যস্বরূপ, যিনি অবিদ্যাদি সমস্ত ক্লেশ ও কলুষ থেকে সতত মুক্ত, যিনি জ্যোতিস্বরূপ আনন্দময় ব্রহ্ম, এমন শিবতুল্য যোগীশ্বর ব্রহ্মচারীবাবা এখন লোকাচারের আশ্রয় গ্রহণ করে বহু ধর্মকর্ম করছেন দেখলাম। মায়াতীত ও বিকারাতীত ব্রহ্মজ্ঞ এই মহাপুরুষ আমার সঙ্গে কথা বলার সময়েও জগতের মঙ্গলের জন্য অশ্রু বিসর্জন করছিলেন। কামিনী, যদি প্রশ্ন করো, এ সব কেন? তার উত্তরে শুধু বলতে পারি, এসব কিছুই তাঁর লোকশিক্ষার জন্য।

ব্রহ্মচারীবাবার জ্ঞান অনন্ত, যোগবল অনন্ত, ভক্তি অনন্ত। এমন পূর্ণপুরুষ আমার চোখে আগে আর কখনো কোথাও পড়েনি। যিনি যে মার্গের সাধকই হোন না কেন, তিনি ব্রহ্মচারীবাবাকে সেই পথেরই দিশারি রূপে দেখবেন। আমি দেখেছি তার প্রতি রোমকূপেই দেবতা। তাছাড়া চতুর্ভুজ, কালী, মহেশ্বর প্রভৃতি বিবিধ মূর্তিতে আমি তাঁকে দেখেছি।

কামিনীবাবু এবার বললেন, ঠাকুর, আমরা গন্তব্যস্থানে এসে গেছি। সামনেই আমার বাড়ি। ঠাকুর, আপনি যথার্থজ্ঞানী। তাই ত ব্রহ্মচারী-বাবার ঐ সব অপার্থিব অলৌকিকত্ব আপনার জ্ঞানচোখে ধরা পড়েছে। আমি যথার্থই ভাগ্যবান। এই পুণ্য মুহূর্তে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ আমার পর্ণ-কুটিরে পদার্পণ করেছেন। সত্যিই আমি ধন্য।

এদিকে কামিনীবাবুর বাড়িতে তখন লোকে লোকারণ্য। গোঁসাইজীকে দর্শন করার জন্য বারদীর অগণিত ভক্ত এসে উপস্থিত হয়েছে। তারা সবাই প্রতীক্ষায় উদ্‌গ্রীব হয়ে আছে।

গোঁসাইজী বাড়ির ভিতরে একবার প্রবেশ করার পর সেখান থেকে আখড়ায় চলে গেলেন। সেখানে গিয়ে গৌর নিতাইয়ের মূর্তির সামনে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়ালেন। অবিরল অশ্রু ঝরে পড়তে লাগল তাঁর নয়নযুগল হতে। সঙ্গে সঙ্গে সমবেত ভক্তগণ কীর্তন করতে লাগলেন।

এক মহাভাবে বিভোর হয়ে ঊর্ধ্বে দুহাত তুলে জোর গলায় হুংকার দিতে লাগলেন গোঁসাই, জয় শচীনন্দন! জয় গৌর নিতাই। কলির জীবের আর ভয় নাই। হরের্নাম, হরের্নাম, হরের্নামৈব কেবলম্‌। কলৌ নাস্ত্যেব, নাস্ত্যেব, নাস্ত্যেব গতিরন্যথা।

কীর্তন শেষে নিজের হাতে হরির লুট দিলেন গোঁসাইজী।

তারপর গোঁসাইজী তাঁর ভক্তদের সঙ্গে নিয়ে কয়েকটি শিষ্যবাড়ি ঘুরে ফিরে এলেন ব্রহ্মচারীবাবার কাছে। আখড়ার মোহান্ত তাঁর সঙ্গে ছিলেন।

মোহান্তকে দেখে ব্রহ্মচারীবাবা লোকনাথ বললেন, হ্যাঁগো মোহান্তজী, আমাদের মহাপ্রভুকে দেখলে ত?

মোহান্তজী বুঝতে পারলেন, বাবা গোঁসাইজীকেই মহাপ্রভু বলে ইঙ্গিত করছেন।

বাবা লোকনাথ বললেন, মোহান্তজী, তোমাদের আখড়ার মহাপ্রভু কথা

কন না। কিন্তু আমাদের মহাপ্রভু কথা কন।

মোহান্তজী বললেন, দেখলাম। আমাদের মহাপ্রভু ভক্তের সঙ্গে কথা কন।

ব্রহ্মচারীবাবা আবার বললেন, মোহান্তজী, তোমাদের আখড়ার মহাপ্রভু অচল, নিমকাঠের। আর দেখ, আমাদের মহাপ্রভু সচল, রক্তমাংসের। তিনি সকলের সঙ্গেই কথা কন।

এই বলে ব্রহ্মচারীবাবা ভজন গাইতে শুরু করলেন। প্রাণগৌরাঙ্গ, নিত্যানন্দ, জীবনকৃষ্ণ, জীবনকৃষ্ণ।

তারপর গোঁসাইজীকে লক্ষ্য করে উপস্থিত ভক্তদের বলতে লাগলেন, তোরা দেখ, তোরা সবাই মিলে দেখ আমার জীবনকৃষ্ণকে। এ কৃষ্ণ জীবিত। এর বিজয় দিক দিগন্তে।

এইভাবে 'জীবনকৃষ্ণ জীবনকৃষ্ণ' বলে আত্মহারা হয়ে উঠলেন বাবা লোকনাথ। গোঁসাইজীকে কি খাওয়াবেন, কোথায় বসাবেন, কি দেবেন—সেই চিন্তায় যেন পাগল হয়ে উঠেছেন তিনি। আর গোঁসাইজী দেখছেন ব্রহ্মচারী বাবাকে। দেখছেন এক অমর্ত্য মহাপুরুষ যাঁর প্রতি রোমকূপে দেবদেবীর প্রকাশ।

ব্রহ্মচারী বাবা বললেন, জীবনকৃষ্ণ, তুই বারদী আশ্রমে না এলে আমাকেই তোর কাছে যেতে হত। জানিস, আমি তোর পিতামহের আপন খুড়ো। পূর্বপুরুষের চিহ্ন হিসাবে আমি তোকে এই খড়ম জোড়াটা আর এই কম্বলখানি দিচ্ছি। এগুলো যত্ন করে রেখে দিস। আচ্ছা প্রাণগৌরাঙ্গ জীবনকৃষ্ণ, তোর প্রতি কেন আমার এত দয়া হয় ?

গোঁসাইজী শ্রদ্ধাযুক্ত চিত্তে সেই খড়মজোড়া আর কম্বলখানি গ্রহণ করলেন।

তারপর দুজনের মধ্যে আলোচনা শুরু হলো।

গোঁসাইজী বললেন, আজ্ঞে, ভগবানের সৃষ্ট জীব হয়ে মানবদের মধ্যে কেউ তাঁকে ভজন করে, আবার কেউ বা সে বিষয়ে বিমুখ হয়। এর কারণ কি ? খাদ্য বা পানীয় জীবমাত্রেরই দরকার। তার মধ্যে উৎকৃষ্ট ব্যক্তি উৎকৃষ্ট আহার্য গ্রহণ করে আর নিকৃষ্ট ব্যক্তি অপকৃষ্ট আহার্য গ্রহণ করে। কিন্তু ঈশ্বর ত তেমন উৎকৃষ্ট অপকৃষ্ট গুণবাচক বস্তু নন। ভগবান

আনন্দময়। অথচ কেউ তাঁকে প্রিয় ভাবে আর কেউ তাঁকে স্বীকারই করে না। সকল অবস্থার লোকই আনন্দকে স্বীকার করে, আনন্দই চায়। দুঃখকে কেউ ভালবাসে না। স্বভাবতঃ আনন্দশক্তিসম্পন্ন ভগবানকে তবে কেউ কেউ অনাদর করে কেন? আর সেই অনাদরকারীদের অন্তিমগতি কি রকম হয়?

গোঁসাইজীর এই সব প্রশ্নের উত্তরে মহাযোগী মহাজ্ঞানী ব্রহ্মচারীবাবা বললেন, গুণভেদে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই চারবর্ণ সেই আদিপুরুষ ভগবানের মুখ, বাহু, ঊরু ও পা থেকে উৎপন্ন হয়েছে। তাদের মধ্যে যারা আপন আপন উৎপত্তিক্ষেত্রস্বরূপ ঈশ্বরকে লব্ধ গুণানুসারে ভজনা না করে অথবা অবজ্ঞা করে তারা স্থানচ্যুত হয়ে অধঃপতিত হয়ে থাকে।

শোন জীবনকৃষ্ণ, হরিকথা বলতে বা হরিলীলা কীর্তন করতে যাদের রুচি হয় না, তারা তোর মত সাধু ব্যক্তির অণুকম্পার পাত্র। সুজন্ম, উপনয়ন ও অধ্যয়নাদি দ্বারা হরির চরণসান্নিধ্যে থাকবার অধিকার পেয়েও যে সকল ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য বেদের আর্থবাদ ও রুচিকর বাক্যে মুগ্ধ হয়, আর তাতে বিশ্বাস করে আপাতমধুর ভোগযুক্ত বাক্যগুলিকে গ্রহণ করে, বিষয়াসক্তিযুক্ত রজোগুণের প্রভাবে কাম, ক্রোধ, অহঙ্কারের বশীভূত হয়, সেই অহঙ্কারী পাপিষ্ঠরাই হরিভক্ত ও নিষ্ঠাবান সাধুদের উপহাস করে। সেই সব অন্ধবুদ্ধি ব্যক্তিরা সাধুগণ এমন কি ঈশ্বরকেও অবজ্ঞা করে। ঈশ্বররূপী আত্মা যে সকল দেহধারীর মধ্যেই অবস্থান করছেন, সকল মূর্খেরা তা বিশ্বাস করতে চায় না। তারা আপন আপন মনোরথ-কল্পিত বিষয় নিয়ে মত্ত থাকে আর সেই বিষয়েরই কথা পরস্পরে বলাবলি করে।

শোন জীবনকৃষ্ণ, জগতে স্ত্রীসঙ্গ, আমিষ ও মদ্যপান প্রাণীমাত্রেরই স্বাভাবিক ইচ্ছাধীন। কিন্তু এ সব অনুষ্ঠানের যথেচ্ছ প্রবৃত্তি বিধি-সম্মত নয়। কেবল প্রবৃত্তি-সংস্কারের জন্য বিবাহে স্ত্রীসংসর্গ, যজ্ঞে পশুহত্যা আর 'সুবাগ্রাহ' কার্যে মদ্যপানের ব্যবস্থা শ্রুতি প্রভৃতি শাস্ত্রে বলা হয়েছে। কিন্তু এ সবের প্রকৃত উদ্দেশ্যই হলো ঐ সব কর্ম থেকে নিবৃত্তি। তাহলেই জীবের পরম মঙ্গল। মনে রাখতে হবে, রতির জন্য নয়, সন্তানের জন্যই স্ত্রীসঙ্গম; দেবোদ্দেশে পশুবধ এবং কর্মবিশেষে

সুরাপান বিধেয়। যথেচ্ছ স্ত্রীসঙ্গম, পশু ভক্ষণ ও সুরাপানের কোন বিধান নেই।

বেদের তাৎপর্য অর্থাৎ এই সব আসল অর্থ না বুঝে ঐ সব মূর্খেরা ইচ্ছানুসারে ধর্মাচরণ করে। ঈশ্বর সর্বজীবে জীবাত্মারূপে অবস্থান করেন। যে লোক অজ্ঞানবশে তা না বুঝে নিজেকে শ্রেষ্ঠ এবং অপরকে নিকৃষ্ট মনে করে তাদের হিংসা করে আর নিজের পুত্রপরিবারকে সমাদর করে, সে লোক স্নেহপাশ ও সংসারবন্ধনে জড়িয়ে পড়ে। যেমন একপাল গাই গরুর মধ্যে একটিকে কিনে সর্বদা তার প্রতি মনোযোগ দিলে অন্য গাইদের থেকে ঐ বিশেষ গাইটিতেই ক্রেতার অধিক স্নেহ বদ্ধমূল হয়। তেমনি এই সংসারে আত্মপর ভাবনা থেকেই স্নেহপাশের উদ্ভব হয়। স্নেহ ও মমতাপাশে আবদ্ধ হলে কখনো বৈরাগ্য অভ্যাস করা যায় না। বৈরাগ্যে অভ্যস্ত না হলে ভগবৎ ভাব-প্রকাশ হয় না। তাই স্নেহাদিই অজ্ঞানী জীবকে ক্রমে অধোগামী করে ফেলে।

আবার এ সংসারে এক শ্রেণীর লোক আছে যারা পুরোপুরি মূর্খও নয়, আবার তত্ত্বজ্ঞানও লাভ করেনি। এমন সব মধ্যবর্তী লোক ত্রিবর্গকে অর্থাৎ ধর্ম, অর্থ, কামকে প্রধান এবং দেহাদিকে নিত্য বলে মনে করে। আর যারা আত্মাকে অসৎ ভাবে তাদের সবাইকে আত্মঘাতী বলা হয়। এরা অশান্ত এবং অজ্ঞানকে জ্ঞান বলে বিবেচনা করে। ভবিষ্যতে এদের মনোরথ বিফল হলে এরা দারুণ দুঃখ পায়। ঈশ্বরপরাঙ্মুখ এই সব লোকদের ইচ্ছা না থাকলেও জীবনশেষে আত্মমায়া বিরচিত গৃহ, পুত্র, সুহৃদ্ ও শ্রী ত্যাগ করে নরকে নিপতিত হতে হয়।

এই সব শুনে গোঁসাইজী ব্রহ্মচারী বাবাকে বললেন, আজ্ঞে, আপনার বিশ্লেষণ শুনলাম। কিন্তু আরো সহজ করে যদি বলেন ত ভাল হয়। একথা বলছি, কারণ এখানে যে সব ভক্ত রয়েছে তাদের এসব কথা শুনে চৈতন্যোদয় হতে পারে বলে আমার ধারণা।

ব্রহ্মচারী বাবা বললেন, শ্রীনন্দের নন্দন, তুই ত বুঝেছিস। তুই-ই একটু গুছিয়ে এদের বল না।

ব্রহ্মচারী বাবার আজ্ঞা শিরোধার্য করে গোঁসাইজী বলতে লাগলেন, তোমরা শোন গো। শাস্ত্রে বলেছে, ভগবান জগন্ময়। তাঁর থেকে অতীত

আর কিছু নেই। বিশেষভাবে তিনি আনন্দময়। তবু লোকে তাঁকে ভুলে যায় কেন? তাঁকে অশ্রদ্ধা করে কেন? ভগবান থেকেই ত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য শূদ্রাদি ও অনুলোম প্রতিলোমজাত সব মানুষই উৎপন্ন হয়েছে। সব মানুষই ভগবানের সন্তান ও শিষ্য। তাহলে সকলেরই পরম পিতা ও পরম গুরুরূপী আনন্দময় হরিকে ভজনা করা উচিত। তবে যে সংসারে কাউকে ভক্তিমান ও কাউকে অভক্তিমান দেখা তার কারণ কি? ব্রাহ্মণাদির জন্ম ও কর্মসত্ত্ব গুণময়, ক্ষত্রিয়দের সত্ত্বরজোময়, বৈশ্যদের রজোতমোময় আর শূদ্রদের কেবলই তমোময়। ব্রাহ্মণাদি যদি নিম্নশ্রেণীর ধর্ম ও কর্ম আচরণ করে, তবে তাদের অধোগতি হয়। শূদ্রাদি যদি উচ্চ অবস্থার ধর্মাচরণ করে, তবে তাদের উচ্চগতি হয়। স্থান, সহবাস, আচার ব্যবহার যে অনুষ্ঠানে অনুষ্ঠিত হয়, মানুষ সেই অনুষ্ঠান অনুযায়ী স্বভাব পেয়ে থাকে। যেমন কোন সাধু লোকের হিতাহিত বিবেক উদয় হবার আগে তাকে যদি কোন কদাচারীর সহবাসে রাখা যায়, তা হলে তার আচার ব্যবহার ঐ কদাচারীর মতই হয়ে থাকে। আবার কোন কদাচারীকে পবিত্রতার শিক্ষা বা অনুষ্ঠান করালে তাকে উন্নত করা যায়। এই উপায় শিক্ষার জন্যই ভগবান বর্ণাশ্রমের সৃষ্টি করেছেন। সত্ত্বগুণাদির অনুষ্ঠানে যতদূর ভগবদ্ভক্তি ও আনন্দানুভূতি হয়, রজোগুণাদির অনুষ্ঠানে ততদূর হয় না।

ব্রাহ্মণাদির মনোবৃত্তি যদি জন্ম থেকে নিম্নগুণসম্পন্ন হয়, তাহলে তাতে চিত্তের বিশুদ্ধি হ্রাস পায়। চিত্তের বিশুদ্ধতা কমে গেলে চিত্ত আপনা থেকে অজ্ঞানে আচ্ছন্ন হয়। এই অজ্ঞানতার জন্য যথেচ্ছ ব্যবহারী হয়ে লোকে আত্মহিতাহিতবোধ শূন্য হয়। এই আত্মহিতাহিতবোধশূন্য হওয়াকেই অভক্তি বা অশ্রদ্ধা বলা যায়। যেমন মধু স্বাভাবিকভাবে মিষ্ট হলেও পিত্ত-রোগগ্রস্ত রোগী কখনো মধুকে আদর করে না। তেমনি ভগবান স্বাভাবিক ভাবে আনন্দময় হলেও অজ্ঞানে সমাচ্ছন্ন লোকে তাঁকে আদর করে না।

এর মানে হলো এই যে, বর্ণাশ্রমের নিয়ম অনুযায়ী মানুষ যদি আপন আপন হিত চিন্তা করে উন্নতির পথে ছুটে যায়, তাহলে চিত্ত বিশুদ্ধি লাভ করে। আর চিত্তের বিশুদ্ধি অনুসারে তার ভগবৎ—আনন্দ বা ভগবদ্ভক্তি হয়। যারা শাস্ত্রমতে না চলে যথেচ্ছ আচরণ করে তারা চিত্তকে মলিন করে, অজ্ঞানে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। সেই অজ্ঞানরোগে

ভগবদ্ বিষয়ে তাদের অরুচি জন্মায়। এই সব অজ্ঞানী ব্যক্তি সংসারকেই সার করে, আসক্তিতে ডুবে যায়। ভগবান ও ভক্তকে উপহাস করে। তারা দাম্ভিক ও অভিমানী হয়ে ওঠে। তারা পরহিংসা করে। সংসারে ও সমাজে বিবাদ বিসম্বাদে বাধায় যাতে তাতে! তারা বেদবিধিকে যথেচ্ছ ব্যবহার করে ধর্মানুষ্ঠানচ্ছলে পাপাচারণ করে। অভক্তি কেন হয় এবং অভক্তদের অধোগতিই বা কেন হয়, তাই এতক্ষণ বোঝালাম।

ক্রমে সন্ধ্যা সমাগত হয়। গোঁসাইজীর এবার বিদায় নেবার পালা। গোঁসাইজী, মুক্তকেশী ও যোগমায়া দেবী ভূমিষ্ঠ হয়ে ব্রহ্মচারীবাবাকে প্রণাম করলেন।

ব্রহ্মচারী বাবা মুক্তকেশী দেবীকে বললেন, ব্রাহ্মসমাজের শুকনো বাঁশের মুড়ো আর না চিবিয়ে এবার ভক্তির আশ্রয় নাও। জ্ঞান ভক্তি ছাড়া দাঁড়াবে কোথায়? যাঁকে তুমি জামাই করেছ, তাঁর কাছেই সত্যবস্তু আছে। আর সময় নষ্ট না করে, তাঁর কাছেই দীক্ষা নাও। জানো, আমার জীবনকৃষ্ণ পরম ভক্তির ভাণ্ডারী। তাঁর কাছে প্রেমভক্তি লাভ করে ধন্য হও।

এর পর ব্রহ্মচারী বাবা গোঁসাইজীকে বললেন, জীবনকৃষ্ণ, আজ তোকে পেয়ে আমি যে আনন্দ পেলাম তা বলবার নয়। তুই যথার্থ ধর্মপিপাসু, প্রেমভক্তির ভাণ্ডারী, সরল, অকপট ও সত্যনিষ্ঠ। এবার তুই আমার ভার নে। আমি চলে যাই।

পরক্ষণেই গোঁসাইজীর শরীরের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বললেন, না রে তা হবার নয়। তোর শরীর এখনো তেমন পটু নয়। আমার ভার বইতে গেলে তোকে আরও কিছুদিন সাধনা করতে হবে।

গোঁসাইজী বললেন, আজ্ঞে, আজ আপনি আমাকে যে অনুগ্রহ করলেন তাতেই আমি ধর্মজীবনে আরও উচু অবস্থায় পেঁছিতে পারব। আজ আপনার সঙ্গ ও কৃপালাভ করে ধন্য মনে করছি নিজেকে। এবার অনুমতি চাইছি বিদায় নেবার।

সেকালে সারা পূর্ববাংলায় বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীজীর খুব নাম ডাক ছিল। সকলেই জানত গোঁসাইজী ভারতের বহু অঞ্চল পরিভ্রমণ করে বহু সাধু মহাপুরুষের সঙ্গ ও কৃপালাভ করেছেন। এদিকে ইতিমধ্যে ঢাকা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের বহু লোক বারদীর ব্রহ্মচারী লোকনাথ বাবার

কথা শুনেছেন। এবার গোঁসাইজী বারদীর আশ্রম থেকে তাঁর গেণ্ডারিয়া আশ্রমে ফিরে গিয়ে ব্রহ্মচারী লোকনাথের মহিমা ও মাহাত্ম্যের কথা প্রচার করতে লাগলেন। তিনি সকলকে বলতে লাগলেন, বহু পাহাড়পর্বত ও তীর্থস্থান পরিভ্রমণ করে অসংখ্য সাধু সন্ন্যাসীর সঙ্গলাভ করেছি বটে, কিন্তু বারদীর ব্রহ্মচারীর মত মহাশক্তিধর মহাপুরুষ কোথাও দেখতে পাইনি। ব্রহ্মচারীর অলৌকিক যোগৈশ্বর্যের কথা আর কি বলব? তাঁর যোগবল অনন্ত। কর্মফল অনন্ত, তাঁর জ্ঞানভক্তিও অনন্ত। এমন পূর্ণ পুরুষ আগে আমার চোখে পড়েনি।

গোঁসাইজীর মুখে এই সব কথা শুনে অনেকেরই চৈতন্য হয়। তাই এখন ঢাকা, ফরিদপুর, নারায়ণগঞ্জ, ময়মনসিংহ এবং আরো অনেক জায়গা থেকে দলে দলে বহু শিক্ষিত ভদ্রলোক ব্রহ্মচারীবাবাকে দর্শন করতে আসেন বারদীর আশ্রমে। এখন শুধু গোটা ঢাকা শহর ও পূর্ববাংলার প্রায় সব জায়গাতেই বারদীর ব্রহ্মচারীর নাম লোকমুখে শোনা যেতে থাকে। ভক্তের দল যোগসিদ্ধির চরমাদর্শ স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করে কৃতার্থ হন। আর তাঁরা মহাযোগী ব্রহ্মচারীবাবার কথা প্রচার করতে থাকেন। এমন কি, সাধনমার্গের লোকেরাও যোগসিদ্ধ ব্রহ্মচারীর অলৌকিক সিদ্ধি, অলৌকিক করুণা ও বিশ্বপ্রেম এবং অলৌকিক যোগৈশ্বর্যময় আচরণ নিজের চোখে দর্শন করে গ্রামে গ্রামে তাঁর অপার মহিমা প্রচার করতে থাকেন।

সেদিন ঢাকায় গেণ্ডারিয়া আশ্রমে ধর্মালোচনা হচ্ছিল। হঠাৎ এক সময় গোঁসাইজী কথায় কথায় উপস্থিত ভক্তদের বললেন, দেখ, আমার আশ্রমেরই এত কাছে এক পবিত্র ধর্মস্থান রয়েছে, আগে তা জানতে পারিনি। গিয়ে দেখলাম এক মহাশক্তিধর মহাযোগী সেখানে প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থান করছেন। দেখে খুব বিস্মিত ও চমৎকৃত হলাম। এই মহাপুরুষের সর্বাঙ্গ দেবদেবীময়। গাত্রবস্ত্র দেবময় আর তার বাসগৃহ পর্যন্ত দেবদেবীময়। পাঁচ মিনিট তোমরা যদি কেউ তাঁর চোখের দিকে চেয়ে থাকতে পার, তবে মূর্ছিত হয়ে পড়বে। হিমালয় ও তিব্বতাদি থেকে প্রাচীন যোগসাধকগণ প্রায় প্রতি রাতেই ঐ মহাপুরুষের কাছে যোগশিক্ষা করতে আসেন। এজন্য রাতে তাঁর ঘরে অন্য কেউ প্রবেশ করে না। ঐ মহাপুরুষ সন্ধ্যার সময়েই তাঁর ঘরের দরজা বন্ধ করে দেন। এই মহাপুরুষের নাম শ্রীশ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী। বারদীতে তাঁর আশ্রম।

উপস্থিত ভক্তদের অনেকেই বললেন, আমরা কি একবার ব্রহ্মচারীকে দর্শন করতে যাব?

গোঁসাইজী বললেন, হ্যাঁ, যাবে বৈকি। গেলেই তাঁর কৃপালাভ করতে পারবে। শোন, ওখানে গিয়ে তোমরা নিজে থেকে কিছু জিজ্ঞাসা করবে না। একটু দূরে চুপ করে বসে থাকবে। দেখবে, অন্তর্যামী মহাপুরুষ তোমাদের যা যা জানবার দরকার তা তিনি নিজে থেকেই তোমাদের ডেকে ডেকে বলে দেবেন।

গোঁসাইজী আরও বললেন, শোন, বারদীর ব্রহ্মচারীকে দর্শন করে আমার বহু দিনের বহু আকাঙ্খিত পরম সত্যের খনির সন্ধান পেয়েছি। এই ব্রহ্মচারী অনন্ত গুণসম্পন্ন, ব্রহ্মস্বরূপ ও আনন্দানুভবাত্মা। ঈশ্বরে এমন ঐকান্তিকী ভক্তি আর দেখা যায় না। নিখিল বিশ্বের কোন বিষয়ই তাঁর অজানা নয়, অলব্ধ নয়। অগ্নিকে আশ্রয় করলে লোকের যেমন শীত ও অন্ধকারের ভয় থাকে না, তেমনি এই ব্রহ্মচারীর সেবা করলে তোমাদের ভয় থাকবে না। সমস্ত পাপ নষ্ট হয়ে যাবে। যারা জলে ডুবে যাচ্ছে তাদের যেমন নৌকোই একমাত্র আশ্রয়, তেমনি তোমাদের মত যারা সংসার-সাগরে ডুবে গিয়েছে বা ভেসে বেড়াচ্ছে তাদের পক্ষে তিনিই একমাত্র আশ্রয়।

এখন জীবগণের পক্ষে ব্রহ্মজ্ঞ এই মহাপুরুষই পরম অবলম্বন। সূর্য উদিত হয়ে নিজের কিরণ দিয়ে কেবলমাত্র বাইরের জগৎ আলোকিত করে। কিন্তু এই ব্রহ্মচারীরূপ সূর্য উপদেশরূপ কিরণ দিয়ে বাইরের ও অন্তরের জ্ঞান অর্থাৎ সগুণ ও নির্গুণ জ্ঞান প্রদান করতে পারেন। এই ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ অভয়দানরূপী দেবতা। বিপদ নিবারণের বন্ধু। বিশুদ্ধ আত্মস্বরূপ চৈতন্যদাতা। এমন কি, এই ব্রহ্মচারীই ঈশ্বরের স্বরূপ।

৬

কিছুদিন পর গোঁসাইজী তাঁর আশ্রমে বসে যখন ধর্মালোচনা করছিলেন, তখন তাঁর শিষ্য কুলদাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় জিজ্ঞাসা করলেন, আমি একবার বারদীর ব্রহ্মচারীকে দর্শন করতে যাব?

গোঁসাইজী তখনি তাঁকে অনুমতি দিলেন। পরবর্তীকালে এই

কুলদাকান্তই শ্রীমৎ কুলদানন্দ ব্রহ্মচারী নামে খ্যাত হন।

এর কিছুদিন পর ১২৯৫ সনের ১লা জ্যৈষ্ঠ রবিবার সকালে আহার করে কুলদানন্দজী বারদীর পথে রওনা হন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন তাঁর বড়দা হরকান্ত, মেজদা বরদা কান্ত ও আর এক ভাই তারাকান্ত। এই তারাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ই পরবর্তী কালে ব্রহ্মানন্দ ভারতী নামে খ্যাত হন।

দেড়ঘণ্টা পথ হেঁটে গিয়ে তালতলা থেকে নৌকো ঠিক করলেন তাঁরা। কারণ এবার জলপথে যেতে হবে। সন্ধ্যার একটু পরেই তাঁরা বারদীর বাজারে পেঁছিলেন। সকলেই জানতেন সন্ধ্যার পরেই ব্রহ্মচারীবাবার ঘরের দরজা বন্ধ হয়ে যায়। গোঁসাইজী এক দিন কথাপ্রসঙ্গে একথা জানিয়ে দিয়েছিলেন তাঁদের।

কিন্তু হরকান্ত সেইদিন রাতেই অন্তরের আবেগে বাবাকে দর্শন করতে যাবার জন্য ব্যগ্র হয়ে উঠলেন। তখন কুলদানন্দ ছাড়া বাকি সবাই ব্রহ্মচারী বাবাকে দর্শন করতে চলে গেলেন। কুলদানন্দ নৌকোতেই রয়ে গেলেন।

আশ্রমে পেঁছেই আশ্চর্য হয়ে গেলেন তাঁরা। দেখলেন ব্রহ্মচারীবাবা তখনো তার ঘরের বাইরেই আছেন। বাবা তাঁদের দেখেই হরকান্তকে বললেন, হরকান্ত, আমি তোমাদের জন্য এত রাত পর্যন্ত আমার ঘরের দরজা বন্ধ করিনি। এখন যাও, নৌকোয় গিয়ে বিশ্রাম করগে। কাল সকালে এস।

এই বলে বাবা তাঁকে তাঁদের নৌকোয় পাঠিয়ে দিয়ে তাঁর ঘরে দরজা বন্ধ করে দিলেন।

হরকান্তবাবুরা নৌকোয় ফিরে গিয়ে কুলদানন্দকে সব কথা জানালেন।

পরদিন ভোরবেলায় স্নানাদি সেরে সকলে মিলে অর্থাৎ চার ভাই বারদীর আশ্রমে গিয়ে উপস্থিত হলেন। তাঁরা তাঁর ঘরের বারান্দার সামনে যাওয়া-মাত্র ব্রহ্মচারীবাবা উঠে এসে হরকান্তের হাত ধরে তাঁকে নিয়ে গিয়ে নিজের আসনের পাশে বসালেন। তারপর বললেন, হরকান্ত, তুমি ত মহাপুরুষ হে, ছদ্মবেশে কেন বাবু সেজে এসেছ?

হরকান্তবাবু বললেন, আমি ত সবসময়ই এই বেশে থাকি।

এর পর দুজনে অনেকক্ষণ ধরে নানা বিষয়ে আলোচনা করলেন। তার-

পর একসময় ব্রহ্মচারীবাবা প্রসন্ন হয়ে বললেন, দেখ হরকান্ত, তোমার কর্ম প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। আজ তুমি এসেছ আমাকে দর্শন করতে। দশ বছর পর শত শত লোক তোমাকে দর্শন করেই কৃতার্থ হবে।

হরকান্তবাবু বললেন, আমার যথার্থ কল্যাণ কেমন করে হবে, তা আমায় বলে দিন।

ব্রহ্মচারীবাবা বললেন, তাহলে তুমি গোঁসাইজীর কাছে গিয়ে দীক্ষা নাও। সত্য বস্তু তাঁর কাছেই আছে। তিনি আশ্রয় দিলে খুব শিগগিরই তোমার কল্যাণ হবে। জানি, তুমি আচার্য কেশব সেনকে গোঁসাইয়ের চেয়েও বড় মনে করো। আর ভেবেছ, গুরুর আশ্রয় গ্রহণ না করলেও শুধু পুরুষকার দ্বারা ধর্মজীবনলাভ করা যায়! জেনেছ, কেশবও কখনো গুরু গ্রহণ করেনি। বাইরে ধর্মলাভের জন্য যা দরকার তা তোমার সবই রয়েছে। তবে সাক্ষাৎ-ভাবে জীবন্ত সদ্‌গুরুর কাছে দীক্ষিত না হলে ঈশ্বরদর্শনে অধিকার হয় না। পাঁচ বছরের শিশু ধ্রুব বনে বনে ঘুরে পদ্মপলাশলোচন হরিকে কত ডাকল; কত কাঁদল। তবু গুরুকরণ না হওয়া পর্যন্ত হরির দর্শন পেল না। গুরুকরণ ছাড়া ব্রহ্মদর্শন হয় না। আহার নিদ্রা ত্যাগ করবে, মৌনী হবে, কত লোকে সাধু বলে ভক্তি করবে। কিন্তু তাতে প্রকৃত বস্তু লাভ হবে না। যদি ব্রহ্মদর্শন করতে চাস, তবে অন্তরের সমস্ত পূর্বসংস্কার দূর করে ফেলতে হবে। গুরু করণে সমস্ত বাসনা দূরীভূত হয় তার তখনি ব্রহ্মদর্শন সম্ভব হয়। এখন তোর যা অবস্থা তাতে অন্তরে যা বাসনা আছে তা পাবি। কিন্তু ব্রহ্মদর্শন হবে না।

তারপর বরদাকান্তকে বললেন, তুই অর্থ উপার্জন কর আর নির্লিপ্ত-ভাবে লোকের সেবায় তা ব্যয় কর।

অন্যান্য সকলের সঙ্গে কথাবার্তা শেষ হলে কুলদানন্দকে ডেকে বললেন, তুই এখানে এসেছিস কেন? দেবতা দেখতে এসেছিস?

কুলদানন্দ গোঁসাইজীর পূর্ব নির্দেশমত নিজে থেকে কোন প্রশ্ন করলেন না। বারান্দার একধারে চুপ করে স্থির হয়ে বসে রইলেন। ব্রহ্মচারীবাবার প্রশ্নের উত্তরে শুধু মাথা নেড়ে জানালেন, না।

বাবা তখন ঘুঁষি দেখিয়ে ধমক দিয়ে বললেন, কথা না বলে শুধু মাথা নাড়ছিস? কথা বল।

উঠে বললেন, আমার পিছু পিছু চল। তখন আমরা চারজনেই আবার একই ক্রমে আগের মত পথ চলা শুরু করলাম। উঁচুনীচু জঙ্গলময় পথ কণ্টকে আকীর্ণ। সেই পথে চলতে চলতে কাঁটায় ক্ষতচিহ্ণত হলো আমার পদতল। বার কয়েক হোঁচট খেলাম। দু তিনবার পড়ে গেলাম। এরপর গোঁসাইজী দুর্গম সংকীর্ণ গিরিপথের বিপদের কথা ইশারা করে জানিয়ে দিলেন। তারপর তিনি ধীরে ধীরে এগোতে লাগলেন। বারবার আমাকে বলতে লাগলেন, খুব সাবধানে ধীরে ধীরে আমার পিছু পিছু এস।

এইভাবে অতি কষ্ট করে অনেক দূর পথ চলার পর শেষে এক বিশাল রাজ্যের খুব কাছে এসে পড়েছি বলে বুঝতে পারলাম। ঘনসন্নিবিষ্ট সবুজ গাছের ফাঁক দিয়ে সূর্যরশ্মির মত সেই রাজ্যের তেজ বেরিয়ে আসছে দেখলাম।

সেই রশ্মি ধরে এগোতে লাগলাম। গোঁসাইজী এক একবার মুখ ফিরিয়ে আমার মুখপানে তাকিয়ে আমাকে সাহস দিতে লাগলেন। তাতে মনে হলো, সামনে কোন দৈব বিপদ আছে। আমরা যে অরণ্যপথে পথ চলছিলাম তা থেকে সেই জ্যোতির্ময় রাজ্যে প্রবেশ করবার একটিমাত্র দ্বার ছিল। তা ছাড়া গোটা রাজ্যটাই কাঁটার বেড়ায় পরিবেষ্টিত। খুব উৎসুক হয়ে প্রবেশদ্বারের দিকে এগিয়ে গেলাম। দ্বারের কাছে গিয়ে দেখি, কৃষ্ণবর্ণ এক ভয়ংকর লম্বা সাপ ফোঁস ফোঁস করছে আমাদের দেখে। সাপটি ফণা বিস্তার করে তেজের সঙ্গে আমাদের দংশন করতে এল। প্রথমে আপনার সামনে ফণা উঁচিয়ে দাঁড়াল, কারণ আপনি সবার আগে ছিলেন। কিন্তু আপনি তাকে গ্রাহ্য করলেন না। সাপটি এবার ফণা নামিয়ে গোঁসাইজীর দিকে ছুটল। কিন্তু গোঁসাইজীও তাকে গ্রাহ্য করলেন না। তিনি তখন পিছন ফিরে আমার পানে তাকিয়ে ভয় নেই, ভয় নেই, বলে আশ্বাস দিতে লাগলেন আমাকে। আমিও ভয় পেলাম না। সাপটি তখন ফণা নামিয়ে গোঁসাইজীর কাছ থেকে তারাকান্তদার দিকে এগিয়ে চলল। তারাকান্তদার হাতে একটা লাঠি ছিল। সাপটি তাঁর কাছে যেতে তিনি তাঁর লাঠি দিয়ে তাকে প্রহার করতে লাগলেন। সাপটি তখন তাঁর পাদুটোকে জড়িয়ে ধরল। গোঁসাইজী চিৎকার করে বললেন, ওকে মেরো না। মেরে ওকে ছাড়াতে পারবে না। ওকে না মারলে ও কোন ক্ষতি

করবে না।

কিন্তু ভয়ে ও ব্যস্ততায় তারাকান্তদা লাঠি দিয়ে সাপটিকে ক্রমাগত আঘাত করে যেতে লাগলেন। সাপটিও তাঁর পা দুটোকে খুব শক্ত করে জড়িয়ে ধরল।

এমন সময় দেখলাম, উলঙ্গ, দীর্ঘাকৃতি, গৌরবর্ণ, একজটা ব্রহ্মচারীবাবা আপনি অবলীলাক্রমে প্রবেশদ্বার দিয়ে সেই উজ্জ্বল জ্যোতির্ময় রাজ্যের মধ্যে প্রবেশ করলেন। গোঁসাইজীর সেই দ্বারপথের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আমার জন্য প্রতীক্ষা করতে লাগলেন। তাঁর দেহের অর্ধেকটা রাজ্যের মধ্যে আর বাকি অর্ধেকটা এদিকে।

গোঁসাইজী তখন আমাকে হাত নেড়ে অঙ্গুলি সংকেত করে বললেন, তুমি সাপটিকে ডিঙ্গিয়ে তার উপর দিয়ে আমার দিকে লাফ দাও। সাপ তোমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না।

আমি যেমনি একটা জোর লাফ দিয়ে তাঁর কাছে গিয়ে পড়লাম, অমনি সেই ধাক্কায় আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল। স্বপ্নে আমি আপনাকে যেমনটি দেখেছি, আজ এখানে এসে আপনাকে দেখলাম সেই রূপ ও আকৃতি।

কুলদানন্দের এই মুখ থেকে স্বপ্নবৃত্তান্ত শুনে ব্রহ্মচারী বাবা বললেন, তোর ডায়েরীতে এই স্বপ্নের কথা লিখে রাখবি। তোর পথ ত স্বপ্নেই তোকে দেখিয়েছে। আচ্ছা, তুই আমার সঙ্গে কথা বলছিলি না কেন রে?

কুলদানন্দ বললেন, গোঁসাইজী আমাকে বলে দিয়েছেন, আমার ভবিষ্যতে যা যা দরকার, সে সব বিষয় আপনি নিজে থেকেই ডেকে বলবেন। নিজে থেকে কোন কথা বলতে তিনিই আমাকে নিষেধ করেছিলেন।

এবার ব্রহ্মচারীবাবা বললেন, তোর সব কথার উত্তর, তোর যা যা দরকার তা সব পেয়েছিস ত?

কুলদানন্দ বললেন, হ্যাঁ পেয়েছি।

ব্রহ্মবারীবাবা বললেন, তবে যা। স্বপ্নে যা দেখেছিস, তোর ডায়েরীতে তা লিখে রাখবি, তোর যত কিছু ব্যথা বেদনা তা প্রারব্ধের। হাত বুলিয়ে দিলে এখনকার মত সারত বটে, কিন্তু পরে আবার হত। ওষুধ খাসনি।

তাতে ব্যথা আরো বেড়ে যাবে। কর্মফল শেষ হলেই আপনা থেকে সেরে যাবে।

হরকান্তকে দেখিয়ে বললেন, ওদের ওষুধে কোন কাজ হবে না। অসহ্য বোধ হলে তাজা মাটি লেপে দিস; কমে যাবে।

কুলদানন্দ এবার ব্রহ্মচারীবাবাকে প্রণাম করে বারান্দায় গিয়ে বসলেন। দুপুরবেলায় খাওয়ার ব্যাপার সব শেষ হলে আবার তাঁরা গেলেন বাবার কাছে। ব্রহ্মচারীবাবা তাঁর জীবনের অনেক কথাই তাঁদের কাছে বললেন। তারপর বরদাকান্ত বললেন, আমার কী করণীয় তা দয়া করে বলুন।

বাবা বললেন, পুজো।

বরদাকান্ত জিজ্ঞাসা করলেন, কি পুজো?

ব্রহ্মচারীবাবা তখন আঙ্গুল দিয়ে একটি বৃত্ত এঁকে বললেন, বুঝলি কি পুজো?

বরদাকান্ত বললেন, ঠিক বুঝতে পারলাম না। আপনি কি শালগ্রাম পুজোর কথা বলছেন?

বাবা বললেন, না রে, তা নয়। টাকা পুজোর কথা বলছি। অর্থ উপার্জন করে তা ভোগ করে কর্ম শেষ কর।

এ কথার উত্তরে বরদাকান্ত বললেন, মহাভারতে আছে, ন জাতু কামঃ কামনামুপভোগেন শাম্যতি। হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্ধতে।

তা শুনে ব্রহ্মচারীবাবা একটু হেসে বললেন, শ্লোকটির বাংলা মানে কি বলত।

বরদাকান্ত বললেন, কাম কখনো কাম্যবস্তুর উপভোগের দ্বারা উপশমিত হয় না। আগুনে ঘি ঢাললে আগুন যেমন বেড়ে যায়, তেমনি কামও ভোগ্যবস্তু পেলে কমার পরিবর্তে আরো বেড়ে যায়।

বাবা বললেন, আমি তোকে ভোগ করেই কর্ম শেষ করার কথা বলেছি। আমি তো উপভোগের কথা বলিনি। ভোগ আর উপভোগের মধ্যে পার্থক্য আছে। যেমন পতি আর উপপতি। শাস্ত্রবিধি না মেনে স্বেচ্ছাচারী হয়ে যা ভোগ করা হয় তা হলো উপভোগ। উপভোগে শান্তি নেই। শাস্ত্রবিধি মেনে ভোগ করার মধ্যেই আছে শান্তি।

এবার কুলদানন্দ জিজ্ঞাসা করলেন, পৃথিবী ছাড়া অন্যান্য লোক

লোকান্তরে মানুষের গতিবিধির পথ আছে কি ?

ব্রহ্মচারীবাবা বললেন, নিশ্চয়ই আছে। পথ একটা না থাকলে সে সব জায়গায় মানুষ যাতায়াত করবে কি করে ? যাতায়াত করে দেখে শুনে না এলে সে সব লোক সম্বন্ধে এত স্পষ্ট করে তাঁরা বলেছেনই বা কিকরে ? মুনি ঋষিরা বিভিন্ন সময়ে একই কথা বলে গেছেন। ভূঃ ভুবঃ স্বঃ মহঃ তপঃ সত্য—এই সপ্ত ভুবন বা জগৎ কি রকম ? কত দীর্ঘ, কত প্রস্থ ? কোন লোকে কত পাহাড় কত নদী, এমন কি বড় বড় রাজপ্রাসাদের বর্ণনাও তাঁরা দিয়ে গেছেন। সে সব লোকের আদিবাসীদের আকৃতি প্রকৃতি, তাদের কার্যকলাপ সব কিছুরই তাঁরা বিশেষভাবে বর্ণনা লিখে গেছেন। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্রই যাতায়াতের পরিষ্কার পথ আছে। বহুসংখ্যক মনি যেমন একসূত্রে মালার আকারে গাঁথা থাকে, তেমনি সপ্ত ভুবন, ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যবর্তী সমস্ত লোক শিকলে গাঁথার মত সংহত রয়েছে। তবে হ্যাঁ, সকল শরীরেই ত সকল লোকে যাওয়া যায় না। দেহটিকে বিভিন্ন লোক বা জায়গার উপযোগী করে নিতে হয়। তা না হলে যাওয়া যায় না।

কুলদানন্দ এবার জিজ্ঞাসা করলেন, সকল লোকে যাবার জন্য দেহটিকে কিকরে উপযোগী বা তৈরি করে নিতে হয় ?

ব্রহ্মচারীবাবা বললেন, যোগাভ্যাস দ্বারা। যোগক্রিয়ার দ্বারা মানুষ ইচ্ছামত দেহ পরিগ্রহ করতে পারে। সে সব লোকে যেতে হলে কোথাও জলে প্রবেশের উপযোগী জলীয় দেহ, কোথাও বায়বীয় দেহ আবার কোথাও তৈজস বা তেজ সম্পর্কিত দেহ দরকার হয়।

কুলদানন্দ জিজ্ঞাসা করলেন, সে সব দেহে কি রক্ত মাংস, অস্থি মজ্জা থাকে না ?

বাবা বললেন, কেন থাকবে না ? সে দেহে প্রধান ভূতানুরূপ সব উপাদানই থাকে।

কুলদানন্দ বললেন, আমরা ত এই পৃথিবীরই সব জায়গায় যেতে পারি না।

বাবা বললেন, পৃথিবী ত দূরের কথা, এই ভারতবর্ষের সব জায়গায় কি যেতে পারিস ? পাশ্চাত্য ভূগোল পড়ে তোরা পৃথিবীকে খুব ছোট করে ফেলেছিস। পুরাণে বলা হয়েছে সপ্তদ্বীপা পৃথিবী। জম্বু, কুশ, প্লক্ষ,

শাল্মলী, ক্রৌঞ্চ, শাক ও পুষ্কর—এই হলো পুরানোক্ত সাতটি দ্বীপ বা পৃথিবীর বিভাগ। তার মধ্যে একটা দ্বীপের খবরও ত কেউ জানে না। আবার এক একটা দ্বীপের সাতটি করে বর্ষ অর্থাৎ অংশ বা দেশ আছে। তারও বিন্দু বিসর্গ কেউ এখনো বিশ্বাস করে না। জম্বু দ্বীপের যে সাতটা বর্ষ, তার একটা হলো এই ভারতবর্ষ। লোহিত সাগর, কৃষ্ণসাগর, যবদ্বীপ, সুবর্ণদ্বীপ, চীন, পারস্য ও আরবাদি সব দেশই ত প্রাচীন পৌরাণিক ভূগোল মতে এক ভারতবর্ষের অন্তর্গত।

ভারতবর্ষের পর কিম্পুরুষবর্ষের ত আজ পর্যন্ত কোন খোঁজ নেই! জানিস ঐ দেশের মানুষের মুখ ঘোড়ার মত? সেখানকার বিবরণ ক'জন দেখে এসে বলতে পেরেছে?

কুলদানন্দ বললেন, বিশাল পৃথিবীকে কতবার কত লোকে পরিক্রমা করে এসেছে। তাদের চোখে ত এসব পড়েনি।

ব্রহ্মচারীবাবা বললেন, ও, তাই নাকি? ওরে, পৃথিবী গোল, একথা কে বলল? সে সব জায়গায় জাহাজ নিয়ে যাবে কি করে? পৃথিবী শুধু পূব পশ্চিমেই গোল, তাই তারা ঘুরে আসে। উত্তর দক্ষিণের পার কেউ পেয়েছে কি? এ দুদিকের খবর কেউ বলতে পারে কি?

কুলদানন্দ তখন জিজ্ঞাসা করলেন, তবে পৃথিবী কি গোল নয়?

ব্রহ্মচারীবাবা বললেন, গোল নয় কেন? পূব পশ্চিমে গোল। উত্তর দক্ষিণে শঙ্খাকৃতির মালার মত। পর পর সাতটি। প্রথমটির চেয়ে দ্বিতীয়টি দ্বিগুণ। এইভাবে ক্রমান্বয়ে বড়। এই সাতটি দ্বীপকে এক সুতোয় গাঁথলে যেমন হয়, পৃথিবী অনেকটা সেই রকম। সপ্তদ্বীপের মধ্যে লবণবেষ্টিত যে দ্বীপ তাই হলো জম্বুদ্বীপ। তারপর কুশ, তারপর প্লক্ষ। এইভাবে ক্রমান্বয়ে সাতটি দ্বীপ সংলগ্ন রয়েছে। লোকে সে সব বিশ্বাস করে না। করবে কি করে? দেখেনি ত। কিন্তু যাঁরা ঐ সব দেখেছিলেন, তাঁরা ঐ সব দ্বীপের অন্তর্গত পাহাড় পর্বত, নদনদী প্রভৃতির বিস্তৃত বিবরণ পরিষ্কার করে লিখে গেছেন।

এবার তারাকান্তকে বাবা জিজ্ঞাসা করলেন, তুই কি জন্য এসেছিস?

উত্তরে তারাকান্ত বললেন, আজ্ঞে রামপ্রসাদ বলেছেন, 'আমি স্বখাত সলিলে ডুবে মলেম শ্যামা'। আমারও হয়েছে ঠিক তাই। আমি নিজের

ইচ্ছায় সংসারে এসে ঠেকে পড়েছি। সেই মায়াকে পেরিয়ে যেতে পারছি না। আপনি সাধু, মহাযোগী, এই মায়াকে বশ করেছেন। আচ্ছা, এই মায়া কি? আর তা থেকে উদ্ধারের উপায় কি?

এর উত্তরে ব্রহ্মচারীবাবা বললেন, মায়া শব্দটি মী ধাতু থেকে ব্যুৎপন্ন হয়েছে। মী ধাতুর অর্থ হলো বোধ করা। যে শক্তিদ্বারা ঈশ্বরের সৃজন, পালন, হরণাদি বোধ হয় তাকে মায়া বলা হয়। যে মায়া সমস্ত দেবতা গণকেও বিমোহিত করে, সে মায়াতে মর্ত্যজীবেরাও যে বিমুগ্ধ হবে, তাতে আর সন্দেহ কি? মায়া সুখদুঃখ, আশা দুরাশায় জীবকে মুগ্ধ রেখেছে। কর্মফলসমূহের দ্বারা জীবজগতে সৃজন, পালন ও হরণ ঘটাচ্ছে। এই মায়ার তত্ত্ব বুঝলে সংসারে আবদ্ধ জীব পরমতত্ত্ব বুঝতে পারে।

ব্রহ্মচারীবাবা আরও বললেন, তারাকান্ত, সন্দেহ করতে পারিস, যদি মুক্তির জন্যই মানুষের জন্ম হয়, তবে ভগবান মায়া দিয়ে কেন তাদের আবদ্ধ করেছেন? এর উত্তরে বলা যায়, বিষয়ভোগে আসক্ত জীবদের মোক্ষের আশা জোরাল করবার জন্যই ভগবান মায়া সৃজন করেছেন। ভোগ ও মুক্তি এই উভয় অবস্থা বোঝাতেই ভগবান সমস্ত পশুজগৎকে আহার, নিদ্রা, ভয়, ক্রোধ, মৈথুনাদির দ্বারা ভারাক্রান্ত করে শুধু বিষয়ভোগেই মত্ত রেখেছেন। বিষয় ভোগে দুঃখ লাভ হয়—এ জ্ঞান অন্তরে অনুভব করার ক্ষমতা ভগবান মানুষকেই দিয়েছেন। এই মোহ ও জ্ঞান উভয়ই অধিকার ভেদে একা মায়া থেকেই মানুষ সংসারে লাভ করে। যদি এই মোহজ্ঞানের বোধ স্বভাবতঃ না হত, তাহলে একদিনও সংসার চলত না।

মায়াদ্বারা অবস্থাভেদে জীব অজ্ঞান ও জ্ঞান দুইই লাভ করে। যে সকল জীব মায়াঘটিত বিষয়ভোগে উন্মত্ত হয়, তারাই বিষয়ে আসক্ত হয় এবং অজ্ঞান বা মোহ লাভ করে। আর যাঁরা মায়াঘটিত বিষয় ভোগকে চিত্তের আবরণকারী বুঝে তা থেকে চিত্তকে বিশুদ্ধ রাখতে ইচ্ছা করেন, তাঁরাই জ্ঞানলাভ করে থাকেন। এখন প্রশ্ন, যারা অকৃতাত্মা ও স্থূলবুদ্ধি, তারা ঈশ্বরমায়া থেকে কেমন করে উদ্ধার লাভ করে?

অকৃতাত্মা হলো তারা, যাদের ইন্দ্রিয় ও মন বিষয়ে আসক্ত, কিছুতেই যারা জ্ঞানের বশীভূত হয় না। আর স্থূলবুদ্ধি হলো তারা, যাদের দেহ, গৃহ, ধন ও জনে নিত্যবুদ্ধি। চৈতন্যস্বরূপ ভগবানে তাদের বিশ্বাস বা

শ্রদ্ধা জন্মায় না। এই উভয়বিধ মানুষই মানবজন্মের উপযুক্ত অবস্থা লাভ করে না। মায়া থেকে তাদের উদ্ধারের উপায় বলছি, শোন।

বৈরাগ্য বিনা ঐ সব দোষ দূর হয় না। মায়ার তত্ত্ব ও আত্মতত্ত্ব এই উভয় বিষয়ই উপযুক্ত গুরুর কাছে শুনতে শুনতে যখন মায়াঘটিত ভোগকে দুঃখ বলে বোধ হবে, তখনই বৈরাগ্যের উদয় হবে। এই বৈরাগ্য যত জোরাল হবে ততই মন বিশুদ্ধ ও চিত্ত উজ্জ্বল হবে। এই তত্ত্বকথা শুনতে শুনতে মনের মালিন্য দূর হয়ে যায়। এ অবস্থায় কর্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয় যোগে এমন কিছু কর্ম করা চাই, যে কর্মের গুণে ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে মন বিশুদ্ধ হবে। ভগবৎ সেবারূপ কর্ম আর আত্মতত্ত্বের অনুভব—এই উভয় বিষয় অভ্যাসে পরিপক্ক হতে হতে অন্তর যত নির্মল হবে, ততই শ্রদ্ধা, ভক্তি ও প্রেমের সঞ্চার হবে। আর তখনই মায়ার বন্ধন হতে মুক্ত হওয়া যাবে।

তবে প্রশ্ন করতে পারিস, সুশিক্ষার জন্য না হয় তত্ত্বজ্ঞান শুনেই অভ্যাস করলাম, তাতে আবার কর্মের দরকার কি? এর উত্তরে বলা যায়, যে উপদেশ শেখার উপযুক্ত, তার কর্তব্য ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা অনুষ্ঠিত না হলে কখনো সেই বিষয়ে অন্তরের পরিণতি ঘটতে পারে না। যেমন কেউ অহিংসা পরম ধর্ম একথা মুখে বলে, উপদেশ শোনে, কিন্তু কাজে তা দেখায় না। যদি সে প্রতিদিনই নিজের হাতে জীবহত্যা করে তার মাংস খায়, তাহলে তাতে অহিংসার জন্য চিত্তের যে বিশুদ্ধ ভাব দরকার, তা কখনো তার হতে পারে না। যেমন ওষুধের নাম, চিকিৎসকের নাম, রোগের নাম বারবার শুনলে বা ওষুধ শিখলে রোগ দূর হয় না। নিজে ওষুধ খেতে হবে। তেমনি মায়াভোগে ইন্দ্রিয়াদির সঙ্গে অন্তরের প্রবৃত্তি ও স্থূলদেহের সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আসক্তিরূপ যে রোগে আক্রান্ত হয়েছে, কর্মের দ্বারা তা শোধন করতে হবে। তাতে ওষুধ ব্যবহারে রোগক্ষয়ের মত জীবের পক্ষে মায়ারও ক্ষয় হতে পারে।

যাক এসব কথা! তারাকান্ত, তুই মায়ার উপাসনা করে মায়াকে বশ কর না কেন।

তারাকান্ত তখন বললেন, মায়া বা প্রকৃতি জড়স্বভাবা। তাই তার উপাসনা করতে প্রবৃত্তি হয় না।

একথা শুনে ব্রহ্মচারীবাবা কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর বললেন, গুটিপোকা তার লালা থেকে রেশম বার করে তা দিয়ে নিজেকে পুরোপুরি আচ্ছাদিত করে। তখন সেই আচ্ছাদন কেটে তার আর বার হবার সামর্থ্য থাকে না। অন্য কেউ তাকে বার করে দিলেও তাকে বাঁচাতে পারে না। কিন্তু কালক্রমে যখন সে আগের রূপ পরিবর্তন করে, অর্থাৎ গুটিপোকা প্রজাপতির আকারে পরিণত হয়, তখন সে নিজেই তার সেই বাসা কেটে বার হয়ে যায়। কারো সাহায্য নেয় না।

তারাকান্ত এই কথার প্রকৃত অর্থ অনুধাবন করতে পারলেন না। তিনি ভাবলেন, প্রকৃতিকে বশীভূত করবার যে কৌশলের কথা বাবা বললেন, তা তাঁর আয়ত্তের বাইরে। তাই মনে মনে ঠিক করলেন, তিনি হরকান্তদের সঙ্গে ফিরে যাবেন।

অন্তর্যামী মহাপুরুষ তা বুঝতে পেরে বললেন, তারাকান্ত তুই দু-একদিন থেকে যা। পরে এ বিষয়ে তোর সঙ্গে আলোচনা হবে।

এদিকে হরকান্ত তাঁর দুই ভাই বরদাকান্ত ও কুলদানন্দকে নিয়ে ব্রহ্মচারীবাবার চরণে এসে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করলেন। তাঁর কৃপা লাভ করে বাড়ি ফিরে গেলেন।

পরের দিন তারাকান্ত আবার ব্রহ্মচারীবাবার কাছে এসে নানা রকম প্রশ্ন করতে লাগলেন।

সেই সব প্রশ্ন শোনার পর বাবা গভীর ধ্যানে মগ্ন হলেন। কিছুক্ষণ পর ধ্যানভঙ্গ হলে তিনি বললেন, তারাকান্ত, তুই আমার কথা বিশ্বাস করিস না।

তারাকান্ত বললেন, কোন কথা!

বাবা বললেন, আমি ত তোর প্রশ্নের উত্তর গতকালই দিয়েছিলাম ঐ গুটিপোকার উদাহরণ।

তারপর তারাকান্ত ব্রহ্মচারীবাবাকে প্রণাম করে বাড়ি ফিরে গেলেন।

তারাকান্ত ব্রহ্মচারীবাবার কথার প্রকৃত অর্থ বুঝতে না পেরে যা বললেন তাতে সূক্ষ্মদর্শী বাবা বুঝলেন, তারাকান্ত ভক্তি ও কর্মমার্গকে উপেক্ষা করে জ্ঞানমার্গের উপদেশ চাইছেন। তাই কিছুক্ষণ মৌন থাকার পর গুটিপোকার উপদেশ দিলেন।

তারাকান্ত মায়াকে বশীভূত করার উপায় জানতে চাইলে লোকনাথ-বাবা তাঁকে উপাসনা দ্বারা মায়াকে বশীভূত করতে বলেছিলেন। কারণ এই মায়াকে বশ না করলে মুক্তির কোন উপায় নেই।

মার্কণ্ডেয় পুরাণের অন্তর্গত শ্রীশ্রীচণ্ডীতে আছে, সেই দেবী মহামায়া বলপূর্বক জ্ঞানীগণেরও চিত্ত আকর্ষণ করে মোহিত করেন। সেই মহামায়াই বিশ্বের বীজ। তাঁর দ্বারাই জগৎ সৃষ্ট হয়েছে। তিনিই বিদ্যারূপে প্রসন্না হলে মানুষের মুক্তির বিধান করেন। আর তিনিই মুক্তির উপায়স্বরূপা ব্রহ্মবিদ্যা। তিনি আদি অন্তহীনা, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরেরও ঈশ্বরী। আবার তিনিই সংসারবন্ধনের হেতু অর্থাৎ অবিদ্যা বা মায়া।

নারদীয় পুরাণেও দেখা যায়, ভগবতী মহামায়ার দুটি রূপ—বিদ্যা ও অবিদ্যা।

তাই ব্রহ্মচারীবাবা তারাকন্তকে প্রথম উপদেশ দিলেন, মায়া বা অবিদ্যাকে পরিত্যাগ করে উপাসনাদ্বারা বিদ্যাকে প্রসন্না করে অবিদ্যাপাশ থেকে মুক্তিলাভ করো।

কিন্তু তারাকান্ত এই উপদেশের অর্থ অনুধাবন করতে না পেরে বলেছিলেন, প্রকৃতি জড়স্বভাব, তার উপাসনা করতে প্রবৃত্তি হয় না'।

এইভাবে তারাকান্তের যুক্তির অসারতা তত্ত্বদর্শী মহাজ্ঞানী লোকনাথ বাবার কাছে ধরা পড়েছে এবং তা পরাজিত হয়েছে।

গুটিপোকা যেমন স্বনির্মিত গুটিতে আবদ্ধ হয়ে প্রজাপতিতে পরিণত না হওয়া পর্যন্ত ঐ আবদ্ধ দশা থেকে মুক্তিলাভ করতে পারে না, তেমনি জীবও মায়াকে অতিক্রম না করা পর্যন্ত নিজের স্বরূপচৈতন্যে অবস্থিত হতে পারে না। জ্ঞানমার্গে এই মায়াকে অতিক্রম করা যেমন আয়াসসাধ্য, তেমনি সময়সাপেক্ষ। কিন্তু ভক্তি ও কর্মমার্গে তা অনেকখানি সহজ হয়ে পড়ে সাধকের কাছে। এই হলো ব্রহ্মচারীবাবার মঙ্গলময় উপদেশ।

বাবা লোকনাথ ব্রহ্মচারীর অপার মহিমা ও কৃপা অচিন্ত্যনীয়। তাঁর ভক্তবাৎসল্য গভীর। কঠোর অথচ মধুর তাঁর শিক্ষাপ্রণালী। ভক্তদের তিনি কতভাবেই না পরীক্ষা করেন, কি অদ্ভুত কৌশলেই না তাদের উপযুক্ত শিক্ষা দেন।

ওঁ

রজনীকান্ত চক্রবর্তী ঢাকা প্রথম সাবজজ আদালতের সেরেস্তাদার। পরবর্তীকালে রজনী ব্রহ্মচারী নামে প্রসিদ্ধ হন এবং ঢাকা শহরের অন্তর্গত ফরিদাবাদে এক আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। সাধুদর্শনের ঐকান্তিক ইচ্ছা-বশতঃ তিনি মাঝে মাঝে প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর কাছে যেতেন।

একদিন গোসাইজী রজনীবাবুকে বললেন, শোন রজনী, বারদীর ব্রহ্মচারীকে একদিন দর্শন করে এস। এমন উচুদরের মহাপুরুষ আমি আর কোথাও দেখিনি।

তারপর একদিন কোন এক উকীলের মুখে ঐ একই কথা শুনে বারদীর ব্রহ্মচারীকে দর্শন করার আকাঙ্ক্ষা প্রবল হয়ে ওঠে তাঁর মনে। তিনি তখন ছুটির অপেক্ষা না করেই একদিন আদালতের পিওন বৃন্দাবন দেকে সঙ্গে নিয়ে জলপথে নৌকাযোগে বারদীর পথে রওনা হয়ে পড়লেন। সেদিন ছিল ১২৯৪ সনের শ্রাবণ মাস। সূর্যোদয়ের কিছুটা বাকি ছিল। রজনী-বাবুর নৌকা বারদী বাজারের পশ্চিম দিকে আখড়ার কাছে পেঁছানো মাত্র এক অলৌকিক ঘটনা ঘটল।

রজনীবাবুর নৌকো পাড়ের কাছে এলে কূলের কাছে দাঁড় করানো আর একটা নৌকো থেকে কে যেন জিজ্ঞাসা করল, নৌকো কোথা থেকে আসছে ?

বৃন্দাবন উত্তর করল, ঢাকা থেকে।

তখন আবার প্রশ্ন হলো, রজনীবাবু এসেছেন নাকি ?

তখন বৃন্দাবন পাল্টা প্রশ্ন করল, আপনি জানলেন কিকরে ?

সেই নৌকো থেকে উত্তর এল, ঢাকা থেকে বিষ্টুবাবু এসে বলে গেছেন।

একথা শুনে রজনীবাবু ও বৃন্দাবন দুজনেই বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলেন। ভাবতে লাগলেন, কিকরে তা সম্ভব ? বিষ্ণুচরণ চক্রবর্তী ঢাকা মুন্সেফী আদালতে ওকালতি করেন। রজনীবাবুর সঙ্গেই বিষ্ণুবাবুর বারদী যাবার কথা ছিল! কিন্তু রজনীবাবু যখন নৌকাযোগে রওনা হন, তখন তিনি নিজে এসে তাঁকে জানিয়ে গেছেন, বাড়িতে একটা ঝামেলার জন্য তিনি বারদী যেতে পারবেন না; তাই রজনীবাবু বৃন্দাবনকে নিয়ে

রওনা হয়ে পড়েন। এটা কিকরে সম্ভব যে বিষ্ণুবাবু তার পরে বারদী এসেছেন এবং রজনীবাবু বারদী পেঁছানোর আগেই খবর দিয়ে চলে গেছেন? রজনীবাবু এবার বুঝলেন, এ সবই বাবা লোকনাথের ক্ষমতার লীলা।

এর পর রজনীবাবু ও বৃন্দাবন দুজনেই স্নান করে নিলেন। তারপর একটা মিছরির পুঁটলি নিয়ে রজনীবাবু বারদীর আশ্রমের দিকে এগিয়ে চললেন। তার পিছু পিছু চলল বৃন্দাবনচন্দ্র।

আশ্রমে প্রবেশ করেই রজনীবাবুর মনে হলো, তিনি যেন পুরাকালের মুনি ঋষিদের কোন আশ্রমে এসেছেন। আশ্রমটি পরিচ্ছন্ন এবং পবিত্রতায় ভরা। নানা ফুল ও ফলের গাছে পরিশোভিত। উঠোনে একটি ছোট বেলগাছ, হাত চারেক উচু। কিন্তু গাছটি উপরের দিকে তিনটি শাখায় বিভক্ত। গাছটির শাখা প্রশাখা এমনভাবে বিস্তৃত যেন কোন প্রাচীন বট গাছ তার শাখা প্রশাখা ছড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

রজনীবাবু লোকনাথ বাবার ঘরে প্রবেশ করলেন। মিছরির পুঁটলিটি বাবার সামনে রেখে তাঁর চরণে মাথা ঠেকিয়ে যেই প্রণাম করতে গেলেন অমনি এমন এক স্বর্গীয় সুগন্ধ পেলেন যে, সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে তিনি পাগলের মত লাফাতে লাগলেন। তারপর আবার অপার্থিব সুগন্ধে মোহিত হয়ে প্রায় পনের মিনিট সেই চরণে মাথা ঠেকিয়ে রাখলেন বাহ্য জ্ঞানশূন্য অবস্থায়। পরে জ্ঞান ফিরে এলে বাবার ডান দিকে মাটির উপর বসে পড়লেন। তারপর বাবার পলকহীন দুটি চোখের পানে নির্নিমেষ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। কিছুক্ষণ নীরব থাকার পর বাবা বারান্দায় পাতা একটি কুশাসন দেখিয়ে বললেন, এখানে বসেছিস কেন? ঐ আসনে গিয়ে বস্।

রজনীবাবু তা শুনে বললেন, আপনার চরণপদ্ম ছাড়া অন্য কোথাও বসবার বাসনা আমার নেই।

বাবা তখন একটু কঠোরভাবে বললেন, ঐ বাসনাতেই তো সব মাটি করলি।

রজনীবাবু তখন মনে মনে ভাবলেন, এক দিক দিয়ে সর্বজ্ঞ অন্তর্যামী বাবা ঠিকই বলেছেন। আমি ত কোন বিষয় বাসনা নিয়ে এখানে আসিনি। শুধু বাবার চরণদর্শনই আমার আকাঙ্ক্ষা ছিল। শুনেছি, এই বাসনাতেই

মানুষ সোনা হয়ে যেতে পারে। আর সোনা হবার জন্যই ত আমি তাঁর চরণপ্রান্তে উপস্থিত হয়েছি।

হঠাৎ রজনীবাবু দেখলেন, লোকনাথ বাবার পলকশূন্য দুটি চোখই স্থির হয়ে আছে। কোন শ্বাস প্রশ্বাসের লক্ষণ নেই তাঁর দেহে। যোগাসনে তিনি পটে আঁকা ছবির মত স্থির নিষ্পন্দভাবে বসে আছেন। কে জানে এই নবলোক ছেড়ে কোন অলক্ষ্য দূর প্রদেশে তাঁর দৃষ্টি চলে গেছে।

প্রায় পনের মিনিট পর মহাযোগী লোকনাথ বাবা আবার যেন নেমে এলেন এই জগতে। তারপর অতি গভীর ও কঠোরভাবে রজনীবাবুকে নানা প্রশ্ন করতে লাগলেন।

রজনীবাবু একসময় জানালেন, অনেকদিন হলো তাঁর স্ত্রী গত হয়েছেন। আবার বিয়ে না করে তাঁর দীক্ষাগুরুর নির্দেশমত নিবৃত্তি মার্গে চলেছেন তিনি।

তা শুনে লোকনাথবাবা বললেন, তুই বিয়ে করলি না। তা হলে ত তোর ব্রহ্মজ্ঞান হবে না। তুই একটা কাপুরুষ।

রজনীবাবু একথা শুনে একটু চমকে গেলেন। বিস্ময়ের চমক ভাঙলে নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, কাপুরুষ না হলে এখানে আসব কেন?

বাবা লোকনাথ তখন করুণামাখা স্বরে বললেন, কিরে, তুই চটলি না যে?

রজনীবাবু বললেন, চটব কেন? চটবার কি আছে? কাপুরুষকে কাপুরুষ বলেছেন। আমাকে যদি দুটো চড় কিংবা জুতোর বাড়িও দেন, তাহলেও আমি চটব না। আমি বুঝেছি, নিতান্ত পাষণ্ডও যদি আপনার সাক্ষাতে আসে, সেও চটতে পারে না।

বাবা লোকনাথ বললেন, রজনী, তুই আবার বিয়ে কর। এই আমার আদেশ।

রজনীবাবু বললেন, আপনার এ আদেশ আমি পালন করতে পারব না।

একথা শুনে বাবা বললেন, কেন পারবি না?

রজনীবাবু উত্তর দিলেন, স্ত্রীলোকে আমার মাতৃভাব হয়েছে। অবশ্য এর পিছনে আমার বিগতা স্ত্রীর ভূমিকা ছিল।

সে আজ বছর তিনেক আগের কথা। তখন আমার স্ত্রী জীবিতা

ছিলেন। সেদিন তাঁর এক ব্রত প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে আমি বাড়ি গিয়েছিলাম। সারাদিন ধরে চলল ব্রত প্রতিষ্ঠার কাজ। রাতে আমি শুতে যাব, এমন সময় স্ত্রীর সঙ্গে দেখা। তিনি বললেন, আজ আমি তোমার কাছে এক বর চাইছি। বল তুমি তা দেবে?

আমি রাজী হলে তিনি বললেন, আজ হতে তোমার আমার সম্পর্ক স্বামীস্ত্রীর সম্পর্ক অর্থাৎ সহবাসের সম্পর্ক হবে না।

আমি বললাম বেশ, তাই হবে। আজ থেকে তাহলে তুমি আমার মা হলে।

তিনি তখনি বললেন, হ্যাঁ, তাই হলাম।

বাবা লোকনাথ রজনীবাবুর এসব কথা শুনে বললেন, সত্যযুগ কি ফিরে এল নাকি রে? তাহলে তুই আমার কাছে এসেছিস কেন? আমার তো উচিত ছিল তোর কাছে যাওয়া।

এই কথায় বাবা লোকনাথ ইন্দ্রিয়সংযমকেই সত্যলাভের একমাত্র উপায় রূপে বোঝাতে চেয়েছেন। ইন্দ্রিয়সংযম না থাকলে হৃদয়ে ষোল আনা ধর্মের আবির্ভাব হয় না। তাই বাবা রজনীবাবুকে বলতে চেয়েছেন, তাঁর অন্তরে যখন ইন্দ্রিয়সংযমরূপ সত্যের আবির্ভাব হয়েছে, তখন তিনি ষোল আনা ধর্মের অধিকারী।

গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে ভগবান কৃষ্ণও ঐ একই কথা বলেছেন, ইন্দ্রিয়-সংযম ছাড়া মানুষ স্থিতপ্রজ্ঞ হয় না। অর্থাৎ তার প্রজ্ঞা স্থির হয় না। ইন্দ্রিয়সংযমই স্থিরপ্রজ্ঞতার প্রধান সাধন ও লক্ষণ।

তবে ইন্দ্রিয়দ্বারা বিষয় উপভোগ না করলেই কিন্তু মানুষ জিতেন্দ্রিয় বা বা স্থিতপ্রজ্ঞ হয় না। জরাগ্রস্ত, রুগ্ন, বিকলেন্দ্রিয় লোকের বিষয়ভোগ করতে পারে না। অনেকে লোকনিন্দার ভয়ে বিষয়ভোগে বিরত থাকে। অনেকে আবার স্বর্গাদি ফল বাসনায় কৃচ্ছ্রসাধনভিত্তিক তপস্যাদিতে নিযুক্ত হয়। এরা কি স্থিতপ্রজ্ঞ? না, তা নয়। এদের উপভোগ নেই, কিন্তু বাসনার অভাব নেই। বাসনার নিবৃত্তি না হলে প্রজ্ঞা স্থির হয় না। আবার ভগবৎ চিন্তাই ইন্দ্রিয়সংযম ও বাসনার নিবৃত্তির মহৌষধ। ঈশ্বরানুরাগ না জন্মালে বিষয়ানুরাগ দূরীভূত হয় না। ঈশ্বরে অনুরাগ হলেই ইন্দ্রিগণ সংযত হয়। চিত্ত নির্মল হয়।

'কাপুরুষ না হলে আপনার কাছে এখানে আসব কেন ?'—এই উক্তিটি শোনবার জন্যই হয়ত লোকনাথবাবা তাঁকে কাপুরুষ বলেছিলেন। সত্যের আলোকরশ্মি হৃদয়ে প্রবেশ করলেও তাকে অনির্বাণ ভাবে ধরে রাখতে হলে দিব্য আধারের প্রয়োজন। সাধারণ মানুষে সে শক্তি সহজে অর্জন করতে পারে না। একমাত্র যোগীপুরুষের কৃপায় তা সম্ভব হতে পারে। তাই তাঁর অন্তরকে দিব্য করে তোলার জন্যই রজনীবাবু হয়ত লোকনাথবাবার কাছে উপস্থিত হয়েছেন কৃপাপ্রার্থী হয়ে। তাঁর উক্তির মধ্যে এই কৃপা প্রার্থনার ভাবটিই ফুটে উঠেছে।

আবার কাপুরুষ না হলে সাধুসঙ্গ ঘটে না। আত্মশক্তি বা সামর্থ্যকে তুচ্ছ জ্ঞান করে সাধুসঙ্গলাভে আকুল না হলে কেউ যোগী পুরুষ বা সাধুর কাছে আসে না। ধর্মজগতে এই অপূর্ব শিক্ষাই বাবা লোকনাথ দিতে চেয়েছিলেন রজনীবাবুকে।

কিছুক্ষণ পর রজনীবাবু বারান্দা থেকে উঠে গিয়ে আশ্রমের উঠোনে একটা আমগাছের নীচে বসলেন। হঠাৎ ঝড়বৃষ্টি শুরু হলো।

কিন্তু রজনীবাবু সেখান থেকে উঠলেন না। ভাবলেন, এতদিন জ্ঞানে বা অজ্ঞানে যে পাপ করেছি, আজ তা এই মুক্ত মহাপুরুষের সামনে ধুয়ে ফেলব। আজ এই জলঝড়ে আমার দেহের যদি কোন ক্ষতি হয়, তাহলে এই মহাপুরুষই তার প্রতিকার করবেন।

ঠিক সেই সময় বাবা লোকনাথ তাঁকে ডেকে বললেন, রজনী, তুই উঠে আয়। আমার কাছে চলে আয়। ওরে, তুই এখনো ছায়ার কচু। রোদ বৃষ্টি ঝড় সইবি কিকরে ?

একথা শুনে রজনীবাবু উঠে বাবার কাছে গিয়ে বসলেন। রজনীবাবুর তামাক খাওয়ার অভ্যাস ছিল। বাবার কাছে বসে কথা বলার সময় তাঁর তিনবার তামাক খাওয়ার ইচ্ছা হয়। সর্বজ্ঞ অন্তর্যামী বাবা তা বুঝতে পেরে তিনবারই তাঁকে বলেন, তুই কেমন ভক্ত রে, যে আমাকে তামাক খাওয়াতে পারলি-না।

এই বলে তিনি রজনীবাবুকে দিয়ে তামাক সাজিয়ে নিজে খেয়ে রজনীবাবুকে খেতে বলেন। রজনীবাবু একটু আড়ালে গিয়ে তা খেতে চাইলে বাবা বলেন, তা হবে না। আমার সামনে বসে খেতে হবে।

আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, তৃতীয়বার রজনীবাবু তামাক খাওয়ার জন্য হুঁকোতে মুখ ঠেকানোর সঙ্গে সঙ্গেই তামাক খাওয়ার ইচ্ছা তাঁর চিরদিনের মত চলে গেল।

এরপর রজনীবাবু বাবার প্রসাদ গ্রহণ করে, ঢাকা ফিরে যাবার জন্য অনুমতি চাইলেন। বাবা তাঁকে বললেন, আয়, একবার আমার বুকে আয়!

রজনীবাবু তখন বাবার কাছে যেতেই বাবা তাঁকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। সঙ্গে সঙ্গে রজনীবাবুর ভিতরে সঞ্চারিত হলো অনির্বচনীয় এক শান্তির প্রবাহ। এমন শান্তি জীবনে তিনি কখনো অনুভব করেননি, তখন রজনীবাবুর চোখ থেকে অবিরল ধারায় আনন্দাশ্রু ঝরে পড়তে লাগল।

বাবা লোকনাথ জগদ্‌গুরু করুণাসাগর। তিনি ভক্তদের কাছে একাধারে পিতা, মাতা, শিক্ষক ও বন্ধু। তিনি পিতার মত ভক্তদের স্নেহ করেন। মাতার মত অসুস্থ ভক্ত সন্তানের শুশ্রূষা করে তাকে আরোগ্য করে তোলেন। শিক্ষকের মত সদুপদেশ দিয়ে তাদের জ্ঞানে বীজ বপন করেন। আর বন্ধুর মতই প্রিয় অপ্রিয় বাক্য দ্বারা তাদের মঙ্গল সাধন করেন।

মহাযোগী হলেও বাবা লোকনাথের স্নেহ ও বাৎসল্য অপরিসীম। তাই ত তিনি ঝড়বৃষ্টির হাত থেকে ডেকে এনে রক্ষা করলেন ভক্তকে। শিক্ষকের মত কত উপদেশ দিলেন। আবার পরম বন্ধুর মত অপূর্ব কৌশলে তাঁর তামাক খাওয়ার কু-অভ্যাস চিরতরে ত্যাগ করালেন। ভক্তবৎসল স্নেহময় পিতার মত রজনীবাবুকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন।

এর পর থেকে লোকনাথবাবাকে বেশীদিন না দেখে থাকতে পারতেন না রজনীবাবু। সুযোগ পেলেই ব্যাকুলভাবে ছুটে আসতেন বারদীর আশ্রমে। কোন কারণবশতঃ আসতে না পারলে তাঁর প্রাণ ছটফট করত। একেই বলে মহাপুরুষের কৃপালাভ।

ওঁ

পূর্ববাংলার কায়লীপাড়া নিবাসী শ্রীহরি বিদ্যালঙ্কার মশাই বারদীর আশ্রমে প্রায়ই আসতেন। বিদ্যালঙ্কার মশাই অসাধারণ পণ্ডিত ও তপস্বী

ব্রাহ্মণ। তিনি বছরের মধ্যে ছয় মাস আহার করেন না। বাকি ছয়মাস একবেলা সাত্ত্বিক আহার করেন। শাস্ত্রীয় বিধান মেনেই তিনি সকল কর্তব্যকর্ম করেন। বিদ্যালংকার মশাই দ্বেষ, মাৎসর্য, কপটতা প্রভৃতি সমস্ত দোষ থেকে মুক্ত। তিনি শান্ত, সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয় ও পক্ষপাত শূন্য।

পূর্ববাংলার বহু জায়গায় তাঁর অনেক শিষ্য আছে। শিষ্যবাড়ি যাবার পথে অথবা ফেরার পথে তিনি বারদীর আশ্রমে এসে লোকনাথ ব্রহ্মচারীকে দর্শন করে যান। তিনি কিন্তু লোকনাথ বাবার প্রসাদ গ্রহণ করেন না। যখনই আসেন, বাবার সঙ্গে নানা বিষয়ে আলাপ আলোচনা করেন।

একদিন বাবার এক ভক্ত বাবাকে জিজ্ঞাসা করলেন, আজ্ঞে, বিদ্যালংকার মশাইকে আপনি আপনার প্রসাদ গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন কি ?

বাবা লোকনাথ বললেন, হ্যাঁরে তাই। বিদ্যালংকার সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণ কিন্তু সংস্কারমুক্ত নন। তাই ত আমি তাঁকে আমার প্রসাদ গ্রহণ করতে নিষেধ করেছি।

তিনি আরও বললেন, বিদ্যালংকার গৃহী হলেও বিষয় বাসনাতে উন্মত্ত হয়নি তাঁর চিত্ত। ধন অর্জনের জন্য বিশেষ আগ্রহ নেই তাঁর। জানিস, এমন অনেক গৃহাশ্রমী আছেন যাঁরা ঈশ্বরের প্রেরিত মায়াতে মুগ্ধ হন না। বিষয় বাসনা পরিত্যাগ করে কামপীড়ন থেকে নিজেদের মুক্ত রেখে এই সংসারের সমস্ত কাজ শাস্ত্রীয় বিধান মতে করে যান। বিদ্যালংকার এমনই একজন গৃহাশ্রমী। শাস্ত্রের বিধান মেনেই ধর্মসাধনার প্রবৃত্ত হওয়া প্রয়োজন।

যারা ধর্মের পথে চলতে চায় তাদের শাস্ত্রের বিধান মেনে চলার উপর বিশেষ গুরুত্ব দিতেন লোকনাথবাবা।

মহাভারতে শান্তিপর্বে ব্যাসদেব বলেছেন, শাস্ত্রই সাধুগণের চোখ। শাস্ত্রের আলোকেই সমস্ত বিষয় অবগত হন তাঁরা। শাস্ত্রের দ্বারাই কর্তব্য অকর্তব্য স্থির করা যায়। তাই শাস্ত্রের অনুশীলন সকলের কর্তব্য। শাস্ত্রজ্ঞান না থাকলে সৎ বুদ্ধি পরিণত বা পরিপক্ক হয় না। এই কারণেই বিদ্যালংকার মশাই-এর শাস্ত্রের বিধান মেনে চলাকে সমর্থন করতেন বাবা

লোকনাথ।

সেদিন বিদ্যালঙ্কার মশাই আশ্রমে এলে বাবা লোকনাথ বললেন, শ্রীহরি, তুমি ত গুরু হে। আচ্ছা, তুমি তোমার শিষ্যদের কি শিক্ষা দাও, বলত।

বিদ্যালঙ্কার মশাই বললেন, ব্রহ্মচারী ঠাকুর, আমি আমার শিষ্যদের আত্মতত্ত্ব শিক্ষা দিয়ে থাকি।

ব্রহ্মচারী বাবা তখন প্রশ্ন করলেন, এই আত্মতত্ত্ব কি জিনিস গো?

বিদ্যালঙ্কার মশাই বললেন, দেহ আত্মা থেকে পৃথক আর আত্মা বিশুদ্ধ ও চিন্ময়। এই দুইয়ের ভিন্নাবস্থা বোধই আত্মতত্ত্ব।

একথা শুনে লোকনাথবাবা বললেন, তুমি ঠিকই বলেছ শ্রীহরি। জন্ম মৃত্যু, সুখ দুঃখাদি সবই প্রারব্ধ সংযুক্ত দেহের ধর্ম, আত্মার নয়। আত্মা তাতে সাক্ষী থাকে মাত্র। কিন্তু অজ্ঞানীরা ঐ গুলোকে আত্মার ধর্ম বলে মনে করে, কারণ তারা আত্মা থেকে দেহকে পৃথকজ্ঞান করতে পারে না। এই উভয় বস্তুতত্ত্ব বোধ হলে নিজেকে আবদ্ধ বলে বোধ হয়। আর আবদ্ধ বোধ হলেই মুক্তির প্রয়াস বৃদ্ধি পেয়ে থাকে। এজন্য প্রথমে দেহ ও আত্মার ভিন্ন অবস্থা শিক্ষা করতে হয়। যেমন কোন গরীব ছেলে তার পিতার দ্বারা রক্ষিত গুপ্তধনের কথা শুনলে তা পাবার জন্য ছটফট করে, তেমনি জীব যখন নিজেকে বিশুদ্ধ ও নির্মুক্ত আত্মস্বরূপ বলে বুঝতে পারে, তখন দেহাদির ও প্রারব্ধজনিত কর্মের, আসক্তিতে, সুখ দুঃখ, জন্ম মৃত্যু জরা ব্যাধি প্রভৃতি ঘটছে, তা বুঝতে পারে। তখন তার সব সময়ই মুক্ত হতে ইচ্ছা হয়। তা হলে শিষ্যদের শিক্ষা জ্ঞান হয়।

তারপর বাবা আবার প্রশ্ন করলেন, হ্যাঁগো শ্রীহরি, তুমি কিভাবে তোমার শিষ্যদের মধ্যে ঐ অবস্থা বোধ করাও?

বিদ্যালঙ্কার মশাই বললেন, হে ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ, তবে শুনুন। আমি উপযুক্ত শিষ্যকে দেহ ও আত্মতত্ত্ব আর সংসারের প্রবৃত্তিজনক কাজের পরিণাম বুঝিয়ে ঐ সকলের মধ্যে হেয় কি, আর উপাদেয় কি, তা বুঝিয়ে থাকি। আমি এই কথা বলি যে, যজ্ঞীয় কাম্যভোগলাভাদি থেকে স্বর্গাদি, আবার অন্য দেব পূজা বা অভিচারাদি অর্থাৎ অথর্ববেদবিহিত কিংবা তন্ত্রোক্ত ক্রিয়াদির অনুষ্ঠান থেকে নরকাদি লাভ হয়। তাই যাতে ক্ষণিক সুখ ভোগের পর শেষে মৃত্যু ও নরকযন্ত্রণা লাভ হয়, অভিচারাদি প্রবৃত্তিরোচক

সেই সব কর্মের অনুষ্ঠান অতীব হেয়। শুধু ভগবৎপরায়ণ হয়ে বিষয়াসক্তি পরিহারের জন্য কর্মানুষ্ঠানই শ্রেয় বা উপাদেয়। আমি শিষ্যদের এই শিক্ষাই দিয়ে থাকি।

তখন ব্রহ্মচারী বাবা বললেন, শ্রীহরি, তুমি সদ্‌গুরু। প্রবৃত্তিব্যঞ্জক কর্মে ব্রহ্মাদি থেকে কীটানু পর্যন্ত কারোরই শ্রেয়লাভ হয় না। ঈশ্বর কালরূপে কর্মফলদাতা, আত্মারূপে কর্মের সাক্ষী, শাস্ত্ররূপে উপদেষ্টা, স্বভাবরূপে নানাবিধ ইন্দ্রিয়দেবতা আর ধর্মরূপে কর্মভোগের হেতু। আর ঈশ্বরই বলেছেন, মানবের পক্ষে কর্মাতীত হওয়াই শ্রেয় আর কর্মপরায়ণ হওয়াই হেয়। তাই প্রবৃত্তিমূলক কর্ম পরিহার করে নিষ্কাম হয়ে ঈশ্বরের শরণাগত হওয়াই মানুষের উচিত।

এর পর ব্রহ্মচারীবাবা বললেন, আচ্ছা শ্রীহরি, যদি আকাশের মত আত্মা বিশুদ্ধ হন, তাহলে মেঘাদির মত দেহগত গুণ বা দোষ তাঁর উপাধিমাত্র। তা যদি হয়, তাহলে আকাশ যেমন প্রকৃত মেঘাচ্ছন্ন নয়, তেমনি আত্মাও কোন বন্ধনে আবদ্ধ থাকতে পারে না। তাহলে মুক্তির প্রয়োজন কি? আর মুক্ত জীবের লক্ষণ কি? দেখ শ্রীহরি, আমি যদি তোমার শিষ্য হতাম, তাহলে আত্মা ও দেহাদি বিষয়ে তখনই সন্দেহ প্রকাশ করতাম।

বিদ্যালঙ্কার মশাই বললেন, হে সর্বজ্ঞ মহাযোগী, জানি না এ পরীক্ষায় আমি উত্তীর্ণ হতে পারব কিনা। শিষ্যের প্রথম সন্দেহ হচ্ছে, আত্মা যদি স্বভাবতঃ বিশুদ্ধ ও মুক্ত হন, তবে তাঁর বন্ধন কিরূপে ঘটতে পারে? আর বন্ধন না ঘটলেও বিকৃত না হয়ে তাতেই বিশুদ্ধ থাকেন কিকরে?

এর উত্তরে বলতে হয়, যে বস্তু বিকৃত হয় তাকে বিশুদ্ধ করা যায় না। যেমন জলে-তেল পড়লে তা বিকৃত হয়ে যায়। কিন্তু যে বস্তু বিকারের মধ্যে সাক্ষীভূত থাকে, তা কখনো বিকৃত হয় না। যেমন জলে চন্দ্রসূর্যাদির প্রতিবিম্ব বর্তমান থাকলে জলের কম্পনাদি ধর্ম আরোপিত হয় তাতে। কিন্তু জলের চন্দ্রসূর্যাদির কম্পন ভাবময় দেখায় মাত্র, বাস্তবিক পক্ষে তারা কম্পিত বা জলধর্মী হয় না। তেমনি আত্মা এক পৃথক অবস্থা আর মায়া একটি পৃথক অবস্থা। অহঙ্কারাদি থেকে সত্ত্বগুণ পর্যন্ত মায়া বা প্রকৃতির ধর্ম। কিন্তু চৈতন্যদ্বারা চির উজ্জ্বল বা সঞ্জীবিত থাকাই আত্মার ধর্ম।

অহঙ্কারাদি মায়াগুণের উপরে জলে পতিত চন্দ্রসূর্যের প্রতিবিম্বের মত আত্মা জীবরূপে সাক্ষী থাকেন, কিন্তু সে গুণে তেলপড়া জলের মত বিকৃত হন না। এইজন্যই প্রকৃত অর্থে আত্মার বন্ধন বা মুক্তি নেই। মায়াগত গুণের উপাধিতে যুক্ত হওয়ার জন্যই মনোময় জীবদেহে আত্মা কখনো শোক, কখনো মোহ, কখনো সুখ, কখনো দুঃখ প্রভৃতি ভোগ করেন মাত্র। সংসারে জাগরণ, স্বপ্ন ও নিদ্রা এই তিন অবস্থা জীব ভিন্নভাবে অনুভব করে বলেই বোধ হয়। তবে এই অনুভবের ক্ষেত্রে মনই অনুভূত হয়। এর কারণ এই তিন অবস্থায় ভোগ্য ও অনুভবযোগ্য বিষয় হলো মন। কিন্তু চিত্ত মনের অতীত হলে আর অনুভূত হয় না। জাগরণে ও স্বপ্নে মনের আত্মাকে কর্ম বলে মনে হয়। কিন্তু ঘোর নিদ্রায় মনের কোন ক্রিয়া না থাকায় এবং ইন্দ্রিয় সংযোগ না থাকায় আত্মাকে ক্রিয়াহীন ও প্রশান্ত বলে বোধ হয়। অবস্থা ভেদেই বস্তুকে ভিন্ন ভিন্ন রূপে দেখা যায়। যেমন শুভ্র জ্যোতি বর্ণময় কাচের মধ্যে প্রতিফলিত হলে তাকে বর্ণময় দেখায়। তেমনি আত্মা যখন যে প্রকৃতিতে সাক্ষীভূত হয়ে থাকেন, সেই সেই অবস্থাতে সে আত্মাকে ভিন্ন ভিন্ন বলে বোধ হয়।

সর্বজ্ঞ মহাযোগী লোকনাথবাবা এবার বললেন, ওহে শ্রীহরি, আত্মার যদি বন্ধন-মোচন না থাকে, তবে আত্মার জীবোপাধি কেন ঘটে আর তাঁকে বিশুদ্ধ করতে এত সাধনারই বা প্রয়োজন কি ?

বিদ্যালঙ্কার মশাই বললেন, হে ব্রহ্মভূত ব্রহ্মচারী, ঈশ্বর তাঁর অংশ-স্বরূপ জীবকে সংসারী করে তাঁর অবিদ্যা বা মায়া শক্তির দ্বারা সংসার কার্যের জন্য জীবকে আবদ্ধ করেন। আবার ঈশ্বরই তাঁর বিদ্যাশক্তির দ্বারা জীবকে মুক্ত করেন। তিনিই বেদাদিতে ও অবতার দেহাদিতে প্রকাশ হয়ে জীবগণের প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির উপায় নির্দেশ করেন। যে দেহে ভোগাসক্তি যত ক্ষীণ হয় সেই দেহস্থ জীব তত নিবৃত্তির আশ্রয় গ্রহণ করে।

এখন দ্বিতীয় সন্দেহ হলো, যদি জীব ও পরমাত্মা এক হয়, তবে পরমাত্মা মুক্ত আর জীব বদ্ধ থাকে কিকরে ? এর উত্তরে বলা যায়, জীবাত্মা দেহগত কর্মফল ভোগ করে এবং তাতে আবদ্ধ হয়, কিন্তু পরমাত্মা নিত্য শুদ্ধ আর আপন আনন্দে আপনি তৃপ্ত ও পূর্ণ হয়ে থাকেন। যেমন সমস্ত জলরাশি একই পদার্থ, কিন্তু অংশভেদে তাপে থাকলে উত্তপ্ত ও ঠাণ্ডায়

থাকলে শীতল অবস্থায় থাকে। জল বাস্তবিক তাপ বা হিম নয়। তেমনি একই ঈশ্বর তাঁর যে অংশ কর্মে পরিণত করেন তাই জীবনাম প্রাপ্ত হয় আর যা কর্মদ্বারা বদ্ধ হয় না, যা বিশ্বব্যাপী অবিকৃত, বিশুদ্ধ ও পূর্ণ থাকে তাই পরমাত্মা নাম ধারণ করে। তাই পরমাত্মা ও আত্মা এক বস্তু হলেও কেউ বন্ধন ও কেউ মুক্তির অধীন নিরানন্দময় হয়ে থাকেন। পরমাত্মা নিয়ন্তা আর জীব নিয়ন্ত্রণের অধীন। এই দুই অবস্থার অতীত হলো ভগবৎসত্তা। তা বোধ হয়, কিন্তু মীমাংসা হয় না। তিনি লীলাচ্ছলে জগৎ ও জীবকে বন্ধন ও মুক্তি, প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি দান করেন।

এই সব কথা শুনে সর্বজ্ঞ ব্রহ্মচারী লোকনাথবাবা খুশি হয়ে বললেন, তুমি যথার্থই পণ্ডিত। তুমি ঠিকই বলেছ। জীব ও পরমাত্মাগত ভেদ যিনি বোঝেন, তিনিই আত্মজ্ঞানী। এই দুই অবস্থার অতীত যে ঈশ্বর, তিনি বিচারের অতীত। তাঁকে কেবল ভক্তিতে জানা যায়। তাই ভক্তি ছাড়া ঈশ্বরের কৃপার পাত্র হওয়া যায় না। এই তত্ত্ব অনুভব করলেই সাধু পদবী লাভ করা যায়।

এই সব আলোচনার এখানেই শেষ হলো। ব্রহ্মচারী বাবার আশীর্বাদ নিয়ে বিদ্যালঙ্কার মশাই বাড়ি ফিরে গেলেন।

ওঁ

পূর্ববাংলার ময়মনসিংহ জেলাশহরে রেজেস্ট্রী অফিসে অভয়াচরণ চক্রবর্তী কেরানীর কাজ করতেন। তিনি সেই শহরেই বাস করতেন বাড়িতে তাঁর স্ত্রী পুত্র ও বড় ভাই ছিল। হঠাৎ একদিন বাড়ি ছেড়ে চলে যান তিনি।

সতের বছর ধরে অনেক পাহাড় পর্বত পরিভ্রমণ করে ব্রহ্মচারী হয়ে ফিরে এসেছেন তিনি। সেবার শিবচতুর্দশীর দিন কয়েক আগে অভয়াচরণ ময়মনসিংএর জজকোর্টের এক উকীলের বাড়িতে এসে বললেন, প্রতি-বছর আমি শিবরাত্রি উপলক্ষে চন্দ্রনাথ পাহাড়ের তীর্থধামে যাই। কিন্তু সময় না থাকায় আর অর্থাভাবের জন্য এবার চন্দ্রনাথ তীর্থে যেতে পারলাম না।

একথা শুনে উকীলবাবু বললেন, অভয়াচরণ ব্রহ্মচারী, আপনি ত প্রতি

বছর চন্দ্রনাথ পাহাড়ের পাষাণ শিবের পুজো করে থাকেন। এবার এক কাজ করুন না। বারদীর আশ্রমে গিয়ে সচল শিব দর্শন করে আসুন। ঢাকা জেলার বারদী আশ্রমে এমন এক অলৌকিক যোগশক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষ আছেন যাঁকে দর্শন করলে আপনার চিত্তের সকল ক্ষোভ দূর হয়ে যাবে।

একথা বলে উকীলবাবু অভয় ব্রহ্মচারীকে পাথেয় হিসাবে কিছু টাকা দিলেন।

উকীলবাবুর কথামত অভয়াচরণ শিবচতুর্দশীর আগের দিন ঢাকা এসে পেঁছিলেন। পরের দিন নারায়ণগঞ্জ এসে সেখান থেকে পায়ে হেঁটে বারদীর উদ্দেশে যাত্রা করলেন।

অভয়াচরণের গাঁজা খাবার অভ্যাস ছিল। বারদীর পথে যেতে যেতে তাঁর খুব গাঁজা খাওয়ার ইচ্ছা হলো। কিন্তু একে সেদিন শিবচতুর্দশী, তাতে আবার চলেছেন সচল শিব দর্শন করতে। তাই তাঁকে গাঁজা সেবনের তীব্র ইচ্ছা সংবরণ করতে হলো। অবশেষে হাঁটতে হাঁটতে আশ্রমের কাছে এসে পেঁছিলেন।

বাবা লোকনাথ তখন আশ্রমের ভক্তদের মাঝে বসেছিলেন। ভক্তেরা তাঁর চারদিকে এমনভাবে বসেছিলেন যে সেখানে অন্য কোন লোকের প্রবেশের পথ ছিল না। হঠাৎ বাবা লোকনাথ ভক্তদের দিকে একবার তাকিয়ে হাত নাড়লেন। কিন্তু ভক্তেরা তার কারণ কিছুই বুঝতে পারলেন না। কিছুক্ষণ পর বাবা আবার হাত নাড়লেন। ভক্তেরা তখন অনুমান করলেন, হয়ত বাইরে থেকে কোন সাধু আসছেন। আর সে জন্যই অন্তর্যামী বাবা তাঁর আসার পথ করে দিতে বলছেন। তাই তাঁরা সবাই একটু করে সরে বসলেন। সকলেই বাইরের দিকে তাকালেন। হঠাৎ তাঁরা দেখলেন, এক ব্রহ্মচারী দ্রুতবেগে আশ্রমে এসে প্রবেশ করছেন।

তখন তাঁরা বুঝলেন, এই ব্রহ্মচারীর আসার জন্য অন্তর্যামী বাবা লোকনাথ প্রবেশের পথ ছেড়ে দেবার জন্য তাঁদের হাত নেড়ে সংকেত করছিলেন।

মনে হলো, এই ব্রহ্মচারীর জন্যই বাবা আগে থেকেই প্রস্তুত হয়েছিলেন। তাঁর আসা অন্য কেউ দেখতে না পেলেও তিনি তা দেখতে

পেয়েছিলেন সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে। অথবা লোকনাথ বাবার মহা আকর্ষণেই অভয়াচরণ সতের বছর ধরে পাহাড় পর্বতে পরিভ্রমণ করার পর নিম্নভূমিতে অবতরণ করেছেন।

অভয়াচরণ সোজা লোকনাথ বাবার কাছে গিয়ে তাঁকে প্রণাম করে আসনে বসতে যাবেন এমন সময় বাবা বললেন, হ্যাঁরে অভয়াচরণ, আজ তোর খুব কষ্ট হয়েছে ত?

অভয়াচরণ ভাবলেন, বাবা তাঁর পথশ্রমের কথা বলছেন। কিন্তু পরক্ষণেই তাঁর ভুল ভাঙ্গল যখন বাবা বললেন, অভয়াচরণ, একটু গাঁজা সেজে নিয়ে আয় ত।

অভয়াচরণ তখন ভাবতে লাগলেন, হঠাৎ বাবা একথা বললেন কেন? তবে কি তিনি তাঁর গাঁজা খাওয়ার ইচ্ছার কথা জানতে পেরেছেন?

একথা ভাবতে ভাবতে অভয়চরণ খুশি হয়ে বাবার আদেশ পালন করলেন। তিনি গাঁজা সেজে এনে বাবার সামনে কলকেটী ধরলেন।

বাবা লোকনাথ তখন ঘরের বারান্দায় বসে গীতাপাঠ করছিলেন। হঠাৎ সেখানে দমকা হাওয়া বইতে লাগল। সে হাওয়ায় কলকের টীকা জ্বলে উঠল। গাঁজার ধোঁয়া হাতির শুঁড়ের মত বেঁকে গিয়ে বাবার নাকে প্রবেশ করল।

বাবা তখন অভয়চরণকে বললেন, তুই এবার ঐ গাঁজা সেবন কর।

অভয়াচরণ বললেন, আপনি আগে প্রসাদ করে দিলেন?

বাবা বললেন: প্রসাদ করা হয়েছে। অভয়াচরণ একটু আগে বাবার নাকে গাঁজার ধোঁয়া প্রবেশের কথা ভেবে সে গাঁজা প্রসাদ করা হয়েছে মনে করলেন। তখন তিনি আনন্দিত হয়ে গাঁজা সেবন করলেন।

ঐ দিন রাতে বাবা অভয়াচরণকে দুধ ও মিছরির সরবত পান করতে দিলেন।

অভয়াচরণ প্রতিবার শিবচতুর্দশীর দিন চন্দ্রানাথতীর্থে যান। কিন্তু সময়ের অল্পতা ও অর্থাভাবের জন্য এবার তাঁর যাওয়া হলো না। এর পিছনে নিশ্চয় কোন রহস্য নিহিত আছে। যদি অভয়াচরণের সময় আর অর্থাভাব না ঘটত, তবে তিনি অবশ্যই চন্দ্রনাথতীর্থে যেতেন। বারদীর আশ্রমে আসতেন না। এ যেন বিপাকে পড়ে সাক্ষাৎ ব্রহ্মদর্শন হলো।

সময়ের অল্পতা ও অর্থাভাব অভয়াচরণকে এই শুভ সুযোগ এনে দিল। যে কারণে এতদিন তাঁর সময় ও অর্থের প্রয়োজন ছিল আজ আর তাঁর সে প্রয়োজন নেই। আজ এক মহাযোগী মহাপুরুষের সঙ্গে মহামিলন ঘটল অভয়াচরণের। এই মিলনের জন্যই হয়ত অন্তর্যামী সর্বজ্ঞ মহাপুরুষ লোকনাথবাবা সময় বুঝে অভয়াচরণের সময় ও অর্থ দুইই হরণ করেছেন। তাঁর সূক্ষ্মনির্দেশ ময়মনসিংহের উকীলবাবুর মারফত জানিয়ে দিয়েছেন।।

উপাসনা করতে করতে ভক্ত সাধকের চিত্ত বিশুদ্ধ হয় এবং প্রেমানন্দ লাভ হয়। তখন সাধকের সকল কর্মের প্রকাশক লিঙ্গদেহ ক্ষয় হয়ে যায়। তখন মন ও ইন্দ্রিয়ের শক্তি ক্ষয় হয়ে যাওয়ায় সাধকের পরমানন্দ অবস্থা উপস্থিত হয়ে থাকে। শুধু যোগ, জ্ঞান ও পুণ্যকর্মাদির অনুষ্ঠান করলে চিত্তের বিশুদ্ধি নাও ঘটতে পারে, আবার বিঘ্ন ঘটলে বিশুদ্ধি নাও ঘটতে পারে।

কিন্তু ভগবানের মূর্তিপূজা, আত্মজ্ঞান ও সদগুরুর আশ্রমে উপদেশ লাভ এই সব কর্মের অভ্যাস করলে অবিলম্বে সুফল লাভ হয়।

পরদিন সকালে যাবা লোকনাথের কৃপা ভিক্ষা করলে বাবা বললেন, তুই নিজেই ত একজন ব্রহ্মচারী, তুই আবার কৃপা ভিক্ষা করছিস কেন ?

একথা অভয়াচরণ শুনে মনে মনে বললেন, বুঝেছি ঠাকুর, আপনি ধরা দিতে চান না। তা ত হবে না। যাঁকে দেখবার জন্য আহার, নিদ্রা, পিপাসা ভুলে বন্ধুর পার্বত্যপ্রদেশ হতে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে এসেছি, মহাতীর্থ চন্দ্রনাথে না গিয়ে যে জীবন্ত শিবপূজার আশায় উন্মত্ত হয়েছি, সেই শিবময় মহাপুরুষ আমাকে এমন ভাবে প্রত্যাখ্যান করবেন, এটা হতে পারে না। যে জীবন্ত শিবের কৃপালাভ করার আশায় আগের দিন উপোস করেছি, আজ দেখতে চাই কিকরে তিনি প্রত্যাখ্যান করেন! যদি আমার হৃদয়ে একনিষ্ঠ ভক্তি থাকে, তবে তাঁর সাধ্য কি ধরা না দিয়ে যান।

কিন্তু বাবার কাছ থেকে কোন সাড়া না পেয়ে ক্ষুব্ধ হলেন অভয়াচরণ। গভীর মনোবেদনা নিয়ে বাবার সামনে তিন তিনবার মাথা ঠুকে আশ্রম থেকে চলে যাবার জন্য উদ্যত হলেন।

সেখানে তখন একজন উকীল ভক্ত বসেছিলেন। অভয়াচরণ আগের

দিন থেকে উপোস করে আছেন তা জানতেন তিনি। তাই তিনি বললেন, বাবা, উনি ত আগের দিন উপোস করেছেন। প্রসাদ না খেয়ে আশ্রম থেকে চলে যাচ্ছেন কেন ?

বাবা লোকনাথ বললেন, ওকে বসতে বল। ওর আহারের জন্য এখনি আহার মিলবে।

অভয়াচরণ তখন একটু চড়া গলায় বললেন, আমি বামুনের ছেলে। দু-একদিন না খেলে মরব না। খুব ক্ষিদে পেলে তিন বাড়ি ঘুরে তিন মুঠো চাল এনে নিজের হাতে আমি রান্না করে খাব। আমি এখানে খেতে আসিনি। যে জন্যে এখানে আসা তা যদি না পেলাম, তবে কি জন্যে এখানে থাকব ?

অভয়াচরণ প্রায় প্রতি মুহূর্তেই গাঁজা খেতেন। কিন্তু শিব চতুর্দশীর দিন জীবন্ত শিবের দর্শন পাবেন বলে গাঁজার পিপাসা অতি কষ্টে দমন করে আছেন। অভয়াচরণ আশ্রমে আসার সঙ্গে সঙ্গে অন্তর্যামী বাবা লোকনাথ তাঁর গাঁজার পিপাসা মেটান। তাতে অভয়াচরণের মনে হয়েছিল, বাবার কৃপা অবশ্যই তিনি লাভ করবেন। কিন্তু তিনি যখন বাবার কৃপা প্রার্থনা করেন, তখন বাবা তাঁকে বলেন, তুই নিজেই ত ব্রহ্মচারী। আমার কাছে কৃপা প্রার্থনা করছিস কেন ?

এই কথা বলে বাবা যেন অভয়াচরণকে এক কঠোর পরীক্ষায় ফেলেছেন। তাঁর ভক্তি কত নিবিড়, তাঁর ব্রহ্মচর্য কত খাঁটি, তাই হয়ত পরীক্ষা করতে চেয়েছেন। বাবা অভয়াচরণকে খাবার নেয়ার কথা বললে অভয়াচরণ বলেন, তিনি খেতে আসেননি, ভিক্ষান্নে তিনি জীবনধারণ করতে পারেন। তা শুনে মনে মনে খুশি হন লোকনাথবাবা। বুঝতে পারেন, এই মনের জোরেই সতের বছর ধরে নিষ্ঠার সঙ্গে ব্রহ্মচর্য পালন করে এসেছেন অভয়াচরণ।

এর পর অভয়াচরণ যখন আশ্রম থেকে চলে যাবার জন্য পা বাড়িয়েছেন। ঠিক সেই সময় এক সধবা রমনী ভোগ রান্না করে বাবা লোকনাথের জন্য নানাবিধ অন্নব্যঞ্জন ও মিষ্টান্ন সাজিয়ে নিয়ে এলেন। শিবরাত্রির পারণ অর্থাৎ ব্রত উদ্‌যাপনের পর উপবাস ভঙ্গের জন্য ঐ মহিলা রাত্রিতে ভোগ রান্না করে সকালবেলাতেই আশ্রমে বাবাকে তা নিবেদন করতে এসেছেন।

তা দেখেই বাবা স্নেহমাখা কণ্ঠে অভয়াচরণকে ডেকে বললেন. অভয়াচরণ, তোর খাবার এসেছে। এবার খেয়ে উদর পূর্তি কর।

সে ডাকে সাড়া না দিয়ে পারলেন না অভয়াচরণ। তিনি ফিরে এসে ভোগ খেয়ে উপবাসভঙ্গ করবার জন্য বাবার ঘরে ঢুকতেই বাবা সেই মহিলাকে বললেন, তুই সরে যা এখান থেকে। ছুঁয়ে ফেলবি।

মহিলাটি শসব্যস্ত হয়ে ঘর হতে বেরিয়ে এলে অভয়াচরণ সেই প্রসাদ খেতে লাগলেন।

প্রায় অর্ধেক খাওয়া হয়ে গেলে বাবা বললেন, এ যে কায়েতের মেয়ের রান্না খাচ্ছিস অভয়াচরণ।

একথা শুনে অভয়াচরণ বললেন, আমি ত ঠাকুরের প্রসাদ খাচ্ছি। চণ্ডালের মেয়ের রান্না হলেই বা দোষ কি ?

এইভাবে প্রসাদ গ্রহণ করে সেদিন আশ্রমেই রয়ে গেলেন অভয়াচরণ।

পরের দিন বিদায় নেবার জন্য বাবা লোকনাথের কাছে গেলেন অভয়াচরণ। বাবা তখন বললেন, হ্যাঁরে অভয়াচরণ, যার জন্য তুই সতের বছর পাহাড়পর্বতে ঘুরে বেড়িয়েছিস, তা কি তুই পেয়েছিস ?

অভয়াচরণ উত্তর করলেন, না তা পাইনি।

বাবা তখন অভয়াচরণের ডান্ হাতের কবজীটা নিজের হাতে ধরে বললেন, যার জন্য ঘুরেছিস তা তোর হাতে বেঁধে দিলাম। আর তোকে ঘুরতে হবে না। শুধু ঘুরে বেড়ালে কি হবে রে ? জানবি, কর্মই ব্রহ্ম।

এর পর রজনী চক্রবর্তীকে ডেকে বললেন, রজনী, তুই অভয়াচরণকে তোর সঙ্গে নিয়ে যা। বুঝিয়ে দে, কি কর্ম তুই করছিস এখন। আর ওকে বেশ করে খাইয়ে দিস। শোন অভয়াচরণ, রজনীও যা আমিও তা। রজনী আমার সীলমোহরের নকল।

রজনী চক্রবর্তী তখন রজনী ব্রহ্মচারী নামে খ্যাত।

রজনী ব্রহ্মচারী তখন বাবার আদেশ মত অভয়াচরণকে তাঁর সঙ্গে ঢাকা নিয়ে গেলেন। সেখানে তিনদিন থাকার পর আবার অজানার পথে বেরিয়ে পড়লেন অভয়াচরণ। এর পর আর একবার মাত্র লোকনাথবাবার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন তিনি।

বাবা লোকনাথ অভয়াচরণকে কৃতার্থ করলেন বটে। কিন্তু তাঁর কর্ম-

গুরু করলেন রজনী চক্রবর্তীকে। সেই কর্মগুরুর সঙ্গেই তাকে যেতে বললেন। অভয়াচরণও রজনী ব্রহ্মচারীর সঙ্গে তাঁর ঢাকার আশ্রমে গেলেন। বাবা অভয়াচরণকে বলে দেন, রজনীও যা আমিও তা। রজনী আমার সই-মোহরের নকল।

বাবার এই কথা থেকে বোঝা যায়, তাঁর নিজের কর্মযোগ রজনী ব্রহ্মচারীর মধ্যে সম্পূর্ণরূপে ফুটে উঠেছে। রজনীর মধ্যেই তাঁর সত্তা সম্পূর্ণ রূপে উপলব্ধ হয়। তাই তাঁর সত্তার মধ্যে ডুবে রজনী যে কর্ম-উপদেশ দেবেন তা বাবা লোকনাথের উপদেশ বলেই গণ্য হবে।

শাস্ত্রে আছে, ভক্ত ও ভগবান এক ও অভিন্ন। যিনি প্রকৃত ভক্ত তিনি ভক্তিসমাহিত চিত্তে ভগবানে প্রাণমন সমর্পণ করলে ভক্তের মধ্যেই ভগবানের সত্তা উপলব্ধ হয়।

ওঁ

কুলদানন্দ ব্রহ্মচারী ছিলেন প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর শিষ্য। গুরুর কৃপায় তিনি বেশ উচ্চস্থান লাভ করেছেন সাধন জগতে, তবু বারদীর ব্রহ্মচারী লোকনাথ বাবাকে দর্শন করার ইচ্ছা তাঁর প্রবল। তাই মাঝে মাঝে প্রাণের আকুতি নিয়ে বাবাকে দর্শন করতে আসেন বারদীর আশ্রমে। কিছুদিন ধরে পেটের শূলবেদনায় ভুগছেন। এই বেদনায় অতিশয় কাতর হয়ে পড়ার জন্য ব্রহ্মচারীবাবাকে দর্শন করার ইচ্ছা হলেও যাই যাই করে বারদীর আশ্রমে যাওয়া সম্ভব হয়ে ওঠেনি।

অবশেষে এই অবস্থাতেই পেটে শূলবেদনার যন্ত্রণা নিয়েই একদিন বারদীর আশ্রমে এসে উপস্থিত হলেন। তারপর ভক্তিভরে বাবার চরণ বন্দনা করলেন। অন্তর্যামী সর্বজ্ঞ বাবা আগে হতেই কুলদানন্দের এই রোগের কথা যোগবলে জানতে পেরেছিলেন।

প্রাথমিক কুশল জিজ্ঞাসার পর বাবা নিজে থেকে কুলদানন্দকে জিজ্ঞাসা করলেন, কিরে, তুই পেটের শূলবেদনায় খুব কষ্ট পাচ্ছিস, তাই না ?

বাবার কথা শুনে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলেন কুলদানন্দ। তিনি ত তাঁকে এ রোগের কথা বলেননি। সত্যিই তিনি অন্তর্যামী, তা না হলে একথা জানলেন কি করে ?

বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে কুলদানন্দ বললেন, হ্যাঁ বাবা, আমি শূলবেদনায় খুবই কষ্ট পাচ্ছি।

বাবা বললেন, বেশ, তুই যদি এ রোগের হাত থেকে মুক্তি পেতে চাস ত আমাকে বল।

কুলদানন্দ ব্রহ্মচারী কি বলবেন কিছু ঠিক করতে পারলেন না। তিনি চিন্তা করে দেখলেন, এই রোগযন্ত্রণা তাঁর সাধনপথে বিশেষভাবে বিঘ্ন ঘটাচ্ছে। তিনি চেষ্টা করেও ঠিকমত মনঃসংযোগ করতে পারছেন না তাঁর সাধনায়। অতএব মহাশক্তিধর মহাযোগী বাবার কাছে রোগ সারাবার প্রার্থনা করাই ভাল।

এই ভেবে তিনি কাতরভাবে বাবাকে বললেন, আপনার যদি কৃপা হয়, তাহলে এই রোগযন্ত্রণার হাত থেকে আমাকে মুক্ত করে দিন।

বাবা লোকনাথ মহাশক্তিধর মহাপুরুষ। তিনি তাঁর অলৌকিক যোগ-শক্তিবলে যে কোন রোগার্ত ব্যক্তিকেই রোগমুক্ত করতে পারেন এবং অনেককেই তা করেছেন। ইচ্ছা করলেই তা পারেন। অন্তরে তাঁর আর্ত মানুষের প্রতি কৃপারও অভাব নেই। কিন্তু সাধারণ গৃহী মানুষের ক্ষেত্রে যা খাটে, কুলদানন্দের ক্ষেত্রে তা খাটে না। কারণ বাবা দেখলেন, কুলদানন্দ ব্রহ্মচারী, তিনি সাধনার উচ্চমার্গে উপনীত হয়েছেন।

তাই তিনি একটু চিন্তা করে বললেন, আমি তোর রোগ সারিয়ে দিতে পারি।

এই বলে তিনি আশ্রমের উঠোনে অবস্থিত বেলগাছটি দেখিয়ে বললেন, ঐ বেলগাছের একটু মাটি খেয়ে পেটে লাগিয়ে দিলেই তোর রোগ সেরে যাবে। কিন্তু ভোগ শেষ হবে না। ভোগ শেষ করার জন্য আবার তোকে মৃত্যুর পর দেহ ধারণ করে এই পৃথিবীতে আসতে হবে। এখন তোকে ভেবে বলতে হবে, কি করবি। তোকে ঠিক করতে হবে, এই দেহেই ব্যথা সহ্য করে সাধনার দ্বারা মুক্ত হবি, না এ জীবনে রোগমুক্ত হয়ে শেষ ভোগের জন্য আবার দেহ ধারণ করে আসবি।

বাবার কথা শুনে মহা পরীক্ষায় পড়লেন কুলদানন্দজী। তিনি গম্ভীর হয়ে ভাবতে লাগলেন। ভাবলেন, এখন তিনি সাধনার উচ্চস্তরে পৌঁছেছেন। এখন মনে তাঁর বৈরাগ্য। বর্তমানে জীবন্মুক্তির বাসনাই

তাঁর প্রবল। এমত অবস্থায় ভোগ শেষ বা সম্পূর্ণ করার জন্য আবার দেহ ধারণ করা সম্ভব নয় তাঁর পক্ষে।

অনেক ভাবার পর জীবন্মুক্তি আর রোগমুক্তি—এই দুটি পথের মধ্যে জীবন্মুক্তির পথকেই বেছে নিলেন কুলদানন্দজী। তিনি বুঝলেন, এখন জীবন্মুক্তির চেণ্টাই ত তাঁর কাছে পরম পুরুষার্থ।

সাময়িক ব্যাধির কণ্ট থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য সেই পরম পুরুষার্থ লাভের পথ হতে বিচ্যুত হওয়া সম্ভব নয় তাঁর পক্ষে। সে পথ ত্যাগ করা কোনক্রমেই উচিত হবে না তাঁর।

কুলদানন্দ কিন্তু মুখ ফুটে বলতে পারছেন না সে কথা। মনে মনে পথটা ঠিক করে ফেললেও তখনো মুখে তা বলতে পারলেন না। অন্তর্দ্বন্দ্বের দোলায় তখনো দুলছিল তাঁর মনটা।

তখন কুলদানন্দকে মৌন দেখে বাবা আবার জিজ্ঞাসা করলেন, কিরে, কি হলো? চুপ করে রইলি কেন? বল, তোর কি ইচ্ছা।

এবার কুলদানন্দ মনে দৃঢ় সংকল্প নিয়ে বললেন, রোগ মুক্তির চেয়ে জীবন্মুক্তিই আমার বেশী কাম্য। এখন রোগমুক্ত হয়ে ভোগশেষের জন্য আবার জীবনে বদ্ধ হতে চাই না আমি। সাধন জীবনে যাতে আমি চরম উন্নতি লাভ করতে পারি, রোগযন্ত্রণা যাতে আমার সেই সাধনপথে বিশেষ কোন বিঘ্ন ঘটাতে না পারে, আপনি আমাকে সেই করুণা করুন। আমি রোগমুক্তি চাই না।

কুলদানন্দের কথা শুনে খুবই সন্তুষ্ট হলেন বাবা। তিনি তাঁর মাথায় হাত দিয়ে স্নেহভরে আশীর্বাদ করলেন। এর পর কয়েকদিন বারদীর আশ্রমে থেকে বাবার কাছে বিদায় নিয়ে নিজের জায়গায় ফিরে গেলেন কুলদানন্দ ব্রহ্মচারী।

একদিন বাবাকে দর্শন করার জন্য বহু দূর থেকে এক ভক্ত এসে উপস্থিত হলো বারদীর আশ্রমে। তিনি নৌকাযোগে ব্রহ্মপুত্র নদীপথে এসেছেন। দরকারী কাজ থাকায় সেদিনই তাঁকে ফিরে যেতে হবে। ভক্তটি আশ্রমে এসে বাবার চরণ বন্দনা করলেন। দুপুরে আহারাদির পর বাড়ি ফিরে যাবার জন্য বাবার কাছে অনুমতি চাইলেন। কিন্তু বাবা তাকে বললেন, আজকে থেকে যা, কাল যাবি।

বাবা আর কোন কথা বললেন না। কিন্তু কেন তিনি তাঁকে নিষেধ করলেন তখন তিনি তা বুঝতে পারলেন না। বুঝতে না পারলেও কারণ জিজ্ঞাসা করতে সাহস হলো না তাঁর। তাই গুরুর আদেশ শিরোধার্য করে সেদিনকার মত রয়ে গেলেন ভক্তটি। তবে তাঁর মনটা চঞ্চল হয়ে রইল।

এমন সময় আশ্রমের গয়লানী মা ভক্তটির কাছে এসে বললেন, চিন্তা করো না বাবা। তুমি থেকে যাও। তোমার কাজের কোন ক্ষতি হবে না বাবার কৃপায়। বাবা যখন নিষেধ করেছেন, তখন নিশ্চয়ই কোন রহস্য আছে এর মধ্যে।

কিন্তু সে রহস্য বুঝতে বেশী দেরি হলো না ভক্তটির। দু তিন ঘণ্টা পর মেঘমুক্ত নীল আকাশে হঠাৎ দেখা গেল একখণ্ড কালো মেঘ। ক্রমে ক্রমে সমস্ত আকাশ ছেয়ে গেল সেই কালো মেঘে। তারপরই শুরু হল প্রবল ঝড় আর সেই সঙ্গে মুষলধারে বৃষ্টি। গাছপালা সব ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হলো ঝড়ের প্রচণ্ড আঘাতে। ঘন ঘন বজ্র গর্জনে কেঁপে উঠতে লাগল চারিদিক প্রবলভাবে।

ভক্তটি তখন স্তব্ধ বিস্ময়ে ভাবতে লাগলেন তাঁর সর্বজ্ঞ মহাযোগী গুরুদেবের কথা। এবার তিনি পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারলেন কিজন্য সর্বজ্ঞ গুরুদেব তাঁকে যেতে নিষেধ করেছিলেন। শুধু মানবজগতের মনের কথা নয়, প্রকৃতিজগতের সব ঘটনার কথাও আগে হতেই এক মহাশক্তিবলে জানতে পারেন তিনি। ভক্তদের প্রতি কি অসীম তার করুণা! এই পরম করুণাময় গুরুদেব যদি তাকে নিষেধ না করতেন, তাহলে এই প্রচণ্ড ঝড়ের তাণ্ডবে ক্ষিপ্ত উত্তাল ব্রহ্মপুত্রের বুকে তাঁর প্রাণ যেত। জীবনে আর বাড়ি ফিরে যাওয়া হত না।

এই কথা ভাবতে ভাবতে পরম শ্রদ্ধাভরে বারবার প্রণাম জানালেন গুরুদেবের উদ্দেশ্যে।

গয়লানী মা এবার বললেন, দেখলে ত বাবা, কেন তোমাকে যেতে বাবা নিষেধ করেছিলেন। এবার বুঝলে ত, উনি অন্তর্যামী। আগে হতে সব বুঝতে পেরেছিলেন।

এই গয়লানী মা লোকনাথ ব্রহ্মচারীকে বাবার মত ভক্তি করতেন।

লোকনাথও তেমনি তাঁকে মার মত ভক্তি করতেন। আশ্রমের কাছেই এই গয়লানী মার বাড়ি ছিল। বাড়ি বলতে একখানি মাটির কুঁড়ে ঘর; নিঃসন্তান বিধবা মানুষ। সংসারে সহায় সম্বল বলতে কিছু ছিল না। একটি গাই গরু ছিল তাঁর সম্বল। লোকনাথ বাবা এখানে আসার আগে এই গরুর দুধ বিক্রী করেই জীবিকা নির্বাহ করতেন তিনি।

লোকনাথবাবা যখন এখানে প্রথম আসেন, তখন তাঁকে দেখেই গয়লানী মার মনে হলো, এই মানুষটি যেন তাঁর কত দিনের চেনা। সঙ্গে সঙ্গে বাবার প্রতি এক বাৎসল্য রস জাগল তাঁর অন্তরে।

সন্তানের মত বাবা লোকনাথের সেবা করে যেতে লাগলেন। রোজ তাঁর গরুর দুধ এনে আশ্রমে দিয়ে যেতেন। আশ্রমের সব ভার নিজের হাতে তুলে নিলেন। তখন তাঁর বয়স আশী বছর, কিন্তু সেই অশীতিপর বৃদ্ধ বয়সেও বাবার কৃপায় এক আশ্চর্য কর্মশক্তির অধিকারিণী হলেন গয়লানী মা। তাঁর দেহটি এমনই শক্ত সামর্থ হয়ে ছিল যে, দেহ দেখে তাঁর বয়স বোঝা যেত না। আশ্রমের যাবতীয় কাজকর্ম, অতিথিদের দেখা-শোনা নিজের হাতে সারাদিন ধরে করে যেতেন।

প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী আশ্রমে এলে বাবা যখন গয়লানী মাকে বললেন, 'এটি তোমার ছেলে', তখন তিনি সঙ্গে সঙ্গে বিজয়কৃষ্ণের বিশাল বপুটি অবলীলাক্রমে নিজের কোলে তুলে নিয়ে তাঁকে স্তন্যপান করান। বিজয়কৃষ্ণও সে স্তন্য পান করেন। এই অভাবনীয় ঘটনা দেখে আশ্রমে উপস্থিত ভক্তগণ বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়েন। আশী বছরের নিঃসন্তান বৃদ্ধার স্তনে সহসা দুধ কোথা থেকে এল এবং বিজয়কৃষ্ণের বিশাল দেহের ভার বহনের এত ক্ষমতাই তাঁর হলো কিকরে, ভক্তেরা তখন বুঝতে পারেন নি। পরে তাঁরা বুঝলেন, গয়লানী মা ধর্ম বিষয়ে অনভিজ্ঞা এবং সাধন ভজন কিছু না করেও শুধু মহাপুরুষের সেবা, ভক্তি ও তাঁর প্রতি অকুণ্ঠ আত্মসমর্পণের জোরেই এই অলৌকিক অসামান্য শক্তির অধিকারিণী হয়েছেন।

আপন গর্ভধারিণী জননীর মতই গয়লানী মাকে ভক্তি শ্রদ্ধা করতেন লোকনাথবাবা। আশ্রমের সব দায়িত্ব তাই তিনি তাঁর হাতে তুলে দিয়েছিলেন। গয়লানী মাও সে দায়িত্ব পালন করে যেতেন যথাযথভাবে।

গয়লানী মা সম্বন্ধে ভক্তদের কাছে বাবা বলতেন, ইনিই পূর্বজন্মে তাঁর গর্ভধারিণী জননী ছিলেন।

সমদর্শী বাবা লোকনাথ ছিলেন সমস্ত ভেদজ্ঞানের ঊর্ধ্বে। মানুষের মধ্যেও যেমন উচ্চ নীচ ও ধনী গরীবের কোন ভেদ ছিল না তাঁর কাছে, তেমনি কোন জীব সম্পর্কেও তাঁর কোন ভেদজ্ঞান ছিল না।

কালীচরণ পোদ্দার নামে বাবার এক ধনী ভক্ত ছিল। কিন্তু ধনীর সন্তান বলে মনের মধ্যে অহমিকা তখনো দূর হয়নি। একদিন সে এক দুরারোগ্য ব্যাধি হতে মুক্ত হবার আশায় বারদীর আশ্রমে এসে উপস্থিত হয়। অর্থের কোন অভাব নেই তার। আসার সময় সঙ্গে চাকর নিয়ে এসেছে। বাবার সেবায় নিবেদন করার জন্য এক হাঁড়ি দুধ এনেছে সঙ্গে। দুধের পাত্রটি ছিল চাকরের হাতে।

আশ্রমে এসেই কালীচরণ দুধের পাত্রটি বাবার ঘরের বারান্দায় রাখার জন্য নির্দেশ দিল তার চাকরকে। চাকরটি সেই আদেশমত বারান্দায় পাত্রটি রাখতেই বাবা ঘরের ভিতর থেকে বলে উঠলেন, না না, ওখানে রেখো না।

বাবার আদেশ শুনে থমকে দাঁড়িয়ে রইল চাকরটি। সে তখন দুধের পাত্রটি বারান্দার নীচে রাখল।

এদিকে এই সব দেখে ভয় পেয়ে গেল কালীচরণ। সে তখন ভাবল, বাবা হয়ত তার আনা দুধ গ্রহণ করবেন না। কত আশা করে বাবার সেবার জন্য এই দুধ এনেছে। যেমন করে হোক তুষ্ট করে তাঁর কৃপালাভ করতেই হবে। কৃপালাভ না হলে রোগ মুক্তি হবে না তার। যে রোগ কোন ডাক্তার কবরেজ বা কোন ওষুধপত্র সারাতে পারে না, বাবার দয়া হলে তাঁর ইচ্ছামাত্র তা সেরে যায়।

এই সব ভেবে বাবাকে দুধ গ্রহণ করার জন্য অনুনয় বিনয় করতে লাগল কালীচরণ। এমনিতে তার ধনের অহঙ্কার কিছুটা থাকলেও লোকনাথ-বাবাকে সত্যিই ভক্তিশ্রদ্ধা করত সে। তাঁর অলৌকিক শক্তির কথা সে সব জানত। আশ্রমে এসে বাবার সামনে যতক্ষণ থাকত কোন অহঙ্কার বা অহমিকা থাকত না তার মনে।

কিন্তু কালীচরণের অনুনয় বিনয় সব শুনেও বাবা সেই একই কথা

বললেন। তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন, না না, ও দুধ আশ্রমে রাখা চলবে না।

বাবার এই অনমনীয় ভাব দেখে আরও ভয় পেয়ে গেল কালীচরণ। সর্বজ্ঞ বাবা কেন তার দুধ গ্রহণ করতে চাইছেন না, সে কি দোষ করেছে, তার কিছুই বুঝতে না পেরে বিহ্বল হয়ে দাঁড়িয়ে রইল কালীচরণ।

এমন সময় আশ্রমেরই একটা কুকুর এসে সেই দুধ খেতে শুরু করে দিল। আশ্রমের ভক্তেরা তা দেখেও কেউ কিছু বলল না। কিন্তু কালীচরণ বাবার জীবপ্রেমের কথা, বিশেষ করে আশ্রমের প্রতিটি জীব ও কীটপতঙ্গের প্রতি অফুরন্ত মমতার কথা জানত না। সে তাই কুকুরটা দুধে মুখ দিতেই সে ছুটে এসে কুকুরটাকে তাড়িয়ে দিল। এত কষ্ট করে আনা এতখানি দুধ নষ্ট হয়ে যাওয়ায় আফশোষ করতে লাগল সে।

তা দেখে বাবা বুঝলেন, তাঁর ভক্ত ও শিষ্য হলেও কালীচরণ সর্বজীবে সমদর্শিতার শিক্ষাটি আয়ত্ত করতে পারেনি। তাছাড়া সে এখনো মায়া ও অহংবোধের বশীভূত। তার আচরণ বিসদৃশ্য ঠেকল বাবার কাছে।

তাই তিনি কালীচরণকে বললেন, কালীচরণ, আমি তোর মনের ভাব জানি বলেই তোর দুধ রাখা চলবে না বলেছিলাম। ভেবে দেখ, দুধটা তুই আমার জন্য এনেছিস। আমাকে দিয়েছিস। কিন্তু এখনও তার উপর মায়া ছাড়তে পারিসনি। আমাকে যখন দিয়েছিস, তখন তোর তাতে অধিকার কি? আমি তা খাই বা না খাই তাতে তোর কি? যখন দান করবি নিঃস্বার্থভাবে দান করবি। তা না হলে সে দানের কোন সার্থকতা থাকতে পারে না। তুই আশ্রমের কুকুরটাকে কেন তাড়ালি?

বাবার কথা শুনে নিজের ভুল বুঝতে পেরে লজ্জিত হয়ে বাবাকে ভক্তি ভরে প্রণাম করে ক্ষমা চাইল তার কাছে সে ভুলের জন্য।

কালীচরকে বাবা যে উপদেশ দিলেন তাতে দুটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে। প্রথমতঃ তিনি কালীচরণকে নিঃস্বার্থ দানের বিষয়ে শিক্ষা দিয়েছেন। নিঃস্বার্থ দান মানেই সাত্ত্বিক দান। গীতায় বলা হয়েছে সত্ত্ব, রজ, তমঃ এই তিনটি গুণ আমাদের সকল কর্ম ও চিন্তার সঙ্গে অল্প বিস্তর জড়িয়ে থাকে। এই গুণভেদে আমাদের সকল কর্মের মত আমাদের দানও সাত্ত্বিক, রাজসিক বা তামসিক হয়ে থাকে। সাত্ত্বিক দানই শ্রেষ্ঠ, কারণ তাতে দাতার মনে

কোন স্বার্থবোধ বা প্রতিদানের আশা থাকে না। রাজসিক দানের দাতার মনে 'আমি দান করছি—এই অহমিকা ও আত্মপ্রচারের ভাব থাকে। আবার তামসিক দানে স্বার্থচিন্তা এবং প্রতিদানের আশা প্রবল থাকে। কালীচরণের দানে রজোভাব ও তমোভাব মিশ্রিত ছিল। তার দান নিঃস্বার্থ বা সাত্ত্বিক ছিল না কোনক্রমেই। তার দেওয়া দুধ বাবা লোকনাথ সেবা করলে তিনি তুষ্ট হয়ে তাকে রোগমুক্ত করবেন—এই আশা ও স্বার্থচিন্তা বলবতী ছিল তার মনে।

অন্তর্যামী বাবা কালীচরণের মনের এই কথা ও ভাব আগে থেকে জানতে পেরেই তার দেওয়া দুধ তাঁর ঘরের বারান্দায় রাখতে দিতে চান নি।

দ্বিতীয়তঃ কোন জীব সম্বন্ধে কোন ভেদজ্ঞান লুপ্ত করে সর্ব জীবে সমদর্শিতা বোধ জাগিয়ে জগতের সকল জীবের মধ্যে এক অভিন্ন আত্মাকে দেখতে শেখার জন্যই বাবা তাঁর আশ্রমের সব জীবকে সমানজ্ঞান করতেন। উৎকৃষ্ট নিকৃষ্ট নির্বিশেষে সকল জীবকে তিনি সমানভাবে ভালবাসতেন। তাই তিনি কালীচরণকে বলেছেন, তুই যখন আমাকে দিয়েছিস, তখন সেই দুধ আমি খাই বা না খাই তাতে তোর কি? অর্থাৎ তাঁর উদ্দেশ্যে নিবেদিত দুধ আশ্রমের কোন একটি কুকুর খেলেও তাঁর আত্মাই তাতে তৃপ্ত হয়েছে। এই শিক্ষাই তিনি দিতে চেয়েছেন কালীচরণকে।

প্রাকৃতিক দুর্যোগের হাত থেকে অনুগত ভক্তকে সর্বজ্ঞ বাবা লোকনাথ আগে হতেই তাকে সাবধান করে দিতেন। আবার কোন সময় প্রাকৃতিক দুর্যোগের কবলে পড়ে কোন ভক্ত তাঁকে স্মরণ করলে সেখানে সূক্ষ্মদেহে ছুটে গিয়ে সেই শরণাগত ভক্তকে আসন্ন মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করতেন বাবা। বিহারীলাল মুখোপাধ্যায় নামে বাবার এক ভক্তের জীবনে এই ধরনের একটি ঘটনা ঘটে।

বিহারীলাল মুখোপাধ্যায় ছিলেন আইনজীবী, ঢাকা জজ কোর্টের উকীল হিসাবে সারা শহরে তাঁর খুব খ্যাতি ও প্রতিপত্তি ছিল।

বিহারীলাল ছিলেন বাবার পরম অনুগত ভক্ত। মাঝে মাঝে তিনি ছুটি পেলেই ঢাকা থেকে বারদীর আশ্রমে ছুটে আসতেন বাবাকে দর্শন

করার জন্য।

একবার তিনি ঢাকা থেকে স্টীমারযোগে রওনা হয়ে মেঘনা নদীর উপর দিয়ে চট্টগ্রাম যাচ্ছিলেন। ফেরার পথে বারদী গিয়ে বাবাকে দর্শন করার ইচ্ছা ছিল।

মেঘনা নদীর উপর দিয়ে কিছুদূর যাবার পর হঠাৎ আকাশে কালো মেঘ দেখা যায়। দেখতে দেখতে গোটা আকাশটা ঢেকে যায় সেই কালো মেঘে। কিছুক্ষণের মধ্যেই বজ্রবিদ্যুৎসহ প্রবল ঝড় বৃষ্টি শুরু হয়। সেই ঝড়ের আঘাতে উত্তাল উদ্দাম হয়ে ওঠে মেঘনা নদী। একটার পর একটা করে প্রকাণ্ড ঢেউ এসে আছাড় খেয়ে পড়তে থাকে স্টীমারের গায়ে। প্রলয় তাণ্ডবে মেতে উঠেছে যেন সমগ্র প্রকৃতি।

যাত্রীগণকে বিপদ সংকেত জানাবার জন্য বারবার বেজে উঠতে থাকে স্টীমারের বাঁশী। যাত্রীদের বুক কেঁপে ওঠে সে বাঁশীর শব্দে। আবার বিপন্ন স্টীমারের বাঁশীর শব্দটাও করুণ আর্তনাদের মত শোনায়।

মৃত্যু অবধারিত জেনে বিহ্বল ও বিমূঢ় হয়ে পড়েন বিহারীলাল ও স্টীমারের অন্যান্য যাত্রীরা। স্টীমারের নাবিকরাও বুঝতে পারে, কিছুক্ষণের মধ্যেই ঢেউ-এর আঘাতে উল্টে গিয়ে স্টীমারটাও তলিয়ে যাবে গভীর জলের তলায়। আজ মেঘনা নদীর বুকেই তাদের সলিল সমাধি হবে। তাই আসন্ন মৃত্যুর কালো ছায়া পড়ে সব নাবিক ও যাত্রীদের চোখে মুখে।

ক্রমে স্টীমারের মধ্যে জল ঢুকতে শুরু করে। ফলে কাত হয়ে পড়ে স্টীমারটা। এবার অবশ্যই উল্টিয়ে যাবে। প্রাণরক্ষার কোন উপায় না দেখে বিহারীলাল ব্যাকুল হয়ে একমনে স্মরণ করতে থাকেন লোকনাথ-বাবাকে। 'হে বাবা রক্ষা করো, হে বাবা রক্ষা করো' বলে বাবাকে ডাকতে থাকেন কাতর কণ্ঠে। শরণাগত ভক্তের সেই কাতর ডাকে বাবার আসন টলে যায়। সে ডাকে তিনি সাড়া না দিয়ে পারেন না।

সেই সময় বাবা লোকনাথ ভক্তদের সঙ্গে বসেছিলেন আশ্রমে তাঁর ঘরের বারান্দায়। ঢাকা কলেজের সুপারিন্টেন্ডেন্ট অনাথবন্ধু মৌলিক তখন বাবার কাছে বসেছিলেন। ধর্ম আলোচনা হচ্ছিল তাঁদের মধ্যে। উপস্থিত ভক্তেরা তাই একমনে শুনছিলেন।

হঠাৎ বাবা কেমন যেন চঞ্চল হয়ে উঠলেন। ভক্তেরা এর কোন কারণ জানতে পারলেন না।

বাবা এবার নিজে থেকেই বলে উঠলেন, বিহারী খুবই বিপন্ন। সে আমাকে বারবার ডাকছে। আমি তার কাছে যাচ্ছি।

এই বলেই সমাধিস্থ হয়ে পড়লেন তিনি। সঙ্গে সঙ্গে স্তব্ধ ও পাথরের মত নিশ্চল নিস্পন্দ হয়ে উঠল তাঁর সারা দেহটা। তা দেখে বিস্ময়ে হত-বাক হয়ে বসে রইলেন ভক্তেরা।

কিছুক্ষণ পর সমাধি ভঙ্গ হলো। দেহটি আবার প্রাণচঞ্চল হয়ে উঠল। বাবা তখন বলে উঠলেন, মেঘনা নদীর বুকে বিহারী খুবই বিপদে পড়েছিল। তাকে আসন্ন মৃত্যুর কবল থেকে রক্ষা করে এলাম। তার সঙ্গে স্টীমারের অন্যান্য যাত্রীরাও বেঁচে গেল।

এদিকে তখন জল ঢুকে সত্যিই স্টীমারটি ডুবে যায়, কিন্তু পরক্ষণেই অলৌকিকভাবে ভেসে ওঠে স্টীমারটি। তারপর স্থির হয়ে থাকে। কিছুক্ষণের মধ্যেই সেই ঝড়ের তাণ্ডবও স্তব্ধ হয়ে যায়। স্টীমারটি যখন ভেসে ওঠে, তখন বিস্মিত ও হতচকিত যাত্রীরা দেখতে পায়, দুটি অলৌকিক হাত যেন শক্ত করে ধরে রেখেছে স্টীমারটাকে। বিহারীলাল এবার বুঝতে পারলেন, এটা হলো অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন মহাযোগী বাবা লোকনাথের লীলা। তিনি বারবার প্রণাম জানালেন বাবার উদ্দেশে।

ভাওয়ালের রাজা ছিলেন তখন রায়বাহাদুর রাজেন্দ্র নারায়ণ। তিনি ছিলেন ধার্মিক ও গুণগ্রাহী। তিনি বারদীর ব্রহ্মচারী লোকনাথ বাবার অলৌকিক যোগবিভূতি ও কৃপার কথা শুনে আকৃষ্ট হন তাঁর প্রতি।

একদিন রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ সদলবলে একজন ফটোগ্রাফারকে নিয়ে বারদীর আশ্রমে এসে বাবার একখানি ছবি তুলে নিয়ে গিয়ে নিজের ঘরে টাঙ্গিয়ে রাখেন। সেই থেকে তিনি বাবার একজন পরম ভক্ত হয়ে ওঠেন। বাবার দিব্যজ্যোতির্মণ্ডিত দেহ দেখে এবং তাঁর মুখ থেকে ধর্মালোচনা শুনে অভিভূত হয়ে পড়েন রাজেন্দ্রনারায়ণ।

তারপর থেকে তিনি বাবাকে শিবজ্ঞানে পুজো করতেন। রাজকার্য পরিচালনায় ও সাংসারিক যে কোন সমস্যায় পড়লে বাবার কাছে ছুটে আসতেন। বাবার আদেশমত কাজ করতেন।

একবার রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ বাবাকে ভাওয়ালে নিয়ে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তিনি বাবার কাছে বলেন, ভাওয়ালে তিনি বাবার জন্য মন্দির ও আশ্রম প্রতিষ্ঠা করবেন।

ভক্তের এই একান্ত আগ্রহ দেখে তাঁকে সান্ত্বনা দেবার জন্য বাবা বলেন, আমাকে ভাওয়ালে নিয়ে যাবার জন্য এত ব্যস্ত হচ্ছিস কেন ? আমি ত সব সময় তোর কাছেই আছি। আমাকে যেখান থেকে ডাকবি, সেখানেই আমাকে পাবি।

এইভাবে রাজাকে অনেক করে বুঝিয়ে শান্ত করেন বাবা। অবশেষে বাবার আদেশে তাঁর অভিপ্রায় ত্যাগ করেন রাজা।

বাবাকে যেমন রাজেন্দ্রনারায়ণ ভক্তি করতেন, বাবাও তেমনি তাঁকে ভালবাসতেন। এইভাবে এক মধুর সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল তাঁদের মধ্যে। বাবাকে বেশীদিন না দেখে থাকতে পারতেন না রাজা বাহাদুর। কাজকর্মের মাঝে সময় করে প্রায়ই ছুটে আসতেন বাবার কাছে। আর তিনি আশ্রমে এলেই বাবা তাঁকে নানা উপদেশ দিতেন। বাবার সেই উপদেশমত রাজা কাজ করছেন কিনা সে বিষয়েও লক্ষ্য রাখতেন।

একদিন রাজেন্দ্রনারায়ণ পাত্রমিত্র ও লোকজন নিয়ে হাতীর পিঠে চড়ে বাবাকে দর্শন করার জন্য বারদীর আশ্রমে এলেন। যথারীতি গুরুদর্শন ও চরণবন্দনার পর প্রসাদ পেলেন রাজা। তারপর বাবার কাছে বিদায় নেবার জন্য অনুমতি চাইতে গেলেন। তিনি বাবাকে বললেন, বাবা, আজ আমাকে এবার যাবার অনুমতি দিন। আমার বিশেষ কাজকর্ম আছে। আর থাকা চলবে না।

বাবা তখন হঠাৎ বলে উঠলেন, না-না, এখন যাসনি। যদি একান্তই যেতে হয় কিছু পরে যাবি।

কিন্তু রাজেন্দ্রনারায়ণ ভাওয়ালে তখনি ফিরে যাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। তিনি বাবাকে প্রণাম করে তখনি হাতীর পিঠে চড়ে রওনা হয়ে পড়লেন।

আশ্রম থেকে বেরিয়ে রাজা পথে কিছুদূরে যেতেই সহসা নীল আকাশে কালো মেঘ উঠল। দেখতে দেখতে সারা আকাশ ছেয়ে গিয়ে প্রবল ঝড়-বৃষ্টি শুরু হলো। রাজা বুঝতে পারলেন, এতগুলি লোক নিয়ে এই

অবস্থায় ভাওয়াল যাওয়া সম্ভব হবে না। এই ভেবে তিনি আশ্রমে ফিরে এলেন।

রাজাকে ফিরে আসতে দেখে সর্বজ্ঞ বাবা মনে মনে হাসলেন। কিন্তু তিনি যেন কিছুই জানেন না, মুখে এমন ভাব দেখিয়ে বললেন, কিরে ফিরে এলি কেন?

রাজা বিনীতভাবে বললেন, ঝড়বৃষ্টির জন্য ফিরে এলাম। না থামলে যাবার উপায় নেই।

বাবা তাঁর স্বভাবসিদ্ধ হাসি হেসে বললেন, বেশ বেশ ভালই করেছিস।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ঝড়বৃষ্টি থেমে গেল। রাজা হাতী সাজাতে আদেশ দিলেন লোকজনদের রওনা হবার জন্য। রাজার আদেশে হাতী সাজানো হলে লোকজন নিয়ে রওনা হয়ে পড়লেন রাজা।

কিন্তু এবারেও কিছুদূর যাবার পরই আবার তেমনি করে ঝড়বৃষ্টি শুরু হলো। রাজা আবার ফিরে এলেন। বাবা চুপচাপ বসেছিলেন। যেন কিছুই জানেন না।

রাজার এবার চৈতন্য হলো। তিনি ভাবতে লাগলেন, বারবার এমন হচ্ছে কেন? ঝড়বৃষ্টি থামলে যাত্রা করলে আবার হয়ত ঝড়বৃষ্টি শুরু হবে পথে। তিনি এবার বুঝতে পারছেন, তিনি বিদায় নেবার সময় বাবার আদেশমত কাজ করেননি বলেই এমন হচ্ছে। বাবা তাঁকে বিদায় নেবার সময় বলেছিলেন, এখন যাসনি, পরে যাবি। সেই কথা অমান্য করার জন্যই বারবার ফিরে আসতে হচ্ছে তাঁকে আশ্রমে। বাবা সর্বজ্ঞ বলেই ঝড়বৃষ্টি জনিত বিপদের কথা আগেই বুঝতে পেরেছিলেন তিনি। তাই ভক্তকে সাবধান করে দিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর নির্দেশের গূঢ় অর্থ বুঝতে পারেন নি রাজা। বাবা সব কথা সব সময় ভেঙ্গে বলেন না। কিন্তু তাঁর কথা মান্য করা ভক্তদের উচিত। তা না করে ভুল করেছেন তিনি।

রাজা আরও বুঝতে পারলেন, বাবা লোকনাথ সাক্ষাৎ শিব। সব দেবতাই বিরাজ করেন তাঁর দেহে। তিনিই পুরুষ, আবার তিনিই প্রকৃতি।

রাজা এবার নিজের ভুল বুঝতে পেরে বাবার চরণ ধরে বললেন, বাবা আমাকে ক্ষমা করুন। আপনার আদেশ অমান্য করার জন্যই বারবার আমাকে ফিরে আসতে হয়েছে। আমি বুঝতে পেরেছি, আপনার আদেশ

না পেলে আমার এমন সাধ্য নেই যে আমি এই আশ্রম ছেড়ে চলে যাই। খুবই অপরাধ করেছি বাবা, আর কখনো আপনার কথার অবাধ্য হব না। আপনি কৃপা করে আমাকে যাবার অনুমতি দিন।

ভক্ত তার ভুল বুঝতে পেরেছে, একথা সে নিজে স্বীকার করলে বাবা সন্তুষ্ট হলেন। তাঁর তখন দয়া হলো। তিনি এবার প্রসন্ন মুখে বললেন, আমি ত তোকে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে যেতে বলেছিলাম। তুই ত আমার কথা শুনলি না। সেই জন্যই এত কষ্ট ভোগ করতে হলো। আমি আর কি করব বল।

রাজা তখন কাতরভাবে বললেন, আমার কৃত অপরাধের জন্য আমাকে ক্ষমা করুন। বিশেষ কাজ থাকার জন্যই যেতে চাইছি। আপনিই ত বলেছিলেন, কর্তব্যকর্ম ঠিকমত পালন করতে। তাহলে এবার যাবার অনুমতি দিন।

রাজার এই ব্যাকুলতা দেখে বাবা বললেন, আচ্ছা যা, আর কোন চিন্তা নেই। পথে আর কোন বিঘ্ন ঘটবে না। নিশ্চিন্ত মনে যেতে পারবি।

রাজা বাবার চরণে প্রণাম করে বিদায় নিয়ে সদলবলে যাত্রা করলেন। আশ্রমের বাইরে এসে দেখলেন, আকাশ একেবারে পরিষ্কার। আকাশে মেঘের চিহ্নমাত্র নেই। আকাশের অবস্থা দেখে এখন মনেই হয় না যে, কিছুক্ষণ আগে প্রবল ঝড়বৃষ্টি হয়েছে। সরাই বুঝতে পারল, এটা বাবার লীলা। রাজা হাতীতে চড়ে লোকজনসহ নির্বিঘ্নে ভাওয়ালে গিয়ে পেঁছিলেন।

এর পর থেকে রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ লোকনাথ বাবার সব আদেশ ও উপদেশের গূঢ় অর্থটি বোঝাবার চেষ্টা করতেন ধৈর্য ধরে। সেদিনকার ঘটনায় তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, বাবা ভক্তদের যে আদেশ দেন, তার পিছনে একটি করে গূঢ় কারণ থাকে। অনেকে তা বুঝতে না পারলেও মেনে চলে। অনেকে আবার তা বুঝতেও পারে না। মেনেও চলে না। তাঁর মনে পড়ে, এর আগে একদিন ভাওয়ালে আশ্রম প্রতিষ্ঠা করে বাবাকে সেখানে নিয়ে যেতে চাইলে বাবা তাঁকে বলেছিলেন, কেন আমাকে নিয়ে যেতে চাইছিস? আমি ত তোর কাছেই আছি। আমাকে ডাকলেই পাবি।

এ কথার অর্থ হলো এই যে, বাবাকে সাধারণ মানুষ হিসারে দেখলে

চলবে না। তাঁর আত্মা নরদেহে আবদ্ধ হয়ে একটি বিশেষ জায়গায় থাকলেও আসলে তাঁর যে আত্মা সর্বব্যাপী, সকল ভক্তের মধ্যেই তা বিরাজ করে সর্বক্ষণ। ভক্ত আত্মজ্ঞানী হয়ে তার আত্মার মধ্যে খুঁজলেই বাবার আত্মাকে দেখতে পাবে। তাই ভক্তিভরে বাবাকে স্মরণ করে ডাকলেই তারই মধ্যে বাবার আত্মা জাগ্রত হয়ে উঠবে। তখন সে তার ডাকে সাড়া পাবে। তার অভীষ্ট সিদ্ধ হবে। এই জন্যই বহু দূর থেকে বহু ভক্ত বিপদাপন্ন হয়ে বাবাকে একাগ্রচিত্তে স্মরণ করে ডাকতেই বাবা সঙ্গে সঙ্গে সূক্ষ্মদেহে তার কাছে ছুটে গিয়ে তাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করেছেন।

ওঁ

কুমিল্লার নিবারণ রায় নামে একটি লোক খুনের মামলার আসামী হয়ে অভিযুক্ত হয় আদালতে। বেশ কিছুদিন ধরে মামলা চলতে থাকে জেলা-কোর্টে। নিবারণের পক্ষে ভাল উকীল নিযুক্ত করা হয়। কিন্তু উকীলের শত চেষ্টা সত্ত্বেও কোন ফল হয় না। জেলাকোর্টে ফাঁসির হুকুম হয় নিবারণের।

এর পর কলকাতা হাইকোর্টে আসামীর পক্ষ থেকে আপীল করা হয়। এবারেও বড় বড় আইনজীবী নিযুক্ত করা হয় আসামীর পক্ষে। তাঁরাও নিবারণকে ফাঁসির হাত থেকে বাঁচাবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করতে লাগলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না। সকলেই আশা ছেড়ে দিলেন।

আর সময় নেই। পরের দিন হাইকোর্টের রায় বার হবে। নিবারণ তখন বদ্ধ কারাগারে অবধারিত মৃত্যুর কথা ভাবতে ভাবতে শুধু প্রহর গণনা করতে থাকে। আসন্ন মৃত্যুর কালো ছায়া ঘনিয়ে ওঠে তার চোখে মুখে।

রুদ্ধদ্বার কারাগারের মধ্যে অশান্তভাবে পায়চারি করতে থাকে নিবারণ। এই ঘোর সংকটে কে তাকে রক্ষা করবে, কেমন করে সে প্রাণ বাঁচাবে, এই চিন্তায় পাগলের মত হয়ে ওঠে সে। ধৈর্যের সব বাঁধ ভেঙ্গে যায়। সব আশা নির্মূল হয়ে যায় একে একে।

হঠাৎ তার অন্তরের মধ্যে কে যেন বলে ওঠে, বাবা লোকনাথের চরণে শরণ নে। এ ছাড়া আর অন্য কোন উপায় নেই। একমাত্র তিনিই তোকে ইচ্ছা করলে কৃপা করে বাঁচাতে পারেন এই আসন্ন মৃত্যুর হাত থেকে।

বারদীর ব্রহ্মচারী নামে খ্যাত এই মহাপুরুষের নাম নিবারণ শুনেছে বটে, কিন্তু তাঁকে দেখার সৌভাগ্য কখনো হয়নি তার। আজ জীবনমৃত্যুর এই সন্ধিক্ষণে তার বাঁচার একমাত্র উপায় হিসেবে সেই করুণাময় মহাপুরুষের নামটি কে যেন তার অন্তরে বলে দিল।

সঙ্গে সঙ্গে নিবারণ কাতরভাবে সমস্ত অন্তর নিয়ে একাগ্রচিত্তে পরম ভক্তিভরে বাবা লোকনাথের মহানাম স্মরণ করতে লাগল।

বাবার নাম স্মরণ করতে করতে তন্ময় হয়ে পড়ে নিবারণ। সহসা এক স্নিগ্ধ দিব্যজ্যোতিতে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে সমগ্র কারাকক্ষ। আর সেই জ্যোতির মধ্যে আবির্ভূত হন বিপদের বন্ধু, আর্তের পরিত্রাতা, শরণাগত বৎসল বাবা লোকনাথ।

নিবারণ দেখতে পেল জটাজুটধারী জ্যোতির্ময় এক সন্ন্যাসী কারাগারের লোহার দরজার ভিতর দিয়ে অবলীলাক্রমে ঘরের ভিতর প্রবেশ করে তাঁর দিকে এগিয়ে আসছেন। নিবারণ তখন এক অপূর্ব বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে সন্ন্যাসীর চরণতলে পতিত হয়ে বলল, কে আপনি প্রভু? কোথা থেকে আপনি এসেছেন? আমাকে কৃপা করবার জন্যই কি আপনার আবির্ভাব?

সেই জটাজুটধারী সন্ন্যাসী বললেন, তুই আমাকে স্মরণ করে আমার শরণাপন্ন হয়েছিস, সেজন্য আমি তোর মামলার রায় লিখে দিতে এসেছি। শুনে রাখ, এতক্ষণ তুই যার নাম করছিলি, আমিই সেই বারদীর লোকনাথ ব্রহ্মচারী।

এই বলেই মুহূর্তমধ্যে বাবা অন্তর্হিত হলেন। সঙ্গে সঙ্গে যে দিব্যজ্যোতিতে ঘরখানি উদ্ভাসিত হয়েছিল সে জ্যোতি মিলিয়ে যেতেই ঘরখানি অন্ধকার হয়ে গেল।

মনের মধ্যে আশা জাগলেও সংশয়ের দোলায় মনটা দুলতে লাগল নিবারণের। সারারাত ঘুম হলো না তার। অবশেষে বিনিদ্র রাত্রি কেটে গিয়ে রাত্রি প্রভাত হলো। দেখতে দেখতে সূর্য উঠল আকাশে। নিবারণের দুঃখেরও অবসান হলো।

...রের দিন কোর্ট থেকে খবর এল, নিবারণ রায় হাকিমের রায়ে বেকসুর ...পেয়েছে। এবার মন থেকে সব সংশয় কেটে গেল নিবারণের। সে

বুঝতে পারল মহাযোগী মহাপুরুষ লোকনাথবাবার কৃপাতেই কারামুক্ত হলো সে। তাঁর অলৌকিক যোগশক্তির দ্বারাই এই অসাধ্য সাধন করেছেন তিনি।

কারামুক্ত হয়েই বারদীর আশ্রমে বাবার কাছে ছুটে গেল নিবারণ। সেখানে বাবার তৈলচিত্রখানি দেখেই বুঝতে পারল এই মহাপুরুষই সেদিন রাতে তাকে দর্শন দিয়ে অবধারিত ফাঁসির হাত থেকে রক্ষা করেছেন তাকে।

সেদিন বারদীর আশ্রমে এক যুবক এসে উপস্থিত হলো। যুবকটি আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত। তাই ধর্মকর্ম বা সাধু সন্ন্যাসীর প্রতি তার আস্থা বা আগ্রহ কিছুই নেই। সব সাধু সন্ন্যাসীকে ভণ্ড বলে মনে করে সে।

যুবকটি তার মাকে খুবই ভালবাসে। সম্প্রতি তার মা এক দুরারোগ্য রোগে ভুগছেন। তাই তার মার একান্ত অনুরোধে তার অনিচ্ছা সত্ত্বেও বারদীতে লোকনাথ ব্রহ্মচারীর কাছে এসেছে মার রোগমুক্তির জন্য।

কিন্তু আশ্রমে এসে বাবা লোকনাথকে প্রণাম না করে একধারে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

ছেলেটিকে দেখেই সর্বজ্ঞ অন্তর্যামী বাবা বলে উঠলেন, কিরে, তুই ত ধর্মকর্ম বা সাধু সন্ন্যাসীতে বিশ্বাস করিস না, তবে কেন কষ্ট করে আমার কাছে এসেছিস ?

কথাটা শুনে আশ্চর্য হয়ে যায় ছেলেটি। সে যে সাধু সন্ন্যাসীকে বিশ্বাস করে না, এটা ত তার মনের কথা। এ নিয়ে গতকাল বাড়িতে তার মায়ের সঙ্গে তর্কবিতর্ক হয়েছে। সে কথা ত বাইরের কেউ জানে না। সে কথা ইনি জানলেন কিকরে ? তবে কি ইনি অন্তর্যামী ?

সব সাধু সন্ন্যাসী সমান নয়। সাধু সন্ন্যাসীদের মধ্যে অনেক শক্তিমান সাধক আছেন। অনেকে উচ্চস্তরের যোগশক্তির অধিকারী। সেই শক্তির বলে তাঁরা অসাধ্য সাধন করতে পারেন।

এই সব ভেবে নিজের ভুল বুঝতে পারল ছেলেটি। নিজেকে অপরাধী বলে মনে হলো তার। বাবার প্রশ্নের উত্তরে তাই কোন কথা বলতে না পেরে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল মাথা নীচু করে।

তার সেই অবস্থা দেখে করুণা জাগল বাবার মনে। তিনি তাকে স্নেহ-ভরে কাছে ডাকলেন। ছেলেটি কাছে যেতে তিনি তাকে আবার প্রশ্ন করলেন, তুই তোর মাকে খুব ভালবাসিস, না? তার আদেশেই ত তুই আমার কাছে এসেছিস।

একথা শুনে আরও বিস্মিত হয়ে যায় ছেলেটি। বুঝতে পারে সর্বজ্ঞ এই মহাশক্তিধর সাধকের কোন কিছুই অজানা নেই। অবশেষে সব লজ্জা সংকোচ কাটিয়ে উঠে ছেলেটি উত্তর করল, আজ্ঞে হ্যাঁ, আমি আমার মার আদেশেই এসেছি আপনার কাছে।

ছেলেটির কথায় বাবা সন্তুষ্ট হলেন। তিনি তখন তাকে বললেন, বাঃ, বেশ ভাল ছেলে ত তুই। ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক যে সন্তান মার আদেশ পালন করে, ভগবান তাকে দয়া করেন, তার প্রতি সন্তুষ্ট থাকেন। তার যাতে মঙ্গল হয় তাই তিনি করেন।

যুবকটি কোন কথা বলল না। বাবাও কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর বললেন, তোর মা আমাকে বিশ্বাস করে মনে মনে আমার কাছে যে প্রার্থনা করেছিল, সে প্রার্থনা বিফল হয়নি। তুই সরকারী চাকরির জন্য পরীক্ষা দিয়েছিলি ত? তুই সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিস। তোর পকেটে একটা চিঠি এসেছে। সেটা খুলে দেখ। তোর চাকরির খবর এসেছে।

যুবকটি তাড়াতাড়ি পকেট থেকে চিঠি বার করে দেখল, সত্যিই তার চাকরি পাওয়ার খবর এসেছে।

এই অত্যাশ্চর্য ঘটনায় ছেলেটির চৈতন্যোদয় হয়। এক নিবিড় ভক্তিতে তার মাথা আপনা হতে নত হয়ে যায় বাবার চরণে। বাবার চরণে প্রণত হয়ে সে বারবার ক্ষমা প্রার্থনা করে। সে তার বহুদিনের ভুল বুঝতে পারে। সাধু সন্ন্যাসীদের প্রতি যে অশ্রদ্ধা ও অবিশ্বাসের ভাব বদ্ধমূল ছিল তার অন্তরে, সে ভাব তার এই মহাপুরুষের প্রত্যক্ষ প্রভাবজনিত একটি ঘটনার আঘাতে কেটে যায়। সাধু সন্ন্যাসীদের প্রতি বিশ্বাস ও ভক্তি জাগে তার অন্তরে।

বাবা তা বুঝতে পেরে তার মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বলতে থাকেন, ওরে, তোর বুদ্ধি অল্প। সেই অল্প বুদ্ধির দ্বারা তুই যতটুকু

বুঝেছিস, তাই করেছিস। তাতে তোর দোষ কোথায়? সবই ত তোর বুদ্ধির দোষ। মানুষ তার ক্ষুদ্র বুদ্ধির দ্বারাই পরিচালিত হয়ে বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। বুদ্ধিকে সীমার মধ্যে আবদ্ধ রাখলে অসীমকে জানা যায় না।

বাবা আরও বললেন, তোর সঙ্গে আর আমার দেখা হবে না। তোর মার রোগ সেরে যাবে। চাকরিতে তুই খুবই উন্নতি করবি। শেষে জেলার কর্তা হবি। কিন্তু দেখিস, কোনদিন যেন সত্যকে ভুলে যাসনি। গর্ব রাখিস না মনে। দুঃখীর দুঃখ মোচনের চেষ্টা করবি। সবাইকে ভালবাসতে চেষ্টা করবি। কাউকে ঘৃণা করিস না। যখনই কোন বিপদে পড়বি, কর্তব্য ঠিক করতে বিভ্রান্ত হয়ে পড়বি, তখনই আমাকে স্মরণ করবি। আমি তোকে সাহায্য করব।

মহাপুরুষের সান্নিধ্যের প্রভাবে অজ্ঞানতার সব অন্ধকার দূর হয়ে যায় যুবকটির মন থেকে। বাবার উপদেশের অর্থ বুঝতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করে। পরম করুণাময় বাবার কৃপালাভ করে সব দিক দিয়ে সফলকাম হয়ে নিশ্চিন্ত মনে বাড়ি ফিরে যায় সে। সেদিন থেকে সে হয়ে ওঠে যেন সম্পূর্ণ অন্য মানুষ।

একবার এক বড় রকমের ফৌজদারী মামলা শুরু হয়। তখন বাবার কয়েকজন ভক্ত প্রকৃত সত্য প্রমাণ করবার জন্য বাবাকে সাক্ষী দেবার জন্য অনুনয় বিনয় করতে থাকে বারবার।

বাবা প্রথমে রাজী হলেন না। তিনি বললেন, আমি চালচুলোহীন মানুষ, কখন কোথায় থাকি তার ঠিক নেই। আমাকে আবার মামলা মোকদ্দমায়, জড়াচ্ছিস কেন? আমার দ্বারা ওসব হবে না।

ভক্তরা তবু ছাড়ল না। অবশেষে ভক্তগণের একান্ত অনুরোধে এবং প্রকৃত সত্য প্রমাণের জন্য বাবা রাজী হলেন সাক্ষী দিতে।

মামলাটি হচ্ছিল নারায়ণগঞ্জে জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে। সেখানে সাক্ষী হিসাবে বাবাকে উপস্থিত করা হলো। যে ঘরে মামলা হচ্ছিল, সে ঘর লোকে লোকারণ্য। লোকনাথবাবা সাক্ষী দিতে এসেছেন শুনে বহু লোক এসে ভিড় করেছে তাঁকে দেখার জন্য। দর্শকদের মধ্যে অনেকে তাঁর পরিচিত ছিল, আবার অনেকে তার নাম শুনে দেখতে এসেছে।

বাবা আদালতে উপস্থিত হয়ে সাক্ষীর কাঠগড়াতে গিয়ে দাঁড়াতেই

সব কলগুঞ্জন মুহূর্তে স্তব্ধ হয়ে গেল। উপস্থিত সকলের মধ্যেই শ্রদ্ধার ভাব জাগল। সকলেই কৌতূহলী হয়ে উঠল তাঁর কথা শোনার জন্য।

ম্যাজিস্ট্রেট লোকনাথবাবার জটাজুটমণ্ডিত দীর্ঘ দেহটির দিকে একবার তাকিয়েই প্রশ্ন করলেন, আপনার বয়স কত?

লোকনাথবাবা সহজ ভাবে উত্তর দিলেন, দেড়শো বছরের বেশী।

কথাটা শুনে আশ্চর্য হয়ে গেলেন ম্যাজিস্ট্রেট। ভাবলেন, কোন মানুষ কখনো দেড়শো বছর জীবিত থাকতে পারে না। পরে আবার ভাবলেন, যোগী সাধু পুরুষদের পক্ষে হয়ত বা সম্ভব হলেও হতে পারে।

কিন্তু বিপক্ষের আইনজীবীরা একথা বিশ্বাস করতে পারলেন না। তাঁরা বললেন, সাক্ষী দিতে এসে ন্যায়ালয়ে দাঁড়িয়ে অবান্তর কথা বলা যুক্তিসঙ্গত নয় এবং তা অপরাধ বলে গণ্য হয়।

বাবা তখন সহজ সরলভাবে বললেন, বেশ, আমার কথা তোমাদের বিশ্বাস না হয়, তোমাদের খুশিমত বয়সটা লিখে নাও।

বিপক্ষের উকীল বলল, সাক্ষী বয়সে অতি বৃদ্ধ এবং তাঁর দৃষ্টি ক্ষীণ। সুতরাং যে ঘটনার সাক্ষ্য দিতে এসেছেন, তা দেখা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়।

এইটাই প্রমাণ করার জন্য তিনি নানাভাবে জেরা করতে লাগলেন লোকনাথবাবাকে। কিন্তু বাবা অবিচলিতভাবে সব জেবার ঠিক ঠিক উত্তর দিলেন। কোন মতেই তাকে হতবুদ্ধি করা গেল না।

শেষে বিপক্ষের উকীল বাবাকে বলল, আপনি যে বয়সের কথা বললেন তাতে বোঝা যায়, এই বয়সে দূরের কোন জিনিস বা ঘটনাকে ঠিকমত প্রত্যক্ষ করা সম্ভব নয়। অতএব আপনি যে তা প্রত্যক্ষ করেছেন দূর থেকে, সেকথা কিভাবে মেনে নেওয়া যায়?

বাবা একথা শুনে উকীলবাবুকে কাছে ডাকলেন।

সাক্ষী হয়ত তাঁকে কোন গোপন কথা বলবে ভেবে উকীল সঙ্গে সঙ্গে বাবার কাছে গেলেন।

আদালতঘরের দরজা দিয়ে দূরে একটা আমগাছ দেখা যাচ্ছিল। বাবা উকীলবাবুকে সেই গাছটিকে দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, ঐ গাছটাতে কি কোন প্রাণীকে উঠতে দেখতে পাচ্ছ?

উকীলবাবু মনে মনে ভাবলেন এ প্রশ্ন অবান্তর। তাই তিনি তাচ্ছিল্যের

হাসি হেসে বললেন, না, কিছুই ত দেখতে পাচ্ছি না।

আদালতে উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে যারা বাবাকে চিনত, তারা বুঝতে পারল, এটা বাবার এক লীলা। বুঝল, বাবা তাঁর স্বভাবসুলভ সর্বজ্ঞতার দ্বারা দূরের সব জিনিসকেই প্রত্যক্ষ করতে পারেন। সুতরাং এটা মোটেই অসম্ভব নয় তাঁর পক্ষে। আর যাঁরা তাঁকে চিনত না, তারা কৌতূহলী হয়ে দূরের গাছটাকে ভাল করে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল। কিন্তু কিছুই দেখতে পেল না। তারা সবাই একবাক্যে উকীলের কথার প্রতিধ্বনি করে বলল, না, কিছুই দেখছি না।

বাবা একটু হেসে বললেন, আশ্চর্যের কথা! তোমরা বয়সে যুবক। তোমাদের দৃষ্টিশক্তি বেশ প্রখর। অথচ এত কাছের জিনিসকেও দেখতে পাচ্ছ না! এটা খুবই দুঃখের কথা।

উকীলবাবু তখন বললেন, বেশ, আপনিই বলুন, দূরে ঐ আমগাছে কোন প্রাণী উঠছে।

বাবা সহজভাবে বললেন, একটু ভাল করে দেখলেই দেখতে পাবে, একদল লাল পিঁপড়ে সারি বেঁধে গাছটার উপরে উঠছে।

বাবার কথা শুনে আদালতের সব লোক বিস্মিত হলো। কথাটা সত্য কি মিথ্যা তার প্রমাণের জন্য তারা গাছের কাছে ছুটে গেল, গিয়ে দেখল, সত্যিই একদল লাল পিঁপড়ে সারি দিয়ে গাছে উঠছে।

তারা ফিরে এসে একথা জানাতেই ম্যাজিস্ট্রেট হতবম্ব হয়ে গেলেন। তিনি এবার বুঝতে পারলেন, লোকনাথ ব্রহ্মচারী একজন সাধারণ সন্ন্যাসী নন। তিনি যোগসিদ্ধ পুরুষ। তাই যোগবলে তিনি দূরের অদৃশ্য জিনিসকেও প্রত্যক্ষ করতে পারেন।

এই কথা বুঝতে পেরে তিনি লোকনাথবাবার কথা সত্য বলে মেনে নিয়ে সেইমত রায় দিলেন।

একবার বারদীর একটি যুবক জাল করার অপরাধে মহকুমা হাকিমের কাছে অভিযুক্ত হয়। সে তার অপরাধ অস্বীকার করে। সে গ্রেপ্তার হওয়ার পর জামীনে মুক্ত হয়। মামলা চলতে থাকে, মামলার দিনে দিনে তাকে হাজির হতে হত আদালতে। যুবকটি বারদীর ব্রহ্মচারী লোকনাথবাবার অলৌকিক যোগশক্তির কথা সবই শুনেছে। সে যখন বুঝতে পারল, এই

মামলায় শাস্তি তার অবধারিত, তখন সে একদিন সোজা বারদীর আশ্রমে গিয়ে লোকনাথবাবাকে ধরল এই দারুণ সংকট হতে উদ্ধার হবার জন্য। সে বাবাকে প্রণাম করে বলল, বাবা, আমি সম্পূর্ণ নির্দোষ। এক জালের মামলায় জড়িয়ে পড়েছি, আপনি আমাকে রক্ষা করুন।

এই কথা শুনে বাবা তাকে অভয় দিয়ে বললেন, যা, তুই বাড়ি ফিরে যা। তুই মুক্তি পাবি।

বাবার কাছে অভয় পেয়ে যুবকটি হৃষ্ট চিত্তে বাড়ি ফিরে যাবার জন্য উদ্যত হলো। কিন্তু সে দুপা এগিয়ে যেতেই বাবার এক ভক্ত তার কাছে এসে বলল, ভাই, আমি সব শুনেছি। আমি জানি তুমি দোষী। অথচ বাবার কাছে মিথ্যা কথা বলে তাঁর অভয়বাণী নিয়ে গেলে। মিথ্যা কথা বলে মহাপুরুষের সঙ্গে প্রতারণা করে যেমন আচরণ করলে, তেমনি ফলই তুমি পাবে। তার চেয়ে বেশী কিছু আশা করো না। বাবার অভয়বাণীও তোমার মিথ্যা আচরণের জন্য মিথ্যা হয়ে যাবে। কোন ফল হবে না।

কথাটা শুনে চমকে উঠল যুবকটি। সে নিজের ভুল বুঝতে পারল। সে ভাবল, সাধারণ লোকের কাছে মিথ্যা বলে রেহাই পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু কোন শক্তিমান সাধুকে ঠকাতে গেলে নিজেকেই ঠকতে হয়।

এই ভেবে সে তখনি লোকনাথবাবার কাছে ফিরে গেল। সে বাবার পায়ে মাথা রেখে কাঁদতে কাঁদতে বলল, বাবা, আমি আপনার কাছে মিথ্যা কথা বলেছি। আমি সত্যি সত্যিই জাল করেছি। আমি অপরাধী। আবার আপনার কাছে মিথ্যা কথা বলে সেই অপরাধের মাত্রা শতগুণ বাড়িয়েছি। আমি আপনার শরণাপন্ন হলাম। আপনি আমাকে রক্ষা করুন।

যুবকটির সব কথা শুনে লোকনাথবাবা তাকে বললেন, ওঠ, যদি তুই সত্যিই আমার শরণাপন্ন হয়ে থাকিস, তাহলে আমি যা বলব, তোকে তা করতে হবে। তুই তা পারবি কি ?

অপরাধী যুবকটি বলল, ঠিক পারব। আপনি আদেশ করুন।

বাবা লোকনাথ বললেন, তাহলে তুই হাকিমের কাছে গিয়ে নিজের মুখে তোর দোষ স্বীকার করে প্রায়শ্চিত্ত কর। তাতে যা হয় হবে। ভাববি না। তবে মনে রাখিস, যা আমার মুখ থেকে একবার বেরিয়ে গেছে, তার অন্যথা হবে না। শেষে তুই অবশ্যই মুক্তি পাবি।

যুবকটি তখন নিশ্চিন্ত হয়ে বাবার আশীর্বাদ নিয়ে বাড়ি ফিরে গেল।

বিচারের দিন অভিযুক্ত যুবকটি হাকিমের কাছে নিজের মুখে নিজের দোষ স্বীকার করল। অথচ এর আগে বরাবরই সে তার অপরাধ অস্বীকার করে এসেছে। তাই হাকিম আশ্চর্য হয়ে ভাবলেন, যুবকটিকে হয়ত কেউ ভয় দেখিয়েছে, অথবা সে কোন কিছুতে প্রলুব্ধ হয়েছে। তাই সে এখন তার অপরাধ স্বীকার করছে। কিন্তু এখন সে যা বলল, তার সঙ্গে নথিভুক্ত সাক্ষ্য প্রমাণের কোন মিল খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। হাকিম তখন আসামী পক্ষের উকীলকে কি ইঙ্গিত করলেন। উকীলবাবু তখন আসামী যুবকটিকে তার অপরাধ অস্বীকার করার জন্য পীড়াপীড়ি করলেন।

কিন্তু আসামী সে কথায় কান না দিয়ে বলল, আমি দোষী। আমি আমার দোষ স্বীকার করব। তাতে হাকিম যা করেন করবেন।

হাকিম তখন আসামীকে দায়রা বা উচ্চ ফৌজদারী আদালতে সোপরদ্দ করলেন।

সেখানে গিয়েও সে একই কথা বলল, আমি দোষী।

আদালতের জুরিগণ তখন স্থির করলেন, যুবকটি সত্যিই নির্দোষ। শুধু ভয় বা প্রলোভনের বশবর্তী হয়ে শেষকালে অপরাধ স্বীকার করছে। কিন্তু জজসাহেব জুরিদের সঙ্গে একমত হতে পারলেন না। তিনি মামলাটি হাইকোর্টে পাঠিয়ে দিলেন। কিন্তু আশ্চর্যের কথা, হাইকোর্টের বিচারে যুবকটি মুক্তিলাভ করল।

অনেকে মনে করতে পারেন, লোকনাথবাবা সর্বজ্ঞ ও অন্তর্যামী হয়েও কেন তিনি যুবকটি আসলে অপরাধী একথা জেনেও কেন তিনি তার মিথ্যা কথায় বিশ্বাস করে তাকে অভয় দিলেন।

লোকনাথবাবা তাঁর সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা ঠিকই বুঝতে পেরেছিলেন যুবকটি অপরাধী। তবু তিনি তাকে অভয় দিয়েছিলেন, কারণ তিনি জানতেন যুবকটি লোভে পড়ে অপরাধ করে বসলেও স্বভাবতঃ সে অপরাধ প্রকৃতির নয় এবং মনে তার পাপকর্মের জন্য অনুশোচনা জেগেছে। এই লৌকিক জগতের ঊর্ধ্বে যে এক বৃহত্তর আধ্যাত্মিক শক্তি আছে, সেই শক্তির অধিকারী সাধুপুরুষদের প্রতি তার বিশ্বাস ও ভক্তি জেগেছে। তাই সে ছুটে এসেছে তাঁর কাছে। তিনি এও জানতেন, যুবকটি প্রথমে তাঁর কাছে

মিথ্যা কথা বললেও পরে সে ফিরে তার দোষ স্বীকার করবে।

অবশেষে যুবকটি তার দোষ স্বীকার করলে বাবা বলেছিলেন, আমি যা বলেছি তার অন্যথা হবে না।

এ কথার অর্থ হলো এই যে, মহাপুরুষদের বাক্য অমোঘ। সেই অমোঘ বাক্যের শক্তিদ্বারাই সে আবার ফিরে এসে দোষ স্বীকার করে এবং বিচারের জন্য বিভিন্ন আদালত ঘুরে অবশেষে সে মুক্তি পায়।

বাবা লোকনাথ যোগসাধনা করে অপ্রতিহত আজ্ঞারূপ সিদ্ধিলাভ করেন। তাই তিনি যাকে যা বলতেন তাই হত। তাই ফলত। ঈশ্বর ঈশিতা ও বশিতা এই উভয় শক্তিরই অধিকারী। ঈশিতাশক্তিধারীরূপে তিনি জগতের সব জীবের সব কিছুর নিয়ন্তা আর বশিতাশক্তিধারী হয়ে সকল ভোগ্যবস্তু তাঁর আয়ত্তাধীন হলেও তিনি আসক্তিতে জড়িয়ে পড়েন না অর্থাৎ সর্বদা নিরাসক্ত ও নিষ্কাম থাকতে পারেন। বাবা লোকনাথ ধারণাযোগে ঈশ্বরের এই দুই শক্তিরই অধিকারী হয়ে ওঠেন এবং একই সঙ্গে তা সাধন করতে পারতেন। তাই তাঁর আজ্ঞা অপ্রতিহত। অর্থাৎ তিনি যখন যা বলেন, সেই বাক্য অমোঘ ও অব্যর্থ হয়ে ওঠে। মহাপুরুষদের কথা ও আচরণ আমরা সব সময় সঠিক বুঝতে পারি না।

ওঁ

বাবা লোকনাথ তাঁর দেহস্থ পঞ্চবায়ুর সঙ্গে দেহকে সংযুক্ত করে ঈশ্বরকে সর্বব্যাপী বায়ুরূপে ধারণা করতে পারতেন। তাই তাঁর মনের গতি ছিল বায়ুর মত সর্বত্র। এ অবস্থায় তাঁর মন যেখানেই যেত তাঁর দেহও সূক্ষ্ম হয়ে সেখানে যেতে পারত।

ঈশ্বর প্রাণরূপে আকাশাত্মা অর্থাৎ সর্বব্যাপী সূক্ষ্মাত্মা হয়ে আছেন। মহাযোগী লোকনাথ মনোধারণা করে ঈশ্বরকে সেই আকাশরূপে ধারণা করতেন। ঈশ্বরের সেই আকাশমূর্তির মধ্যে নিয়ত যে হংসশব্দ উঠছে তা শুনতে পেতেন লোকনাথ। তাই তিনি জীবের হৃদয়াকাশে হংসনাদ ও দূরবর্তী অসংখ্য প্রাণীর স্ফুট অস্ফুট ধ্বনি শুনে তাদের ব্যক্ত অব্যক্ত সব কথা বুঝতে পারতেন।

বিপদে পড়ে যে কোন লোক বাবার শরণাপন্ন হন, বাবাকে একাগ্রচিত্তে

স্মরণ ও মনন করেন, বাবা তাঁকে সেই বিপদ থেকে উদ্ধার না করে স্থির থাকতে পারেন না। ভক্তের দুঃখে তাঁর হৃদয় বিগলিত হয় দয়ায়। তার জন্য তাঁর প্রাণ কাঁদে।

একদিন চাঁদপুরের কয়েকজন উকীল লোকনাথবাবাকে দর্শন করতে বারদীর আশ্রমে এসে উপস্থিত হলেন। আদালতে দিনকতক ছুটি ছিল। তাই তাঁরা বাবার আশ্রমে বেশ আনন্দে দিন কাটাতে লাগলেন। আদালত খোলার আগের দিন বাবার অনুমতি নিয়ে তাঁরা ফিরে যেতে চাইলেন। বাবার কাছে গিয়ে অনুমতি প্রার্থনা করলে বাবা তাঁদের বললেন, আজ তোদের না গেলে নয় রে?

একথা শুনে তাঁরা বললেন, কাল কাছারি খুলছে। না গেলে কাজের ক্ষতি হবে বাবা।

তখন বাবা তাঁদের মধ্যে একজনের দিকে আঙ্গুলি নির্দেশ করে বললেন, তুই আজ যাসনি।

তারপর অন্যদের বললেন, তোরা চলে যা। দেরি করিস না।

বাবার কথার গূঢ় অর্থ তাঁরা বুঝতে পারলেন না। তবু বাবার কথা উপেক্ষা করা উচিত নয় মনে করে তাঁরা তাঁদের সেই উকীল বন্ধুটিকে রেখে চলে গেলেন।

তারা চলে যাবার ঘণ্টাখানেক পর ঐ উকীলের হঠাৎ ভেদবমি শুরু হলো। তিনি কলেরা রোগে আক্রান্ত হলেন। যা হোক, বাবার কৃপাবলে তিনি কিছুক্ষণ রোগভোগের পর সুস্থ হয়ে উঠলেন।

উকীল ভদ্রলোক এবার লোকনাথবাবার নিষেধের গূঢ় অর্থটি বুঝতে পারলেন। বুঝতে পারলেন বন্ধুদের মধ্যে বাবা শুধু তাঁকেই কেন থেকে যেতে বলেছিলেন। বন্ধুদের সঙ্গে রওনা হলে হয়ত পথেই এই রোগে আক্রান্ত হয়ে মরণাপন্ন হতে হত। এমন কি মৃত্যু ঘটতে ও পারত। সর্বজ্ঞ মহাশক্তিধর মহাযোগী বাবা তাঁর বিপদের কথা আগে থেকেই বুঝতে পেরে কৃপা করে তাঁকে যেতে নিষেধ করেছিলেন। তাই এক নিবিড়তম কৃতজ্ঞতায় আপনা হতে তাঁর মাথাটি লুটিয়ে পড়ল বাবার চরণে। তিনি কৃপা ভিক্ষা করলেন বাবার কাছে।

মহাপুরুষ বাবার ভবিষ্যৎ দৃষ্টি কত অভ্রান্ত। সেই দৃষ্টিবলে বুঝতে

পেরেছিলেন উকীল ভদ্রলোক কলেরায় আক্রান্ত হবেন। তাই পথে যাতে তিনি নিশ্চিত মৃত্যুর কবলে না পড়েন তার জন্যই তাঁকে আশ্রমে রেখে দিয়ে অন্যদের চলে যেতে বলেন।

বারদীর নাগ জমিদার বাড়ির কালীকান্ত নাগ বাবা লোকনাথের এক-জন বিশেষ ভক্ত। একদিন কালীকান্তবাবুর বড় ছেলে রাধাকান্ত নাগ অপরিমিত মদ্যপান করে বাবার আশ্রমে এসে মাতলামি শুরু করে। তার সেই মাতলামিতে বিরক্ত বাবার এক পশ্চিমদেশীয় ভক্ত রাধাকান্তকে জোর করে আশ্রম থেকে বার করে দেয়। তাতে রাধাকান্ত অপমানিতবোধ করে বাড়ি ফিরে গিয়ে কয়েকজন লেঠেল পাঠিয়ে ঐ পশ্চিমা ভক্তকে ধরে জমিদার বাড়িতে নিয়ে যায়। সেখানে লেঠেলেরা তাকে প্রহার করে এবং তাতে তার কালশিরে পড়ে যায়। কিছুক্ষণ পর ভক্তটিকে ছেড়ে দেওয়া হয়।

ছাড়া পেয়ে ভক্তটি সোজা নারায়ণগঞ্জ আদালতে গিয়ে রাধাকান্ত নাগের বিরুদ্ধে এক ফৌজদারী মামলা রুজু করে।

তখন সেই পশ্চিমা ভক্তের সঙ্গে অন্যান্য ভক্তেরাও দুষ্টের দমনের জন্য বাবাকে সেই মামলায় সাক্ষ্য দিতে বলেন। প্রকৃত সত্য প্রমাণের জন্য বাবাও আদালতে গিয়ে সাক্ষ্য দেন। এই ঘটনার বিবরণ এবং সাক্ষ্য দেওয়ার সময় বাবা যে তাঁর অলৌকিক শক্তির পরিচয় দেন, সে কথা আগেই বলা হয়েছে।

হাকিম লোকনাথবাবার কথা সত্য বলে মেনে নিয়ে অভিযুক্ত আসামী রাধাকান্তকে ছয়মাসের সশ্রম কারাদণ্ড দেন।

কালীকান্তবাবু তখন বাবার কাছে এসে সেই কথা জানালে বাবা দুঃখিত হন। রাধাকান্ত অন্যায় করলেও কালীকান্তবাবু তাঁর ভক্ত। তাই ভক্তের প্রতি করুণাবশতঃ বাবা কালীকান্তবাবুকে বললেন, কালীকান্ত, তুই আবার আপীল কর। তোর ছেলে ছাড়া পাবে।

কালীকান্তবাবু জানতেন, বাবার যে কথা একবার মুখ থেকে বেরিয়ে যায় তা অমোঘ। তা খণ্ডন করার সাধ্য কোন জাগতিক শক্তির পক্ষেই সম্ভব নয়। তাই তিনি বাবার কথামত হাইকোর্টে আপীল করেন। বাবার অমোঘ ইচ্ছাশক্তিবলে রাধাকান্ত হাইকোর্টের বিচারে মুক্তি পায়।

বাবা এই মামলায় সাক্ষী দিয়ে এই কথাই বোঝাতে চেয়েছেন যে, তাঁর

যত ক্ষমতাই থাকুক, সরকারী বিধিব্যবস্থা ও আইনের মর্যাদা রক্ষা করা উচিত। তাছাড়া রাধাকান্ত অপরাধী। তাই তার শাস্তি পাওয়া উচিত। এইজন্যই তিনি এই মামলায় সাক্ষী দিতে গিয়েছিলেন। পরে যখন দেখলেন বিচারের শাস্তি পেয়ে রাধাকান্ত ও তার বাবা কালীকান্ত অনুতপ্ত হয়েছে, তখন তিনিই রাধাকান্তের মুক্তির জন্য উপায় বলে দেন।

আদালতে উকীলের জেরার সময়ে তাঁর দৃষ্টিশক্তির অলৌকিকতার পিছনে রয়েছে তাঁর কঠোর সাধনালব্ধ সিদ্ধি। ঈশ্বরের যে সবিতারূপ আছে সেই মূর্তিতে বাবা লোকনাথ নিজের দৃষ্টি ধারণা করতে পারতেন। আর চোখের ভিতরে সেই সূর্যমূর্তিকে কল্পনা করে ঈশ্বরকে মনোযোগ দ্বারা ধ্যান করতে সক্ষম হতেন। তাই ত কি কাছের কি দূরের বিশ্বের সর্বত্র সব কিছ কিছু দেখতে পেতেন।

কিন্তু বাবা লোকনাথ অনাথশরণ, পতিতপাবন। তাই অপরাধীর দুর্দশা দেখে করুণার অশ্রু বিসর্জন করলেন তিনি। আপীল করলেই ছাড়া পাবে এই অভয়বাণী দিয়ে রক্ষা করলেন পাপীকে। পাপী রাধাকান্তও বুঝল, যাঁকে সে অবমাননা করেছে তাঁরই করুণায় কারাদণ্ড থেকে রেহাই পেল।

বিক্রমপুরনিবাসী চন্দ্রকিশোর চক্রবর্তী সিদ্ধিলাভের আশায় অনেক সাধু সন্ন্যাসীদের সঙ্গে মিশেছেন। কিন্তু কোথাও তিনি তাঁর আকাঙ্ক্ষিত বস্তু পাননি। ফলে মনে রয়ে গিয়েছে এক আধ্যাত্মিক অতৃপ্তি। সে অতৃপ্তি কেউ দূর করতে পারেনি।

অবশেষে একদিন তিনি বারদীর ব্রহ্মচারী লোকনাথবাবার অমিত যোগ-বিভূতি ও কৃপার কথা শুনে মনে মনে আকৃষ্ট হলেন তাঁর প্রতি। মনের মধ্যে এই বিশ্বাস তাঁর দৃঢ় হয়ে উঠল যে এই মহাযোগী মহাপুরুষের কৃপা-লাভ করতে পারলেই যোগসাধনায় সিদ্ধ হয়ে উঠবেন তিনি।

তাই ব্রহ্মচারীবাবার কৃপালাভের জন্য কালবিলম্ব না করে চন্দ্রকিশোর একদিন বারদীর আশ্রমে চলে গেলেন। সেখানে গিয়ে বাবাকে দর্শন ও প্রণাম করে কিছুই বললেন না। বাবার কৃপালাভের জন্য বাবার ঘরের বারান্দায় হত্যা দিয়ে উপবাস করে পড়ে রইলেন নীরবে। একদিন, দুদিন করে আট দিন কেটে গেল। এই কয়দিনের মধ্যে জল পর্যন্ত স্পর্শ করলেন

না তিনি।

এই কয়দিনের মধ্যে বাবা কিন্তু কোন কথাই বললেন না। শুধু নীরবে দেখে যেতে লাগলেন। শুধু ভক্তের ধৈর্য, সংযম আর তিতিক্ষা পরীক্ষা করে যেতে লাগলেন।

নয় দিনের দিন ভক্ত চন্দ্রকিশোরের ক্ষুধা পিপাসার তীব্র যন্ত্রণা অন্তর্যামী বাবা লোকনাথ নিজের মধ্যে অনুভব করলেন। সে যন্ত্রণা তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে তাঁর বুকের মধ্যে এসে তাঁকে কাতর করে তুলল। তিনি ছটফট করতে লাগলেন সে যন্ত্রণায়। অবশেষে তা আর সহ্য করতে না পেরে আশ্রমের এক ভক্তকে ডেকে চন্দ্রকিশোরের খাবারের ব্যবস্থা করতে আদেশ দিলেন। চন্দ্রকিশোরের উপর বাবার করুণা হলো।

বাবার কৃপায় এতদিনে মনস্কামনা পূর্ণ হলো চন্দ্রকিশোরের। এতদিনে তিনি তাঁর বহু আকাঙ্ক্ষিত বস্তু পেয়ে গেলেন। এক অলৌকিক যোগশক্তি লাভ করে ধন্য হলেন চন্দ্রকিশোর চক্রবর্তী।

অবশেষে বাবার চরণবন্দনা করে তাঁর অনুমতি নিয়ে আশ্রম থেকে বিদায় নিয়ে ঢাকায় ফিরে গেলেন চন্দ্রকিশোর। সেখানে গিয়ে আপন নব-লব্ধ যোগশক্তির দ্বারা লোকনাথবাবার নামে বহু লোকের দুরারোগ্য ব্যাধি সারাতে লাগলেন। সেই সব রোগমুক্ত লোকদের মুখে মুখে তাঁর নাম যশ ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে।

কিন্তু নাম যশের মোহে অহঙ্কার দেখা দিল চন্দ্রকিশোরের মনে। ফলে কিছুদিনের মধ্যেই তিনি যোগশক্তি হারিয়ে ফেললেন। এবার চন্দ্র-কিশোর তাঁর ভুল বুঝতে পারলেন। কিন্তু বড় দেরি হয়ে গেছে। আর কোন উপায় নেই। তাই তিনি লজ্জায় আর বাবার কাছে ফিরে যেতে পারলেন না।

আসলে চন্দ্রকিশোর যে সিদ্ধিলাভের জন্য বাবার কাছে এসেছিলেন, সেটা একমাত্র স্বার্থ আর নামযশের জন্য। তাঁর সিদ্ধিলাভের বাসনার মধ্যে বৃহত্তর আধ্যাত্মিক তাৎপর্য ছিল না। সর্বজ্ঞ বাবা তা বুঝতে পেরেছিলেন। তাই তাকে আটদিন উপবাসে ফেলে রেখেছিলেন। তারপর শুধু তাঁর সংকল্পের দৃঢ়তা দেখে যৎসামান্যমাত্র সিদ্ধি তাকে দান করেছিলেন।

কিন্তু বাবা যতটুকুই দান করুন না, সেটুকু রক্ষা করার মত শক্তি ছিল

না চন্দ্রকিশোরের। জমি প্রস্তুত না হলে যেমন তাতে বীজ বপন করলে তা ফলপ্রসূ হয় না, তেমনি দেহমন ঠিকমত প্রস্তুত না হলে দিব্যশক্তিকে ধারণ করা যায় না। তাই এক চরম ব্যর্থতায় আঘাতের মধ্য দিয়ে চন্দ্রকিশোরকে এই শিক্ষা দান করলেন বাবা লোকনাথ।

ওঁ

শ্রীহরি বিদ্যালঙ্কারের পুত্র কালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন মশাই প্রায়ই বারদীর আশ্রমে গিয়ে লোকনাথবাবাকে দর্শন করে আসতেন। একজন তপস্বী ভক্তব্রাহ্মণ ও সুপণ্ডিত হিসাবে পূর্ববাংলায় তাঁর খুব নামডাক ছিল। পূর্ববাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে তাঁর অসংখ্য শিষ্য ছিল।

বিদ্যারত্ন মশাই যথাবিধি ব্রহ্মচর্যানুষ্ঠান করে গুরুগৃহে থেকে বেদ ও ধর্মশাস্ত্র শিক্ষা করেছেন। তিনি ব্রতানুষ্ঠানদ্বারা জিতেন্দ্রিয় ও বিষয়ভোগ থেকে নিরাসক্ত হয়েছেন। কামলোভাদি রিপুগুলিকে জয় করেছেন। পরে গৃহাশ্রমী হয়ে যদৃচ্ছাক্রমে প্রাপ্ত বস্তুদ্বারাই জীবিকা নির্বাহ করে থাকেন। তিনি ছিলেন এমনই অপ্রতিগ্রাহী যে কারো কাছে কোনদিন কোন দান গ্রহণ করতেন না বা তা প্রত্যাশাও করতেন না।

একদিন বিদ্যারত্ন মশাই বারদীর আশ্রমে এসে উপস্থিত হলেন। বাবা তখন তাঁর ঘরের ভিতরে আসনে বসেছিলেন।

বিদ্যারত্ন মশাই বাইরে থেকে বাবার উদ্দেশে প্রণাম নিবেদন করতেই ঘরের ভিতর থেকেই বাবা স্নেহভরা কণ্ঠে বলে উঠলেন, কালীপ্রসন্ন, নিদারুণ অর্থাভাবে তোর এখন দিন কাটছে, নারে? হাতে টাকা পয়সা কিছুই নেই। ভাবিস না। আমার কাছে অনেক টাকা রয়েছে, তুই সে-গুলো নিয়ে যা।

বিদ্যারত্ন মশাই তখন ঘরে ঢুকলেন। বাবার চরণ দর্শন করে বললেন, ব্রহ্মচারী ঠাকুর, আপনি কঠোর যোগাভ্যাসের দ্বারা প্রধানা অষ্টসিদ্ধি, গৌণ দশসিদ্ধি এবং সামান্য পঞ্চ সিদ্ধি লাভ করেছেন। তাই আপনার ত টাকা পয়সার অভাব থাকতে পারে না। কিন্তু আমি সাধারণ এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ। দারিদ্র্য আমার সহচর। তবু কিন্তু আমার কোন অভাব নেই। টাকা

একথা শুনে বাবা খুবই খুশী হলেন। তবু তিনি তাঁর বসার কম্বলাসনটি একটু উঠিয়ে দেখালেন। বিদ্যারত্ন মশাই তা দেখে অবাক হয়ে গেলেন। তিনি দেখলেন আসনের নীচে কত যে টাকা পয়সা রয়েছে তার হিসাব নেই। তিনি বুঝলেন, এসবই হলো ব্রহ্মচারী বাবার অলৌকিক সিদ্ধির ফল। তা না হলে যিনি আজন্ম ব্রহ্মচারী, যিনি টাকা পয়সায় কোনদিন হাত দেন নি, তাঁরই আসনের নীচে এত টাকা পয়সা আসবে কোথা থেকে ?

বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে বিদ্যারত্ন মশাই এবার বললেন, ব্রহ্মচারী ঠাকুর, আপনার যোগৈশ্বর্য আপনারই থাকুক। ওতে আমার কোন দরকার নেই। আশীর্বাদ করুন, আমার যেন ভগবৎ-ঐশ্বর্য লাভ হয়।

প্রকৃত ভক্ত দীনদুঃখী হয়ে সংসারে অশেষ ক্লেশ পেয়েও ভক্তিকে তিনি কখনো ত্যাগ করেন না। ভক্ত ঐশ্বর্যহীন হলেও ভগবৎ কৃপা ছাড়া আর কিছুই চান না। ভক্ত ব্যক্তি বহু জন্ম ধরে বিষয় ভোগ করার পর বৈরাগ্য লাভ করে ইহজন্মে নির্বিষয়ী হয়ে জন্মগ্রহণ করেন। তাই এ জন্মে তাঁদের দরিদ্র বলে মনে হয়। এই দরিদ্র অবস্থাতে যদি ভক্তের সঙ্গহেতু বা ভ্রমহেতু বিষয় ভোগ করতে ইচ্ছা হয়, তাহলে ভগবান তাঁকে অসীম ঐশ্বর্য দান করলেও তাঁর সর্বজ্ঞ চিত্ত বিষয়ের প্রতি আর আসক্ত হয় না। এ জন্য ভক্ত ব্যক্তি ইন্দ্রের মত ঐশ্বর্য পেলেও ভোগ করতে চান না।

তাই বিদ্যারত্ন মশাই-এর মুখ থেকে এই কথা শুনে খুশি হলেন বাবা।

ভক্ত যখন ভক্তিরূপিণী বিদ্যাশক্তিতে সমৃদ্ধ হন, তখন তাঁর বাসনা ক্রিয়াহীন হয়। জমিতে ভর্জিত অর্থাৎ আগুনে সেঁকা বীজ পড়লে যেমন তা থেকে অংকুর বার হয় না, তাতেই লীন্ হয়ে থাকে, তেমনি তাঁর চিত্তে ভোগবাসনা কখনো ক্রিয়াশীল হয় না। বিদ্যারত্ন মশাইএর আচরণে তা প্রমাণিত হলো। তা বোঝানোর জন্য লোকনাথবাবা আবার তাঁর আসনটি উঠিয়ে তাঁর প্রচুর অর্থ দেখিয়ে তা বিদ্যারত্নকে দান করতে চাইলেন। বিদ্যারত্ন মশাই এবারেও তা গ্রহণ করতে চাইলেন না। ভোগের কোন ইচ্ছা জাগল না তাঁর মধ্যে।

আর একদিনের কথা। বিদ্যারত্ন মশাই বারদীর আশ্রমে এসে উপস্থিত হলেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল, ব্রহ্মচারী বাবার কাছে বিদায় নিয়ে কাশী চলে

যাবেন। কিন্তু বাবার ঘরের সামনে এগিয়ে যেতে তাঁকে দেখেই তাঁর মনের ইচ্ছার কথা জানতে পারলেন অন্তর্যামী বাবা। তিনি ঘরের ভিতর থেকে নিজে থেকে বলে উঠলেন, হ্যারে কালীপ্রসন্ন, শেষে মনের দুঃখে কাশীবাসী হতে চলেছিস ?

বিদ্যারত্ন আশ্চর্য হয়ে গেলেন। এই সর্বজ্ঞ অন্তর্যামী মহাপুরুষের তাহলে অজানা কিছুই নেই। যে কথা তিনি বলবার জন্য এসেছেন, কিন্তু এখনো বলেননি কারো কাছে, সে কথা তাঁকে দেখার সঙ্গে সঙ্গেই জানতে পেরেছেন।

বিদ্যারত্ন মশাই বললেন, আগামী মাসেই চলে যাব ঠিক করেছি। আপনার কি অভিমত তা জানতে এসেছি।

বাবা লোকনাথ বললেন, কালীপ্রসন্ন, এ মাসে তোর মেয়ের বিয়ে দিয়ে আসছে মাসে চলে যাবি—এই ত তোর ইচ্ছে। হ্যারে,তোর পুত্রসন্তান নেই বলেই কি এই অভিলাষ ? তোর মনে দুঃখ। তাই বৈরাগ্য। থাক, তোর কাশী যাওয়া হবে না। তুই যেখানে আছিস সেখানেই থাকবি। অচিরেই তোর দুঃখ দূর হবে। আমিই তোর ঘরে ছেলে হয়ে জন্মাব।

এবারেও বাবার কথায় আরও অনেক বেশী বিস্ময়বোধ করলেন বিদ্যারত্ন। তার মনের গভীর গোপন দুঃখের কথাও জানতে পেরেছেন বাবা। শুধু তাই নয়, কী অপরিসীম তাঁর করুণা ও কৃপা! তিনি তার কতদিনের সেই স্থায়ী দুঃখের অবসানও করবেন তাঁর অলৌকিক শক্তির দ্বারা।

বাবার এই অযাচিত কৃপালাভ করে বিদ্যারত্ন মশাই-এর মনের পরিবর্তন হলো। তিনি সঙ্গে সঙ্গে কাশী যাওয়ার পরিকল্পনা বাতিল করলেন।

তবু তিনি বাবাকে বললেন, ব্রহ্মচারী ঠাকুর, আপনি আমায় আবার কেন সংসারে আবদ্ধ করলেন ?

বাবা লোকনাথ বললেন, কালীপ্রসন্ন, তুই ত ব্রহ্মনিষ্ঠ। ব্রহ্মচর্য অনুষ্ঠানের পর গৃহাশ্রমী হয়েছিস। ব্রহ্মচর্য ও ধর্মজ্ঞান শিক্ষা করলে চিত্ত বিশুদ্ধ হয়। চিত্ত বিশুদ্ধ হলে যদি কোন যুবক বা বৃদ্ধ সংসারধর্ম প্রতিপালন করে, তাহলে তার সংসার বন্ধন হয় না। আমি জানি তোর গৃহেও ভোগাসক্তি নেই। মনে রাখিস, শুধু কর্তব্যের খাতিরে সংসারধর্ম প্রতিপালন ও সন্তান প্রজনন করেও সেই পরম ভগবৎ পদে মতি ও ভক্তি স্থির

রাখলে ভোগের মধ্যে গৃহীর চিত্ত আকৃষ্ট বা আবদ্ধ হয় না।

শুনেছি, তোর স্ত্রীও ভগবৎ পরায়ণা। স্বামী স্ত্রী দুজনেই ভক্ত হলে তাতে কখনো বিষয়াসক্তি বা পাপ উপস্থিত হতে পারে না।

পরমাত্মা ও জীবাত্মা নিত্যসখা ও একবস্তু। ব্রহ্মচর্য অনুষ্ঠানের দ্বারা বিশুদ্ধচিত্ত হলেই নিত্যসখা পরমাত্মার সঙ্গে জীবাত্মার সাক্ষাৎ হয়ে থাকে। এখানে বিদ্যারত্ন হলেন সেই বিশুদ্ধচিত্ত জীব। তিনি ব্রহ্মচর্যের দ্বারা অবিদ্যাকে বিনাশ করে ভোগহীন ভগবৎ সাক্ষাৎ করলেন। তিনি ব্রহ্মভূত যোগীশ্বর লোকনাথের পরমতত্ত্ব বুঝতে পারলেন। তাই বাবা লোকনাথ তাঁকে সংসারী করেও সুখে রাখতে চাইলেন।

বাবা লোকনাথ আবার বলতে লাগলেন, শোন কালীপ্রসন্ন, তীর্থস্থানে গিয়ে দান পুণ্যাদি কার্য ও ব্রতনিয়মাদিতে নিরত থাকলে ক্রমে সত্ত্বগুণের উদয় হয়। অন্তরে সত্ত্বগুণের উদয় হলে কি নারী, কি পুরুষ সকলেরই ভক্তি ভগবানে নিশ্চিত হয়। চিত্ত যতই বিশুদ্ধ হয়, ততই ভগবদ্ভক্তের দর্শন ঘটে সাধকের সামনে। কেন না, চিত্ত বিশুদ্ধ না হলে এবং ভগবানের কৃপা না হলে প্রকৃত উপদেশ দানের জন্য ভগবদ্ভক্তের সমাগম হয় না। অনিমন্ত্রিত হয়েও দৈবপ্রেরিত হয়েই তুই এখানে এসেছিস। জানবি গৃহীগণের পক্ষে ভগবানের মূর্তি বা দেবমূর্তি থাকলেও ভক্ত সাধুগণই সর্বপূজ্য মানুষ বলেই ভগবান তাদের কৃতার্থ করেন। সংসারীদের মন বিষয়ে নিবিষ্ট থাকাতে ঊষর ভূমিতে বীজ বপনের মত তাদের প্রতি নির্বাণ বা মুক্তির উপদেশদান নিষ্ফল হয়। তাই তাঁদের ভক্ত সাধুগণের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় না। আর সাধুরা তাদের উপদেশও দান করেন না।

বিদ্যারত্ন মশাই এই সব শুনে পরম আনন্দিত হয়ে বাবা লোকনাথের আশীর্বাদ নিয়ে বাড়ি ফিরে গেলেন।

বাবা লোকনাথ এই ঘটনার দ্বারা এই কথাই বোঝাতে চাইলেন যে বিদ্যারত্ন মশাইএর মত সত্ত্বগুণ ও বিশুদ্ধ চিত্তের অধিকারী হলেই যে কোন ব্যক্তি এমন তত্ত্বজ্ঞান ও ভগবৎ কৃপা লাভ করতে পারেন।

চিত্তশুদ্ধি না ঘটলে কেউই ভগবৎ-তত্ত্বজ্ঞান লাভ করতে পারেন না। বসুদেব, দেবকী, নন্দ, যশোদাদি যাঁদের চেয়ে আর কারোরই কাছে ভগবান কৃষ্ণ বেশী নিকট বা বেশী আপন ছিলেন না, যাঁদের চেয়ে আর কারোরই

সঙ্গে তিনি আত্মীয়তা স্থাপন করেননি, সেই সব আপনজনও কৃষ্ণকে ভগবান বলে প্রথমে জানতে পারেননি। কারণ তখন তাঁরা মায়ার দ্বারা আবদ্ধ ছিলেন। যতক্ষণ নিয়মিত ধর্মানুষ্ঠান দ্বারা মায়া থেকে মুক্ত হয়ে ভগবান কৃষ্ণকে ব্রহ্মরূপে জানতে না পারলেন, ততক্ষণ তাঁদের মুক্তিলাভ হয়নি।

ওঁ

একদিন আশ্রমের কমলা গোয়ালিনী মা বাবা লোকনাথের কাছে গিয়ে বললেন, বাবা, আমার এক আত্মীয় কালীঘাটের কালীর নামে মানত করে ফল পেয়েছে। সে এখন ঐ মানতের টাকা ও পুজোর সামগ্রী কালীঘাটে পাঠাতে চাইছে। আপনার কাছে কলকাতার কত লোকই আসে। তাদের কারো সঙ্গে যদি ঐ টাকা আর পুজোর সামগ্রী পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করেন ত ভাল হয়।

একথা শুনে বাবা বললেন, ঐ টাকা ও পুজোর সামগ্রী আমার কাছে পাঠিয়ে দাও। আমিই কালীঘাটের কালী।

বাবা লোকনাথকে ভগবান জ্ঞানে ভক্তিশ্রদ্ধা করতেন গোয়ালিনী মা। তার যে কোন কথায় তার বিশ্বাস ছিল অগাধ এবং অটল। তাই তিনি তার আত্মীয়কে পুজোর টাকা ও যাবতীয় সামগ্রী বারদীর আশ্রমে বাবার কাছে পাঠিয়ে দিতে বললেন।

পরের দিন সকালেই গোয়ালিনী মার সেই আত্মীয় মানত করা টাকা আর পুজার সামগ্রী সব আশ্রমে এসে দিয়ে গেল। সে বুঝল, এই পুজো বাবাকে দেওয়া মানেই কালীঘাটের কালীকে দেওয়া। কারণ বাবা সিদ্ধ পুরুষ। তিনি কৃপা করলে দেবদেবীরাও কৃপা করবেন। এবার মানতের টাকা ও পুজার উপকরণগুলি গোয়ালিনী মা বাবার ঘরে গিয়ে রেখে আসবেন। তারপর বাবা যা করার করবেন।

বাবা তখন ঘরের ভিতরেই ছিলেন। তিনি যোগাসনে উপবিষ্ট অবস্থায় ধ্যানস্থ ছিলেন। কিন্তু জিনিসগুলি নিয়ে গোয়ালিনী মা ঘরে ঢুকতেই চমকে উঠলেন! একি দেখছেন তিনি! নিজের চোখকে নিজেই বিশ্বাস করতে পারছিলেন না তিনি। তিনি দেখলেন বাবার আসনে বাবা নেই। তাঁর আসনে বাবা নিজেই করালবদনা ভীষণা-

কৃতি কালীমূর্তি ধারণ করে বসে আছেন।

গোয়ালিনী মা একজন নিরক্ষর মহিলা। তিনি জপ, তপ, সাধন ভজন যোগযাগ কিছুই করতেন না। শুধু অসামান্য ভক্তি দ্বারা তিনি বাবার সেবা করে তাঁর কৃপা লাভ করেন। তাই তিনি লোকনাথবাবার তত্ত্ব বুঝতেন। এজন্য তিনি বাবার কালীমূর্তি ধারণ দেখে বিস্মিত হলেও ভীত হননি। সঙ্গে সঙ্গে ভূমিতে লুটিয়ে পড়ে কালীরূপী বাবাকে পরম ভক্তিভরে প্রণাম করেছিলেন।

ঈশ্বরের সর্বদেবময় রূপকে ধ্যান করে সিদ্ধ হবার পর যোগী যখন যোগশক্তি লাভ করেন তখন তিনি যে কোন দেবতার রূপ ধারণ করতে ইচ্ছা করেন, তাতেই তিনি সক্ষম হন। বাবা লোকনাথ মহাযোগী। সত্ত্বগুণের উৎকর্ষের ফলে 'কামরূপ' সিদ্ধি তাঁর ধারণাবস্থায় উদয় হয় তাঁর মধ্যে। তাই কামরূপ সিদ্ধি লাভ করে কালীরূপ ধারণ করতে পেরেছেন।

বাবা লোকনাথ ব্রহ্মচারী দীর্ঘকালের কঠোর যোগাভ্যাসদ্বারা যে অষ্ট মুখ্য, গৌণ দশ সিদ্ধি ও সামান্য পঞ্চসিদ্ধি লাভ করেন, সেই সব সিদ্ধি একমাত্র যোগসিদ্ধ মহাপুরুষ ছাড়া সাধারণ সাধকের প্রকাশ পায় না। গীতায় দেখা যায় ভগবানের বিশ্বরূপ দর্শন করার জন্য অর্জুনের দিব্য দৃষ্টির প্রয়োজন হয়েছিল। বাস্তবিক ভগবানের বিভূতি দর্শনের জন্য যেমন দিব্যনেত্রের দরকার, তেমনি ভগবৎ ঐশ্বর্য লাভের জন্য দিব্যদেহের দরকার। সাধারণ দেহ সে ঐশ্বর্য লাভের একেবারে অনুপযোগী।

অনেকে সাধনার দ্বারা ভগবৎ কৃপা ও ভগবৎ দর্শন লাভ করতে পারেন। কিন্তু দেহের অপরিপক্কতার জন্য ঐ সব শক্তি ধারণ করতে পারেন না। যোগসাধনা ছাড়া দেহ পরিপক্ক হয় না। যোগসাধনায় সিদ্ধিলাভ না করলে শক্তিধারনের উপযোগী দেহ তৈরি হয় না। বরং অপরিপক্ক দেহে কোন ঐশী শক্তির আবির্ভাব হলে ঐ দেহ বিনষ্ট হয়। তবে মহাপুরুষ ইচ্ছা করে সিদ্ধিলাভ করতে পারেন না। তাঁদের কঠোর যোগসাধনার ফলেই ঐ সব সিদ্ধিগুলি আপনা থেকে প্রকাশিত হয় তাঁদের দেহে।

বাবা লোকনাথ যোগী হিসাবে ধারণাকার্যে অর্থাৎ চিত্ত স্থির রাখার কার্যে সক্ষম ছিলেন। তিনি ঈশ্বরের সর্বদেবময় রূপ ধ্যান করে সিদ্ধ হয়ে ঈশ্বরের যোগৈশ্বর্য লাভ করেছিলেন। তাই ত তিনি যে কোন দেব-

দেবীর রূপ ধারণ করতে পারতেন। তেমনি আবার যে কোন পশু বা মানবাদির রূপও ইচ্ছা করলেই ধারণ করতে পারতেন। তিনি একবার ভক্তের নিমন্ত্রণ বাড়িতে কুকুরের রূপধারণ করে গিয়েছিলেন।

বাবা লোকনাথ ধারণাকার্যে সিদ্ধ হওয়ার ফলে যে কোন দেহে প্রবেশ করার ইচ্ছা হলে সেই দেহের ধ্যান করতেন। ঐ ধ্যানে সিদ্ধিলাভ করামাত্র তিনি স্থূলদেহ ত্যাগ করে নিজের সূক্ষ্মদেহে প্রাণাদি বায়ুর সঙ্গে সেই দেহে প্রবেশ করতে পারতেন। মৌমাছি যেমন মধুপানের জন্য ইচ্ছামত নানা ফুল ভোগ করে, তেমনি পরকায় প্রবেশকারী সিদ্ধ যোগী লোকনাথ নানা দেহ ভোগ করতে পারতেন।

বাবা লোকনাথ ঈশ্বরের ধারণাকার্যে সিদ্ধ হয়েছিলেন। তাই তিনি যদি ইচ্ছামত দেহত্যাগ করে ঈশ্বরের সঙ্গে মিলিত হতে চাইতেন, তাহলে পার্ষ্ণি অর্থাৎ গোড়ালিদ্বারা গুহ্যদ্বার রোধ করে প্রাণবায়ুকে হৃদয়, উরু, কণ্ঠ ও মূর্ধা পর্যন্ত উঠিয়ে ঈশ্বরের মূর্তি ধ্যান করতেন। তারপর ঐ মূর্তি ভাবতে ভাবতে ব্রহ্মমূর্ধা ভেদ করে সূক্ষ্মদেহকে প্রাণবায়ুর সঙ্গে বার করে দিয়ে স্বেচ্ছায় দেহত্যাগ করতে পারতেন।

বাবা লোকনাথ ঈশ্বরের সত্ত্বগুণময় মূর্তি ধ্যান করে নিজে সত্ত্বগুণময় হন। তাই তিনি সূক্ষ্মদেহে দেবলোকে ভ্রমণ করতে এবং দেবদেবীদের ক্রীড়া দর্শন করতে পারতেন।

বাবা লোকনাথ সত্যসংকল্প ও সকাম রূপের সাহায্যে ধ্যানযুক্ত হয়ে একান্ত মনোনিবেশ করে ঈশ্বরের সত্যসংকল্প গুণ লাভ করেন। সেই সশক্তিবলে তিনি যা মনে সংকল্প করেন, তাই সিদ্ধ হয়। ঈশ্বর বশিতাশক্তি ধরে সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করেন আর ঈশিতাশক্তি ধরে সকল ভোগ্য বস্তু লাভ করেও স্বতন্ত্র থাকেন। বাবা লোকনাথ ঈশ্বরের এই উভয় শক্তি ধারণাযোগে সাধন করতে পারতেন। তাই অপ্রতিহত আজ্ঞার অধিকারী হন। অর্থাৎ তাঁর সকল বাক্য অমোঘ ও অব্যর্থ হয়ে ওঠে।

বাবা লোকনাথ হিমালয়ের তুষারাচ্ছন্ন শিখরে যখন তপস্যা করতেন, তখন শীতকালে তাঁর গোটা নগ্ন দেহটা বরফে ঢেকে যেত। আবার গ্রীষ্মকালে সেই বরফ গলে সেই বরফগলা জলে দেহটা ভাসতে থাকত। চন্দ্রশেখর পর্বতের শিখরদেশে অবস্থান করার সময় একবার সেখানকার

পর্বতসংলগ্ন বনে দাবানল জ্বলে উঠলে তাঁর দিব্যদেহে সেই আগুনের কোন স্পর্শ লাগেনি।

হিমালয়ে তিনি শতাধিক বছর কাটিয়েছিলেন। কিন্তু সেখানকার প্রবল তুষারঝড় ও বৃষ্টিপাতে তাঁর দেহ কিছুমাত্র বিপন্ন বা বিকৃত হয়নি।

লোকনাথবাবা উত্তরমেরু অতিক্রম করে আরও কয়েক হাজার মাইল উত্তরে গিয়েছিলেন। ঐ প্রদেশে যাতায়াত করতে তাঁর বিশ বছর সময় লেগেছিল। সেই তমসাচ্ছন্ন ও তুষারচ্ছন্ন প্রদেশেও তিনি দিবালোকের মত সব কিছুই দেখতে পেতেন।

যোগ ও ধারণাবলে মহাযোগী লোকনাথ ঈশ্বরকে উপাস্যভাবে ধারণা করে ঈশ্বরের বিভূতিময় মূর্তি ও তাঁর গুণগুলি সর্বাদা ধ্যান করতেন। এই ধ্যানের ফলে তিনি ইন্দ্রিয়গুলিকে ও শ্বাসাদিকে জয় করে ঈশ্বরের অপরাজিতত্ব গুণ লাভ করেন। তাঁর সমগ্র দেহ ও দেহের ইন্দ্রিয়গুলি চৈতন্যময় হয়ে ওঠে। সমস্ত দেহাভিমান ও ইন্দ্রিয়চেতনা লীন হয়ে যায় আত্মচৈতন্যে। ফলে জল, বায়ু, অগ্নিজনিত কোন ভৌতিক বা জাগতিক বিঘ্ন তাঁকে পরাভূত করতে পারত না। বরং ঐ সব কিছুকেই তিনি বশীভূত করতে পেরেছিলেন। ঈশ্বরের ধারণাবলে লোকনাথ এমন এক তুরীয় অবস্থা প্রাপ্ত হয়েছিলেন যে, যে সব সিদ্ধি অন্য সাধকের পক্ষে লাভ করা অসম্ভব, তিনি সেগুলি অনায়াসেই লাভ করে থাকেন।

বাবা লোকনাথ ছিলেন ব্রহ্মজ্ঞ। ব্রহ্মস্বরূপ অনুভূত হয়েছিল তাঁর অন্তরে। তাঁর কাছে ঈশ্বর ছিলেন প্রত্যগাত্মা। তাই ঈশ্বর সর্বদাই তাঁর সন্নিহিত অর্থাৎ তাঁর কাছে থাকতেন। তাঁর হৃদয়ে বিরাজ করতেন।

ঈশোপনিষদের পঞ্চম মন্ত্রে বলা হয়েছে, ঈশ্বর গমন করেন, আবার গমন করেন না। তিনি দূরে, আবার অতি নিকটে। তিনি সমস্ত দৃশ্যমান জগতের অন্তরে ও বাইরে সর্বদা একই সঙ্গে বিরাজমান।

গীতায় ষষ্ঠ অধ্যায়ে ভগবান কৃষ্ণ বলেছেন, ব্রহ্ম সর্বভূতের অন্তরে ও বাইরে বিদ্যমান। স্থাবর ও জঙ্গম সমস্ত ভূতরূপে তিনি বিরাজিত। একই সঙ্গে দূরে ও নিকটে অবস্থিত ব্রহ্ম সূক্ষ্মতম সত্তা বলে ইন্দ্রিয়দ্বারা মানুষ তাঁকে জানতে পারে না। তিনি নামরূপাদিবিহীন বলেন অবিজ্ঞেয়।

লোকনাথবাবা ছিলেন আজীবন ব্রহ্মচারী। তাঁর সুদীর্ঘকালের সাধন-

জীবনে তিনি একমাত্র ব্রহ্ম ছাড়া অন্য কোন দেবদেবীর উপাসনা করেননি। সারা জীবন শুধু এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মেরই ধ্যান ও ধারণা করে গেছেন।

এই ধ্যান ও ধারণার বলে লোকনাথবাবা শুধু ব্রহ্মজ্ঞানই লাভ করেননি, তিনি হয়ে উঠেছিলেন ব্রহ্মস্বরূপ, ব্রহ্মভূত। তাই যারা ব্রহ্মস্বরূপ জানত না, তাদের কাছ থেকে তিনি থাকতেন লক্ষ যোজন দূরে। আবার যাদের মধ্যে ব্রহ্মস্বরূপ অনুভূত হয়েছে, তাদের অতি সন্নিকটে থাকতেন। ব্রহ্মের মতই তিনি ছিলেন সূক্ষ্মতম সত্তা। তাই ব্রহ্মের মতই তিনি ছিলেন অবিজ্ঞেয়। তাই ইন্দ্রিয়দ্বারা তাঁকে জানা যেত না। তিনি নামরূপাদিময় দেহ ধারণ করে এক জায়গায় অবস্থান করলেও তাঁর সূক্ষ্ম আত্মা সর্বভূতে ছিল পরিব্যাপ্ত। তাঁর সেই সূক্ষ্ম আত্মা স্থূলদেহ ত্যাগ করে স্বর্গ ও মর্ত্যলোকের যে কোন স্থানে ইচ্ছামত বিচরণ করতে পারত। তাই তিনি বহুদূরের যে কোন বস্তু বা ঘটনাকে প্রত্যক্ষ করতে পারতেন। দূরস্থিত যে কোন জীবের দুঃখ অনুভব করতে পারতেন। তাই তিনি বহুদূরে অবস্থিত কত বিপন্ন মানুষদের বিপন্মুক্ত করতেন। এমন কি বিপন্ন ব্যক্তি তাকে স্মরণ না করলেও বা তাঁকে না ডাকলেও তিনি অযাচিতভাবে সূক্ষ্ম-দেহে তার কাছে ছুটে গিয়ে উদ্ধার করেছেন তাকে বিপদ থেকে। প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ তার প্রমাণ। চন্দ্রনাথ পাহাড়ে পরিভ্রমণ কালে বিজয়কৃষ্ণ দাবা-নলের মধ্যে আটকে পড়লে তিনি বাবা লোকনাথকে স্মরণ না করলেও এবং বাবা তাঁর কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত হলেও সর্বজ্ঞ বাবা সুদূর বারদীর আশ্রম থেকে তাঁর বিপদের কথা জানতে পেরে ছুটে গিয়ে তাঁর বিশাল বপুটিকে কোলে নিয়ে জ্বলন্ত দাবাগ্নির লেলিহান শিখাগুলিকে অবলীলা-ক্রমে অতিক্রম করে নিরাপদ জায়গায় তাঁকে রেখে আসেন।

ওঁ

লোকনাথ বাবার জনপ্রিয়তা দিনে দিনে বেড়ে যেতে থাকে। বাবার অলৌকিক যোগশক্তি ও যোগৈশ্বর্যের কথা লোকমুখে সর্বত্র প্রচারিত হতে থাকে। ফলে পূর্ববাংলার বিভিন্ন জেলা থেকে ত্রিতাপজ্বালাগ্রস্ত কত নরনারী শান্তির আশায় বারদীর আশ্রমে এসে লুটিয়ে পড়ে বাবার চরণে।

বাবার কৃপায় ও যোগবলে শরণার্থীদের সব সমস্যার প্রতিকার হয়। রোগ-গ্রস্তদের রোগ নিরাময় হয়। মুমুক্ষুরা মোক্ষলাভের সঠিক উপদেশ পায়। সাধকেরা যোগসাধনার গুহ্য প্রক্রিয়াগুলি বাবার কাছে শিখে নেয়। তাই লোকনাথ বাবার আধ্যাত্মিক প্রভাব সর্বত্র বেড়ে যেতে থাকে ধর্ম পিপাসু লোকদের উপর।

এদিকে লোকনাথ ব্রহ্মচারীর প্রভাব ধর্মজগতে যতই বেড়ে যেতে থাকে, ঢাকার ব্রাহ্মসমাজের প্রভাব ততই কমতে থাকে। সাধারণ ধর্মপিপাসু মানুষ ব্রাহ্মধর্মে আস্থা হারিয়ে ফেলে। ব্রাহ্মসমাজের লোকেরা ব্রহ্মের উপাসনা করলেও স্বয়ং ব্রহ্মস্বরূপ ব্রহ্মভূত লোকনাথবাবার মত কোন শক্তি-মান পুরুষের আবির্ভাব ঘটেনি সে সমাজে। তাই লোকনাথবাবার ক্রম-বর্ধমান প্রভাবকে খণ্ডন করার শক্তি ব্রাহ্মসমাজের ছিল না।

ফলে ঢাকার ব্রাহ্মসমাজের লোকেরা রাগে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে বারদীর ব্রহ্ম-চারীবাবার উপরে। তারা বুঝতে পারে, অসামান্য যোগ শক্তির অধিকারী অমিতপ্রভব লোকনাথবাবার বিরুদ্ধে বিরূপ প্রচারের দ্বারা বারদীর আশ্রম থেকে তাঁকে বিতারিত করা অসম্ভব তাদের পক্ষে। কারণ সারা বারদী গ্রাম ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের ছোট বড়' উচ্চ নীচ, শিক্ষিত অশিক্ষিত নির্বিশেষে সব মানুষই তাঁর একনিষ্ঠ ভক্ত।

তাই ঢাকার ব্রাহ্মসমাজের লোকেরা অবশেষে এক জঘন্যতম উপায় অবলম্বন করল। তারা দীর্ঘদিন ধরে ষড়যন্ত্র করে অবশেষে দুজন হীন-প্রকৃতির ব্রাহ্মযুবককে লোকনাথবাবাকে গোপনে মেরে তাড়িয়ে দেবার কাজে নিযুক্ত করল।

ব্রাহ্মযুবকদুটি ঠিক করল, রাতের অন্ধকারে চুপিচুপি বারদীর আশ্রমে গিয়ে এই কাজ সারবে। এই ভেবে একদিন গভীর রাতে যুবকদুটি লাঠি হাতে চুপি চুপি আশ্রমের উঠোনে গিয়ে উপস্থিত হলো। তারা ঠিক করল, তারা লোকনাথ ব্রহ্মচারীকে এমন মার মেরে আশ্রম থেকে তাড়িয়ে দেবে যাতে তিনি ভয়ে আর কখনো এখানে না আসেন।

তখন নিশুতি রাত। আশ্রমের সব লোক ঘুমিয়ে পড়েছে। সমগ্র আশ্রমটি রাতের অন্ধকারে নিস্তব্ধ নিঝুম হয়ে আছে। যুবকদুটি লাঠি হাতে উঠোনে থমকে দাঁড়িয়ে বাবার ঘরের দিকে লক্ষ্য করতে লাগল।

এমন সময় সহসা এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটল। কোথা থেকে এক হিংস্র বাঘিনী গর্জন করতে করতে যুবকদুটির দিকে ছুটে এল। যুবকদুটি তখন দারুণ ভয় পেয়ে চিৎকার করে আশ্রমের একটি ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল।

কিছুক্ষণ পর তারা ঘরের বেড়ার ফাঁক দিয়ে উঁকি মেরে দেখল, হঠাৎ লোকনাথবাবা তাঁর ঘর হতে বেরিয়ে আসছেন। তা দেখে তারা খুশী হলো। তারা ভাবল, তাদের আর কষ্ট করে মারধোর করে তাড়াতে হবে না লোকনাথ ব্রহ্মচারীকে। বাঘিনীই তাঁকে ছিঁড়ে খেয়ে তাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করবে।

এক প্রবল কৌতূহলের বশে তারা বেড়ার ফাঁক দিয়ে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল বাঘিনী কি করে দেখার জন্য। কিন্তু যা তারা দেখল তাতে এক অপার অপরিসীম বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়ল তারা। এত বড় বিস্ময়কর ঘটনা তারা জীবনে দেখা ত দূরের কথা, কানে কখনো শোনেও নি। তারা যা ভেবেছিল, হলো তার উল্টো। তারা ভেবেছিল, বাঘিনী লোকনাথবাবাকে একা পেয়ে তাঁর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাঁর জীবন্ত দেহ-টাকে ছিঁড়ে খুঁড়ে খাবে অথবা মুখ দিয়ে গলাটা ধরে যেমন করে বাঘে মানুষ অথবা কোন পশুকে নিয়ে যায়, সেইভাবে নিয়ে পালিয়ে যাবে।

কিন্তু তারা দেখল, সেই ভয়ঙ্কর হিংস্র বাঘিনীটা তার সব ক্রুদ্ধ গর্জন থামিয়ে নিশ্চুপ ও শান্ত হয়ে পোষা বিড়ালের মত লুটিয়ে পড়ল লোক-নাথবাবার পায়ের উপর। লোকনাথবাবা তখন তার গলায় ও মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে বললেন, মাগো, তোমার এসময়ে আশ্রমে আসা ঠিক হয়নি। দেখছমা, তোমার ভয়ে বেচারা যুবকদুটির কত কষ্ট হচ্ছে। আমার কাছে তারা আসতে পারছে না।

বনের হিংস্র বাঘ যে মানুষের কথা বুঝতে পারে, তা তাদের ধারণা ও কল্পনা অতীত। তারা দেখল, লোকনাথবাবার কথা শুনে বাঘিনী শান্তভাবে উঠে দাঁড়াল। তারপর লোকনাথ বাবার মুখপানে একবার তাকিয়ে এক লাফে চলে গেল আশ্রম থেকে।

এই অভূতপূর্ব অলৌকিক দৃশ্য দেখে আরও বিস্মিত হলো যুবকদুটি। তারা বুঝল, লোকনাথ ব্রহ্মচারী এক সাধারণ সাধক বা ভণ্ড সন্ন্যাসী নন,

তিনি এক অসাধারণ অলৌকিক যোগশক্তির অধিকারী। এক অসামান্য মহাপুরুষ। যে মহাশক্তিধর মহাপুরুষের কথা বা উপদেশ বনের বাঘও বোঝে এবং যাঁর দর্শনমাত্র বাঘ তার স্বভাবজাত হিংস্রতা ও হিংসাবৃত্তি ভুলে শান্তভাবে তাঁর চরণে লুটিয়ে পড়ে, সেই মহাপুরুষকে আঘাত করা তাদের পক্ষে যে কত অবান্তর ও হাস্যাস্পদ ব্যাপার তা বুঝে তাদের অনুতাপ ও অনুশোচনার অবধি রইল না। তারা যার পর নাই অনুতপ্ত ও লজ্জিত হয়ে ধীর পদক্ষেপে লোকনাথ বাবার কাছে এসে তাঁর পায়ে পড়ে তাদের দোষ স্বীকার করে বারবার কৃপাভিক্ষা করতে লাগল। অশ্রুজলে কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে পড়ে ছিল তাদের।

যে যত বড়ই অপরাধ করুক, সে তার দোষ অকুণ্ঠভাবে স্বীকার করলে বাবার চিত্ত দয়ায় বিগলিত হত। তিনি সে অপরাধীকে ক্ষমা না করে পারতেন না।

অনুতপ্ত যুবকদুটির স্বীকারোক্তি ও ক্ষমাপ্রার্থনা শুনে বাবালোকনাথ তাদের ক্ষমা করে বললেন, যা, তোরা বাড়ি ফিরে যা, তোদের চৈতন্য হোক। এমন কাজ আর কখনো করতে যাস না।

বাবা লোকনাথ তাঁর এই লীলার দ্বারা বোঝাতে চাইলেন, হিংসা থেকেই হিংসার উদ্ভব হয়। ব্রাহ্ম যুবকদুটির অন্তরে হিংসাবৃত্তি থাকার জন্য বাঘিনী তাদের লক্ষ্য করে ছুটে এসেছিল। কিন্তু মহাযোগী লোকনাথ-বাবার অহিংসাবৃত্তি সম্যকভাবে স্থির হয়েছিল। অর্থাৎ স্বপ্নেও কারো প্রতি কখনো হিংসার উদয় হত না তাঁর মনে। তাই তাঁর কাছে কোন হিংস্র জন্তুরই হিংসা বৃত্তি থাকত না। তাঁর অহিংসাবৃত্তির প্রভাবে তারাও তাদের হিংসা বৃত্তি ভুলে যেত।

তাছাড়া এটি হলো মহাপুরুষদের সিদ্ধিসূচক যোগৈশ্বর্য প্রকাশের লীলা। শক্তিমান সাধকযোগীদের জীবনে এই লীলার বিরল প্রকাশ দেখা যায়। মহামুনি বশিষ্ঠদেবের আশ্রমে কোন হিংসা ছিল না। সেখানে বাঘে বলদে এক জলাশয়ের একই ঘাটে জল পান করত। একবার নেপালের মহারাজ হিমালয়ের জঙ্গলে একটি বাঘকে শিকার করতে গেলে বাঘটি মহাযোগী তৈলঙ্গ স্বামীর চরণে গিয়ে আশ্রয় নেয় এবং স্বামীজীও তাকে অভয় দেন। অতীতে চন্দ্রনাথ পাহাড়ে তপস্যা করার সময় লোকনাথবাবাও

এক বাঘিনীর বাসার কাছে একটি গুহায় কিছুকাল অবস্থান করেছিলেন। সে সময় তাঁর কথা বাঘিনী বুঝতে পারত এবং সেইমত কাজ করত।

মহাযোগী লোকনাথবাবা ছিলেন পতিতপাবন। তিনি পাপকে ঘৃণা করতেন। কিন্তু পাপীকে কখনো ঘৃণা করতেন না। তিনি সব সময় পাপীকে পাপকাজ হতে প্রতিনিবৃত্ত করার চেষ্টা করতেন। তাকে পাপ থেকে বিরত থেকে ভাল হয়ে ওঠার সুযোগ ও উপযুক্ত শিক্ষা দিতেন।

সেদিন বাবা লোকনাথ তাঁর ঘর থেকে বাইরে এসে আশ্রমের উঠোনে দাঁড়ালেন। ঘরের বারান্দায় কয়েকজন ভক্ত বসেছিলেন। এমন সময় কোথা থেকে এক স্ত্রীলোক এসে বাবার পাশে দাঁড়ালেন। যাঁর পরনে ছিল লাল শাড়ী। তিনি শীতলামুখী অর্থাৎ সারা মুখে বসন্তের দাগ ছিল।

স্ত্রীলোকটি বাবাকে বললেন, আমি বসন্ত রোগের অধিষ্ঠাত্রী দেবী শীতলা। আমি এখান দিয়ে যাব। আমার পথ ছাড়।

বাবা লোকনাথ বললেন, মা, তুমি এখান দিয়ে যেতে পারবে না।

এরপর দুজনেই কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর শীতলা দেবী বললেন, আমি যাচ্ছি।

এই বলে দেবী বাবার সামনে দিয়ে এক পা বাড়িয়েছেন, অমনি বাবা লোকনাথ গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, আমি কিন্তু এখনো দাঁড়িয়ে আছি। দেখি, কার সাধ্য এদিকে যায়।

একথা শুনে দেবী যে পা টি যাবার জন্য উঠিয়েছিলেন তা সেই খানেই নামিয়ে রাখলেন। যাবার জন্য উদ্যত হয়েও যেতে পারলেন না। তারপর বললেন, তাহলে আমি কি যাবার পথ পাব না? এখানেই কি দাঁড়িয়ে থাকব?

তখন বাবা লোকনাথ বললেন, না মা, তোমাকে আর দাঁড়িয়ে থাকতে হবে না। ঐ যে সামনে বাঘিনী নদী দেখছ, তার তীরবর্তী ঢালভূমি ধরে তুমি চলে যাও। তবে সাবধান করে দিচ্ছি, উঁচু সমভূমিতে উঠতে যেও না।

দেবী বাবার আদেশ পেয়ে সেই পথে চলে গেলেন।

এই ঘটনার দিন কয়েক পর এক ভুঁইমালীর বাড়ির অনেকে বসন্ত রোগে আক্রান্ত হলো। একদিন ঐ ভুঁইমালী আশ্রমে বাবার কাছে এসে কান্নাকাটি করতে লাগল। বাবা তখন তাকে জিজ্ঞাসা করে জানলেন, তার

বাড়ি বাঘিনী নদীর তীরে ঢালভূমিতে অবস্থিত।

তা জেনে বাবা লোকনাথ তাকে বললেন, তুই এই মুহূর্তে বাড়ি ছেড়ে বাড়ির লোকজনদের সব নিয়ে চলে যা। ওখানে থাকলে আর রক্ষে নেই।

ভুঁইমালী বাবার কথামত সেখান থেকে চলে গেল।

মহাযোগী লোকনাথ ছিলেন ব্রহ্মজ্ঞ, ব্রহ্মলোকের অধিকারী। তাই দেবলোকের উপর তাঁর আধিপত্য জন্মায়। তাই মা শীতলাদেবী তাঁকে অতিক্রম করে যেতে পারেননি। আবার তিনি অনুমতি না দেওয়া পর্যন্ত তাঁর আজ্ঞা লঙ্ঘন করেও যেতে পারেননি। এর দ্বারা বোঝা যায়, দেবদেবী-গণও ব্রহ্মলোকের অধিকারীদের অমর্যাদা করে বা তাঁদের আজ্ঞা লঙ্ঘন করে কোন কাজ করেন না বা করতে পারেন না।

মহাযোগী বাবা লোকনাথ ধারণাকার্যে সিদ্ধ ছিলেন। তাই তিনি দেবদেবীগণের সঙ্গে ক্রীড়া করতে পারতেন। আবার দেবতাদের সঙ্গে ক্রীড়াকরণ সিদ্ধি ছাড়াও তিনি অপ্রতিহত আজ্ঞা সিদ্ধির অধিকারী ছিলেন। অর্থাৎ তাঁর আজ্ঞা অমান্য করার ক্ষমতা দেব দেবীগণেরও ছিল না।

ওঁ

চিকান্দীর উকীল ব্রজেন্দ্রকুমার বসু একবার দুরারোগ্য শূলরোগে অর্থাৎ পেটের ব্যথায় আক্রান্ত হন। অনেক ডাক্তারবৈদ্যের কাছে চিকিৎসা করিয়েও কোন ফল পাননি। ফলে রোগ কমার পরিবর্তে বেড়ে যেতে থাকে।

ব্রজেন্দ্রবাবু যখন পেটের অসহ্য বেদনায় খুবই কষ্ট পাচ্ছিলেন, তখন তা দেখে একদিন লোকনাথবাবার এক ভক্ত তাঁকে বারদীর আশ্রমে বাবার কাছে যেতে বলেন। ব্রজেন্দ্রবাবুও তা শুনে রোগ নিরাময়ের জন্য বারদী যাবার জন্য প্রস্তুত হলেন।

অবিলম্বে একদিন ব্রজেন্দ্রবাবু আরোগ্য লাভের আশায় বারদীর আশ্রমে এসে উপস্থিত হলেন। বাবা লোকনাথ তখন ভক্তদের মাঝে বসেছিলেন। এমন সময় ব্রজেন্দ্রবাবু ঐ ভক্তদের কাছে গিয়ে বসলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর পেটের শূলবেদনা শুরু হলো।

ব্রজেন্দ্রবাবু তখন বাবার দিব্যদেহ দর্শন করে মনে মনে ভাবলেন, বাবার একখানি পা যদি একবার আমার ব্যথার জায়গায় স্পর্শ করাতে পারি, তাহলে এখনি এই ব্যথা প্রশমিত হবে। কিন্তু কিকরে তা সম্ভব তা ভেবে পেলেন না।

কী আশ্চর্য! সেই মুহূর্তেই বাবা লোকনাথ বললেন, ওরে, আমার পা টা বড় ঝিমঝিম করছে। ঝি ঝি ধরেছে। তোদের কেউ এসে পা টা টিপে দে ত।

এই কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে হাতে যেন চাঁদ পেয়ে গেলেন ব্রজেন্দ্রবাবু। তিনি ত এই সুযোগেরই অপেক্ষা করছিলেন। তাই তিনি তাড়াতাড়ি বাবার কাছে গিয়ে তাঁর পাশে বসে ভক্তিভরে তাঁর পা খানি প্রথমে তাঁর পেটের ব্যথার জায়গায় স্পর্শ করালেন। তারপর টিপতে লাগলেন। সত্যিসত্যিই মহাপুরুষের দিব্যদেহের স্পর্শে তাঁর অপার করুণায় সেই মুহূর্তেই তাঁর শূলরোগ চিরদিনের জন্য দূর হয়ে গেল।

সত্যিই বাবা লোকনাথ অন্তর্যামী। তিনি ব্রজেন্দ্রবাবুর মনের গোপন ইচ্ছার কথা বুঝতে পেরেছিলেন। তাই এক অপূর্ব কৃপা-কৌশলে ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূরণ করলেন। মহাযোগী বাবা তাঁর ঐশী শক্তির দ্বারা ব্রজেন্দ্রবাবুর রোগ নিরাময় করলেন।

পরে ব্রজেন্দ্রবাবু ভক্তদের কাছে কথাটি খুলে বলেন। রোগী তার রোগ সারাবার কথা বাবাকে না বললেও বাবার স্পর্শমাত্র তার রোগ সেরে গেল। ভক্তদের কাছে এ এক পরম বিস্ময়ের কথা।

একদিন বাবা লোকনাথের এক ভক্ত বাবাকে জিজ্ঞাসা করলেন, আচ্ছা বাবা, শুনেছি কোন সাধক তাঁর ঐশীশক্তি বলে কোন রোগীর রোগ সারালে সেই রোগ তাঁকে গ্রহণ করতে হয়। কিন্তু আপনি কত রোগীর রোগ সারালেও নিজে সে রোগ গ্রহণ করেন না ত। অথচ রোগীর রোগ সেরে যায়, কি করে তা সম্ভব হয়?

বাবা লোকনাথ বললেন, রোগীর উপর আমার দয়া হলেই আমার ঐশী-শক্তিতে রোগ সেরে যায়।

ভক্তটি তখন আবার জিজ্ঞাসা করলেন, কি করলে আপনার কৃপা বা দয়া পাওয়া যায়?

বাবা বললেন, আমাকে তুষ্ট করলেই আমার কৃপা পাওয়া যায়। জানিস, যে কোন রোগী আমার শরণাপন্ন হলেই আমি আর সুস্থির থাকতে পারি না। রোগীদের কষ্ট দেখে আমার হৃদয় গলে যায়।

ভক্তটি তখন জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কিসে তুষ্ট হন বাবা?

বাবা বললেন, তা ত আমি জানি না। বলতেও পারি না।

সেদিন বারদীর আশ্রমে কয়েকজন লোক নানারকমের পুজোর সামগ্রী নিয়ে উপস্থিত হয়েছে। বাবা লোকনাথের এক ভক্ত জানকীনাথ চক্রবর্তী তখন আশ্রমে উপস্থিত ছিলেন।

জানকীনাথ কৌতূহলী হয়ে লোকগুলিকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা কিসের পুজো দিতে এসেছ?

লোকগুলি উত্তর করল, আমরা মানসিক শোধ করতে এসেছি। তা না হলে রোগী রোগমুক্ত হবে না।

জানকীনাথ আবার জিজ্ঞাসা করলেন, কার মানসিক শোধ করতে এসেছ?

তখন সেই আগন্তুক লোকগুলির মধ্যে একজন ব্যাপারটা খুলে বলল। সে বলল, বছরখানেক আগে আমাদেরই এক আত্মীয়কে সাপে কামড়ায়। ক্রমে বিষ প্রবল হয়ে সারা দেহে ছড়িয়ে পড়ে। নামকরা ওঝা ও বৈদ্যদের ডাকা হয়। কিন্তু তাঁরা শত চেষ্টা সত্ত্বেও বিষ নামাতে পারলেন না!

অবশেষে বাড়ির লোকদের পরামর্শে বাবা লোকনাথকে মানত করা হলো। সাপে কামড়ানো লোকটির মা বললেন, হে ব্রহ্মচারী বাবা, আপনি আমার ছেলেকে বিষমুক্ত করে দিন। আমি মানত করছি আপনার নামে।

এই মানত করার সঙ্গে সঙ্গে বিষ নামতে শুরু করল। রোগী একেবারে সুস্থ হয়ে উঠল।

কিন্তু ভাগ্যের এমনই ছলনা যে, সে বাড়ির কেউ কেউ বলল, আসলে বৈদ্যের চিকিৎসাগুণেই বিষ নেমেছে, ব্রহ্মচারীবাবার কৃপায় নয়। সবাই মিলে রোগীর মাকে এমনভাবে বোঝাল যে, তিনিও পাঁচ জনের কথায় সত্যরক্ষা করলেন না। লোকনাথবাবাকে পুজো না দিয়ে তাঁর সঙ্গে প্রবঞ্চনা করলেন। এইভাবে পুজো দেবার সময় পার হয়ে গেল। কেউ আর সে কথা ভাবল না।

আজ একবছর পর আবার সেই সর্পদষ্ট লোকটি দংশনের জায়গায় বেদনা অনুভব করছে। বিষ যেন তার সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে পড়ছে বলে মনে হচ্ছে। লোকটি এখন বাড়িতে শুয়ে বেদনায় ছটফট করছে। এখন বাড়ির লোকেরা নিজেদের ভুল বুঝতে পেরেছে। তারা বুঝতে পেরেছে, ব্রহ্মচারী বাবা যোগসিদ্ধ মহাপুরুষ। সাক্ষাৎ দেবতা। তাঁর উদ্দেশ্যে মানত-করা পুজো দেওয়া হয়নি, তাঁর সঙ্গে প্রবঞ্চনা করা হয়েছে বলেই একবছর পর আশ্চর্যভাবে বিষক্রিয়া আবার শুরু হয়েছে। তাই আমরা বাবা লোকনাথের শরণাপন্ন হয়ে মানতকরা পুজো দিতে এসেছি।

এই বলে তারা লোকনাথের চরণ ধরে ক্ষমা প্রার্থনা করল। তারা অনুতপ্ত হয়ে দোষ স্বীকার করায় বাবার চিত্ত দয়ায় বিগলিত হলো। তিনি তাদের দোষ ক্ষমা করে তাদের নিবেদিত পুজো গ্রহণ করলেন।

পুজো শেষ করে তারা বাবার আশীর্বাদ নিয়ে বাড়ি ফিরে গেল। তারা বাড়ি ফিরে গিয়ে দেখল, মহাপুরুষের কৃপায় বিষক্রিয়া বন্ধ হয়ে গেছে। রোগীর দেহের কোন জায়গায় আর কোন বেদনা নেই।

মহাপুরুষের সঙ্গে প্রবঞ্চনা করে কেউ কখনো শান্তিলাভ করতে পারে না। রোগীর মা বাবা লোকনাথের উদ্দেশে যে মানত করে পুজো দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, যে প্রতিশ্রুতি তিনি পালন করেননি। অর্থাৎ সত্যভঙ্গ করেছেন। বাবা লোকনাথ বলতেন, সত্যপালনই প্রকৃত ধর্ম। যারা সত্যপালন করে না, তারা ধর্মদ্রোহী। তারা অপরাধী, পাপী। তাদের নরকে গতি। তারা শাস্তি পাবার যোগ্য।

এখানে দেখা যাচ্ছে, রোগীর মা প্রতিশ্রুতি পালন না করে সত্যভ্রষ্ট ও ধর্মভ্রষ্ট হয়েছিলেন। তাই তাঁর পাপে তাঁর পুত্র বিষক্রিয়ায় আবার অসুস্থ হয়ে পড়ে গুরুতরভাবে।

কিন্তু অনুতাপে পাপীর সব পাপ ধুয়ে যায়। তাই একবছর পর প্রতিশ্রুতি পালনের কথা মনে পড়লে রোগীর আত্মীয়েরা অনুতপ্ত হৃদয়ে বাবা লোকনাথের আশ্রমে পুজো দিতে আসেন। তখন তারা পাপমুক্ত হয়। সত্যরক্ষার দ্বারা বাবা লোকনাথের কৃপা লাভ করে তারা ধন্য হয়। রোগীও সম্পূর্ণরূপে রোগমুক্ত হয়ে সুস্থ হয়ে ওঠে।

প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর শিষ্য বিপিনবিহারী রায় যক্ষ্মা রোগে

আক্রান্ত হন। প্রাণভয়ে ভীত হয়ে রোগমুক্তির আশায় তিনি তাঁর গুরু বিজয়কৃষ্ণের গেণ্ডারিয়া আশ্রমে উপস্থিত হন। কিন্তু বিজয়কৃষ্ণ তাঁকে বারদীর আশ্রমে লোকনাথ ব্রহ্মচারীর কাছে যেতে আদেশ করলেন।

বিপিনবাবু তখন গোঁসাইজীর অন্তরঙ্গ শিষ্য শ্রীধরচন্দ্র ঘোষ ও আরো কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে বারদীর আশ্রমে যাবার জন্য প্রস্তুত হলেন। শ্রীধর বললেন, খালি হাতে সাধুদর্শন করতে নেই।

তাই শ্রীধরের কথামত বিপিনবাবু বাবা লোকনাথের সেবার জন্য নানাবিধ ফল, তরিতরকারি ও চারটে বড় বড় পাকা ফজলি আম কিনে আনলেন। তাছাড়া সঙ্গীদের খাবার জন্য এক টুকরি আমও কিনলেন।

জলপথে যাবার জন্য নৌকোয় উঠে বিপিনবাবু শ্রীধরকে বললেন, ভাই, তোমাদের জন্য এক টুকরি আম আছে। খিদে পেলে তা থেকে খেও। কিন্তু ঐ চারটি ফজলিতে হাত দিও না। আমি নিজের হাতে ঐ চারটি আম বাবা লোকনাথকে নিবেদন করব।

একথা শুনে শ্রীধর বললেন, এমন কথা তুমি আমাকে বলতে পারলে? তুমি ব্রহ্মচারীবাবার উদ্দেশে যে আম নিয়ে যাচ্ছ, আমি তা খাব?

বিপিনবাবু তখন অপ্রস্তুত হয়ে ক্ষমা চাইলেন।

নৌকো চলতে শুরু করল। বেশ কিছুদূর যাবার পর নৌকো একটা বাজারের কাছে গিয়ে থামল। বিপিনবাবু ও অন্যান্য সঙ্গীরা নৌকো থেকে নামলেন। কিন্তু শ্রীধর বললেন, তোমরা বাজার থেকে ঘুরে এস। আমি যাব না। এখানেই থাকব।

বিপিনবাবু তখন বললেন, ভাই শ্রীধর, ইচ্ছে হলে টুকরি থেকে আম নিয়ে খেও।

শ্রীধর কোন কথা না বলে চুপ করে গম্ভীর হয়ে বসে রইলেন। বিপিনবাবু এগিয়ে চলতে চলতে বারবার পিছু ফিরে শ্রীধরের পানে তাকাতে লাগলেন।

তাঁরা চলে গেলে এক ভিখারিণীর সঙ্গে চারটি পাঁচ সাত বছরের উলঙ্গ ছেলে নৌকোর কাছে এসে দাঁড়াল। শ্রীধর তাদের জিজ্ঞাসা করলেন, কি চাও তোমরা?

তারা বলল, বাবা, কিছু খেতে দেবে ?

এই কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে শ্রীধর বাবার উদ্দেশ্যে রাখা সেই চারটে ফজলি আম নিয়ে চারটি ভিখারি ছেলের হাতে দিলেন। তারপর বললেন, এখন পালা। তা না হলে আম কেড়ে নেবে।

এই কথা শুনে তারা ছুটে পালিয়ে গেল। শ্রীধর তার জায়গায় বসে নির্বিকারভাবে ভজন গাইতে লাগলেন।

ঘটনাচক্রে পথে ঐ চারটি ছেলের হাতে চারটি ফজলি আমের উপর বিপিনবাবুর নজর পড়ল। তিনি তখন সঙ্গীদের বললেন, পাগলের কান্ড দেখলে ? শ্রীধর সর্বনাশ করেছে। এত করে বলা সত্ত্বেও পাগল শ্রীধর সেই আম চারটে ছেলেদের দিয়ে দিয়েছে।

বিপিনবাবু ছেলেগুলিকে কিছু পয়সা দিয়ে চারটি আম নিয়ে নিলেন। তারপর রাগে গর্জন করতে করতে নৌকোর কাছে এসে গালাগালি করে শ্রীধরকে বললেন, কী আক্কেল তোমার ? কোন্ বিবেচনায় আম চারটে তুমি ছেলেগুলোকে দিয়েছিলে ? কার হুকুমে তা তুমি দিয়েছ ? জান না, তা আমি ব্রহ্মচারীবাবার নামে রেখেছিলাম ?

শ্রীধর বললেন, দিয়েছি ত কি হয়েছে ? ব্রহ্মচারীবাবার হুকুমেই তা দিয়েছি। যাও না, তাঁকে গিয়ে জিজ্ঞাসা করে এস।

একথা শুনে বিপিনবাবু আর কোন কথা না বলে চুপ করে গেলেন।

এদিকে তখন সন্ধ্যে হয়ে গেছে। নৌকোর মধ্যে প্রদীপ জ্বালতে হবে। কিন্তু পলতে নেই। একটু ছেঁড়া নেকড়া পেলেই তাতে কাজ চলে যাবে। কিন্তু কোথায় তা পাওয়া যাবে তা কেউ বুঝতে পারলেন না। সবাই ভাবতে লাগলেন।

তবে সবাই জানতেন, শ্রীধরের ঝোলার মধ্যে অনেক টুকরো টুকরো ময়লা নেকড়া আছে। কিন্তু সে ঝোলা বড় একটা খোলেন না। ঝোলাটা সব সময় কাছে কাছে রাখেন। মাথার নিচে রেখে শোন।

নৌকোর ভিতরটা একেবারে অন্ধকার। ঝোলাটা তখন শ্রীধরের কাছ থেকে কিছুটা দূরে এক জায়গায় রাখা ছিল। সঙ্গীরা ইশারা করতে বিপিনবাবু ভাবলেন, ঝোলা থেকে এক টুকরো বার করলে অন্ধকরে শ্রীধর তা দেখতে পাবেন না। এই ভেবে তিনি সেই ঝোলা থেকে একটা টুকরো

বার করলেন প্রদীপের পলতে হিসেবে তা ব্যবহার করার জন্য।

কিন্তু ঝোলা থেকে নেকড়াটা বার করার সঙ্গে সঙ্গে শ্রীধর এক বিকট চিৎকার করে বিপিনবাবুর ঊরুটা কামড়ে ধরলেন। বিপিনবাবু কাতর হয়ে বাবাগো, মাগো, খুন করে ফেললগো বলে চিৎকার করতে লাগলেন।

শ্রীধর তখনো পর্যন্ত বিপিনবাবুর উরুটা ধরে থাকায় সঙ্গীরা ছুটে এসে শ্রীধরকে ধরে ছাড়াবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু ছাড়াতে পারলেন না। অবশেষে বিপিনবাবুর ক্ষত বিক্ষত ঊরু থেকে রক্ত ঝরতে শুরু করলে শ্রীধর ছেড়ে দিলেন নিজে থেকে।

মাঝিরা বললে, আপনারাও সবাই মিলে শ্রীধরবাবুকে কামড়ে দিন।

তা শুনে যাত্রীরা সকলে শ্রীধরের পিঠে কামড় দিলেন। শ্রীধর তখন 'জয় বাবা, জয় বাবা' বলে নদীর জলে ঝাঁপ দিলেন। কিন্তু শ্রীধর সাঁতার জানেন না বলে সঙ্গীরা এত কিছু সত্ত্বেও চিন্তিত হয়ে পড়লেন। তাঁরাও তখন শ্রীধরকে উদ্ধার করার জন্য নদীতে ঝাঁপ দিলেন। তারপর টানাটানি করে অনেক কষ্টে তাঁকে নৌকোয় তুলে আনলেন।

যাই হোক, সারারাত দারুণ উদ্বেগের মধ্যে কাটল। কারো ভাল ঘুম হলো না। ভোরবেলা বারদীর বাজারের ঘাটে এসে নৌকো ভিড়ল। তখন সকলে ফল-ফলাদি, তরিতরকারি সব নিয়ে আশ্রমের দিকে এগিয়ে চললেন। কিন্তু শ্রীধর গেলেন না। তিনি নৌকোতেই রয়ে গেলেন।

তাঁরা আশ্রমে পেঁছানোমাত্র সর্বজ্ঞ লোকনাথবাবা তাদের সকলকে কাছে ডাকলেন। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, হ্যাঁরে শ্রীধরকে দেখছি না।

বিপিনবাবুরা বললেন, সে নৌকায় বসে আছে।

বাবা আবার জিজ্ঞাসা করলেন, কেন সে এল না? তোরা কি তাকে মেরেছিস?

বিপিনবাবু বললেন, আজ্ঞে, সারা রাস্তা যে বড় জ্বালিয়েছে। দেখুন না, আমার ঊরু কামড়ে ঘা করে দিয়েছে।

এমন সময় হঠাৎ শ্রীধর এসে হাজির হলেন। বিপিনবাবু তখন বাবা লোকনাথের কাছে তাঁর রোগের কথা বলে আরোগ্যলাভের জন্য প্রার্থনা করছিলেন।

বাবা বললেন, হ্যাঁরে, শ্রীধর তোর উরু কামড়েছে না ? রক্ত বেরিয়েছে কি ?

বিপিনবাবু বললেন, আজ্ঞে হ্যাঁ, খুব রক্ত বেরিয়েছে।

বাবা বললেন, বিপিন, এতেই তোর রোগ সেরে যাবে। হ্যাঁরে, শ্রীধর কেন তোকে কামড়াল, তা ওকে জিজ্ঞাসা করিসনি ?

তখন সবাই মিলে শ্রীধরকে সে কথা জিজ্ঞাসা করলেন। শ্রীধর বললেন, আরে ভাই, তোরা তো সবাই বাজারে গেলি। আমি হঠাৎ সংকীর্তনের ধ্বনি শুনে চমকে উঠলাম। নৌকোর ভিতর থেকে বাইরে এলাম। কিন্তু কিছুই দেখতে পেলাম না। কোথায় সংকীর্তন ?

এরপর দেখি, বাবা লোকনাথ চারজন ঋষিবালককে সঙ্গে নিয়ে নৌকোর কাছে উপস্থিত। আমি তখন তাঁকে প্রণাম করলাম। তিনি তখন বললেন, কই, আমার চারটে ফজলি আম ? আমগুলি এনে এদের হাতে দিয়ে দে।

বাবার আদেশ শুনে আমি আম চারটে বালকদের হাতে দিয়ে দিলাম। বিশ্বাস না হয়, বাবাকেই জিজ্ঞাসা করো না ? তোমরা এসে তার জন্য আমাকে কতই না গালি দিলে। কিন্তু আমি তোমাদের গালি শুনে ভগবানের নাম করতে লাগলাম।

এরপর আবার দেখি আকাশ থেকে একটি সংকীর্তনের দল আসছে। দলের আগে আগে আসছেন বাবা লোকনাথ। এসেই তিনি বললেন, শ্রীধর তুই বিপিনের উরু কামড়ে দে। তাহলেই বিপিনের রোগ সেরে যাবে। কিন্তু আমি তখন ভাবতে লাগলাম, কিকরে কামড়াই ?

এমন সময় বিপিনবাবুর দিকে চেয়ে দেখলাম, তিনি আমার ঝোলা থেকে নেকড়া বার করছেন। তখন আমার মাথা গরম হয়ে গেল। কেন না নানা তীর্থস্থান ঘুরে সাধুসন্তদের কিছু না কিছু ব্যবহার করা কাপড়ের টুকরো সংগ্রহ করে আমার ঝোলায় ভরে রেখেছি। ঐগুলিই আমার একমাত্র সম্পদ। আর সেগুলি বিপিনবাবু নেকড়া ভেবে পলতে বানাতে যাচ্ছেন। তা দেখেই আমি তার উরু কামড়ে ধরলাম। কিন্তু রক্ত বার হচ্ছে না কিছুতেই। তারপর তোমরা যখন আমাকে কামড়ে ধরলে তখন আমি আরও জোর দিয়ে কামড়ালাম। তখন দেখি উরু থেকে রক্ত ঝরছে। অমনি

আমি লাফিয়ে উঠলাম। সামনে দেখি জোরাল সংকীর্তনের দল আসছে। সে দলে গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু, নিত্যানন্দ, অদ্বৈত ও গোঁসাইজী নৃত্য করছেন। আর বাবা লোকনাথ সে দলের আগে আগে আসছেন। আমি সব ভুলে সেই কীর্তনের দলে লাফিয়ে পড়লাম। তারপর দেখি জলে ডুবুনি খাচ্ছি। তখন তোমরা সবাই মিলে আমাকে টানাটানি করে নৌকোর উপরে তুলে আনলে।

শ্রীধরের এই অলৌকিক কাহিনী শুনে উপস্থিত সকলেই এক অপার বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গেলেন।

ধন্য শ্রীধর, ধন্য, বিপিনবিহারী রায় মশাই—তাঁরা দুজনেই বাবা লোকনাথের কৃপালাভ করেছেন। বাবা লোকনাথের সবই অলৌকিক লীলা। ঋষিবালকদের নিয়ে নৌকোর কাছে গিয়ে শ্রীধরের কাছ থেকে আম চেয়ে নেওয়া, শ্রীধরকে বিপিনবাবুর উরু কামড়ে রক্ত বার করবার আদেশ দেওয়া, সংকীর্তন দলের আগে আগে আকাশপথে আসা—সব কিছুই অলৌকিক ব্যাপার। মহাযোগী মহা শক্তিধর মহাপুরুষ লোকনাথ-বাবার পক্ষে সব কিছুই সম্ভব।

বাবা লোকনাথ দেহস্থ পঞ্চবায়ুর সঙ্গে দেহকে যুক্ত করে ঈশ্বরকে সেই সর্বব্যাপী বায়ুরূপে ধারণা করতে পারতেন। তাই তাঁর মনের গতি ছিল সর্বত্র অবাধ্য, অপ্রতিহত। এ অবস্থায় তাঁর মন যেখানেই যেত, তাঁর দেহও সূক্ষ্ম হয়ে সেখানেই যেতে পারত।

সেদিন ভাওয়ালের রাজা রায়বাহাদুর রাজেন্দ্রনারায়ণ তাঁর নিজের লঞ্চে করে বারদীর আশ্রমে এসেছেন বাবা লোকনাথকে দর্শন করার জন্য। লঞ্চে তিনি তাঁর হাতিও এনেছেন। বারদীর কাছে মেঘনা নদীতে লঞ্চ রেখে তিনি হাতির পিঠে চড়ে আশ্রমে এলেন। বাবাকে দর্শন করে প্রসাদ গ্রহণ করলেন। তিনি মাঝে মাঝে বাবাকে দর্শন করতে আসতেন।

কথাপ্রসঙ্গে রাজাবাহাদুর জানালেন, তাঁকে বিশেষ কাজের জন্য তখনি বাড়ি ফিরে যেতে হবে। তিনি বাবাকে বললেন, বাবা, আজ বিকালে ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার বিশেষ প্রয়োজন আছে। তাই এখনি আমাকে উঠতে হবে। আপনি অনুমতি দিলেই আমি রওনা হতে পারি।

সব কথা শুনে বাবা লোকনাথ বললেন, এখন তোর যাওয়া হবে না।

তখন রাজা বললেন, বাবা, এখন না গেলে আমার বিশেষ ক্ষতির সম্ভাবনা আছে।

কিন্তু এবারেও বাবা বললেন, না, তুই আজ যেতে পারবি না।

রাজাবাহাদুর আবার অনুমতি প্রার্থনা করলে বাবা সেই একই কথা বললেন, তুই যেতে পারবি না।

বারবার নিষেধ সত্ত্বেও রাজাবাহাদুর বাবার উদ্দেশে প্রণাম জানিয়ে রওনা হলেন। বিদায় নিয়ে হাতির পিঠে চড়ে লঞ্চের দিকে এগিয়ে চললেন। লঞ্চে উঠে সারেঙকে লঞ্চ ছেড়ে দিতে বললেন। লঞ্চ এগিয়ে চলল।

কিন্তু কিছুদূর যাবার পর আকাশে মেঘ উঠল। দেখতে দেখতে কালো মেঘে সারা আকাশ ছেয়ে গেল। তারপর প্রবল ঝড় বইতে লাগল। ঝড়ের দাপটে লঞ্চ ডুবে যাবার উপক্রম। সারেঙ জানাল, সে কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। এ অবস্থায় লঞ্চ চালানো অসম্ভব।

তখন রাজাবাহাদুরের চৈতন্য হলো। বাবা লোকনাথের নিষেধের কথা স্মরণ হলো। নিজের ভুল বুঝতে পেরে তিনি বললেন, আর এগিয়ে কাজ নেই। তুমি বারদীর ঘাটে ফিরে চল।

কী আশ্চর্য! যে লঞ্চ একেবারেই চালানো যাচ্ছিল না, সেই লঞ্চ ঘুরিয়ে স্টীয়ারিং ধরতেই দুরন্ত গতিতে বারদীর ঘাটে এসে পৌঁছল।

লঞ্চ থেকে নেমে সোজা আশ্রমে চলে গেলেন রাজাবাহাদুর। তারপর লজ্জা ও কুণ্ঠার সঙ্গে বাবার কাছে নীরবে উপস্থিত হতেই বাবা বললেন, আমি ত তোকে আগেই বলেছিলাম, যেতে পারবি না। শুনলি না আমার কথা। বুঝতে পারলি না, কেন যেতে বারণ করেছিলাম। যাক ভবিষ্যতে আমার কথা না শুনে আমাকে এ রকম জ্বালাতন করিস না। এর আগেও ত এ রকম হয়েছে। কিন্তু তাতেও তোর শিক্ষা হয়নি।

এবার নিজের অপরাধের জন্য লজ্জিত হয়ে ক্ষমা চাইলেন রাজাবাহাদুর। ঘণ্টাদুয়েক পর অবশ্য ঝড় থামলে লোকনাথবাবার অনুমতি নিয়ে তিনি রওনা হলেন।

সর্বজ্ঞ মহাযোগী বাবা লোকনাথ তখন আকাশে কোন মেঘ না থাকলেও জানতে পেরেছিলেন, অবিলম্বে ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা আছে। তাই তিনি

রাজাকে যেতে নিষেধ করেছিলেন। কিন্তু বাবার নিষেধ সত্ত্বেও রওনা হয়ে বিপদে পড়েছিলেন। তবে বাবাকে স্মরণ করে নিজের অপরাধের জন্য অনুতপ্ত হয়েছিলেন বলেই সে বিপদে কোন ক্ষয়ক্ষতি হয়নি তাঁর। সেই বিপদের মুখ থেকে নিরাপদে তিনি আশ্রমে ফিরে আসতে পেরেছেন।

ওঁ

ডাক্তার নিশিকান্ত বসু পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর পিতা। আমেরিকার চিকাগো শহরে তিনি ডাক্তারি করতেন। সেখানে চিকিৎসক হিসাবে তিনি সুপরিচিত ছিলেন।

ডাক্তার বসু ছিলেন বাবা লোকনাথের পরম ভক্ত বারদীর অন্যতম জমিদার অরুণকান্ত নাগ মশাইএর পিসতুত ভাই। দিনকতক আগে তিনি আমেরিকা থেকে বিশেষ এক কাজে বারদীতে এসেছেন।

সেদিন নিশিকান্তবাবু অরুণবাবুর সঙ্গে বারদীর আশ্রমে বাবা লোকনাথকে দর্শন করতে এলেন। আশ্রমে ঢুকে বাবাকে দর্শন করেই চমকে উঠলেন তিনি। বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে বলে উঠলেন, একি, ইনিই ত সেই মহাযোগী। দীর্ঘকায় জটাজুটধারী মহাপুরুষ। গায়ের তিলচিহ্নগুলি লোহিতবর্ণ।

চর্মাবৃত অস্থিরাশি অপরূপ প্রভাদীপ্ত। যেন স্নিগ্ধ নবনী। এই ত সেই অপার্থিব দৃষ্টি। পলকহীন নয়নযুগল স্থির ও অবিকৃত। পেয়েছি, আমি তাঁকে দেখতে পেয়েছি। ওগো মার্কিন শ্বেতাঙ্গনা, তুমি ধন্য, সত্যিই ধন্য।

পরে নিশিকান্তবাবুর চমকভঙ্গ হলে অরুণবাবু তাঁকে বললেন, কী ব্যাপার বলত। কি সব বলছিলে এতক্ষণ?

তখন নিশিকান্তবাবু বললেন, মাস কয়েক আগের ঘটনা। একদিন আমার চিকাগোর চেম্বারে এক সম্ভ্রান্ত মার্কিন মহিলা এসে উপস্থিত হলেন। আমি তাঁর আসার কারণ অর্থাৎ রোগের ব্যাপার জিজ্ঞাসা করলাম।

তিনি বললেন, দেখুন ডাক্তারবাবু, আমি শূলরোগে আক্রান্ত এক রোগিনী। আমার রোগের উপশমের জন্য পাশ্চাত্যের যত রকমের অতি আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থা চালু আছে, তা সবই একের পর এক করেছি।

কিন্তু কোন ফলই হয়নি। আমার রোগও সারেনি। তাই আমার ইচ্ছা, ভারতীয় প্রাচীন পদ্ধতিতে চিকিৎসা করাই। এই ভেবে আমি আপনার শরণাপন্ন হয়েছি। ভারতীয় প্রাচীন চিকিৎসা পদ্ধতির উপর আমার অগাধ শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস। অলৌকিক যোগশক্তির দেশ ভারত। আপনি সেই যোগশক্তির সাহায্যে আমার চিকিৎসা করুন।

আমি তাঁর কথা শুনে সেই মহিলাকে বললাম। আমি আমেরিকায় এসে পাশ্চাত্য চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা করেছি। আবার সেই শিক্ষা অনুসারেই এখানে প্র্যাকটিস করছি। ভারতীয় চিকিৎসা বিজ্ঞান সম্পর্কে আমার জ্ঞান সামান্য। তাছাড়া ভারতীয় যোগশক্তি সম্পর্কে আমার কোন অভিজ্ঞতাই নেই। সুতরাং কিকরে আমি যোগশক্তি দ্বারা চিকিৎসা করব?

এইভাবে আমাদের দুজনের মধ্যে কথাবার্তা চলছে। এমন সময় মহিলা সবিস্ময়ে চিৎকার করে উঠলেন, well doctor, who is there? who is behind you? অর্থাৎ আচ্ছা ডাক্তারবাবু, আপনার পিছনে যিনি দাঁড়িয়ে রয়েছেন, উনি কে?

মহিলাটি আরও বললেন, ডাক্তারবাবু দেখুন, আপনার পিছনে এক দীর্ঘকায় জটাজুটধারী মহাযোগী দাঁড়িয়ে রয়েছেন। ঐ দিব্যদেহে মাংস নেই। কিন্তু চর্মাবৃত অস্থিরাশি অপরূপ প্রভাদীপ্ত। তাঁর তিলচিহ্নগুলি কেমন লোহিতবর্ণ। কী অলৌকিক অপার্থিব তাঁর দৃষ্টি। পলকহীন নয়নযুগল স্থির ও অবিকৃত।

আমি তা শুনে বললাম, আপনি শান্ত হোন। এমন পাগলামি করছেন কেন? আমি কিন্তু কিছুই দেখছি না, দেখতে পাচ্ছিও না।

তখন ভদ্রমহিলা বললেন, ডাক্তারবাবু, আমি পাগল নই। এই দেখুন, আমি আমার ওষুধ পেয়ে গেছি। দেখুন, ঐ মহাযোগী, চকিতে আমার হাতের মুঠোয় এই ভারতীয় ওষুধটি গুঁজে দিয়ে বললেন, এটা খেয়ে নে। তাহলেই তোর রোগ সেরে যাবে।

এই বলে মহিলাটি আমাকে ওষুধটি দেখালেন। তাঁর হাতে দেখলাম মধুর গন্ধবিশিষ্ট একটি ফুলের পাপড়ি।

মহিলাটি বাড়ি ফিরে গিয়ে ভক্তিভরে সেই ফুলের পাপড়িটি খেলেন এবং তাতে চিরতরে রোগমুক্ত হলেন। এর পর মহিলাটি বহু অনুসন্ধান

করে লোকনাথ বাবার একটি চিত্র সংগ্রহ করেন এবং নিজের ঘরে সেই চিত্র টাঙ্গিয়ে রাখেন।

এইভাবে শুধু ভারতে নয়, ভারতের বাইরেও অনেকে বাবার অযাচিত করুণা ও কৃপা লাভ করে ধন্য হয়। সিদ্ধযোগী বাবা লোকনাথ কি কাছের, কি দূরের সকল নরনারীর স্ফুট ও অস্ফুট ধ্বনি শুনতে পেতেন ও বুঝতে পারতেন। তাই মার্কিন মহিলার সেই কাতর প্রার্থনা তিনি শুনেছেন ও বুঝেছেন! আবার তাঁর স্নেহ ও কৃপাধন্য বারদীর নাগপরিবারের আত্মীয় নিশিকান্ত বসুর যোগশক্তির দ্বারা রোগ সারানোর ব্যাপারে অসহায় অব্যক্ত মনোবেদনার অস্ফুট কথাও শুনেছেন ও বুঝেছেন এবং সেইমত কাজও করেছেন। মহাযোগী বাবা লোকনাথের মনের গতি সর্বত্র। মন যেখানেই যায় তাঁর দেহও সূক্ষ্ম হয়ে সেখানেই যায়।

ডাক্তার নিশিকান্ত বসুর জন্ম হয় ১৮৮০ সালে আসামের তেজপুরে। তাঁর পিতা রজনীকান্ত বসু তেজপুরে ডেপুটি কমিশনার অফিসে সেকালে সামান্য বেতনে কেরাণীর চাকরি করতেন। নিশিকান্তবাবুরা ছিলেন আট ভাই ও এক বোন। পিতামাতা দুজনেই ছিলেন সৎ ও ধর্ম-পরায়ণ। তাঁদের পূর্বপুরুষদের আদি নিবাস ছিল বরিশাল জেলার অন্তর্গত চাঁদনী গ্রামে। পরে তাঁরা ঢাকার বারদীগ্রামে বাড়ি করে বসবাস করতে থাকেন।

রজনীকান্ত তাঁর পুত্র কন্যাদের জন্য উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। ছাত্র হিসাবে খুবই মেধাবী ছিলেন নিশিকান্ত। তিনি এফ. এ পাশ করার পর ঢাকা মেডিকেল কলেজ থেকে ডাক্তারী পাশ করে চিকিৎসাশাস্ত্রে উচ্চ-শিক্ষার জন্য সরকারি বৃত্তি নিয়ে আমেরিকা যান। সেখানে এম. ডি ডিগ্রীলাভ করে চিকাগো শহরে কিছুদিন প্র্যাকটিস করার পর দেশে ফিরে আসেন। চিকাগো শহরে ডাক্তারি করার সময়েই একদিন অলৌকিকভাবে লোকনাথবাবার কৃপা লাভ করেন এবং এক মার্কিন মহিলার অলৌকিক-ভাবে রোগ সেরে যায় বাবার কৃপায়। সেই থেকে লোকনাথবাবাকে আগে কোনদিন চোখে না দেখলেও এক প্রবল আগ্রহ ও ভক্তিশ্রদ্ধা জাগে তাঁর প্রতি।

নিশিকান্তবাবুর মাতা বারদীর বড় জমিদার কালিকিশোর নাগ মশাই-

এর কনিষ্ঠা কন্যা ছিলেন। লোকনাথবাবার পরমভক্ত বারদীর অন্যতম জমিদার অরুণকান্তি নাগ ছিলেন নিশিকান্তবাবুর পিসতুতো ভাই। একদিন অরুণকান্তই নিশিকান্তবাবুকে বারদীর আশ্রমে বাবা লোকনাথকে দর্শন করাতে নিয়ে যান। সেখানে বাবাকে দেখে চমকে ওঠেন নিশিকান্তবাবু। কারণ চিকাগো শহরে তাঁর চেম্বারে বসে সেই মার্কিন মহিলা দীর্ঘকায় জটাজুটমণ্ডিত যে সন্ন্যাসীকে দেখেন, সেই সন্ন্যাসীর চেহারার সঙ্গে লোকনাথবাবার চেহারা হুবহু মিলে যায় নিশিকান্তবাবু বুঝতে পারেন, এই মহাযোগী মহাপুরুষ লোকনাথবাবাই সুদূর আমেরিকায় সূক্ষ্মদেহে গিয়ে অযাচিত ও অলৌকিকভাবে সেই মার্কিন মহিলাকে দর্শন করে তাঁর রোগ সারান।

যেদিন আশ্রমে লোকনাথবাবাকে প্রথম দর্শন করেন নিশিকান্তবাবু সেদিন থেকেই তাঁর কাছে দীক্ষা গ্রহণ করার বাসনা জাগে তাঁর মনে।

আমেরিকায় থাকাকালে নিশিকান্তবাবু যখন এম· ডি পাশ করার পর এক সেনিটোরিয়ামে চাকরী করতেন, তখন একদিন এক ইংরাজ মহিলার চোখের সামনে লোকনাথবাবা আবির্ভূত হন। একবার তিরিশ বছর বয়স্ক এক ইংরাজ মহিলা পেটের টিউমারের চিকিৎসার জন্য সেই সেনিটোরিয়ামে আসেন। তার টিউমারের অবস্থা খুবই খারাপ হয়ে পড়ে। কিছুদিন সেনিটোরিয়ামে থেকে চিকিৎসা করালেও কোন উন্নতি না হওয়ায় তিনি খুবই চিন্তিত হয়ে পড়েন।

একদিন সেই মহিলা নিশিকান্তবাবুকে একা পেয়ে তাঁকে বললেন, ডাক্তার বোস, আমি তোমাকে বিশ্বাস করি। এতদিন তোমাদের এখানে চিকিৎসা করিয়েও কোন উপকার হলো না। এখন বল, আমি কি করব। তুমি যা বলবে আমি তাই করব।

আমি কি বলতে যাচ্ছিলাম, এমন সময় মহিলাটি হঠাৎ বলে উঠলেন, ডাঃ বোস, চুপ করো, আর কথা বলো না। আমি তোমার পিছনে মাথার উপরে একজনকে পেয়েছি। তাঁর চুলগুলি মাথার উপরে জড়ানো। তাঁর মুখ একদিকে, চোখ অন্যদিকে। তাঁর মোছ দাড়ি আছে। একখানি কাপড় তাঁর ডান হাতের নীচ দিয়ে শরীর ঢেকে বাম কাঁধের উপর ফেলা আছে। তুমি কি জান, ইনি কে? ইনি নিশ্চয় তোমার স্পীরিচুয়্যাল গাইড অর্থাৎ

আধ্যাত্মিক পথপ্রদর্শক।

নিশিকান্তবাবু পিছন দিকে না তাকিয়ে সেই মহিলার মুখের দিকে চেয়ে রইলেন চুপ করে। তিনি বুঝলেন, লোকনাথবাবা আবির্ভূত হয়েছেন সূক্ষ্মদেহে। বাবা বুঝিয়ে দিলেন, তাঁর অপার করুণা। তিনি তাঁর মাথার উপরে ও পিছনে থেকে সর্বদা তাঁকে রক্ষা করছেন। তিনি এভাবে আবির্ভূত না হয়ে নিশিকান্ত বাবুর চোখের সামনে যদি দেখা দিতেন, তাহলে মনে হত আমার চোখের ভ্রম। কিন্তু একজন ইংরেজ মহিলা তাঁকে ঐরূপে দেখছেন। নিশিকান্তবাবুর কাছে তখন লোকনাথ বাবার কোন ফটো ছিল না। ফটো থাকলে মনে হত, তিনি ফটো দেখছেন।

এ তাঁর অসীম দয়া। তিনি নিশিকান্তবাবুর ভক্তি বিশ্বাস বাড়ানোর জন্য এই লীলা করছেন। যাই হোক, তাঁর তখন মনে হলো তিনি ধন্য হলেন বাবার যথোচিত কৃপায়। তাঁর মানবজীবন সার্থক হলো।

তিনি তখন একটি কাগজে লোকনাথ ব্রহ্মচারীর নাম লিখে দিয়ে সেই ইংরেজ মহিলাকে বললেন, তুমি লোকনাথ নাম সর্বদা মনে রাখবে। আর কোন হাসপাতালে গিয়ে তোমার টিউমার অপারেশন করাবে। তাহলেই ভাল হয়ে যাবে।

এই বলে একজনকে নার্সকে সঙ্গে দিয়ে তাঁকে অন্য হাসপাতালে প্যাঠিয়ে দিলেন। সেখানে তাঁর টিউমার আপারেশন হলো। তিনি সেরে উঠলেন। এতে তাঁদের সেনিটোরিয়ামের ব্যবসার ক্ষতি হলো। তবু তিনি এ কাজ করলেন, কারণ ঠিক সেই মুহূর্তে লোকনাথবাবা তাঁকে দেখা দিয়ে সঠিক পথ দেখিয়ে দিলেন। কোন রকম কপটতা বা মিথ্যা আচরণ হতে তিনি তাঁকে রক্ষা করলেন।

এরপর অনেকেই নিশিকান্তবাবুর পিছনে বাবালোকনাথকে দর্শন করেছেন।

১৯৪৩ সালের মে মাসে একদিন শশাঙ্কবাবুর স্ত্রী নিশিকান্তবাবুকে বললেন, কিছুদিন আগে একদিন তিনি যখন নিশিকান্তবাবুর কথা শুনছিলেন, তখন তিনি দেখেন যে তাঁর পিছনে ও ডানদিকে লোকনাথবাবা আবির্ভূত হয়েছেন। প্রথম দর্শনে তাঁর মনে এই সংশয় হলো যে, সত্যিই আবির্ভূত হয়েছেন কিনা। তখন তিনি মনস্থির করে আরও ভাল করে

দৃষ্টি নিবদ্ধ করে দেখেন, সত্যিই তিনি লোকনাথবাবাকে দেখছেন।

ঐ বছরেই আর একবার নিশিকান্তবাবুর ঘরে ধর্মকথা আলোচনার সময় গৌরীর মা দেখেন, বাবা লোকনাথ দেয়াল ভেদ করে আবির্ভূত হয়েছেন। তখন তিনি একা দেখেন নি। তাঁর পাশে ঊষা নামে যে মহিলা বসেছিলেন, তিনিও তা দেখতে পান।

সেই সেনিটোরিয়ামে তিন বছর চাকরি করার পর দেশে ফিরে এসে যতদিন নিশিকান্তবাবু ডাক্তারি করেন ততদিন রোগীদের আরোগ্য করার ক্ষমতার জন্য লোকনাথবাবার উদ্দেশে মনে মনে প্রার্থনা করতেন। সব সময় বাবাকে ভক্তিভরে স্মরণ করতেন।

একবার এক পুলিশ রোগী তার দূষিত রোগের চিকিৎসার জন্য নিশিকান্তবাবুর কাছে আসে। দিনকতক পরে সে এসে তাঁর রোগনির্ণয়ের ভুল ধরে এবং বলে, যে তাঁর নামে মামলা করবে। সে বলল, তোমার রোগনির্ণয় যদি ঠিক প্রমাণিত হয়, তবে তোমাকে কিছু টাকা দেব।

মামলার কথায় নিশিকান্তবাবুর ভয় হলো। তিনি সর্বক্ষণ লোকনাথ-বাবাকে একমনে ডাকতে লাগলেন। সেদিন রাতে না ঘুমিয়ে বসে বসে তাঁকে ডাকতে লাগলেন। একঘণ্টা কি দুঘণ্টা কতক্ষণ স্থির মনে অনন্যচিত্ত হয়ে বাবাকে ডেকেছিলেন, সে দিকে খেয়াল ছিল না তাঁর। এমন সময় সহসা এক অপার্থিব ফুলের স্বর্গীয় সুবাস নাকে আসতেই চমকে উঠলেন তিনি। এমন মধুর সুগন্ধ কোন পার্থিব ফুলের নেই।

নিশিকান্ত বাবু বুঝলেন, এ লোকনাথবাবারই লীলা। তিনি বুঝলেন, বাবা এসেছেন। তাঁর আত্মা আবির্ভূত হয়েছে এই সৌরভের মধ্যে। এ গন্ধ তাঁর দিব্য গাত্রগন্ধ।

পরদিন সেই সিপাই বড়দরের এক সাহেব ডাক্তারের কাছে গিয়ে পরীক্ষা করিয়ে এসে তাঁকে জানাল, নিশিকান্তবাবুর রোগ নির্ণয় ঠিক। কিন্তু টাকা দিল না। বেশ কিছুদিন পর সে এসে বলেছে, সে আরোগ্যলাভ করেছে। কিন্তু টাকা দেয়নি। না দিক। বাবার কৃপায় মামলার দায় হতে মুক্ত হন নিশিকান্তবাবু।

বরাবরই লোকনাথবাবার প্রতি নিশিকান্তবাবুর গভীর শ্রদ্ধা ছিল। তিনি ধানবাদে তাঁর ভাইএর বাড়িতে কিছুদিন থাকার সময় সুপণ্ডিত ও

যথেষ্ট আধ্যাত্মিক জ্ঞানসম্পন্ন রামচন্দ্র শাস্ত্রী মশাইএর কাছে দীক্ষা গ্রহণ করেন। গুরুদেব তাঁকে দুই অক্ষরে যে মন্ত্র দান করেন, সেই মন্ত্র নিশিকান্তবাবু শ্বাস প্রশ্বাসের সঙ্গে সর্বক্ষণ জপ করার সময় লোকনাথ বাবার নামটি তার সঙ্গে জুড়ে দিয়ে একই সঙ্গে জপ করতেন। এইভাবে লোকনাথ ব্রহ্মচারী তাঁর ইষ্ট দেবতার সঙ্গে এক ও অভিন্ন হয়ে যান। তাঁর একান্ত বিশ্বাস, লোকনাথবাবাই তাঁর আত্মার মধ্যে সর্বক্ষণ বিরাজ করে ঊর্ধ্বগতির সাহায্যে তাঁর আধ্যাত্মিক জীবনকে উন্নত ভাবে গড়ে তুলছেন।

গুরুদেবের আদেশমত রোজ ভোর চারটে অথবা সাড়ে চারটেয়, দুপুরে স্নানের পরে, রাত্রিতে শোবার সময় জপ ও ধ্যান নিয়মিত করতে লাগলেন। আর অন্য সময়ে শ্বাসে প্রশ্বাসে জপ চলত।

এক বছরের মধ্যেই অনাহত নাদ শুনতে পেলেন। একদিন বারদীতে ভ্রূযুগলের মধ্যে উজ্জ্বল ওঁকার খুব স্পষ্ট হয়ে উঠল। যেন বৈদ্যুতিক তার দিয়ে প্রজ্বলিত। আমেরিকা থেকে আসার পর তাঁর আত্মীয় নাগপরিবারের আনুকূল্যে বারদীতে ডাক্তারখানা খুলে চিকিৎসা করতে থাকেন। কিন্তু গুরুর আদেশমত তিনি রোগীদের কাছ থেকে ওষুধের ব্যবস্থা দিয়ে কোন টাকাপয়সা নিতেন না আর দিনে তিনটির বেশী রোগী দেখতেন না। তাঁর হাতে অনেক দুরারোগ্য রোগ সেরে যেত।

একবার নিশিকান্ত বাবু তাঁর কলকাতার বাড়িতে এসে কিছুদিন থাকেন। তাঁর ছোট ছেলে জ্যোতি বসু (বর্তমানে যিনি পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী) ঐ বাড়িতে তখন একা থাকতেন। বিলেত থেকে ব্যারিস্টারী পাশ করে আসার পর তিনি আইন ব্যবসা না করে দেশের কাজে জড়িয়ে পড়েন। সব সময় রাজনৈতিক কাজকর্মে ব্যস্ত থাকার জন্য আহার বিশ্রাম বা সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে তাঁর খেয়াল থাকত না। তাঁর প্রথম পক্ষের স্ত্রী মারা যাওয়ার পর থেকে বাড়িতে একজন চাকর ছাড়া তাঁকে যত্ন করার মত কেউ ছিল না। তাই নিশিকান্তবাবু স্নেহবশতঃ কিছুদিন সে বাড়িতে থেকে ছেলের খাওয়া থাকার প্রতি লক্ষ্য রাখতে থাকেন।

তিনি সেখানে থাকাকালে লোকনাথবাবার ভক্ত বঙ্কুবাবু প্রায়ই তাঁর কাছে আসতেন। তাঁর ভগ্নীপতি উপেন্দ্রনাথ মিত্রও বাবার পরম ভক্ত

ছিলেন। তিনিও হরিপাল থেকে প্রায়ই আসতেন। তাঁদের সঙ্গে ধর্মালোচনার সঙ্গে লোকনাথবাবার মাহাত্ম্য কীর্তন করতে করতে ভক্তিভাবে বিভোর হয়ে পড়তেন নিশিকান্তবাবু। তিনি তাঁদের লোকনাথবাবার চরণ তুলসী দান করেন। তখন ১৯৩৬ সাল।

এই বছরের মে মাসে নিশিকান্তবাবু তাঁর স্ত্রী, কন্যা ও বড় পুত্রবধূকে নিয়ে বারদী যাওয়ার স্থির করেন। শিয়ালদা স্টেশানে সকলের সঙ্গে গিয়ে দেখেন, ট্রেনের দ্বিতীয় শ্রেণীর কোচগুলি সব ভর্তি হয়ে গেছে। কোন স্থান নেই। তখন তাঁর কি মনে হলো লোকনাথবাবাকে স্মরণ করে একখানি প্ল্যাটফর্ম টিকিট কেটে ভিতরে ঢুকে কোন কামরা খালি আছে কি না দেখতে লাগলেন। হঠাৎ তিনি দেখতে পেলেন একটি দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরায় কতকগুলি কুলী বসে আছে। তাদের জিজ্ঞাসা করতে তারা জানাল, কামরা খালি, কোন যাত্রী নেই। তখন নিশিকান্তবাবু সাতখানি টিকিট কেটে সঙ্গীদের সবাইকে নিয়ে এসে সেই কামরায় বসলেন। এত ভীড়ের মাঝে এই খালি কামরাটি পেয়ে আশ্চর্য হয়ে গেলেন তিনি। পরে বুঝতে পারলেন, পরমপুরুষ লোকনাথবাবার অলৌকিক অহৈতুকী কৃপার দ্বারাই এই অসম্ভব সম্ভব হয়েছে।

পরদিন তাঁরা গোয়ালন্দে নেমে সেখান থেকে স্টীমারে নারায়ণগঞ্জ যাচ্ছিলেন। মুন্সীগঞ্জে স্টীমার থামতেই তাঁদের সঙ্গে গৌর নামে যে চাকর ছিল তাকে নিশিকান্তবাবু স্টীমারঘাট থেকে কিছু কলা কিনে আনতে পাঠালেন। কিন্তু গৌর ফিরে না আসতেই লঞ্চ ছেড়ে দিল। তখন নিশিকান্তবাবুর মনটা খারাপ হয়ে গেল। কিন্তু কোন উপায় নেই। শ্বাসে প্রশ্বাসে যথারীতি ইষ্টমন্ত্রের সঙ্গে লোকনাথবাবার নাম জপ করে যেতে লাগলেন।

স্টীমার মুন্সীগঞ্জ থেকে সোজা বারদী যাবে। স্টীমারের মুখ ঘুরিয়ে অল্প কিছুদূর যেতেই দেখা গেল গৌর একটি নৌকোয় করে এসে লঞ্চ থামাতে বলছে। নিশিকান্তবাবু চালককে লঞ্চ থামাতে বললে সে বলল, সারেঙ্ উপরে আছে। তার হুকুম ছাড়া সে লঞ্চ থামাতে পারে না। লঞ্চ চলতে লাগল গৌরকে ফেলে রেখে। আগের মত মনটা আবার খারাপ হয়ে গেল নিশিকান্তবাবুর। তবু সমানে নাম জপ করে যেতে লাগলেন তিনি।

প্রায় আধ মাইল যাবার পর লঞ্চটি এক চরা বালিতে আটকে গেল। একজন খালাসী নেমে জলের গভীরতা পরীক্ষা করল। বাঁশ দিয়ে টেলাটেলি করা হলো। কিন্তু লঞ্চ নড়ল না একটুও।

সহসা নিশিকান্তবাবুর মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, আমার লোক না আসা পর্যন্ত লঞ্চ চলবে না।

ঠিক তাই হলো। প্রায় আধ ঘন্টা পর গৌর সেই নৌকোটায় করে স্টীমারের কাছে এসে উপস্থিত হলো। নিশিকান্তবাবু তখন আনন্দের আবেগে বলে উঠলেন, এবার লোকনাথবাবার ইচ্ছায় লঞ্চ চলবে।

ঠিকই তাই হলো। গৌর লঞ্চে উঠতেই লঞ্চ চলতে শুরু করল।

একবার লোকনাথবাবার দয়ায় কিভাবে এক কঠিন রোগ আরোগ্য হয়, সে কথা অনেকের কাছে বলেন।

নিশিকান্তবাবুর বড়দাদার জামাতা প্রফুল্লচন্দ্র দে একজন ইনকাম ট্যাক্স অফিসার। ফুসফুসের কঠিন রোগে আক্রান্ত। কলকাতার বড় বড় ডাক্তারেরা যক্ষ্মা বলে চিকিৎসা করছিলেন। তিনমাস একেবারে শয্যাগত এবং হাড়চামড়া সার হয়ে ওঠে।

অবশেষে একজন বড় ডাক্তার প্রফুল্লবাবুকে ভাওয়ালীতে টি. বি. সেনিটোরিয়ামে পাঠিয়ে দিলেন। সেখানকার ডাক্তারেরা পরীক্ষা করে বললেন, টি. বি. বা যক্ষ্মা নয়, ফুসফুসে ফোড়া হয়েছে। তখন তাঁকে চিকিৎসার জন্য কলকাতায় ফিরিয়ে আনা হলো। এমন সময় একদিন নিশিকান্তবাবু বারদী থেকে কলকাতায় এলেন এবং রোজ প্রফুল্লবাবুকে দেখতে লাগলেন। যে সব ডাক্তার তাঁর চিকিৎসা করছিলেন, তাঁরা আগের মত রোগীর চিকিৎসা করে যেতে লাগলেন। কিন্তু রোগের কোন উপশম হলো না।

তখন নিশিকান্তবাবু একটি ওষুধের নাম লিখে ডাক্তার মুখার্জীকে তা দিতে বললেন। তিনি মনে করলে সেই ওষুধ রোগীকে দিতে পারেন। কিন্তু বাড়ির কোন লোক ডাক্তারকে তা দিতে পারল না। এদিকে রোগীর রোগ দিনে দিনে বেড়ে যেতে লাগল। তখন একজন হোমিওপ্যাথির ডাক্তার আনা হলো। কিন্তু তাঁর ওষুধেও কোন কাজ হলো না। রোগীর জ্বর ও কাশি বাড়তে লাগল। তখন সে চিকিৎসা বন্ধ করা হলো। রোগীর মৃত্যু আসন্ন হয়ে উঠল।

তখন প্রফুল্লবাবুর স্ত্রী তাঁর কাকা নিশিকান্তবাবুকে শেষ চেষ্টা হিসাবে কোন ওষুধের ব্যবস্থা করতে অনুরোধ করলেন। জামাতার অকাল মৃত্যুর কথা চিন্তা করে নিশিকান্তবাবু স্থির থাকতে পারলেন না। তিনি তখন লোকনাথবাবাকে স্মরণ করে এলোপ্যাথিক ওষুধের এক ব্যবস্থাপত্র লিখে দিলেন। ১৯.৯.৩৮ তারিখ হতে সেই ওষুধ ব্যবহার করা হলো। সেই ওষুধ রোগীকে খাওয়াবার আধঘণ্টার মধ্যেই তার ফুসফুস হতে অনেকখানি পুঁজ ও কফ বার হয়ে গেল। দুদিনের মধ্যেই জ্বর ও কাশি কমে গেল। রোগী সুস্থবোধ করতে লাগল।

ডাক্তার মুখার্জী তখন বললেন, ঐ ওষুধটিই এই রোগের উপযুক্ত। কিন্তু এতদিন ঐ ওষুধটির নাম একবারও তার মনে পড়েনি। নিশিকান্তবাবু বুঝলেন, পরমপুরুষ লোকনাথ বাবার অসীম করুণা ও কৃপার বলেই শেষ সময়ে তিনি ঐ ওষুধটি প্রয়োগ করতে পেরেছেন এবং তাতে রোগী আশ্চর্যভাবে আরোগ্যলাভ করেছে। রোগমুক্তির পর প্রফুল্ল বাবু শরীর সারার জন্য রাঁচীতে কিছুদিন থাকার পর কাজে যোগদান করেন।

নিশিকান্তবাবু যেখানেই থাকতেন রোজ ভোর ৪টে বাজলেই ঘুম থেকে উঠে জপ ধ্যান ও সাধন ভজন করতেন। একদিন ৪টে বেজে গেলেও তাঁর ঘুম ভাঙ্গেনি। হঠাৎ মাথার কাছে এক জোর শব্দ হতে তাঁর ঘুম ভেঙ্গে যায়। তখন তিনি ঘড়ির দিকে তাকাতেই বুঝতে পারেন লোকনাথ-বাবাই এই উপায়ে তাঁকে তাঁর সাধন সময়ে জাগিয়ে দিয়েছেন।

কিছুদিন ধরে নিশিকান্তবাবুর পেটে একটা ব্যথা হতে থাকে। অনেক ডাক্তারকে দেখান। কিন্তু কেউ রোগ ঠিক করতে পারেননি। তখন তিনি লোকনাথবাবাকে স্মরণ করেন। বাবার দয়ায় তিনি একদিন বুঝতে পারেন, এই ব্যথাটা আসলে কিডনি বা মূত্রথলীর স্থানচ্যুতির জন্য, তা কোন রোগ নয়। এর পর থেকেই তাঁর পেটের ব্যথা একেবারে চলে গেল। তাঁর শরীর ক্রমশঃ সেরে উঠতে লাগল।

নিশিকান্তবাবুর অনেকদিনের ইচ্ছা, তিনি আশ্রমে মন্দিরের ভিতরে গিয়ে লোকনাথবাবাকে নির্জনে পুজো করবেন। সেদিন ভোরবেলায় স্নান করে বারদী থেকে আশ্রমে চলে গেলেন। সঙ্গে কিছু ফুল নিয়ে যাবার কথা মনে হলেও তিনি তা নিলেন না। ভাবলেন, বাবার দয়াতে সেখানেই

তিনি ফুল পাবেন।

আশ্রমে গিয়ে তিনি দেখলেন পুজো হয়ে গেছে। কিন্তু অনেক ফুল রয়ে গেছে তখনো। আসলে তা দেওয়া হয়নি। তখন তাঁর মনে হলো তাঁর প্রতি দয়াবশতই বাবা তাঁর জন্য এত ফুল রেখে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছেন। তাঁর ইচ্ছাতেই তা হয়েছে। কারণ বাবার পুজোর পর কোনদিন এত ফুল অবশিষ্ট থাকে না।

তখন তিনি আনন্দের সঙ্গে বাবার ঘরের ভিতর গিয়ে ফুল বেলপাতা দিয়ে তাঁকে পুজো করলেন প্রাণভরে। অন্তরে পরম তৃপ্তি অনুভব করলেন।

সেই থেকে বারদীতে যতদিন ছিলেন নিশিকান্তবাবু, সকাল সন্ধ্যা দুবেলা লোকনাথবাবার আশ্রমে গিয়ে বাবাকে দর্শন ও প্রণাম করে মনে বড় তৃপ্তি ও এক অপার্থিব আনন্দ বোধ করতেন।

নিশিকান্তবাবুর বয়স যখন চোদ্দ, তখন তাঁর পিতা তেজপুর হতে ধুবড়ীতে ডেপুটি কমিশনার অফিসের সেরেস্তাদার হয়ে বদলি হন। সেই সময় বসন্তকুমার মজুমদার সেখানে ডেপুটি কমিশনার অফিসে কেরাণীর চাকরি করতেন। তার স্ত্রী বারদীর শশীভূষণ নাগের ভগিনী ছিলেন। বসন্তবাবু ও তাঁর স্ত্রীর কাছে নিশিকান্তবাবু সেই বালক বয়সেই বারদীর ব্রহ্মচারী লোকনাথবাবার কথা প্রথম শোনেন। সেই কথা শুনতে শুনতে ক্রমে লোকনাথবাবার প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধা জাগে তাঁর অন্তরে।

এফ. এ. পাশ করার পর নিশিকান্তবাবু যখন ডিব্রুগড়ের মেডিক্যাল স্কুলে ডাক্তারি পড়তেন, তখন একদিন তিনি তিনজন সহপাঠীর সঙ্গে ব্রহ্মপুত্র নদীতে স্নান করতে যান। তখন শীতকাল! ব্রহ্মপুত্র নদীর জল ভয়ানক ঠাণ্ডা ও প্রখর স্রোত। তা সত্ত্বেও তারা নদীর তীর হতে মাঝখানে এক চড়ায় সাঁতার কেটে যাবার জন্য নদীতে ঝাঁপ দেন।

অর্ধেক পথ সাঁতার কেটে যাবার পর নিশিকান্তবাবুর শরীর অবশ হয়ে গেল। আর যেতে পারলেন না। ক্রমে ডুবতে আরম্ভ করলেন। তখন মাথাটা উঁচু করে নদীর পারের লোকদের সাহায্যের জন্য ডাকতে লাগলেন।

সেই সময় যতীশচন্দ্র চক্রবর্তী নামে এক স্কুল মাস্টার নদীতে স্নান করতে আসছিলেন। তিনি নিশিকান্তবাবুকে চিনতে না পারলেও তাঁর

উদ্ধারের জন্য এক নৌকোর মাঝিকে রাজী করিয়ে নৌকোটি নিয়ে তাঁর দিকে এগিয়ে যেতে লাগলেন।

এদিকে নিশিকান্তবাবু তখন জলে ডুবে গেলেন। ডুবতে ডুবতে অবশেষে জলের তলার মাটিতে তাঁর পা ঠেকল। তাঁর শ্বাসরোধ হয়ে এল। একবার জোর করে শ্বাস টানতে শ্বাসনালীতে জল ঢুকে গেল। তাঁর ভয়ানক কষ্ট হতে লাগল। সেই অবস্থায় তিনি লোকনাথবাবাকে স্মরণ করে মনে মনে বলতে লাগলেন, তোমার অসীম শক্তি, তুমি ইচ্ছা করলেই এই অবস্থা হতে আমাকে রক্ষা করতে পার। তা না হলে আমার মৃত্যু অনিবার্য।

এমন সময় হঠাৎ মনে তিনি বল পেলেন এবং তৎক্ষণাৎ জলের উপর ভেসে উঠলেন। ততক্ষণে যতীশবাবু এসে তাঁকে কোনরকমে নৌকোর উপর তুলে নিলেন। এইভাবে লোকনাথবাবার কৃপায় অবধারিত মৃত্যুর কবল থেকে উদ্ধারলাভ করলেন নিশিকান্তবাবু।

বারদীতে ডাক্তারি করার সময় রোজ সকাল সন্ধ্যা আশ্রমে যেতেন নিশিকান্তবাবু। তাঁর কাছে চিকিৎসার জন্য যেমন লোক আসত, তেমনি ধর্মালোচনার জন্যও অনেক লোক আসত। তিনি লোকনাথবাবাকে মাঝে মাঝে দেবতাজ্ঞানে পুজো করতেন। লোকনাথবাবার তত্ত্ব ও মাহাত্ম্য যতটুকু তিনি বুঝেছিলেন, ততটুকু তিনি তাঁর কাছে সমাগত লোকদের বুঝিয়ে দিতেন। এইভাবে তাঁর দিন কাটছিল।

এমন সময় একদিন কলকাতা থেকে লেখা তাঁর ছোট ছেলে জ্যোতি বসুর একখানি চিঠি পেলেন নিশিকান্তবাবু। চিঠিতে লেখা ছিল, একটি মোকদ্দমায় সাক্ষী মানা হয়েছে তাঁকে। তাঁর বালীগঞ্জের বাড়ির ঠিকানায় এর আগে অনেকবার সমন এসেছিল কোর্ট থেকে। কিন্তু তিনি হাজির না হওয়ায় কোর্ট তাঁর বাড়ি এ্যাটাচ্ করে নোটিস জারি করেছে।

অথচ তিনি এ সবের কিছুই জানে না। ঘটনাটি ঘটে তাঁর এক ভাইপোকে নিয়ে। ভাইপোটিকে তিনি খুবই স্নেহ করতেন এবং সে তাঁর বালীগঞ্জের বাড়িতেই থাকত। তাঁর অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে ঐ ভাইপোটি তাঁর বাড়ি বন্ধক রেখে একজনের কাছে টাকা ধার করে। সে কোর্টে এফিডেভিট করে বলে, নিশিকান্ত বসু তাঁর পিতা এবং তিনি

মৃত। সে টাকা পরিশোধ না করায় পাওনাদার খোঁজ খবর নিয়ে জানতে পারে, নিশিকান্ত বসু তার পিতা নন এবং তিনি এখনো জীবিত। তাই পাওনাদার তার সেই ভাইপোর বিরুদ্ধে মামলা করে এবং তাঁকে সাক্ষী মানে। কিন্তু তিনি হাজির না হওয়ায় তাঁর বাড়ি এ্যাটাচ করে নোটিশ জারি করে।

চিঠিতে সব কথা জেনে মহা মুস্কিলে পড়লেন নিশিকান্তবাবু। তিনি হাজির হয়ে সাক্ষী দিলে তাঁর ভাইপোর কারাদণ্ড হবে। অথচ সাক্ষী না দিলেও তাঁর বাড়িটি দেনার দায়ে পাওনাদারের হাতে চলে যাবে।

নিশিকান্তবাবু নিরুপায় হয়ে অসহায়ভাবে লোকনাথবাবার কাছে কাতর প্রার্থনা জানালেন, এই বিপদ হতে তিনি যেন তাঁকে উদ্ধার করেন। তিনি সর্বক্ষণ লোকনাথবাবার নাম জপ করে মনে মনে ঐ প্রার্থনা একাগ্রচিত্তে জানাতে লাগলেন।

তখন তিনি একখানি চিঠি লিখে ছেলেকে নির্দেশ দিলেন, তিনি যেন আলিপুরে যে ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট ঐ মোকদ্দমা চলছে, তাঁর সঙ্গে দেখা করে সত্য ঘটনা বুঝিয়ে দেন। তারপর তাতে যদি কোন ফল না হয়, তাহলে তিনি যেন টেলিগ্রাম করে তাঁকে জানান। নির্দিষ্ট দিনের মধ্যে টেলিগ্রাম না পেলে তিনি অবশ্যই সাক্ষী দিতে কলকাতায় যাবেন।

নির্দিষ্ট দিনের মধ্যেই টেলিগ্রাম এল, তাঁর আসার দরকার নেই। নিশিকান্তবাবু তখন বুঝলেন, লোকনাথবাবার কৃপাতেই এই অসম্ভব সম্ভব হয়েছে। পরম করুণাময় বাবাই তাঁর যোগশক্তিবলে তাঁকে এই বিপদ হতে উদ্ধার করেছেন।

দিনকতক পরে তাঁর ছোট ছেলে জ্যোতিবাবু ময়মনসিংহ ও নেত্রকোনায় কৃষক সমাবেশে বক্তৃতা দেওয়ার পর বারদী আসেন। তাঁর কাছ থেকে তখন আসল খবরটি পান নিশিকান্তবাবু। জ্যোতিবাবু পিতাকে জানান, তিনি তাঁর কথামত ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে দেখা করে সত্য ঘটনা বুঝিয়ে বলেন। তা শুনে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব হুকুম দেন, ডাঃ এন. কে. বসুর বিরুদ্ধে যে অভিযোগ করা হয়েছিল তা প্রত্যাহার করা হলো এবং মামলা অনির্দিষ্ট কালের জন্য স্থগিত রইল।

এইভাবে লোকনাথবাবার অসীম দয়ার পরিচয় পেয়ে নিজেকে ধন্য মনে

করলেন নিশিকান্তবাবু।

চৈতন্য নাগ মশায়ের স্ত্রী অনেকদিন ধরে ম্যালেরিয়া জ্বরে ভুগতে থাকেন। নিশিকান্তবাবু অনেক চিকিৎসা করলেও কোন ফল হলো না। রোগের উপশম হলো না। একদিন রাত্রে তাঁর শরীর ঠাণ্ডা হয়ে গেল। হার্টের ক্রিয়া বন্ধ হবার উপক্রম। নিশিকান্তবাবু তখন রোগিনীর রোগ নিরাময়ের জন্য লোকনাথবাবার উদ্দেশে কাতর প্রার্থনা জানাতে লাগলেন।

সেই রাতেই এক অলৌকিক ঘটনা ঘটল। রোগিনী তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় স্বপ্ন দেখলেন, সহসা লোকনাথবাবা আশ্রম হতে নেমে এলেন এবং তাঁর মাথার কাছে খাটের উপর বসে বললেন,এই যে আমি এসেছি। তুই ভয় করিস কেন ?

এর পরই রোগিনীর সব রোগ এক মুহূর্তে সেরে গেল। তিনি সম্পূর্ণরূপে আরোগ্যলাভ করলেন। চলৎশক্তিহীনা যে রোগিনীর বিছানা থেকে উঠে বসার ক্ষমতা ছিল না, তিনি পরদিন বাবার আশ্রমে গিয়ে খিচুড়ি প্রসাদ পেট ভরে খেলেন।

এই ঘটনার কথাটি নিশিকান্তবাবু তাঁর ডায়েরীতে যখন লিখছিলেন, তখন তাঁর ঘরটি এক সুমিষ্ট স্বর্গীয় সুবাসে ভরে যায়।

একদিন কয়েকমাসের একটি শিশুকে চিকিৎসার জন্য নিশিকান্তবাবুর কাছে আনা হয়। শিশুটি জ্বর ও কাশিতে ভয়ানক কষ্ট পাচ্ছিল। তাকে ওষুধ খাওয়ালে কোন ফল হলো না। শিশুটি খুব জোরে কাঁদতে লাগল।

তখন নিশিকান্তবাবু কি ভেবে শিশুটিকে নিজের কোলে নিয়ে হাঁটতে লাগলেন। কিন্তু শিশুটির কান্না থামল না। অথচ তার শ্বাস প্রশ্বাসের খুব কষ্ট হচ্ছিল না। কিন্তু তার কান্নাও থামল না।

তখন নিশিকান্তবাবু নিরুপায় হয়ে লোকনাথবাবাকে মনে প্রাণে ডাকতে লাগলেন। শিশুটির রোগ নিরাময়ের জন্য তাঁর দয়া ভিক্ষা করতে লাগলেন। হাঁটতে হাঁটতে ক্লান্ত হয়ে শিশুটিকে কোলে নিয়েই এক জায়গায় বসে সমানে লোকনাথবাবাকে একাগ্র মনে ডেকে যেতে লাগলেন। কিছুক্ষণের মধ্যে শিশুটি শান্ত হলো। আশ্চর্যভাবে তার জ্বর ও কাশি সেরে গেল। লোকনাথবাবার অসীম দয়া আপন অন্তরে নিবিড়ভাবে অনুভব করলেন নিশিকান্তবাবু।

একবার নিশিকান্তবাবু যখন তাঁর কলকাতার বাড়িতে ছিলেন, তখন নিকটবর্তী এক হাসপাতালে যুদ্ধ ফেরত এক আমেরিকান পাগল একদিন ভোরবেলায় ভয়ানক চিৎকার করছিল। ঐ সময় রোজ একমনে জপ তপ ও ধ্যান করেন নিশিকান্তবাবু। কিন্তু সেই একটানা চিৎকারে তাঁর সাধনায় ব্যাঘাত হচ্ছিল। তবু তিনি বুঝলেন, লোকটি রোগযন্ত্রণাতে দারুণ কষ্ট পাচ্ছে বলেই ঐ রকম চিৎকার করছে। তখন তার মনে দুঃখ হলো। তিনি লোকনাথবাবার উদ্দেশে লোকটির শান্তির জন্য প্রার্থনা করতে করতে লাগলেন। তারপর তিনি মনে মনে কল্পনা করলেন, তিনি বারদীর আশ্রমে প্রণাম করে আশ্রমের ধূলি দুহাতে তুলে নিলেন। তারপর রোগীর কাছে গিয়ে তাঁর দুহাত লোকটির মাথায় রাখলেন যাতে তার শান্তি হয় এবং চিৎকার বন্ধ হয়।

এইভাবে হাতদুটি তার মাথায় কিছুক্ষণ রাখতেই সে একেবারে শান্ত হয়ে উঠল। তার চিৎকার একেবারে বন্ধ হয়ে গেল। পরম করুণাময় বাবার প্রতি কৃতজ্ঞতা ও ভক্তিতে তাঁর মন ভরে গেল।

এইভাবে লোকনাথবার পরম ভক্ত অনুগ্রহভাজন নিশিকান্তবাবু নিজের আত্মাটিকে দেহ হতে বিচ্ছিন্ন করে বাবার আত্মার সঙ্গে সব সময় যুক্ত করে তাঁকে প্রায়ই ধ্যান করতেন, তাঁর নাম জপ করতেন। লোকনাথবাবাই ছিলেন তাঁর ধ্যান জ্ঞান। এইভাবে মনে প্রাণে তাঁর ধ্যান করে কতবার কত বিপদ হতে যে তিনি উদ্ধার পান, তার শেষ নেই।

অবশেষে নিশিকান্তবাবু তাঁর সুদীর্ঘ জীবনপথের শেষ প্রান্তে এসে উপনীত হন। বুঝতে পারেন, তাঁর মৃত্যুকাল ক্রমশই এগিয়ে আসছে। কিন্তু তা জেনেও সাধারণ মানুষের মত মৃত্যু সম্পর্কে কোন ভীতি বা দুঃখ জাগল না তাঁর মনে।

তিনি বৈষয়িক কর্ম ও চিন্তা পরিত্যাগ করে পরমেশ্বরে চিত্ত সমাহিত করে থাকতেন সর্বদা, যাতে মৃত্যুকালে ব্রাহ্মীস্থিতি লাভ হয়। মৃত্যুকালে যদি ভাগবৎ স্মরণ করবার সামর্থ্য থাকে, তাহলে মুক্তি অথবা পরজন্মে মুক্তিলাভের যোগ্যতা নিশ্চয়ই হয়ে থাকে।

মৃত্যু আসন্ন হলে মৃত্যুসূচক যে সব লক্ষণ দেখা যায় তাকে অরিষ্ট বলে। এই অরিষ্ট তিন প্রকার—আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক।

দৈহিক ও মানসিক বিকারের নাম আধ্যাত্মিক অরিষ্ট। যেমন, ধর্ম বা নীতিকথা শুনতে অনিচ্ছা, দীপনির্বাণের গন্ধ না পাওয়া, কানে তালা লাগা, ভ্রূমধ্যে জ্যোতিদর্শন না হওয়া, মলমূত্র বমন করা এই ধরনের স্বপ্ন দেখা।

অপ্রাকৃত বস্তু দেখাকে আধিদৈবিক অরিষ্ট বলে। যেমন, যমদূত দর্শন, বিকটাকার কোন জীব দর্শন, আকাশে ইন্দ্রজালের মত গন্ধর্বনগর দর্শন ইত্যাদি।

কপোত, শকুনি, কাক, পেঁচা প্রভৃতি পাখির উপর পতন ও স্বপ্নে মহিষের উপর আরোহণ প্রভৃতিকে আধিভৌতিক অরিষ্ট বলে।

কিন্তু মৃত্যুর আগে পরমেশ্বর ও লোকনাথবাবার স্মরণ ও ধ্যানে চিত্ত সব সময় সমাহিত থাকত বলে এই ধরনের কেন লক্ষণ বা অরিষ্ট দেখতে পাননি নিশিকান্তবাবু।

ইষ্টপ্রণামের সময় বলতেন,

ওঁ নমঃ ব্রহ্মণ্য দেবায় গো ব্রাহ্মণ হিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ।
শ্রীশ্রীবাবা লোকনাথায় নমো নমঃ।

এইভাবে ইষ্টদেবতার নামের সঙ্গে লোকনাথ বাবার নামটি জুড়ে দিয়ে তাঁদের একাসনে বসিয়ে প্রণাম করতেন তিনি। আনন্দে হৃদয় উদ্বেল হয়ে উঠল। দেহ রোমাঞ্চিত হয়ে উঠতো পুলকে।

তিনি গান গাইতেন না কখনো। গান জানতেন না। তবু এইভাবে ইষ্ঠ প্রণামের পর মনের আনন্দে আপনা হতে গান বেরিয়ে আসত তাঁর অন্তর থেকে। হৃদয়ের গভীর হতে সমস্ত অন্তরাত্মাকে আলোড়িত করে বেরিয়ে আসত স্বতস্ফূর্ত সুরের ধারা। তিনি গাইতেন।

তোমার রাগিনী জীবনকুঞ্জে বাজে যেন সদা বাজে গো।
তোমার আসন হৃদয়পদ্মে বাজে যেন সদা বাজে গো।

এই গানের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত মনপ্রাণ নেচে উঠত তাঁর। প্রতিটি জীব কোষে, দেহের প্রতিটি অনু-পরামাণুতে লাগত এক অপূর্ব ছন্দের দোলা।

সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে তিনি বাবা লোকনাথকে ডাকতেন। মনে মনে বলতেন, বাবা, তুমি এস, তুমি প্রসন্ন হও। বাবা, আমি তোমার, তুমি

আমার। আমি তুমি এক। আমিই সূক্ষ্ম আত্মা। আমার জরা নাই, ব্যাধি নাই, মৃত্যু নাই, শোক নাই, মোহ নাই, কাম, ক্রোধ, লোভ নাই। আমার কোন পাপ নাই। আমি নিত্য শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত আত্মা।

তিনি আরও বলতেন, বাবা, তুমি সচ্চিদানন্দ, সর্বশক্তিমান, সর্বব্যাপী, সর্বজ্ঞ। তুমি সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্ম, মহান থেকে মহান, বিরাট থেকে বিরাট। তুমি অনন্ত আকাশ, মহাকাশ।

জীবনে অনেক সময় অনেক কঠিন আঘাত পেয়েছি। তবু আমার স্থির ও দৃঢ় বিশ্বাস, বাবা আমায় ভালবাসেন। তিনি পরম মঙ্গলময়। তিনি সর্বদা সকল বিপদ হতে রক্ষা করেন। আমি তাঁর পরম দয়ায় আকৃষ্ট হয়ে তাঁর দিকে চেয়ে থাকি। তিনিও আমার দিকে সর্বদা চেয়ে থাকেন। আমাকে শান্তি দান করেন। কোন অন্যায় করলে তিনি শাস্তি দিয়ে শুধরিয়ে দেন।

জীবনের অতীত ঘটনাবলী স্মরণ করে বুঝছি, আমি তাঁর প্রিয় বলেই তিনি কত বিপদ হতে রক্ষা করেছেন আমাকে। আমার ঈপ্সিত সমস্তই অকাতরে দান করে কত সুখ শান্তি দিয়েছেন। এমন সৌভাগ্য পৃথিবীর কয়জনের হয়?

লিখে শেষ করতে পারি না, তিনি প্রতিদিন কত কাজে কতভাবে সহায়তা করেছেন। অনেক ঘটনা যথাস্থানে লিখে রেখেছি, কিন্তু আরও অসংখ্য ঘটনার কথা লেখা হয়নি।

ওঁ

ঢাকার হোমিওপ্যাথি ডাক্তার রমণীমোহন দাসের ছেলে দীর্ঘদিন ধরে দুরারোগ্য রোগে ভুগছে। বিভিন্ন পদ্ধতিতে তার অনেক চিকিৎসা করিয়েও কোন ফল হয়নি। ভুগে ভুগে সে তার দৃষ্টিশক্তি ও বাকশক্তি দুই-ই হারিয়েছে।

বারদী স্কুলের হেডমাষ্টার প্রভাতচন্দ্র গুহ প্রায়ই লোকনাথ বাবার আশ্রমে যেতেন। বাবার প্রতি তাঁর ভক্তিশ্রদ্ধা অগাধ ও অপরিসীম। তিনি রমণীবাবুকে প্রায়ই বলতেন, বাবা লোকনাথই তোমার এ বিপদে একমাত্র ভরসা। তাঁর কোনরকমে দয়া হলে তিনিই তাঁর ছেলেকে রোগমুক্ত করতে

পারেন তাঁর অলৌকিক শক্তিবলে।

কথাটা মনে ধরে রমণীবাবুর। তাঁরও অকৃত্রিম বিশ্বাস জাগে বাবার উপর। তিনি একদিন প্রভাতবাবুকে সঙ্গে করে বাবার আশ্রমে যাওয়ার মনস্থ করেন। প্রভাতবাবু সেদিন যেতে না পারায় তিনি বাবার একখানি ছবি দিয়ে সেটিকে ছেলের ঘরে রাখতে বলেন। ছবিটিকে ধূপ ধুনা দিয়ে পুজো করতে বলেন। রমণীবাবু তাই করেন।

কিছুদিন পর ছেলেটি স্বপ্নে দেখল, একজন দীর্ঘাকৃতি জটাধারী সন্ন্যাসী বড় বড় খড়ম পায়ে তাঁর সামনে দিয়ে চলে গেলেন। তারপর সেই পুরুষ তাকে অভয় দিয়ে বললেন, অমুক সময়ে তোর প্রস্রাব হবে। অমুক সময়ে তুই দৃষ্টি শক্তি পাবি।

ঘুম ভাঙ্গতেই ছেলেটির প্রস্রাব হলো এবং সে দৃষ্টি শক্তিও পেল। তারপর ছেলেটি ইশারা করে লিখবার সরঞ্জাম চাইল। তখন তার হাতে শ্লেট পেন্সিল দেওয়া হলো। সে তাতে লিখল, 'আমি এসেছি'। তাছাড়া আরো কিছু কথা লেখা ছিল।

তা দেখে সকলে বুঝল, পরম করুণাময় মহাযোগী মহাপুরুষ লোকনাথ বাবাই দয়া করে এসেছিলেন।

তারপর ছেলেটি তার হারানো বাকশক্তিও ফিরে পেয়ে সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়ে উঠল। সকলে জয়জয়কার করতে লাগল বাবা লোকনাথের।

সেদিন এক ভদ্রলোক তাঁর এক বন্ধুকে নিয়ে বারদীর আশ্রমে এসে উপস্থিত হলেন। তাঁর হাতে ছিল একটি পাকা কাঁঠাল। বাবা লোকনাথকে দর্শন করার পর প্রণাম করলেন ভদ্রলোক।

ভদ্রলোক কিছু না বলতেই বাবা গোয়ালিনী মাকে ডাকলেন। গোয়ালিনী মা এলে বাবা তাঁকে বললেন, মাগো, ও যে কাঁটালটি এনেছে, তা ভেঙ্গে আন।

কথাটা শুনে ভদ্রলোকের কেমন যেন সন্দিগ্ধ হলো। তাঁর মনে হলো, কি যেন তিনি অন্যায় করেছেন।

একটু পরে গোয়ালিনী মা একটি পাথরের থালায় কাঁঠালটি ভেঙ্গে এনে উপস্থিত হলেন।

অমনি বাবা লোকনাথ সেই পাথরের থালাটি ভদ্রলোকের দিকে এগিয়ে

দিয়ে বললেন, নে খেয়ে নে।

তা শুনে ভদ্রলোক অনুতপ্ত হৃদয়ে কাঁদতে কাঁদতে নিজের অপরাধ স্বীকার করলেন বাবার কাছে।

বাবা লোকনাথ তখন স্নেহভরা কণ্ঠে বললেন, তুই কাঁদছিস কেন? তোর যখন বড় কাঁঠালটি খাওয়ার ইচ্ছা হয়েছিল, তখন সেইটিই তোর খাওয়া উচিত ছিল। আমার কাছে ছোট বড় সব সমান। ছোট কাঁঠালটি এখানে আনলেই হত। যে জিনিসে লোভ জন্মায়, সে জিনিসে কখনো আশ্রমের সেবা হয় না।

ভদ্রলোক কাঁঠালে হাত দিচ্ছেন না দেখে বাবা তাঁর নিজের হাতে কাঁঠালের কোয়া ভদ্রলোকের হাতে দিলেন। ভদ্রলোক তখন তা খেলে বাবা বাকি কোয়াগুলি উপস্থিত ভদ্রলোকদের মধ্যে বিতরণ করলেন।

অন্তর্যামী সর্বজ্ঞ মহাযোগী বাবা লোকনাথ 'সর্বেন্দ্রিয় তত্ত্বজ্ঞা প্রাপ্তি' সিদ্ধি ও ঐহিক বা পারত্রিক অর্থাৎ ইহলোক ও পরলোকের সকল তত্ত্ব অবগত হবার 'প্রাকাম্য' সিদ্ধি লাভ করেছিলেন। তাই তিনি ভদ্রলোককে দেখেই জানতে পেরেছিলেন, তার আনা কাঁঠালটির উপর তার লোভ জন্মেছিল।

এর কিছুক্ষণ পর বাবার এক ভক্ত ভদ্রলোককে আসল ব্যাপারটা কি তা জিজ্ঞাসা করলেন। তখন ভদ্রলোক বললেন, আমি এখানে আসার জন্য নারায়ণগঞ্জে পেঁছে ভাবলাম, খালি হাতে মহাপুরুষকে দর্শন করতে নেই। তাই কি নিয়ে আসব তাই ভাবতে লাগলাম। এখন জ্যৈষ্ঠ মাস। তাই আমার বন্ধুটি বলল, একটি পাকা কাঁঠাল নিয়ে গেলে কেমন হয়?

কথাটা আমার মনে ধরল। তাই নারায়ণগঞ্জ বাজারে গিয়ে দুটি পাকা কাঁঠাল কিনলাম। একটি বড়, একটি ছোট। ঠিক হলো, পথে আমাদের খিদে পেলে দুজনে একটি কাঁঠাল ভেঙ্গে খাব। তারপর আমরা পথ হাঁটতে শুরু করলাম। সেখান থেকে বারদী ছয় সাত মাইলের পথ। কিছুটা পথ হাঁটার পর আমাদের খিদে পেল। তখন আমি বললাম, এস, আমরা বড় কাঁঠালটি ভেঙ্গে খাই। কারণ বড়টি খেলে আমাদের দুজনের খিদে মেটবে। আশ্রমে ছোটটি দিলেও কোন দোষ হবে না।

কিন্তু আমার বন্ধুটি বেঁকে বসল। সে বলল, তা হয় না। আশ্রমে

বড় কাঁঠালটিই দেওয়া উচিত।

শেষে ছোট কাঁঠালটি আমরা ভেঙ্গে খেলাম। তারপর সুস্থ হয়ে পথ হাঁটতে লাগলাম। তারপর কি হয়েছে তা আপনি সব দেখেছেন ও শুনেছেন।

ওঁ

আর একদিনের কথা। এক পণ্ডিত এলেন বারদীর আশ্রমে। বাবাকে দর্শন করার পর নানা তত্ত্ব নিয়ে বাবার সঙ্গে আলোচনা করতে লাগলেন। এমন সময় এক ভিখিরি ভিক্ষের জন্য কাতরভাবে প্রার্থনা জানাতে লাগল।

করুণাময় বাবা তখন পণ্ডিতকে বললেন, পণ্ডিত, আমার ঘরের বেড়ার পিছনে একটা কলসীর মুখে একটা সরা আছে। ঐ সরার মধ্যে কিছু পয়সা আছে। তা এনে এই ভিখিরিকে দাও ত।

একথা শুনে পণ্ডিত বেড়ার পিছনে গিয়ে দেখলেন, একটি কলসীর মুখে একটি সরা বসানো আছে। কিন্তু তাতে পয়সা বা কোন পদার্থই নেই, সরাটি একেবারে শূন্য।

তিনি তখন বাবার কাছে ফিরে গিয়ে বললেন, আজ্ঞে, সরাতে ত কিছু নেই।

একথা শুনে বাবার মুখে ফুটে উঠল মৃদু হাসি। তিনি বললেন, পণ্ডিত যে কি করে এত অন্ধ হয় তা বুঝি না। তুমি গিয়ে ভাল করে দেখ, পয়সা আছে।

পণ্ডিত আবার সেখানে গিয়ে দেখলেন, সরা একেবারে ফাঁকা। তাতে কিছুই নেই।

তিনি আবার ফিরে এসে বাবাকে বললেন, সরাতে সত্যিই কিছু নেই।

বাবা বললেন, পণ্ডিত, তোমার চোখ নেই। চলত গিয়ে দেখি।

এই বলে আসন থেকে উঠলেন বাবা লোকনাথ। পণ্ডিত আগে আগে চলেছেন, পিছনে বাবা লোকনাথ। কী আশ্চর্য! বেড়ার পিছন দিকে গিয়েই পণ্ডিত দেখলেন, সেই সরার মধ্যে বেশ কিছু পয়সা চিকচিক করছে।

বাবা লোকনাথ কাছে না গিয়েই দূরে থেকে বললেন, কি গো পণ্ডিত

কিছু দেখতে পাচ্ছ ?

পণ্ডিত লজ্জিত হয়ে বললেন, হ্যাঁ বাবা, বেশ কিছু পয়সা সরার মধ্যে রয়েছে দেখছি।

বাবা বললেন, তবে যে বললে, পয়সা নেই।

পণ্ডিত বুঝতে পারলেন, এ হচ্ছে যোগসিদ্ধ মহাপুরুষ লোকনাথবাবার অলৌকিক লীলা। সেই অলৌকিক ব্যাপার লক্ষ্য করে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গেলেন তিনি।

মহাযোগী বাবা লোকনাথের যোগসিদ্ধ মন সর্বদা ভগবানের নির্গুণ ব্রহ্মরূপে বিলীন হয়ে থাকে। তাই ঐ অবস্থায় ইচ্ছামত যে কোন কামনাও পূরণ করতে পারেন। সাধারণ লোকের কাছে তা অলৌকিক বলে মনে হয়।

এই ঘটনার দ্বারা বাবা লোকনাথ পণ্ডিতকে বুঝিয়ে দিলেন, মানুষ জ্ঞানের অহংকারে মত্ত হয়ে পাণ্ডিত্য সুলভ তর্কদ্বারা সত্যকে চিরে চিরে দেখে। ফলে সত্যের একটা অংশ পায় মাত্র। প্রকৃত সত্যকে অবিকৃত বা যথার্থরূপে তাতে লাভ করা যায় না। এই বাস্তব জগতের উর্ধ্বে অধ্যাত্ম-শক্তির এমন অনেক ক্রিয়া আছে, যা লৌকিক জ্ঞানবুদ্ধি দিয়ে বুঝতে পারা যায় না।

পণ্ডিত এবার বুঝতে পেরে লজ্জিত হলেন। তাঁর জ্ঞানের অভিমান চলে গেল

ওঁ

সেদিন বাবা লোকনাথ আশ্রমে বসে ভক্তদের সঙ্গে কথা বলছিলেন। এমন সময় গোয়ালিনী মার এক আত্মীয় বাবার ভোগের জন্য কিছু খাদ্য-সামগ্রী নিয়ে আশ্রমে উপস্থিত হলেন। ভদ্রলোকের ইচ্ছা, তিনি নিজের হাতে বাবাকে ঐ ভোগ খাইয়ে দেবেন। এই মনে করে তিনি যেই না খাবারসহ হাতটা বাবার মুখের দিকে বাড়িয়েছেন, অমনি তাঁর হাত কাঁপতে শুরু করল। ভোগের খাবার হাত থেকে পড়ে গেল।

সেই সময় পাশে বসে ছিলেন চিকন্দীর উকীল গিরীশ চক্রবর্তীর বড় ভাই শরৎ চক্রবর্তী। বেশ কিছুদিন শরৎবাবু একবার বাবাকে নিজের হাতে খাইয়ে দিয়েছিলেন। তাই আজ ভাবলেন, তিনিই ঐ ভোগ বাবাকে

খাইয়ে দেবেন।

এই ভেবে তিনি এগিয়ে গিয়ে ভদ্রলোকের হাত থেকে ভোগের থালাটি নিয়ে বললেন, আমিই খাইয়ে দিচ্ছি।

এই বলে যেই না তিনি খাইয়ে দেবার জন্য বাবার মুখের দিকে হাত ওঠালেন, অমনি বাবা মুখ ঘুরিয়ে নিলেন পিছন দিকে। শরৎবাবু বাবার ঐ মুখভঙ্গির কারণ বুঝতে না পেরে পুনরায় বাবার মুখের দিকে হাত ওঠালেন। বাবাও তাঁর মুখ আরও সরিয়ে নিলেন। এইভাবে বাবা যতই মুখ সরাচ্ছেন, শরৎ বাবুও ততই তাঁর হাতটি বাবার মুখের দিকে নিয়ে যাচ্ছেন। তিনি কিছুতেই নিরস্ত হচ্ছেন না দেখে বাবা তাঁর পায়ের খড়ম দিয়ে শরৎবাবুর পিঠে তিনবার আঘাত করলেন। শরৎবাবু তখন কাঁদতে কাঁদতে সেখান থেকে চলে গেলেন।

শরৎবাবুর কান্নায় ব্যথিত হয়ে বাবা লোকনাথ তাঁকে ডেকে তাঁর কাছে বসে খাওয়াতে বললেন। বাবার কণ্ঠে স্নেহের সুর পেয়ে শরৎবাবু সব অভিমান ভুলে তাঁর কাছে বসে তাঁকে ভোগের দুধ ও খই খাইয়ে দিলেন।

আশ্রমে উপস্থিত ভক্তেরা কেউ এর কারণ বুঝতে পারল না। লঘু অপরাধে বাবা কেন শরৎবাবুকে খড়ম দিয়ে তাঁর পিঠে সজোরে আঘাত করলেন, তা সবার কাছে রহস্যময় ঠেকল।

পরে তারা এর কারণ জেনে আশ্চর্য হয়ে গেল। বাবা লোকনাথ শরৎ-বাবুর পিঠের যে জায়গায় আঘাত করেছেন, যেখানে শরৎবাবু বেশ কয়েক-বছর ধরে একটা বেদনা অনুভব করে আসছেন। অনেক চিকিৎসা করিয়েও তার কোন প্রতিবিধান হয়নি। কিন্তু আজ পরম মঙ্গলময় বাবার খড়মের জোর আঘাত পেয়ে সেই বেদনা চিরতরে সেরে গেল।

এইভাবে অন্তর্যামী মহাপুরুষ লোকনাথবাবা অলৌকিক উপায়ে শরৎ-বাবুর রোগ সারিয়ে দিলেন। শরৎবাবুও বাবা লোকনাথের ভক্তের মঙ্গল চিন্তার কথা ভেবে বাবার প্রতি অগাধ ভক্তি ও বিশ্বাসে অভিভূত হয়ে গেলেন।

একদিন বারদীর জমিদার অরুণকান্তি নাগের শিশুপুত্রটি খাট থেকে পড়ে যায়। তার বুকে চোট লাগে। কাছাকাছি কোন কবিরাজ বা ডাক্তারকে পাওয়া গেল না। তখন অরুণবাবুর মা বললেন, অরুণ, তুই বাচ্চাটাকে

নিয়ে এখনি বাবার আশ্রমে চলে যা। সেখানে বাবার আসনের একটুখানি ধুলো ওর বুকে মালিশ করে দিবি। আমার একান্ত বিশ্বাস, তাহলেই আমার নাতি ভাল হয়ে যাবে।

অরুণবাবুর এতে বিশ্বাস নেই। তবু মার অনুরোধে শিশু-পুত্রকে নিয়ে এসে আশ্রমে উপস্থিত হলেন। কিন্তু আসনের ধুলো নিতে কুণ্ঠাবোধ করতে লাগলেন।

অন্তর্যামী বাবা লোকনাথ অরুণবাবুর মনের ভাব বুঝতে পারলেন। তিনি বললেন, হ্যাঁরে, আসনের ধুলো নিতে তোর মন চাইছে না। তাতে যদি তোর ইচ্ছা না হয়, তবে আশ্রমের যে কোন জায়গা থেকে একটু মাটি নিয়ে গিয়ে তোর মাকে দিবি। তিনি মালিশ করে দেবেন, তোকে মালিশ করতে হবে না।

বাবা তাঁর মনের ভাব বুঝতে পেরেছেন জেনে লজ্জিত হলেন অরুণবাবু। তিনি তখন বাবার আসনের নীচের থেকে একটু ধুলো তুলে নিয়ে বাবাকে প্রণাম করে বাড়ি ফিরে গেলেন। অরুণবাবুর মা সেই ধুলো শিশুর বুকে মালিশ করে দিলেন। তাতে সত্যি সত্যিই শিশুটি সুস্থ হয়ে উঠল।

অরুণবাবুর মা ভক্তিমতী, কিন্তু অরুণবাবু অবিশ্বাসী। তবু মার আদেশ পালনের জন্যই তিনি আশ্রমে আসেন। কিন্তু অবিশ্বাসবশতঃ আসনের নীচের ধুলো নিতে কুণ্ঠাবোধ করছিলেন। কি করা উচিত তাই ভাবছিলেন। অন্তর্যামী মহাপুরুষ বাবা লোকনাথ তখন অরুণবাবুর মা-র ভক্তিতে বিচলিত হলেন। সেই ভক্তিতেই বাবার দয়া হয়। সেই দয়ার মধ্য দিয়ে বাবার ঐশী শক্তি নেমে এসে তাঁর শিশুপুত্রকে রোগমুক্ত করল।

বাবা অরুণবাবুকে যে কথা বললেন তার প্রকৃত অর্থ এই যে, অরুণবাবুর বিশ্বাস থাক বা না থাক, মার আদেশ পালনের জন্যই ধুলো নিয়ে যাওয়া তাঁর কর্তব্য।

এই ঘটনার আর একটি তাৎপর্য এই যে, অরুণবাবুর মার ভক্তিতে বাঁধা পড়ে বাবা লোকনাথ অরুণবাবুর অবিশ্বাস সত্ত্বেও বাধ্য হয়ে কৃপা করলেন। অরুণবাবু অজ্ঞানে অন্ধ ছিলেন বলেই বাবার অযাচিত করুণার

কারণ বুঝতে পারেননি। তাই বাবা অরুণবাবুকে ধুলো নিয়ে যেতে বললেন যাতে তাঁর পরে চৈতন্য হয়।

ওঁ

সে বছর বারদীর নাগজমিদারদের কোন এক এজমালি মহালে প্রজারা বিদ্রোহী হলো। তারা খাজনা দেওয়া বন্ধ করে দিল। তখন জমিদারির শরিকদের কেউ কেউ সে বিদ্রোহ কঠোর হতে দমন করার নির্দেশ দিল। কিন্তু তাঁদের মধ্যে যিনি বয়োবৃদ্ধ তিনি বললেন, কিছু করবার আগে বাবা লোকনাথের পরামর্শ নেওয়া উচিত।

একথা শুনে কেউ কেউ বললেন, নিজেদের জমিদারি নিজেরা রক্ষা করব। তাতে আবার বাবার পরামর্শ নেবার দরকার আছে বলে মনে করি না।

কিন্তু বেশীর ভাগ শরিক বাবার পরামর্শ নেবার পক্ষে মত দিলেন। তাই তাঁরা সকলে মিলে লোকনাথবাবার আশ্রমে গেলেন।

যাবার আগে তাঁদের মধ্যে যে সব কথাবার্তা হয়েছে তা সর্বজ্ঞ অন্তর্যামী মহাপুরুষ লোকনাথ সব আগেই জানতে পেরেছেন। তাই তাঁরা আশ্রমে গিয়ে উপস্থিত হতেই বাবা তাঁদের বললেন, হ্যাঁরে, নিজেদের জমিদারি নিজেরা রক্ষা করবি, তাতে আবার বাবার পরামর্শ নেবার দরকার আছে বলে মনে করি না।

নাগবাবুরা বুঝতে পারলেন, তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ যে কথা বলেছিলেন, তা মহাযোগী লোকনাথবাবা সর্বান্তর্যামিত্ব ও সর্বজ্ঞতাশক্তিবলে তা জেনে গেছেন। বাবার কথা শুনে তাই তাঁরা ভীত, বিস্মিত ও লজ্জিত হলেন। পরে বললেন, আমাদের অন্যায় হয়েছে। আমাদের ক্ষমা করুন। আমরা আপনার শরণাপন্ন।

তখন বাবা লোকনাথ তাঁরা কিছু না বললেও তাঁদের সমস্যার কথাটা নিজেই বলে দিলেন। তিনি বললেন, তোদের প্রজারা বিদ্রোহী হয়েছে এই ত? ঠিক আছে; তোদের কিছুই করতে হবে না। তোরা এই আশ্রম থেকেই বিদ্রোহী প্রজাদের খাজনা ও কবুলীত বুঝে পাবি।

বাবার কথা শুনে নাগবাবুরা ভাবলেন, বিদ্রোহী প্রজারা আশ্রমে এসে

ভাল মানুষের মত খাজনা ও কবুলীতি দেবে, এটা অবিশ্বাস্য ব্যাপার। বাবার কথায় তাঁদের বিশ্বাস হলো না। তাই বাড়ি গিয়ে তাঁরা বাবার সেকথা অমান্য করে ঠিক করলেন, লেঠেল পাঠিয়ে বিদ্রোহী প্রজাদের পাট-ক্ষেত থেকে পাট কেটে আনা হবে।

এই ভেবে তাঁরা লেটেল সংগ্রহ করলেন। কিন্তু কি মনে হতে তাঁরা লেঠেলদের হুকুম দেবার আগে আশ্রমে গিয়ে লোকনাথবাবার পরামর্শ চাইলেন।

এবারও তাঁদের দেখেই বাবা লোকনাথ বললেন, তোরা একাজ করিস না। আমি ত বলছি, ভয় নেই। আশ্রম থেকেই তোরা খাজনা ও কবুলীতি পাবি।

কিন্তু বাড়ি ফিরে গিয়ে এবারও তাঁরা বাবার আদেশ অমান্য করলেন। তাঁরা একদল লেঠেল পাঠিয়ে জোর করে প্রজাদের ক্ষেত হতে সব পাট কেটে আনলেন। প্রজারা বাধা দিতে এলে লেঠেলরা তাদের উপর লাঠি চালাতে থাকে। লেঠেলদের লাঠির আঘাতে একজন প্রজা গুরুতরভাবে আহত হয়। তার জন্য লেঠেলদের আসামী করে আদালতে ফৌজদারী মামলা রুজু করে প্রজারা। তারা দায়রা বা উচ্চ ফৌজদারী আদালতে সোপরর্দ্দ হয়।

এতে নাগবাবুরা ভয় পেয়ে গেলেন। তাঁরা বুঝতে পারলেন, এ হলো বাবার আদেশ অমান্য করার ফল। তাঁরা নিজেদের মধ্যে বলা বলি করতে লাগলেন, আমরা দু দুবার বাবার আদেশ অমান্য করেছি।

তাই তাঁরা ঠিক করলেন, তাঁরা আবার যোগসিদ্ধ মহাপুরুষ বাবা লোকনাথের কাছে গিয়ে ক্ষমা চাইবেন। তিনি যা আদেশ করবেন তা যথাযথভাবে তা পালন করবেন।

তাঁরা সকলে মিলে আবার আশ্রমে গিয়ে উপস্থিত হলেন।

তাঁদের দেখে বাবা বললেন, ওরে তোরা এবারও আমার আদেশ অমান্য করেছিস। শুধু তাই নয়, গতকাল সকাল আটটা নাগাদ আমার উদ্দেশে কটূক্তি করেছিস।

একথা শুনে লজ্জিত হলেন নাগবাবুরা। তারপর অনুনয় বিনয় করে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। অন্যায় স্বীকার করলেন। বাবার কৃপা প্রার্থনা

করে বললেন, বাবা, আমাদের ক্ষমা করুন।

বাবা লোকনাথ এবারও তাঁদের ক্ষমা করলেন। তিনি বললেন, ওরা যা করেছে করুক। তোরা দারোগা, পুলিস, আমলা, উকীল, মোক্তার কাউকেই কোন টাকা পয়সা দিবি না। তোরা বাড়ি ফিরে যা।

বাবার এই অভয়বাণী শুনে তাঁরা বাড়ি ফিরে গেলেন। কিন্তু বাবার কথায় আস্থা রাখতে পারলেন না। তাঁরা ভাবলেন, লেঠেলদের বিরুদ্ধে ফৌজদারী মামলা দায়ের করা হয়েছে। এই অবস্থায় উকীল মোক্তার দিয়ে যদি আসামীদের পক্ষ সমর্থন করা না হয়, তবে তাদের শাস্তি অনিবার্য। তাহলে লেঠেলদের কাছে তাঁদের আপমানিত হতে হবে। তাদের কাছে তাঁরা হেয় প্রতিপন্ন হবেন। কারণ লেঠেলরা তাঁদের হুকুম অনুসারেই কাজ করেছে। এই ভেবে তাঁরা লেঠেলদের পক্ষে মামলা চালাতে লাগলেন।

কিন্তু কোন কিছুতেই শাস্তির হাত থেকে লেঠেলদের বাঁচানো গেল না। আসামী লেঠেলদের প্রত্যেকের ছ'মাস করে জেল হয়ে গেল। নাগবাবুদের এখন বাবা লোকনাথের কাছে যাবার মুখ নেই। কারণ তাঁরা তাঁর কোন কথাই শোনেননি।

তাই ঐ শাস্তির বিরুদ্ধে তাঁরা আপীল করলেন উচ্চ আদালতে। এই সময় আবার নাগবাবুদের বিপদ আরো বেড়ে গেল। কারণ বিদ্রোহী প্রজাদের মধ্যে যে লোকটি পাট তুলে আনার সময় লেঠেলদের লাঠির আঘাতে আহত হয়েছিল, সে মারা যায়। তাই আপীলের মামলা চলতে থাকা অবস্থায় ফরিয়াদি পক্ষ থেকে আদালতে এই বলে এক দরখাস্ত করা হয় যে আহত লোকটি মারা গেছে। তাই তারা খুনের বিচার প্রার্থনা করছে।

নাগবাবুরা এতে বিশেষভাবে চিন্তিত হয়ে পড়লেন। তাঁরা তখন ভাবতে লাগলেন, আপীলে যদি আসামীরা অব্যাহতি পায়, তাহলে আর তাদের বিরুদ্ধে খুনের মামলা টিকবে না। কিন্তু আগের শাস্তি যদি বহাল থাকে, তবে খুনের মামলা চলবে।

এই ঘোরতর বিপদের সম্মুখীন হয়ে নাগবাবুদের সব অহঙ্কার চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল। তাঁদের অনুতাপ অনুশোচনা চরমে উঠল। তাঁরা আবার দ্বিধা ও কুণ্ঠা ঝেড়ে ফেলে বাবা লোকনাথের শরণাপন্ন হলেন।

নাগবাবুরা বারবার তাঁর আদেশ অমান্য করা সত্ত্বেও বাবা লোকনাথ

তাঁদের দেখে রাগের ভান করে বললেন, তোরা বারবার আমার আদেশ অমান্য করে মহা অপরাধ করেছিস। এজন্য তোদের একশো টাকা জরিমানা দিতে হবে। তোরা জানিস না, আমি যা ইচ্ছা তাই করতে পারি। তোরা নাস্তিক, তাই তোদের বিশ্বাস নেই।

একথা শুনে আশ্বস্ত হলেন নাগবাবুরা। তাঁরা বুঝলেন, বাবা তাদের সব অপরাধ ক্ষমা করেছেন। বুঝতে পারলেন, মাত্র একশো টাকা জরিমানা দিলেই এই বিপদ থেকে উদ্ধার পাবেন তাঁরা বাবার কৃপায়। তাই সানন্দে জরিমানা দিতে সম্মত হলেন তাঁরা।

বাবা লোকনাথ এর পর বললেন, যেদিন তোদের আপীলের মামলার শুনানি হবে, সেদিন বিকেলবেলায় তোরা আমার কাছে আসবি।

নাগবাবুরা আশ্বস্ত হয়ে বাড়ি ফিরে গেলেন।

এর কিছুদিন পর আপীলের শুনানির দিন নির্দিষ্ট হলো। ঐ নির্দিষ্ট দিনে বিকেলে নাগবাবুরা ভয়ে ভয়ে বাবা লোকনাথের কাছে গিয়ে উপস্থিত হলেন।

তাঁরা আশ্রমে উপস্থিত হলে তাঁদের দেখামাত্র বাবা বললেন, তোদের জজ অসুস্থ। আমি সেখানে গিয়েছিলাম। আমি তাকে উঠিয়ে বিচারের রায় লিখিয়ে দিয়ে এসেছি। আগামী কালই আসামীদের খালাস পাবার টেলিগ্রাম পাবি। আর শোন, আসামীদের তোরা আমার আশ্রমেই পাবি। যা এখন বাড়ি ফিরে যা।

পরম করুণাময় মহাশক্তিধর বাবার কাছ থেকে এই অভয়বাণী শুনে নিশ্চিন্ত মনে বাড়ি ফিরে গেলেন নাগবাবুরা।

কী আশ্চর্য! পরেরদিনই টেলিগ্রামযোগে খবর এল, আসামীরা খালাস পেয়েছে। আরো আশ্চর্যের কথা এই যে, আসামীরা খালাস পেয়ে নাগবাবুদের বাড়ি না গিয়ে বাবা লোকনাথের আশ্রমে এসে উপস্থিত হলো। নাগবাবুরা খবর পেয়ে বাবার আশ্রমে এসে দেখা করলেন তাদের সঙ্গে।

ঘটনাটি সত্যিই বড় অদ্ভুত। যেভাবে নাগবাবুরা বাবার আদেশ বার-বার অমান্য করেছেন তাতে দেবতরাও রেগে যেতেন তাঁদের উপর। কিন্তু দয়াময় বাবা লোকনাথ রাগ করেননি তাঁদের উপর। তাঁদের সব অপরাধ

ক্ষমা করেছেন। তিনি তাদের অবিশ্বাসী ও কলুসিত মনে বিশ্বাসের পবিত্র আলো আনার জন্য ধৈর্যধারণ করেছেন।

অন্তর্যামী মহাপুরুষ বাবা লোকনাথের সব কিছুই অলৌকিক। তাঁর যোগসাধনা ও সিদ্ধি দুইই অলৌকিক। তিনি সূক্ষ্মদেহ ধারণ করে জজের কাছে গিয়েছিলেন। তাঁর কথা ঈশ্বরের, মতই অমোঘ ও অব্যর্থ। বাবা লোকনাথের সব কিছুই অলৌকিক। তাঁর যোগসাধনা, যোগসিদ্ধি, শিক্ষা-পদ্ধতি, তাঁর করুণা ও বিশ্বপ্রেম সবই অলৌকিক। তাঁর অলৌকিক ও মহৈশ্বর্যময় আচরণগুলিকে লৌকিক জ্ঞানের দ্বারা বুঝতে যাওয়া মূর্খতা ছাড়া আর কিছুই নয়।

সেদিন পশ্চিমদী গ্রামের বাসিন্দা অন্নদাসুন্দরী বারদীর আশ্রমে এসেছেন। অন্নদাসুন্দরী খুবই ভক্তিমতী। তিনি প্রায়ই আশ্রমে আসেন। বাবা লোকনাথকে দর্শন করে ও তাঁর প্রসাদ পেয়ে কৃতার্থ হন। তাঁর নিষ্ঠা ও ভক্তি দেখে বাবা তাঁকে 'মা' বলে ডাকেন।

সেদিন আশ্রমে এসে বাবা লোকনাথকে প্রণাম করে অন্নদাসুন্দরী বাবার পাশে বসলেন। বাবা তখন অন্নদাসুন্দরীকে বলেন, আচ্ছা, তুই ত আমার মা হয়েছিস। তোর ছেলেকে একটিবার কোলে নিয়ে বসতে ইচ্ছা করে না ?

তা শুনে অন্নদাসুন্দরী বললেন, তা কেন হবে না বাবা ? তবে তুমি এখন কত বড় হয়েছ। তাই কেমন করে তোমাকে কোলে নিয়ে বসব ? তোমার যদি কৃপা হয় তবেই তোমাকে কোলে নিয়ে বসতে পারি।

বাবা বললেন, আচ্ছা একবার চেষ্টা করেই দেখনা। কোলে নিতে পার কিনা।

তখন অন্নদাসুন্দরী এগিয়ে এসে সন্তানরূপী লোকনাথকে কোলে তুলে নিলেন।

এ কি ! সহসা বিস্ময়ের ঘোরে চেঁচিয়ে উঠলেন অন্নদাসুন্দরী। এযে দেখছি শোলার চেয়েও হালকা ও নরম।

এদিকে ছোট শিশুটির মত কোলে শুয়ে মিটমিট করে চেয়ে আছেন সন্তানরূপী লোকনাথ। মুখে মধুর হাসি।

অন্নদাসুন্দরী মহাযোগী লোকনাথবাবার এই যথাচিত করুণা ও

মহিমা দেখে কৃতার্থ হয়ে, সজল নয়নে ভক্তিগদগদ কণ্ঠে বললেন, বাবা, আমি তোমার সামান্য এক মেয়ে। কোন জ্ঞান নেই। তাই এসব কথা বলেছিলাম। বুঝতে পারিনি, তোমার কৃপা হলে সবই সম্ভব।

কালশক্তির দ্বারা ভগবান যেভাবে পরমাণুর মত সূক্ষ্ম মূর্তিতে বিরাজ করেন, ভগবানের সেই পরমাণু মূর্তিতে মনকে যুক্ত করে মহাযোগী বাবা লোকনাথ দেহকে অতিমাত্রায় লঘু করে 'লখিমা' সিদ্ধির পরিচয় দিতেন। তাইত অন্নদাসুন্দরীর মনে হয়েছিল, বাবা শোলার মত হালকা।

ওঁ

যেদিন বারদীর জমিদারবাড়ির কুঞ্জলাল নাগ ও অরুণকান্তি নাগ সন্ধ্যার পর হঠাৎ আশ্রমে এসে উপস্থিত হলেন। বাবাকে দর্শন ও প্রণাম করলে, বাবা তাঁদের বললেন, তোরা না খেয়ে যাসনি। এখনি খিচুড়িভোগ রান্না করে দিতে বলছি।

এই বলে তিনি গোয়ালিনী মাকে ডেকে নিজেই খিঁচুড়ির জন্য চাল ডালের পরিমাণ ঠিক করে দিলেন। যে পরিমাণ চাল ডালের পরিমাণ ঠিক করে দিলেন, তাতে পঞ্চাশ জনেরও বেশী লোক খেতে পারবে।

যথাসময়ে খিঁচুড়ি রান্না হলে কুঞ্জবাবু অরুণবাবুকে বললেন, কিরে, কি ব্যাপার বলত? আমরা মাত্র দশজন, অথচ রান্না হলো পঞ্চাশ জনেরও বেশী লোকের জন্য। এত খিঁচুড়ি কে খাবে রে?

কথাটা বাবা লোকনাথ শুনলেন। কিন্তু কিছু বললেন না।

তখন রাত দশটা। কুঞ্জবাবু ও অরুণবাবু পেট ভরে খিঁচুড়ি খেয়ে বাবাকে প্রণাম করে বাড়ি ফিরে যাবার জন্য রওনা হলেন। তাঁরা আশ্রমের উঠোনটা পার হতেই পিছনে থেকে বাবা পরিহাস করে বললেন, এত খিঁচুড়ি খাবে কেরে?

বাবার এই পরিহাসের অর্থ নাগবাবুরা বুঝতে পারলেন না। আশ্রমের আঙ্গিনা পার হতেই তাঁরা দেখলেন, হঠাৎ কোথা হতে চল্লিশ পঞ্চাশ জন লোক এসে হাজির। এতক্ষণে কুঞ্জবাবু ও অরুণবাবু বাবার পরিহাসের অর্থ বুঝতে পারলেন। এতক্ষণে বুঝতে পারলেন পঞ্চাশ জনেরও বেশী লোকের জন্য চাল ডাল প্রভৃতি কেন বার করে দিয়েছিলেন বাবা লোকনাথ।

সর্বজ্ঞ বাবা লোকনাথ অনেক আগে হতেই বুঝতে পেরেছিলেন, চল্লিশ পঞ্চাশজন অতিথি অসময়ে এসে হাজির হবে আশ্রমে। তাই তাদের খাওয়ার ব্যবস্থা আগে হতেই করে রেখেছিলেন।

কলকাতার হাটখোলানিবাসী সীতানাথ দাস বেশ ধনী লোক। টাকা পয়সার কোন অভাব নেই। সংসারে সুখ ঐশ্বর্যেরও কোন অভাব নেই। কিন্তু তাঁর একটাই দুঃখ। দীর্ঘকাল বাতরোগে ভুগে তিনি পঙ্গু হয়ে গেছেন উত্থান শক্তিরহিত। অনেক চিকিৎসা করিয়েও কোন ফল হয়নি।

অবশেষে লোকমুখে লোকনাথবাবার কথা শুনলেন তিনি। শুনলেন, বারদীর ব্রহ্মচারী যোগসিদ্ধ মহাপুরুষ। নানারকমের দুরারোগ্য রোগ সারাবার অলৌকিক শক্তি আছে তাঁর।

তাই শুনে একদিন তিনি একটি বজরা নিয়ে আত্মীয়স্বজন ও দাসদাসী সব নিয়ে জলপথে বারদীর উদ্দেশ্যে রওনা হলেন।

বারদীর ঘাটে বজরা নোঙ্গর করলে সীতানাথবাবুকে অতিকষ্টে ধরাধরি করে বারদীর আশ্রমে নিয়ে গিয়ে হাজির করা হলো। সীতানাথ বাবু তাঁর আত্মীয়স্বজন ও দাসদাসীদের বজরায় পাঠিয়ে দিয়ে আশ্রমের আঙ্গিনায় একটা দড়ির খাট পেতে তাতে শুয়ে পড়লেন।

তিনি মনে মনে ভাবলেন, যখন মহাপুরুষের শরনাপন্ন হয়েছি, তখন এই আশ্রমের আঙিনাতেই পড়ে থাকব। যদি মহাপুরুষের কৃপা হয় তবে রোগমুক্ত হব। আর যদি অদৃষ্টে মৃত্যুই থাকে তবে মহাপুরুষের সামনেই মরব।

দুদিন দুরাত কাটল। বৃষ্টির জল ও রোদের তাপ সমানে সহ্য করেও সীতানাথবাবুর মনোবল কিছুমাত্র কমল না। তিনি অটল হয়ে রইলেন তাঁর সংকল্পে। কিন্তু এই দুদিনের মধ্যে বাবার কৃপা দৃষ্টি পড়ল না তাঁর উপর।

দুদিন পর সীতানাথবাবুর আত্মীয়স্বজন ও অনুচরেরা এসে তাঁর এই দুর্দশা দেখে মনে দুঃখ পেল। তারা সীতানাথবাবুকে বজরায় ফিরে যেতে অনুরোধ করল। কিন্তু সীতানাথবাবু বললেন, এখানে বাবার আশ্রমে প্রাণ যায় সেও ভাল। তবুও আমি বজরায় ফিরে যাব না।

এ[illegible] শুনে তারা সবাই বজরায় ফিরে গেল।

তৃতীয় দিনে ভোরবেলায় সহসা বাবার প্রাণ কেঁদে উঠল। সূর্য ওঠার পরেই বাবা তাঁর ঘর হতে বেরিয়ে সীতানাথবাবুর কাছে গিয়ে বললেন, সীতানাথ, তোকে অনেক কষ্ট দেয়েছি। নে, এবার উঠে দাঁড়া।

এই বলে বাবা যেমনি সীতানাথবাবুকে স্পর্শ করলেন, অমনি বহুদিনের পঙ্গু বাতরোগগ্রস্ত সীতানাথবাবু দেহে অসীম শক্তি পেয়ে উঠে দাঁড়ালেন। এক অলৌকিক শক্তিদ্বারা শুধুমাত্র একবার স্পর্শ করে বাবা লোকনাথ চলৎশক্তিহীন ভক্তকে মুহূর্তমধ্যে দুরারোগ্য ব্যাধি থেকে মুক্ত করলেন।

এবার সীতানাথবাবুর বিদায় নেবার পালা। অপরিসীম ভক্তি ও কৃতজ্ঞতায় বিগলিত হয়ে গেল তাঁর অন্তর। তিনি অশ্রুসজলনেত্রে ভক্তিভরে প্রণাম করলেন বাবাকে। বাবা বললেন, সীতানাথ, তুই তোর দেহ মনপ্রাণ, স্ত্রীপুত্র, আত্মীয়স্বজন, দাসদাসী, এমন কি তোর সব বিষয়সম্পত্তি —সব আমাকে অর্পণ করে আমারই উঠানে বৃষ্টিতে ভিজেছিস ও রোদে পুড়েছিস। তোর জন্য আমারও প্রাণ কেঁদেছে। এখন তুই সুস্থ সবল হয়েছিস। তুই আমাকে যা দিয়েছিস তা আমারই রইল। আমি শুধু ভোগাধিকার দান করলাম তোকে। যা, এবার বাড়ি ফিরে যা।

সীতানাথবাবুর মনোবল ও ভক্তির প্রগাঢ়তা পরীক্ষা করবার জন্যই দুদিন তাঁকে আশ্রমের উঠোনে ঐ অবস্থায় ফেলে রেখেছিলেন বাবা। তাঁর জন্য তাঁর প্রাণ কাঁদলেও বাইরে তা প্রকাশ করেননি। ওঁর কৃপাদৃষ্টি পড়েনি তাঁর উপর। অবশেষে সীতানাথবাবু সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে তবে বাবা কৃপা করেন তাঁকে।

তারপর বাবা তাঁর উপদেশের দ্বারা এই কথাই বোঝাতে চাইলেন যে, এই হলো প্রকৃত ভক্তির পরিণাম। প্রকৃত ভক্ত উপাস্য বা ইষ্ট দেবতার জন্য কাঁদে, তেমনি ভক্তের জন্য উপাস্য দেবতাও কাঁদেন।

সীতানাথবাবু অনন্যহৃদয় হয়ে বাবার প্রতি যে অপূর্ব ভক্তির পরিচয় দেন, তাতেই সন্তুষ্ট হয়ে বাবা তাঁকে বিষয়ভোগের অধিকার দান করেন। তিনি তাঁকে বলেন, তুই আমাকে তোর যথাসর্বস্ব দান করেছিস, তাতে আমারই স্বত্ব বর্তেছে। এ সব এখন আমার। তোকে শুধু ভোগাধিকার দিলাম। অর্থাৎ তুই অহংভাব বা 'আমার আমার' এই সব ত্যাগ করে ঐ

সব বস্তু নিষ্কামভাবে ভোগ করবি।

কিছুদিনের মধ্যে এই ধরনের আর একটি রোগী এসে উপস্থিত হয় বারদীর আশ্রমে। ঢাকা পশ্চিমদী নিবাসী রাধিকামোহন রায় দীর্ঘদিন বাতরোগে ভুগে পঙ্গু হয়ে চলার শক্তি হারিয়ে ফেলেন। বহু নামজাদা ডাক্তার কবরেজ দেখিয়েও কোন ফল হয়নি। রোগের কিছুমাত্র উপশম হয়নি।

অবশেষে রাধিকাবাবু বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ও রজনী ব্রহ্মচারীর পরামর্শে একটি বজরা ভাড়া করে জলপথে আত্মীয় পরিজনসহ বারদী রওনা হন। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস, বাবা লোকনাথের চরণস্পর্শে পবিত্র তাঁর আশ্রমের মাটি গায়ে মাখলেই তাঁর দুরারোগ্য এই বাতরোগ একেবারে সেরে যাবে।

বারদীর ঘাটে বজরা নোঙ্গর করে স্ত্রী ও আত্মীয়স্বজনদের সাহায্যে বারদীয় আশ্রমে গিয়ে উপস্থিত হন রাধিকাবাবু। তিনি আশ্রমে গিয়ে বাবা লোকনাথকে দর্শন ও প্রণাম করে মুখে কিছু না বলে বাবার পাশে বসলেন। তারপর বাবার সঙ্গে আলাপ আলোচনা করতে করতে মাঝে মাঝে বাবার আসনের সামনের জায়গার ধুলো নিয়ে গায়ে মাখতে লাগলেন। তারপর বজরায় ফিরে গেলেন।

এইভাবে প্রতিদিনই নির্দিষ্ট সময়ে বজরা থেকে আশ্রমে এসে বাবার কাছে বসে আলোচনা করতে করতে বাবার আসনের সামনের ধুলো নিয়ে গায়ে মাখতে থাকেন। তারপর বজরায় ফিরে যান

এইভাবে পুরো একটি মাস কেটে গেল।

আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এই একমাস ধরে আশ্রমের পবিত্র মাটি মাখার ফলে রাধিকাবাবুর বাতরোগ প্রায় নির্মূল হতে চলেছে। সারা দেহের মধ্যে কোথাও ব্যথা বেশী বা পঙ্গুত্ব নেই। শুধু তিনি তাঁর ডান হাতটি তখনো ওঠাতে পারেন না। এ ছাড়া কোন কষ্টই নেই তাঁর। তবু বাবা লোকনাথকে মুখ ফুটে কিছু বলতে পারলেন না রাধিকাবাবু। কারণ মহাতীর্থ বারদীয় আশ্রমের পবিত্র মাটির উপর যে আস্থা ও গভীর বিশ্বাস নিয়ে তিনি এখানে এসেছেন, সেই বিশ্বাসের উপরেই নির্ভর করে রোগ মুক্ত হতে চান তিনি।

কিন্তু সামান্য একটুর জন্য স্বামী সম্পূর্ণরূপে রোগমুক্ত হতে পারছেন

না দেখে রাধিকাবাবুর স্ত্রী আর থাকতে পারলেন না। একদিন তিনি নিজে আশ্রমে এসে বাবার পাশে বিষন্নমনে বসলেন। কিছুক্ষণ পর বাবা তাঁকে, জিজ্ঞাসা করলেন, এমন বিষন্ন বদন কেন গো মা?

রাধিকাবাবুর স্ত্রী তখন কাতরকণ্ঠে বললেন, বাবা, আমার স্বামীর বাতরোগ প্রায় সেরে গেছে বটে, কিন্তু তিনি এখনো তাঁর ডান হাতটি ওঠাতে পারছেন না। তাই আমার মনে শান্তি নেই।

এই কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে বাবা লোকনাথ তাঁর নিজের ডান হাতটি তিনবার নাড়লেন। তিনবার হাতটি ওঠালেন। তারপর বললেন, এবার মা তুমি বজরায় ফিরে যাও। এবার হতে তোমার স্বামীর ডান হাতটি ওঠাতে আর কোন কষ্ট হবে না।

রাধিকাবাবুর স্ত্রী কথাটি শুনে আশ্চর্য হয়ে গেলেন। এত দূর থেকে শুধু নিজের ডান হাতটি তিনবার উঠিয়ে কি করে তাঁর স্বামীকে তাঁর ডান হাতটি ওঠাবার শক্তি দান করলেন বাবা, তা ভেবে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলেন রাধিকাবাবুর স্ত্রী। পরে বুঝলেন, লোকনাথবাবার মত মহাযোগী মহাপুরুষের পক্ষেই এ কাজ সম্ভব।

যাই হোক, বাবার প্রতি তাঁর বিশ্বাস অগাধ। তিনি জানেন, বাবার কথা মিথ্যা হবার নয়। তাই সন্তুষ্ট মনে বজরায় ফিরে গেলেন। সেখানে গিয়েই তিনি আশ্চর্য হয়ে গেলেন। তিনি দেখলেন, তাঁর আসার আগেই তাঁর স্বামীর ডান হাতটি ভাল হয়ে গেছে। যে হাতটি তাঁর স্বামী এতদিন ওঠাতে বা নাড়তে পারতেন না, সেই হাত নিয়ে সহজভাবে কি একটি কাজ করছেন। অর্থাৎ আশ্রমে তাঁর সামনে বাবা লোকনাথ যখন তাঁর নিজের ডান হাতটি তিনবার উঠিয়েছিলেন, ঠিক তখনি তাঁর স্বামীর ডান হাতটি ভাল হয়ে যায়।

জীবনে কিছু কিছু যোগশক্তির কথা শুনেছেন রাধিকাবাবুর স্ত্রী। কিন্তু আজ বাবা লোকনাথের এই অলৌকিক যোগশক্তি নিজের চোখে দেখে নিজেকে ধন্য ও কৃতার্থ মনে করলেন তিনি। এমন বিস্ময়কর ও অলৌকিক ব্যাপার জীবনে কখনো দেখেননি তিনি।

এদিকে রাধিকাবাবুও তাঁর ডান হাতটি হঠাৎ ভাল হয়ে ওঠায় কম আশ্চর্যবোধ করেননি। তারপর স্ত্রীর কাছে সব কথা শুনে তাঁর বিস্ময়

আরো বেড়ে যায়। তখন ভক্তিনম্র চিত্তে বাবার উদ্দেশে প্রণাম জানাতে থাকেন বারবার।

রাধিকাবাবু ও সীতানাথবাবু দুজনেই ধনী এবং দুজনেই বাত-রোগগ্রস্ত। কিন্তু দুজনে দুভাবে রোগমুক্ত হন। অর্থাৎ দুজনের ক্ষেত্রে মহাপুরুষের ব্যবস্থা বিপরীত। বাতরোগগ্রস্ত পঙ্গু সীতানাথবাবু তাঁর যথাসর্বস্ব ত্যাগ করে ও বাবাকে তা সমর্পন করে বাবার উঠোনে বৃষ্টিতে ভিজে ও রোদে পুড়ে অতিকষ্টে রোগমুক্ত হন। কিন্তু রাধিকাবাবু বাবুগিরি করে বাবার কাছে বসে আলাপ আলোচনা করে শুধু ধুলো মেখে বিনা আয়াসে রোগমুক্ত হয়েছেন।

সীতানাথবাবু ধনী বিষয়ী হলেও তিনি ধার্মিক, সৎ ও ভক্তিমান। তবু তাঁর ধর্মনিষ্ঠা ও ভক্তির পরীক্ষা করে দুদিনমাত্র তাঁকে কষ্ট দিয়েই তাঁকে রোগমুক্ত করেন বাবা লোকনাথ। কিন্তু রাধিকাবাবু কুটিল স্বভাবের, দুশ্চরিত্র ও ধর্মকর্মহীন বলে পুরো একটি মাস আশ্রমে আসা যাওয়া করতে হয় তাঁকে। রাধিকাবাবুর স্ত্রী পতিব্রতা, ধর্মপরায়ণা ও ভক্তিমতী রমণী ছিলেন বলেই তাঁর মুখের দিকে চেয়ে তাঁর স্বামীকে রোগমুক্ত করেন বাবা। বাবা জানতেন রাধিকাবাবুর স্ত্রী অনেক চেষ্টা করেও স্বামীকে সংশোধন করতে পারেননি। তবু তিনি স্বামীসেবার কোন ত্রুটি করেননি। তাই তাঁর উপর বাবার দয়া হয়, আর তাতেই রোগমুক্ত হন রাধিকাবাবু।

তাছাড়া পাপী রাধিকাবাবুর রোগমুক্তির আর একটি কারণ ছিল। আমরা পুরাণে দেখতে পাই, যখনই কোন পাপিষ্ঠ অসুরের অসুরত্ব পূর্ণমাত্রায় জন্মেছে, যখনই তার পাপের মাত্রা সীমা ছাড়িয়ে গেছে, তখনই ভগবান কৃপা করে তাকে অসুরত্ব থেকে মুক্তি দিয়েছেন। রাবণ, হিরণ্য-কশিপু, শিশুপাল তার দৃষ্টান্ত। রাধিকাবাবুও যখন পাপকাজের সীমা ছাড়িয়ে যান, যখন তাঁর পাপের মাত্রা সীমা ছাড়িয়ে যায়, যখন তাঁর সংসর্গে বহু লোক নরকের দ্বারে গিয়ে উপনীত হয়, তখনই বাবা তাকে কৃপা করে মুক্ত করেন।

তাছাড়া যে পতিব্রতা বিদ্যারূপিণী স্ত্রীর দীর্ঘশ্বাসে রাধিকাবাবু দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হন, সেই স্ত্রী নিজে প্রতিদিনই মাসাধিককাল লোকনাথবাবার কাছে এসে তাঁর দুশ্চরিত্র স্বামীর রোগমুক্তির জন্য বাবার

কৃপাভিক্ষা করেছেন। তাই সাবিত্রীর সতীত্বগুণে যেমন তাঁর মৃত স্বামী পূর্ণজীবন লাভ করেন, তেমনি পতিপরায়ণা স্ত্রীর গুণেই রাধিকাবাবুও বাবা লোকনাথের কৃপায় দুরারোগ্য রোগ থেকে মুক্তিলাভ করেন।

সেদিন কেউটাখালী গ্রামের মহেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর অন্তসত্ত্বা স্ত্রী ও মাকে নিয়ে রজনী ব্রহ্মচারীর সঙ্গে বারদীর আশ্রমে এসে উপস্থিত হলেন। মহেন্দ্রবাবুর স্ত্রী ছিলেন মৃতবৎসা। প্রতিবারই তাঁর সন্তান নষ্ট হয়ে যেত। হয় তাঁর গর্ভেই সন্তান নষ্ট হত, না হয় তিনি মৃত সন্তান প্রসব করতেন। তাই এবার যাতে সন্তান নষ্ট না হয়, সেজন্য স্ত্রীর মৃতবৎসা দোষের প্রতিকার করতে বাবা লোকনাথের শরণাপন্ন হয়েছেন মহেন্দ্রবাবু।

মহেন্দ্রবাবুরা আশ্রমে উপস্থিত হয়ে বাবাকে দর্শন ও প্রণাম করলেন। তখন বাবার প্রসাদ গ্রহণের জন্য সকলের ডাক পড়ল। সকলেই প্রসাদ নিতে বসে গেলেন। কিন্তু মহেন্দ্রবাবুর মা প্রসাদ নিতে গেলেন না। কারণ তিনি ছিলেন ব্রাহ্মণ বিধবা।

এদিকে তরণীকান্ত চক্রবর্তীর বিধবা মা ও বোন সকলের সঙ্গে বসে বাবার প্রসাদ গ্রহণ করলেন। বামুনের ঘরের বিধবা হয়ে তাঁরা বাবার প্রসাদ গ্রহণ করলেন বলে মহেন্দ্রবাবুর মা তাঁদের উদ্দেশ্যে নানা কটূক্তি করলেন।

পরদিন মহেন্দ্রবাবুর মা পুত্রবধূকে নিয়ে বাবার কাছে গেলেন। তারপর বাবার পায়ের ধুলো নিয়ে নিজের মাথায় না ঠেকিয়ে বধূর মাথায় ঠেকালেন।

তা দেখে এবং আগের দিনের প্রসাদ গ্রহণের সময় তাঁর আচরণের কথা মনে করে বাবা ক্ষুব্ধ হয়ে তাঁকে কিছু উপদেশ দিলেন। কিন্তু ভক্তিমতী বধূটির কথা ভেবে বাবা কোনরূপ রাগ করলেন না। বধূটির উপর তাঁর কৃপা হলো।

তাই বাবা লোকনাথ বধূকে ডেকে বললেন, মাগো, কাল থেকে সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার দিন পর্যন্ত প্রতিদিন সকালে উঠে আমার এই আশ্রম সেবার জন্য একটি করে পয়সা সরিয়ে রাখবি। সন্তান ভূমিষ্ঠ হলে সেই সব পয়সা এখানে পাঠিয়ে দিবি, তাহলেই তোর সন্তান বেঁচে থাকবে।

মহেন্দ্রবাবুর মার আচরণ সত্যিই নিন্দনীয়। তিনি পুত্রবধূর জন্য

বাবা লোকনাথের কৃপাপ্রার্থিনী হয়ে আশ্রমে এসেছেন। কিন্তু বাবার প্রতি তাঁর কোন ভক্তি নেই। এই ভক্তির অভাবের জন্যই তিনি নিজে প্রসাদ গ্রহণ করেননি। তার উপর তরণীবাবুর মা ও বোন প্রসাদ গ্রহণ করায় কটূক্তি করেছেন তাঁদের উপর। তা ছাড়া বাবার পায়ের ধুলো তিনি নিজের মাথায় ঠেকাননি। যে মহাপুরুষের কাছে তিনি কৃপা-প্রার্থনা করতে এসেছেন, সেই মহাপুরুষের প্রতিই তাঁর ভক্তি নেই। তিনি এমনই মূঢ়। শুধু নির্দোষ বধূটির ভক্তিশ্রদ্ধার জন্যই তিনি কৃপা করেছেন তার উপর।

বাবা লোকনাথ অন্তর্যামী। তিনি তাঁর অন্তর্দৃষ্টির দ্বারা মহেন্দ্রবাবুর মনের ভাব বুঝতে পেরেছেন। মহেন্দ্রবাবুর মার মনের ভাব এমন নয় যে, লোকনাথবাবা এক ভণ্ড সাধু। তাহলে তিনি পুত্রবধূকে নিয়ে তাঁর আশ্রমে আসতেন না বা বাবার পায়ের ধুলো নিয়ে বধূর মাথায় ঠেকাতেন না। আসলে তিনি অজ্ঞানান্ধ। এই কথা বুঝেই বাবা তাঁর প্রতি অসন্তুষ্ট হলেও বধূর উপর কৃপা করেছেন।

মহেন্দ্রবাবুর ভক্তিমতী স্ত্রী বাবার আদেশ যথাযথভাবে প্রতিপালন করেন। মহাযোগী বাবা লোকনাথে কৃপাবলে তিনি যথাসময়ে একটি পুত্র সন্তান প্রসব করেছিলেন এবং তাঁর সে সন্তান বেঁচে যায়। মৃতবৎসা-দোষ থেকে চিরতরে মুক্ত হন তিনি।

ওঁ

রজনী ব্রহ্মচারী প্রথম জীবনে ছিলেন সরকারী চাকুরে। ঢাকার সাব-জজ আদালতের সেরেস্তাদার। সুখী স্বচ্ছল সংসারে থাকাকালেই বিষয়-বৈরাগ্য জাগে তাঁর অন্তরে। এক আধ্যাত্মিক অতৃপ্তিতে সব সময় অস্থির ও অশান্ত থাকত তাঁর মনপ্রাণ। সংসারের বন্ধনটি কোনরকমে টিকে ছিল। ধর্মপথে নিয়ে যাবার জন্য কে যেন তাঁর মনটিকে দুর্বার বেগে টানত।

অবশেষে একদিন তাঁর ধর্মপথকে নিষ্কণ্টক করবার জন্য তাঁর ভক্তিমতি ব্রহ্মচারিণী স্ত্রী নিজের হাতে তাঁর সংসারবন্ধনটিকে ছিন্ন করে দেন। সেদিন তাঁর স্ত্রী তাঁকে বলেন, আজ থেকে তোমার আমার মধ্যে স্বামী স্ত্রীর সম্বন্ধ ঘুচে গেল চিরদিনের মত। শুধু তোমার ধর্ম আচরণে রইল

আমার অধিকার। সে অধিকার থেকে আমাকে বঞ্চিত করতে পারবে না তুমি। আমার উপর তোমার থাকবে মাতৃভাব আর তোমার উপর আমার থাকবে প্রভুভাব। এই প্রতিজ্ঞা আজ তোমায় করতেই হবে।

সেই থেকে লৌকিক জীবনের সব কামনা বাসনা ও লোভ, মোহ ঝেড়ে ফেলে সংসারে ভোগের সমস্ত উপকরণের মাঝে থেকেও তিনি হয়ে ওঠেন সর্বত্যাগী এক সন্ন্যাসী। এক পরম সত্যের সন্ধানে ছুটে চলে তাঁর মন। সদ্‌গুরু লাভের জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠেন তিনি।

সেই সময় রজনীবাবু একদিন বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। সেই সময় শক্তিমান সাধক বিজয়কৃষ্ণ ব্রাহ্মধর্ম ত্যাগ করে ঢাকায় এক আশ্রম স্থাপন করেছেন। তিনি তখন সন্ন্যাস নিয়েছেন। তখন সবে-মাত্র মহাযোগী বিজয়কৃষ্ণ বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করে সারা ভারতের বহু তীর্থ পর্যটন করে এসেছেন।

রজনীবাবুর সঙ্গে সাক্ষাতের পর বিজয়কৃষ্ণ তাঁকে বলেছিলেন, বহু তীর্থে ঘুরেছি। বহু সাধু সন্ন্যাসীর সঙ্গে পরিচয় হয়েছে। কিন্তু বারদীর ব্রহ্মচারীর মত এত উচ্চস্তরের মহাপুরুষ আর কোথাও দেখিনি। এতবড় বিরাট পুরুষ যে লোকালয়ে আসতে পারেন, সে বিষয়ে আমার কোন ধারণা বা বিশ্বাস ছিল না। তাঁর প্রতি লোমকূপে দেবতা বিরাজ করেন। ত্রিসন্ধ্যায় ত্রিবিধ মূর্তিতে তাঁকে বসে থাকতে দেখেছি। একই দেহে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরের অবস্থান প্রত্যক্ষ করেছি। তিনি যে বিরাট শক্তির অধিকারী তা কল্পনার অতীত।

১৮৮০ সালে প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর মুখে লোকনাথ ব্রহ্মচারীর অসাধারণ অধ্যাত্মশক্তির কথা শুনে মুগ্ধ হন রজনী চক্রবর্তী। মনে মনে ভাবেন এমন এক উচ্চস্তরের শক্তিমান সদ্‌গুরুর পথ চেয়েই তিনি বসে আছেন অন্তরে এক তীব্র ব্যাকুলতা নিয়ে।

মহাপুরুষ দর্শনের সেই ব্যাকুলতা নিয়ে তিনি একদিন ছুটে যান বারদীর আশ্রমে। তাঁর বহু আকাঙ্ক্ষিত প্রাণের দেবতাকে দর্শন করে ধন্য হন।

কথাপ্রসঙ্গে বাবা লোকনাথ যখন বুঝলেন, কিছুকাল আগে রজনী ব্রহ্মচারীর স্ত্রীবিয়োগ হয়েছে, তখন তিনি তাঁকে আবার বিয়ে করতে

বলেন। কিন্তু রজনী ব্রহ্মচারী তখন কিভাবে স্ত্রীজাতির উপর তাঁর মাতৃ ভাব জাগে সে কথা সব খুলে বলেন বাবার কাছে। সেকথা শুনে বাবা বলেন, তাহলে তুই আমার কাছে এসেছিস কেন? আমারই তোর কাছে যাওয়া উচিত ছিল।

একথার মধ্য দিয়ে বাবা বোঝাতে চান, যারা যোগের পথে চলতে চায়, তাদের জীবনে ব্রহ্মচর্য সাধন ও ইন্দ্রিয় সংযমের প্রয়োজনীয়তা কতখানি।

এর কিছুদিন পর বাবা লোকনাথ একবার রজনী ব্রহ্মচারীকে দেখতে চান। বাবা যখন কোন বিশেষ ভক্তকে দেখতে চাইতেন, তখন অন্য কোন মানুষের মাধ্যমে ডেকে পাঠাতেন না। ভক্তকে কাছে আনার পদ্ধতিটি ছিল অভিনব। সূক্ষ্মভাবে ভক্তকে তিনি ডাকতেন, তাঁর কাছে আসতে বলতেন। এই ইচ্ছা তাঁর হলেই ভক্তের হৃদয়ে তখন সহসা জাগত প্রভুর চরণ দর্শনের দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষা। সে তখন এক তীব্র ব্যাকুলতা নিয়ে বাবাকে দর্শন করার জন্য ছুটে আসত বারদীর আশ্রমে।

একদিন রজনী ব্রহ্মচারী তাঁর হৃদয়ের মধ্যে বাবা লোকনাথের এক সূক্ষ্ম আদেশ শুনতে পেলেন, আগামী ছুটিতে বিনা ছাতিতে খালি পায়ে আমার সঙ্গে দেখা করতে চলে আয়।

এই অমোঘ আদেশ পাবার সঙ্গে সঙ্গে বাবার চরণ দর্শনের এক তীব্র ইচ্ছা তাঁর সমস্ত অন্তরকে আচ্ছন্ন করে সব ভুলিয়ে দেয়। এক একটি মুহূর্ত এক একটি যুগ বলে মনে হয়। তিনি চটীজুতো না পরে পথ হাঁটতে পারতেন না। তবু তিনি ছাতা ও জুতোর কথা একেবারে ভুলে যান।

ঢাকা থেকে বারদী পর্যন্ত দীর্ঘ পথ তিনি রোদে পুড়ে খালি মাথায় খালি পায়ে মন্ত্রমুগ্ধের মত ঊর্ধ্বশ্বাসে হেঁটে চলতে থাকেন। সূর্যের প্রখর তেজ, পায়ের তলায় তপ্ত কাঁকর বালি আজ কোন কষ্টই দিতে পারে না তাঁর দেহকে। মাইলের পর মাইল অবলীলাক্রমে অতিক্রম করে অবশেষে তিনি আশ্রমে এসে বাবার চরণে মাথাটি রাখলেন। সঙ্গে সঙ্গে এক অপার্থিব আনন্দের ধারায় অন্তর প্লাবিত হয়ে গেল তাঁর। সমস্ত পথক্লান্তি মুহূর্তে ধুয়ে মুছে গেল। ক্ষুধাতৃষ্ণার কথা সব ভুলে গেলেন।

আশ্রমের কোন ভক্ত কর্তব্যপালনে কোন ত্রুটি করলে বাবা তা সহ্য করতে পারতেন না। রেগে গিয়ে বকাবকি করতেন। একদিন তিনি রজনী ব্রহ্মচারীকে বলেন, আমি জনক ঋষি নই। জনক ঋষি একদিক জ্বলে পুড়ে গেলেও ভ্রূক্ষেপ করত না। আমি তা পারি না। ত্রুটি দেখলেই আমি কাউকে বকি, কাউকে মারি। পরে, আবার তাকে কোলেও তুলে নিই।

মিথিলার রাজা জনক ঋষি ছিলেন কর্মযোগে সিদ্ধ। রাজঐশ্বর্য ও যাবতীয় পার্থিব ভোগ্যবস্তুর মধ্যে থেকেও তিনি ছিলেন নিরাসক্ত, নির্বিকার ও নির্লিপ্ত। একদিন মিথিলার রাজপ্রাসাদের একটি দিকে আগুন লেগে যায়। তখন প্রাসাদের প্রায় সবাই প্রাণ বাঁচাবার জন্য পালিয়ে যেতে থাকে। আবার কেউ কেউ আগুন নিবিয়ে রাজ সম্পত্তি রক্ষা করার চেষ্টা করতে থাকে।

কিন্তু সেই প্রবল অগ্নিকাণ্ডের সময় একেবারে নির্বিকার, নির্লিপ্ত থাকেন রাজর্ষি জনক। তিনি যেন ঐ প্রাসাদের কেউ নন, ঐ সব রাজ-সম্পত্তিতে তাঁর যেন কোন অধিকারই নেই। তিনি তখন ছোট্ট শিশুর মত অট্টহাস্য করে বলে ওঠেন, কার সম্পত্তি, কে রক্ষা করে ?

রাজর্ষি জনকের এই কথার অর্থ হলো এই যে, তিনি এই দৃশ্যমান নশ্বর জগতের সব কিছুর থেকে পৃথক আত্মা ও সাক্ষীচৈতন্য যাকে অগ্নি কখনই দগ্ধ করতে পারবে না। কর্মযোগের দুশ্চর তপস্যায় সিদ্ধিলাভ করার ফলেই প্রাপ্ত হন এই নির্লিপ্ত নির্বিকার অবস্থা।

কিন্তু মহাযোগী বাবা লোকনাথ কর্ম, জ্ঞান, ভক্তি—সব কটি যোগে সিদ্ধ হয়ে ও সবকটি যোগের সর্বোচ্চ স্তরগুলি পার হয়ে যোগ সমন্বয়ের এক আধ্যাত্মিক ভূমিতে উন্নীত হয়েছেন। তবু তিনি সব সময় নির্লিপ্ত থাকতে পারেন না, যদিও কোন বিকার বা আসক্তি নেই তাঁর মনে। তিনি বলেছেন, ত্রুটি দেখলেই কাউকে বকি, কাউকে মারি। কাউকে আবার কোলেও নি।

বাবার এই কথার তাৎপর্য হলো এই যে, তিনি একাধারে শিব ও শক্তি। নির্লিপ্ত নির্বিকার শিবস্বরূপ হয়েও তিনি একই আধারে করে চলেছেন

শক্তিরূপা জগন্মাতার লীলা।

একাধারে তিনি প্রকৃতি ও পুরুষ।

পুরুষরূপে, সাক্ষীচৈতন্যরূপে তিনি সমাধির পূর্ণভূমিতে অবস্থান করেন। আবার জগতের ত্রিতাপজ্বালায় জর্জরিত ও দগ্ধ জীবের উদ্ধারের জন্য পরমাপ্রকৃতি আদ্যাশক্তি জগন্মাতারূপে সন্তানস্বরূপ জীবকে কোলে তুলে নেন।

একাধারে তিনি জগতের পিতা ও মাতা। কখনো তিনি পিতার মত শাসনে কঠিন, আবার কখনো মাতার মত স্নেহে বিগলিতচিত্ত।

বাবা লোকনাথ ভক্ত ও শিষ্যদের বকেন, মারেন, আবার কোলেও তুলে নেন।

কথাগুলি বাবা রজনী ব্রহ্মচারীকে লক্ষ্য করে বললেও আসলে যারা বাবার ভক্ত ও তাঁর চরণে শরণাগত, তাদের সকলের উদ্দেশ্যেই বলেছেন। তার মানে কোন ভক্তের বাবার কৃপায় কোন মনস্কামনা পূর্ণ না হলে বা কোন পার্থিব বস্তুলাভ না হলে তার মনে যেন অবিশ্বাস না জাগে, যেন ভক্তি নিষ্ঠার অভাব দেখা না দেয় তার মধ্যে। শরণাগত ভক্তের জন্মজন্মান্তরের কৃতকর্মের জন্য তিনি যখন শাসন করবেন, তখন যেন কোন সংশয় স্থান না পায় তার মনে। কারণ প্রারব্ধের ভোগগুলি অল্পের উপর দিয়ে কাটিয়ে নিয়ে, তিনিই তাকে কোলে তুলে নেবেন। অর্থাৎ তাকে পাপমুক্ত করে নবজীবন দান করবেন।

রজনী ব্রহ্মচারীর গুরুর প্রতি ভক্তি ও সাধনার নিষ্ঠা দেখে প্রসন্ন হন বাবা লোকনাথ। তিনি দিব্যদৃষ্টিতে লক্ষ্য করেন, রজনী ব্রহ্মচারী পার্থিব ভোগ্যবস্তুর প্রতি নিরাসক্ত, ঈশ্বরলাভের জন্য ব্যাকুলতা তীব্র হয়ে উঠেছে তার অন্তরে। তা দেখে একদিন তিনি তাঁর প্রিয় শিষ্য রজনীকে আদেশ করেন কৌপীন পরার জন্য। তিনি বলেন, বাড়িতে যতক্ষণ থাকবি, নেংটি পরে থাকবি। আর বাইরে বেরোবার সময় শাল দোশালা ব্যবহার করবি।

একদিন বাবা লোকনাথ রজনী ব্রহ্মচারীকে বললেন, যে কারণে মোহ-আসে, তা আমার জানা আছে। আসতে না দিলেই হয়।

রজনী ব্রহ্মচারী তখন গুরুকে সহজ সরলভাবে জিজ্ঞাসা করেন, মোহ জয়ের সহজ পন্থাটি কি?

বাবা তখন উত্তর দিলেন, বাক্যবাণ, বন্ধুবিচ্ছেদ বাণ ও চিত্তবিচ্ছেদ বাণ সহ্য করতে পারলে মৃত্যুকে জয় করা যায়।

রজনী ব্রহ্মচারীকে মান অপমানের উর্ধ্বে ওঠার জন্য বাবা এক অভিনব পরীক্ষার ব্যবস্থা করেন। বাবা তাঁর অহংবোধের মূলোৎপাটন করতে চান। বাবা কিছুদিন আগে নিজেই রজনী ব্রহ্মচারীকে লেংটি পরতে আদেশ করেন। কিন্তু কিছুকাল তাঁর প্রিয় রজনীর বিরুদ্ধে সমালোচনা করতে থাকেন।

রজনী ব্রহ্মচারীর কাছে যে সব ভক্ত যাতায়াত করতেন, তাঁরা বাবা লোকনাথের চরণদর্শন করতে এলেই বাবা তাঁদের বলতেন, রজনী ভণ্ড, তোরা আর রজনীর কাছে যাস না। সে বলে, আমিই তাকে কৌপীন পরতে আদেশ করেছি। কিন্তু এমন কথা আমি বলিনি। ও নিজেকে জাহির করার জন্য লোকের কাছ থেকে সম্মান পাবার লোভে আমার নাম দিয়ে মিথ্যা কথা বলছে।

রজনী ব্রহ্মচারীর গুণমুগ্ধ ভক্তগণ বাবার মুখে এসব কথা শুনে আশ্চর্য হন। তাঁরা ভাবেন, যে মহাপুরুষের কৃপায় রজনী ব্রহ্মচারী এত অল্পকালের মধ্যে সাধনার এমন উচ্চস্তরে উঠতে পেরেছে, একজন গৃহস্থ আশ্রমী হয়েও কত সিদ্ধাই আয়ত্ত করেছে, সেই মহাপুরুষ যখন নিজ মুখে তাঁর প্রিয় শিষ্য সম্বন্ধে এই সব কথা বলছেন, তখন তা কখনো মিথ্যা হতে পারে না যে মহাযোগী পরম পুরুষের এক পলকের কৃপা কটাক্ষে কত অসম্ভব সম্ভব হয়, তাঁর কথা মিথ্যা হতে পারে, এমন কথা ভাবাও পাপ তাই বাবার মুখে রজনী ব্রহ্মচারীর নিন্দা শুনে তাঁরা ঢাকা ও অন্যান্য জায়গায় সে কথা মুখে প্রচার করতে থাকেন।

ফলে কিছুদিনের মধ্যেই রজনী ব্রহ্মচারী সম্বন্ধে ভক্তদের মধ্যে এক বিরূপ ধারণার সৃষ্টি হয় এবং বহু ভক্ত তাঁর কাছে যাওয়া বন্ধ করে দেন।

গিরিশচন্দ্র চক্রবর্তী বাবা লোকনাথের একজন অনুগত ভক্ত। তিনি জানতেন গুরুভক্তি ও সাধননিষ্ঠার এক জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত হলেন রজনী ব্রহ্মচারী। সেই রজনী সম্বন্ধে বাবা লোকনাথ কেন এসব কথা বলছেন এবং তার সত্যতা কোথায় তা জানার জন্য গিরিশ চক্রবর্তী একদিন রজনী ব্রহ্মচারীর কাছে গিয়ে উপস্থিত হন। তিনি বাবার কথাগুলি সব রজনী

ব্রহ্মচারীকে বলেন।

কিন্তু সে সব কথা শুনে মোটেই বিচলিত হন না রজনী ব্রহ্মচারী। কারণ তিনি তাঁর গুরুদেব বাবা লোকনাথের আসল তত্ত্ব জানেন, তাঁর মঙ্গলময় স্বরূপ দর্শন করেছেন। গুরু তাঁর হৃদয়ে স্ব-মহিমায় প্রতিষ্ঠিত।

তাই গিরিশ চক্রবর্তীর সব কথা শুনে রজনী ব্রহ্মচারী বললেন, ব্রহ্মচারীবাবার লীলা বোঝা আমাদের ক্ষমতার বাইরে। তাঁর প্রতিটি আচরণ পরম মঙ্গলময়। তিনি আমার সম্বন্ধে যাই বলুন না কেন, আমি জানি, তিনি আমার মঙ্গলের জন্যই সব কিছু বলেছেন।

একথা শুনে রজনী ব্রহ্মচারীর প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা অনেক বেড়ে যায় গিরিশবাবুর। তিনি বুঝতে পারেন, রজনীর গুরুভক্তি কত গভীর কত অবিচল। এই অতুলনীয় গুরুভক্তির জোরেই তিনি গুরুর সঞ্চারিত শক্তিকে ধারণ করতে পেরেছেন।

এইভাবে এক বছর ধরে বাবার লীলা চলতে থাকে। তারপর একদিন বাবাকে দর্শন করার জন্য বারদীর আশ্রমে এসে উপস্থিত হন রজনী ব্রহ্মচারী। রজনী কিন্তু একেবারে নির্বিকার। কোন মান-অপমানবোধ নেই, কোন অভিমান নেই। শুধু বাবার মুখ থেকে তাঁর এই লীলারহস্যের আসল কারণটি জানার আগ্রহ ছাড়া আর কিছুই নেই তাঁর মনে। এই আগ্রহকে আর চেপে রাখতে পারছেন না তিনি। তাই তিনি আশ্রমে এসেছেন বাবার মুখে আসল কথাটা শোনার জন্য।

প্রিয় শিষ্য রজনীর হাতে খেতে বাবা বড় ভালবাসেন। রজনী যখনই আশ্রমে আসেন, বাবা তাঁর হাতে খান।

তাই সেদিন পরম ভক্তিভরে বাবাকে খাইয়ে দিতে লাগলেন রজনী। খাওয়াতে খাওয়াতে এক সময় রজনী প্রশ্ন করলেন বাবাকে, বাবা, একথা কি সত্য যে, আপনি বহু লোকের কাছে বলেছেন, রজনী নিজের ইচ্ছায় সম্মান আর যশের লোভে কৌপীন পরেছে, আমি তাকে পরতে বলিনি? আপনি জানেন, আপনি যা বলেছেন, তা মিথ্যা। তবে কেন এই মিথ্যার অবতারণা করেছেন?

শিশুর মত সহজ সরলভাবে বাবা উত্তর দেন, হ্যাঁ, বলেছি তা। তোকে কৌপীন নিতে বলেছি বলে তুই আমার দুর্নাম করে বেড়াস। আর তার

ফলে বহু লোক এসে আমায় বিরক্ত করে।

বাবার কথাগুলি দুর্বোধ্য ঠেকে রজনীর কাছে। বাবা লোকনাথের যশ ও মাহাত্ম্যকীর্তন তাঁর জীবনের ব্রত, অথচ বাবা বলছেন কি না তুই আমার দুর্নাম করে বেড়াস।

এ কথার প্রকৃত অর্থ বুঝতে না পেরে বাবার মুখের দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চেয়ে থাকেন রজনী।

অন্তর্যামী বাবা তখন শিষ্যের অন্তরের কথা বুঝতে পেরে বলেন, দূর শব্দের অর্থ ব্যবধান আর নাম শব্দের অর্থ যশ। দূরে থেকে যশকীর্তন করার নাম দুর্নাম।

রজনী এবার বাবার কথার গূঢ় অর্থটি বুঝতে পারেন। তিনি বুঝতে পারেন, আসলে, সকল দুর্নামেরই একটি ভাল দিক আছে। যার বিরুদ্ধে দুর্নাম করা হয়, তার যদি সত্যি সত্যিই কোন দোষ থাকে, তাহলে সে সেই দোষত্রুটি সংশোধন করে দোষমুক্ত হয়ে উঠবার সুযোগ পায়। এই দুর্নাম প্রচারের ফলে নিজের দোষের কথাটি বুঝতে পারেন রজনী। বাবার দ্বারা সঞ্চারিত অলৌকিক শক্তির বলে তিনি অনেক শরণাগত লোকের দুরারোগ্য ব্যাধি সারিয়ে দিয়েছেন। বারদী অনেক দূর এবং সেখানে যাওয়া কষ্টসাধ্য বলে অনেক লোক তাঁর কাছে রোগমুক্তি প্রার্থনা করে। কিন্তু এই সব সিদ্ধাই তার মত কম শক্তিসম্পন্ন সাধকের মনে মোহ ও অহঙ্কার সৃষ্টি করতে পারে। আর তা তাঁর যোগসাধনা ও অধ্যাত্মমার্গের সর্বোচ্চ স্তরে ওঠার পথে বাধা হয়ে উঠতে পারে। তাই পরম মঙ্গলময় ও করুণাময় বাবা এই দুর্নামের মাধ্যমে এ বিষয়ে সতর্ক করে দিতে চান তাঁকে।

এদিকে ভক্তদের মধ্যে রজনী ব্রহ্মচারী সম্বন্ধে যে বিরূপ মনোভাবের সৃষ্টি হয়েছিল, তা দিনে দিনে কেটে যায়। গুরু শিষ্যের লীলা রহস্যটি ক্রমে উপলব্ধি করতে পারেন তাঁরা। বুঝতে পারেন বাবা এই দুর্নামের দ্বারা শিষ্যকে অহংমুক্ত করতে চান, তাকে জ্ঞানের ঊর্ধ্বতন স্তরে উন্নীত করতে চান।

রজনীর পক্ষে এ যেন এক চরম পরীক্ষা। সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন তিনি। লোকহিতের জন্য হলেও এই সব সিদ্ধাই প্রয়োগের মধ্যে সূক্ষ্ম অহঙ্কারের ক্রিয়া থাকে। তাই সে সিদ্ধাই প্রয়োগের মোহকে জয় করে

গুরুর প্রতি অবিচল ভক্তি ও অটল বিশ্বাসের জোরে উত্তরোত্তর সাধনায় উন্নতি করতে থাকেন রজনী। বাবার কৃপায় তিনি জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির পথে চলে কর্মযোগের উচ্চ ভূমিতে উপনীত হন।

অবশেষে অন্তর্যামী গুরু বাবা লোকনাথ তাঁর শিষ্যকে কাছে ডেকে স্নেহভরে বলেন, সংসার আশ্রমে থেকে সংসারের কর্তব্য কর্ম করে যতটা সাধনা করার তা হয়েছে। এবার তোকে নিরালায় গিয়ে যোগসাধনা করতে হবে।

বাবা আরও বললেন, তুই যোগী হয়েছিস ঠিক, আমি চাই তুই মহাযোগী হ। আর তার জন্য সংসারের সমস্ত সম্বন্ধ পরিত্যাগ করে সম্পূর্ণ একনিষ্ঠ হয়ে যোগসাধন করতে হবে। তা না হলে প্রকৃত জীবন্মুক্তির অবস্থা লাভ করা সম্ভব নয়। তাই তুই আলাদা কোথাও আমার মত একটা ঘর করে বসে সাধনার গভীরে ডুবে যা।

মহাশক্তিধর গুরুর আদেশ মাথা পেতে নেন রজনী। এই আদেশ, জীবন্মুক্তির এক পরোক্ষ প্রতিশ্রুতি দিব্য ভাবের এক আবেশ জাগায় তাঁর অন্তরে। এক পরম শ্রদ্ধা ও ভক্তিভাবে বিভোর তার মাথাটি লুটিয়ে পড়ে বাবার চরণে।

সংসার সম্বন্ধ ত্যাগ করে একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করে সাধনার গভীরে ডুবে যান তিনি। পরবর্তীকালে বাবার নামে একটি আশ্রম করে বাবার ধর্মাদর্শ প্রচারের কাজে উৎসর্গ করেন তাঁর জীবন।

এইভাবে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর ভক্ত শিষ্যগণ বারদীর আশ্রমে এলে তাদের সামনে তাদের গুরু বিজয়কৃষ্ণেরও নিন্দা করতেন লীলাময় বাবা। বাক্যবাণে জর্জরিত করে তাদের গুরুভক্তির নিবিড়তা ও নিষ্ঠা পরীক্ষা করতেন।

ওঁ

একদিন বাবা লোকনাথ বারদীর আশ্রমে বসেছিলেন। এমন সময় পুরীর এক পান্ডা এসে উপস্থিত হলো তাঁর সামনে।

পান্ডা এসে বাবাকে বলল, আমি আপনাকে পুরীর জগন্নাথ দেবের প্রসাদ দিতে চাই। আপনি গ্রহণ করুন।

কিন্তু বাবা সে প্রসাদ গ্রহণ করলেন না। উল্টে তিনি পাণ্ডাকে হেসে বললেন, প্রসাদ নেব কি গো, আমি যে মুসলমান।

পাণ্ডা তখন হতাশ হয়ে চলে গেল। যাবার সময় রাগের মাথায় বাবাকে 'ভণ্ড সাধু' প্রভৃতি নানা কটু কথা বলে গেল।

উপস্থিত ভক্তেরা বাবার এই অদ্ভুত আচরণ দেখে আশ্চর্য হয়ে গেল। কিন্তু বাবাকে কেউ কোন কথা বলতে সাহস পেল না।

বাবা লোকনাথ কিন্তু ধীর স্থির ও নির্বিকারভাবে বসে আছেন। পাণ্ডার আসা, প্রসাদ গ্রহণে তাঁর অনীহা, পাণ্ডার গালাগালি প্রভৃতি ঘটনাগুলো শুনে একটুও বিচলিত করতে পারল না তাঁকে। যেন কিছুই হয়নি। সকল গুণের অতীত নির্গুণ ব্রহ্মসত্তার মতই স্থিরভাবে বসে রইলেন তিনি।

আশ্রমের পুরাতন ভৃত্য বাবার স্নেহভাজন ভজলেরাম কিন্তু থাকতে পারল না। সে বাবাকে বলল, পুরীর পাণ্ডাকে তুমি ও কথা বললে কেন বাবা? তুমি পুরীর জগন্নাথদেবের প্রসাদ নিলে না। উপরন্তু বললে, তুমি মুসলমান। এর মানে কি?

বাবা তখন বললেন, আমি ত ঠিকই বলেছি। তোরা যদি আমার কথা না বুঝিস ত কি করব? ষোল আনা ঈমানই আমার যখন বজায় আছে, তখন আমি মুসলমান নই ত কি?

সর্বদা ব্রহ্মে বিচরণশীল ও আচরণশীল ব্রহ্মজ্ঞ মহাপুরুষ বাবা লোকনাথ যখন সর্ব সময়ই ঈশ্বরের সঙ্গে যুক্ত, সকল জীবের হিতসাধনে রত, তখন পুরীর জগন্নাথের প্রসাদ গ্রহণে তাঁর প্রয়োজন কি? তাতে কি তাঁর ধর্ম বাড়বে?

ব্রহ্মচর্যই আত্মার প্রসারতা ও আধ্যাত্মিক শক্তিলাভের প্রথম সোপান। তাই ব্রহ্মচর্য প্রাচীন ভারতীয় আর্য সমাজের আদর্শ ছিল। যিনি প্রকৃত ব্রহ্মচারী তিনি সবসময় সুখ দুঃখ বিস্মৃত হয়ে শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা অগ্রাহ্য করে সাগর পর্বতাদির প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করে কেবল পরোপকারকেই জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য ও ব্রত মনে করে বিশ্বের কল্যাণ সাধনে নিজেকে নিয়োজিত রাখেন। পরমপুরুষ লোকনাথ ব্রহ্মচারী বাবার পুণ্যময় জীবনধারা লক্ষ্য করলে বোঝা যায় তিনি ছিলেন প্রকৃত ব্রহ্মচারীর আদর্শের মূর্ত

ও জীবন্ত প্রতীক। সমদর্শিতার মধ্য দিয়ে সম্যকভাবে প্রকাশিত তাঁর পরোপকার ব্রত ছিল চন্দ্র সূর্য ও অগ্নির পরোপকার ব্রতের সমতুল।

অথর্ব বেদে আমরা প্রকৃত ব্রহ্মচারীর বিবরণ পাই, যা লোকনাথ ব্রহ্মচারীর জীবনচর্যার মধ্যে সার্থকভাবে রূপায়িত হয়ে ওঠে। অথর্ব বেদে বলা হয়েছে।

দীর্ঘশ্মশ্রু, জটাধারী, কৃষ্ণাজিন পরিস্থিত ব্রহ্মচারী সমিধাগ্নির দ্বারা জ্যোতিষ্মান হয়ে পূর্ব সমুদ্র হতে উত্তর সমুদ্র পর্যন্ত পরিভ্রমণ করেন। ব্রহ্মচারী ইচ্ছানুসারে হ্রাস বৃদ্ধি করতে পারেন। ব্রহ্মচারী ব্রহ্মবিদ্যা, কর্ম, লোকসমূহ ও প্রজাপতিকে বিরাট করে থাকেন। অমৃতের যোনিতে গর্ভস্থ শিশুর রূপ ধারণ করে থাকেন। আবার তিনি ইন্দ্ররূপ ধারণ করে অসুরকুল বিনাশ করে থাকেন। ভগবান এই পৃথিবী ও অসীম আকাশ সৃষ্টি করেছেন। ব্রহ্মচারীই তপস্যার দ্বারা সে সৃষ্টি রক্ষা করে থাকেন। দেবসমাজ এই ব্রহ্মচারীদের দ্বারা রক্ষিত লোকে অবস্থান করে আনন্দ উপভোগ করে থাকেন।

ব্রহ্মচর্য তপস্যা দ্বারা ব্রহ্মচারীই দেবসমাজে মৃত্যুকে সংহার করেছিলেন। আত্মসংযম, ক্লেশ, সহিষ্ণুতা ও পরোপকার বৃত্তি ছাড়া কেউই ব্রহ্মচারী হতে পারেন না। ব্রহ্মচর্য জীবনে কতখানি আত্মিক প্রশান্তি দিতে পারে, ঋষি ভদ্বরাজ তার প্রমাণ।

ভরদ্বাজ ঋষি পর পর তিনজন্ম ব্রহ্মচর্য ব্রতের মধ্য দিয়ে জীবন অতিবাহিত করেন। তৃতীয় জন্মের শেষ অবস্থায় তিনি যখন মৃত্যুশয্যায় শায়িত ছিলেন, তখন দেবরাজ ইন্দ্র তাঁর কাছে এসে জিজ্ঞাসা করেন, যদি তোমায় চতুর্থ জন্ম দান করি, তাহলে তুমি কি হবে ?

ভরদ্বাজ উত্তর করেছিলেন, ব্রহ্মচর্য ব্রত নিয়েই থাকব।

অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য জীবন যাপন করে ভরদ্বাজ যে শান্তি পেয়েছিলেন, অন্য জীবনে তা পাওয়া সম্ভব নয়। এই কথাই তিনি বলতে চেয়েছিলেন।

কিন্তু, আত্মসংযম, ক্লেশ, সহিষ্ণুতা ও পরোপকার বৃত্তি যতদিন না জাগ্রত হয়, ততদিন ব্রহ্মচর্য ব্রতের অধিকার জন্মে না।

আর্যাবর্তের প্রাচীন ঋষিগণ সংযম, সহিষ্ণুতা ও পরোপকার ব্রতের দ্বারা মানবমনের ক্রমিক বিকাশের জন্য জীবনকে চার ভাগে ভাগ করে,

প্রথম ভাগ ব্রহ্মচর্য ব্রতের দ্বারা আত্মার চরম উৎকর্ষ সাধনের নির্দেশ দিয়েছিলেন। জীবজগৎকে সম্বোধন করে তাঁরা বলেছিলেন, হে জীব, তুমি গরীবের কুটিরে বা রাজপ্রাসাদে যেখানেই জন্মগ্রহণ কর না কেন, যদি তুমি ব্রহ্মচর্যের ভিতর দিয়ে তোমার সবল শরীর, দীর্ঘ জীবন, সংযত মন ও ইন্দ্রিয়াদিদ্বারা তোমার দেহমনকে পবিত্র করতে না পার, তাহলে জীবনে কোন বৃহৎ কাজের অধিকারী হতে পারবে না। তোমার এই সুন্দর দেহটিকে যদি ব্রহ্মচর্যের দ্বারা পবিত্র দেবমন্দিরে পরিণত করতে না পার, তা হলে জলবুদবুদের মত অসার সংসারে বারবার যাতায়াতই সার হবে।

অনেকেই সন্ন্যাসব্রত অবলম্বন করে ব্রহ্মচারী নাম ধারণ করেন। কিন্তু প্রকৃত মতে আচরণশীল ব্রহ্মচারী খুবই বিরল। ধ্যান, ধারণা, স্মরণ, মনন ও নিদিধ্যাসনের মধ্য দিয়ে ব্রহ্মচারীকে আচরণশীল হতে হয়। নিজ জীবনচর্যার মধ্য দিয়ে ব্রহ্মচর্যকে সার্থক রূপদান করতে হয়। প্রাচীন আর্য ঋষিদের যুগেও আচরণশীল ব্রহ্মচারীর সংখ্যা খুবই কম ছিল। তাই ঋষিদের গৃহে ব্রহ্মচারীর পূজা অনুষ্ঠিত হত।

ত্রিকালদর্শী ব্রহ্মজ্ঞ লোকনাথ বাবা ছিলেন আচরণশীল ব্রহ্মচারী। বাবা লোকনাথ ছিলেন তাঁর নামের যথার্থ অধিকারী হয়ে তাঁর নামের তাৎপর্যটিকে মণ্ডিত করে তোলেন তাঁর জীবনে। যেদিন তাঁর নাম লোকনাথ রাখা হয়, সেদিন কে জানত, এই শিশু লোকনাথ ভবিষ্যতে একদিন তাঁর নামের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সকল লোকের নাথ, পাতঞ্জলের ঈশ্বর, সাংখ্যের পুরুষ, বেদান্তের ব্রহ্ম ও গীতার শ্রীভগবান হয়ে দাঁড়াবেন!

'লোকনাথ' নামটির তাৎপর্য বুঝতে হলে আগে লোক শব্দের অর্থ জানতে হবে। লোক বলতে সাধারণভাবে আমরা বুঝি, দেবলোক, সূর্যলোক, চন্দ্রলোক, ব্রহ্মলোক ইত্যাদি।

কিন্তু আচার্য শঙ্কর লোক শব্দের অর্থ নিরূপণ করে বলেছেন, ভগবানের ঈক্ষণে যা সৃষ্ট হয়েছে অর্থাৎ ভগবানের ঈক্ষণে বা দৃষ্টিতে যা প্রকাশিত হয়, সেই প্রকাশিত বস্তুর মধ্যে আমরা জন্মগ্রহণ করে নিজ নিজ কর্মফল ভোগ করি, তারই নাম লোক। যেমন চন্দ্র, সূর্য, পৃথিবী, বায়ু ইত্যাদি ভগবানের ঈক্ষণে চির প্রকাশিত। আর প্রাণীজগৎ তাতে সচ্ছন্দে

নিজ নিজ কর্মফল ভোগ করছে—এই হলো লোক। আর 'নাথ' শব্দের অর্থ হলো ঈশ্বর। মহাযোগী ব্রহ্মজ্ঞানী, ব্রহ্মভূত পরমপুরুষ বাবা লোকনাথ ছিলেন সেই লোকেরই অধীশ্বর।

বিষ্ণুপুরাণে 'বাসুদেব' শব্দটির অর্থ এইভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। অর্থাৎ বিশ্বের সমস্ত অণু পরমাণুতে যিনি প্রবেশশীল, যাঁর অণুশক্তির প্রভাবে পৃথিবী ভাসমান, এই বিশ্বের বুকে বর্তমান প্রতিটি বস্তুর অন্তরে অনুশক্তিরূপে প্রবিষ্ট থেকে প্রতিটি বস্তুকে সক্রিয় করে রেখেছেন, তিনিই বাসুদেব।

আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে স্থূলজ্ঞান অল্প আয়াসেই উদয় হয় জীবের মনে; কিন্তু বিষয়ে বিতৃষ্ণা বা বৈরাগ্যজ্ঞান না হলে প্রকৃত বা বিশুদ্ধ জ্ঞান হয় না। ভোগে ও অনুরাগে যাঁর জ্ঞানশক্তি প্রতিহত না হয়, তিনিই প্রকৃত জ্ঞানী; ভোগ বিষয়ে যিনি উদাসীন, যশ বা সুনামে যাঁর আসক্তি নেই, তিনিই জীবন্মুক্ত পুরুষ।

জীবকে প্রথমে নিষ্কাম কর্ম অভ্যাস করতে হবে। নিষ্কাম কর্ম করতে করতে ভক্তির ভাব উদয় হবে মনে। নিষ্কাম কর্মের সোপান প্রতিক্রম করতে না পারলে ভগবানের প্রতি ভক্তিশ্রদ্ধা জাগবে না। শুধু জ্ঞানের দ্বারা কিছু হবে না। নিষ্কাম কর্ম ও ভক্তিহীন যে জ্ঞান তা স্থূল অহং-জ্ঞান। স্বয়ং ভগবান বলেছেন, আমি লোকশিক্ষা ও লোকহিতের জন্য কর্ম করে থাকি।

মনোনিবৃত্তি ও মনোজয় দ্বারা চিত্তকে বিশুদ্ধ ও জ্ঞানকে নিষ্কাম ও নির্মল করে তুলতে হলে সৎ সঙ্গ, সৎ কর্মের অনুষ্ঠান ও শাস্ত্রানুশীলন করতে হবে। ভগবানের চরণে নিজেকে সমর্পণ করে সৎ কর্মের অনুষ্ঠান করতে করতে 'আমি যা করছি তা ব্রহ্মই করছেন,—এই অভ্যাস পাকা হয়ে স্বভাবে পরিণত হবে। একমাত্র তখনই জীব হয়ে উঠবে প্রকৃত জ্ঞানী। প্রকৃত জ্ঞানী ভগবৎ সত্তা হতে অভিন্ন। তখন সেই জ্ঞানী সাধক তাঁর সর্বাত্মক দৃষ্টির দ্বারা সাধনদুর্লভ পরমপুরুষকে জানতে পারে। আর তা জানতে পারলেই সাধক মহাত্মার পর্যায়ে উন্নীত হয়। তখন তার আত্মাই যে সারা বিশ্বজগতে পরিব্যাপ্ত এই জ্ঞান তার হয়।

এই জ্ঞান হাজার হাজার সাধকের মধ্যে একজনের হয় কি না সন্দেহ।

সাধকের এই অবস্থাকে জ্ঞানপূর্বিকা ভক্তি বলে। এই পথে অন্তঃকরণ শুদ্ধ হলে সমস্তই বাসুদেব—এই জ্ঞান হয়। তখন সাধক বাসুদেবের মত অণু পরমাণু হয়ে প্রতিটি জীবের অন্তরে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে জীবকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারেন। তখন তিনিই হয়ে ওঠেন জগতের প্রভু, তিনিই হয়ে ওঠেন বাসুদেব।

একাধারে জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তিযোগে সিদ্ধ বাবা লোকনাথ ব্রহ্মচারী ছিলেন এমনই এক সাধক।

ওঁ

পরম পুরুষ বাবা লোকনাথ একদিন মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীকে বলেছিলেন, হারে প্রাণকৃষ্ণ, আমাকে আরও একশো বছর নিম্নভূমিতে অপেক্ষা করতে হবে।

সেদিন বারদীর আশ্রমে প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ বাবাকে দর্শন করতে এসেছিলেন। কথাপ্রসঙ্গে বাবা লোকনাথ এই কথা বললে বিজয়কৃষ্ণ তার উত্তরে বলেছিলেন, একশো বছর অপেক্ষা করার কি দরকার? এখন চলে যান। একশো বছর পর না হয় আবার আসবেন।

বাবা তখন বললেন, তাই হবে রে। অল্পদিনের মধ্যেই সূর্যদেবকে বলে দেব, আমি সূর্যরশ্মি অবলম্বন করে ১৯শে জ্যৈষ্ঠ চলে যাব।

মহাপুরুষের কথার ব্যতিক্রম হবে না ভেবে বিজয়কৃষ্ণ তখন অনুরোধের সুরে বলেছিলেন, আপনি ত সকল প্রাণীকে এত ভালবাসেন। কিকরে তাদের ছেড়ে চলে যাবেন?

তখন বাবা বলেছিলেন, তোরা ভাবিস না। আমি চলে গেলেও প্রতিটি প্রাণীর দেহে সূক্ষ্ম দেহে অবস্থান করব। যখনই তোরা আমাকে ভাববি, আমি তোদের রক্ষা করব।

ঠিক যেন বাসুদেব, কূটস্থ ব্রহ্ম। যে কূটস্থ শক্তি অর্থাৎ ব্রহ্মশক্তির প্রভাবে সারা বিশ্বজগৎ প্রাণবন্ত, বাবা লোকনাথ ছিলেন সেই শক্তিভূত এক বিরাট সত্তা। তিনি যেন ছিলেন সমস্ত প্রাণীর প্রাণকেন্দ্র যাঁর প্রতিটি কর্মে চিন্তায়, ভাবে, ভাষায় ও ইঙ্গিতে ঈশ্বরের স্বরূপতত্ত্ব আশ্চর্যভাবে প্রকাশিত হয়। তিনি তাই বলেছিলেন, তোরা আমাকে মানুষ ভেবে ভেকে

মাটি করলি।

ব্রাহ্মণের তিনটি চক্র। প্রথমটি হলো জ্যোতিশ্চক্র, দ্বিতীয় কৃষ্ণচক্র ও তৃতীয় নক্ষত্রচক্র। ব্রহ্মের এই তিনটি চক্রের মধ্যে তিনি জ্বলন্ত গোলক।

এই ত্রিচক্রপ্রভাবে সারা বিশ্বকে তাঁর সুন্দর ও আনন্দঘন মনে হত। তারপর অন্তরে যখন কোটি সূর্যের রূপ উদ্ভাসিত হয়, তখন সারা বিশ্বই ব্রহ্মময় দর্শন হয়। যে মহাপুরুষের কূটস্থ রূপ সূর্যস্বরূপ, তিনিই নিজের মধ্যে ত্রিভুবন দর্শন করতে পারেন।

বাবা লোকনাথ ছিলেন ত্রিভুবনদর্শী মহাপুরুষ। ঠিক যেন বাসুদেবের মত।

লোকনাথবাবা একবার বলেছিলেন, ভগবানের সঙ্গে আমার দেখা হয়নি। আমি দেখি শুধু আমাকে, আমি জেনেছি নিজেকে।

কিন্তু এই আমি কে? কোন 'আমি'কে নিজের মধ্যে দেখেছিলেন বাবা লোকনাথ?

সাধারণ মানুষে নিজের দেহকেই 'আমি' ভাবে। কিন্তু বাবা লোকনাথ তাঁর আমি বা আত্মাকে দেহ থেকে পৃথক করে তার মধ্যে সৌরজগৎ ও ও ত্রিভুবনকে নিজের দেহের মধ্যে দেখেছিলেন।

অনেকে মনে ভাবতে পারেন, বিরাট ব্রহ্ম, ত্রিভুবন ও সৌরজগৎ কিকরে একটি দেহ ও আত্মার মধ্যে আবদ্ধ হতে পারে?

কিন্তু এ প্রশ্নের উত্তরে প্রশ্ন করতে হয়, কিকরে স্বয়ং ভগবান বাসুদেব গর্ভস্থ অবস্থায় কংসের কারাগারে বন্দী হতে পারেন? সাময়িকভাবে হলেও কিকরে সূর্যের জগৎপ্রকাশক শক্তি সামান্য মেঘের মধ্যে অবরুদ্ধ হতে পারে?

কংস হলো সাক্ষাৎ অহংকার। দেবকী দৈব শক্তি বা আদ্যাশক্তি আর বসুদেবপুত্র বাসুদেব স্বয়ং ভগবান। মোহের বশে অহংবোধাচ্ছন্ন কংস কি ভাবতে পেরেছিল আমি যাদের কারাগারে আবদ্ধ করলাম, তারা হলেন দৈবশক্তি দেবকী ও স্বয়ং ভগবান?

এইভাবে ক্ষুদ্র জিনিসের মধ্যেও মাঝে মাঝে বৃহৎ বা মহানের অবলুপ্তি ঘটে।

বেদের প্রথম ভাগে আছে ব্রহ্মবিদ্যা। ব্রহ্মবিদ্যা হলো সেই বিদ্যা যে

বিদ্যার দ্বারা বিশ্বের মূল শক্তিকে যোগের মাধ্যমে মর্ত্যমানুষ আকর্ষণ করে নিজ মনের মধ্যে স্থিতিশীল করে রাখতে পারেন। যোগীগণ যার সাহায্যে মোক্ষলাভ করতে পারেন, যে অবিনাশী শক্তি বিশ্বের সমস্ত প্রাণীর অন্তরে সতত বিদ্যমান রয়েছে, সেই শক্তিই হলো ব্রহ্মবিদ্যা।

মহাযোগী লোকনাথ ছিলেন সেই ব্রহ্মশক্তি ও ব্রহ্মবিদ্যার অধিকারী।

পৃথিবীতে সূর্য, চন্দ্র, অগ্নি—এই তিন দেবতাই ব্রহ্মের আদি সৃষ্টি। অগ্নির বংশে ব্রাহ্মণ, সূর্যের বংশে সূর্যবংশীয় ক্ষত্রিয়গণ ও চন্দ্র-বংশে চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয়গণ জন্মগ্রহণ করেন। আকাশ যেমন সারা বিশ্বময় ব্যাপ্ত, তেমনি সূর্য, চন্দ্র, অগ্নি সারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে ব্যাপ্ত।

সমস্ত বিশ্বে অতীতে যা কিছু ছিল, বর্তমানে যা কিছু আছে এবং ভবিষ্যতে যা কিছু থাকবে, সেই সব কিছুর মূলীভূত তেজশক্তি হলো অগ্নি। সূর্য বিশ্বের প্রাণময় শক্তি আর চন্দ্র মনোময় শক্তি। এই তিন শক্তির শক্তিতেই বিশ্বজগৎ প্রাণবন্ত।

শ্রুতিতে বলা হয়েছে, অগ্নির পূর্ণ তেজ হতে ব্রাহ্মণের সৃষ্টি। সূর্য ও চন্দ্র হতে ক্ষত্রিয়ের জন্ম। এই পৃথিবী নানাপ্রকার তেজোময় পদার্থ হতে সৃষ্ট হয়েছে। পৃথিবীর সমস্ত তেজের মূলে আছে আবার অগ্নি। সেই অগ্নির মূলীভূত তেজ নিয়ে অগ্নির অংশে ব্রাহ্মণের জন্ম হয়।

গুণভেদে অগ্নি প্রধানতঃ কালাগ্নি ও যজ্ঞাগ্নি এই দুইভাগে বিভক্ত। ব্রাহ্মণ কালাগ্নির উপাসনা করে দিক ও দেশ অর্থাৎ প্রাণ ও মন প্রথমেই জয় করেছিল। কিন্তু ক্ষত্রিয় ক্ষণস্থায়ী যজ্ঞাগ্নির উপাসনা দ্বারা দিক ও দেশ জয় করার চেষ্টা করে। আত্মা বিশ্বব্যাপী। দিক ও দেশ আত্মার আভরণ। কিন্তু কামনা বা জয়ের আকাঙ্ক্ষার দ্বারা আত্মার আভরণে যে ক্ষত সৃষ্টি হয়, সেই ক্ষত হতেই ক্ষত্রিয়ের জন্ম হয়।

ব্রাহ্মণ কালাগ্নির উপাসনার দ্বারা অতীত বর্তমান, ভবিষ্যতের ঊর্ধ্বে উঠতে পেরেছেন। এইভাবে কালাগ্নির উপাসনা দ্বারা ব্রাহ্মণ ত্রিকালদর্শী হতে পেরেছেন। বাবা লোকনাথ ব্রহ্মচারী ছিলেন সেই ত্রিকালদর্শী ব্রাহ্মণ। অগ্নির পূর্ণ তেজ নিয়ে অগ্নির অংশে তাঁর জন্ম হয়।

সে ব্রাহ্মণ প্রজাপতি ব্রহ্মার পূর্ণ তেজ ও পূর্ণ শক্তি নিয়ে জীবের কল্যাণের জন্য মানুষের সাথী হয়ে মাটির পৃথিবীতে নেমে আসেন।

মানুষের সুখ দুঃখের সঙ্গে বাস করে পৃথিবীকে দান করেন শান্তি ও অমৃত।

অগ্নিবংশীয় ব্রাহ্মণ আর প্রজাপতি ব্রহ্মা অভিন্ন। অগ্নিবংশীয় ব্রাহ্মণের আধ্যাত্মিক সম্পদ হলো অমোঘবাক। তাঁর বাক্য কখনো ব্যর্থ হয় না। তিনি যা বলবেন তা হবেই। বিশ্ব ধ্বংস হয়ে যেতে পারে, সৃষ্টি অচল হয়ে যেতে পারে, তাঁর কথা ব্যর্থ হবে না। মানুষ ত দূরের কথা, শক্তিধর দেবতারা পর্যন্ত তাঁর কথা লঙ্ঘন করতে পারেন না। তাঁরাও সে বাক্যের বশীভূত। বিশ্বের সব বস্তুর মূলীভূত যে তেজশক্তি অগ্নি, সেই অগ্নির তেজ ব্রাহ্মণের বাক্যের আকাশে প্রকাশিত হয়ে কাজ করে। সে তেজ প্রজাপতি ব্রহ্মার তেজ বিশেষ। সে তেজ লঙ্ঘন করবার সাধ্য কারো নেই।

লোকনাথ ব্রহ্মচারী ছিলেন অমোঘবাক সিদ্ধবাক অগ্নিবংশীয় ব্রাহ্মণ। বাবা লোকনাথ যখন বয়সে বালক ছিলেন, তখন তাঁদের কচুয়া গ্রামে একবার ঘোর অনাবৃষ্টি শুরু হয়। সারা অঞ্চলে জলের জন্য হাহাকার পড়ে যায়। চাষের কাজ সব বন্ধ থাকে। পানীয় জলেরও অভাব দেখা দেয়। একদিন বালক লোকনাথ বাবাকে বিপন্ন দেখে বলেন, 'বাবা তুমি ভেবো না। আমাদের বাড়ির শিবলিঙ্গের মাথায় জল ঢাললেই বৃষ্টি হবে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি গ্রামবাসীদের ডেকে শিবের মাথায় জল ঢালতে বলেন। তিনি নিজে জল ঢালার পর গ্রামের সকলে একে একে জল ঢালতে থাকে শিবলিঙ্গের মাথায়। কিছুক্ষণের মধ্যেই আকাশে মেঘ দেখা যায় এবং প্রচুর বৃষ্টি হয়।

সেদিন বালক লোকনাথের ঐশীশক্তি দেখে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে যায় গ্রামবাসীরা।

রামায়ণের বিভাণ্ডক ঋষির পুত্র ঋষ্যশৃঙ্গের মধ্যে এই শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। রাজা লোমপাদের অঙ্গরাজ্যে একবার ঘোর অনাবৃষ্টি ও দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় এবং দীর্ঘকাল ধরে চলতে থাকে। তখন ব্রাহ্মণদের পরামর্শে রাজা কৌশলে ঋষ্যশৃঙ্গ মুনিকে আনিয়েছিলেন। মহাতেজা ঋষ্যশৃঙ্গ রাজ্যে পদার্পণ করার সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টি শুরু হয়। ঋষ্যশৃঙ্গ ছিলেন অগ্নির অংশসম্ভূত মহাতেজা ব্রাহ্মণ। বাবা লোকনাথ ব্রহ্মচারীও ছিলেন ঠিক তেমনই অগ্নিসম্ভূত এক মহাতেজস্বী ব্রাহ্মণ।

বাবা লোকনাথ একদিন এক ভক্তকে বলেছিলেন, আরে, আমি যে চতুর্ভুজ।

তাঁর কথা শুনে মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ বলছিলেন, আপনি এত পেঁচাল ও গভীরের কথা বলেন যে, সাধারণ লোকে তা বুঝতেই পারে না।

তখন বাবা বলেছিলেন, আমি ত ঠিকই বলিরে। কিন্তু লোকে যদি তা বুঝতে না পারে তা আমি কি করতে পারি।

এ কথার মধ্য দিয়ে বাবা লোকনাথ বলতে চেয়েছেন, চতুর্বেদের যে মূল জিনিস, তাই ত আমি।

সামবেদে ও ছান্দোগ্য উপনিষদে একটি মহাবাক্য লেখা আছে। তা হলো 'তত্ত্বমসি' অর্থাৎ তুমি সেই ব্রহ্ম হও। ঋগ্বেদের ঐতরেয় ব্রাহ্মণে আছে 'প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম' অর্থাৎ ব্রহ্ম প্রজ্ঞানস্বরূপ। বৃহদারণ্যক উপনিষদে আছে অহং ব্রহ্মাস্মী অর্থাৎ আমি ব্রহ্ম স্বরূপ।

বাবা লোকনাথ ছিলেন সেই প্রজ্ঞানময় ব্রহ্মস্বরূপ। তিনি বারবার ভক্তদের কাছে বলে যেছেন, আমি গীতায় বর্ণিত সেই পরমাত্মা, আমিই ব্রহ্ম। আমি চতুর্বেদের ঊর্ধে বলেই আমি চতুর্ভুজ।

তিনি ছিলেন ঋগ্বেদের হোত্রি, সামবেদের উদগাত্র, যজুর্বেদের অধ্বর্য্য এবং অথর্ব বেদের যজ্ঞের ব্রাহ্মণ।

বেদ শ্রুতি ও স্মৃতির ভিতর দিয়ে ব্রহ্মের যে সব প্রমাণ নির্ণয় করা হয়েছে, সেই সব অভ্রান্ত প্রমাণ মূর্ত হয়ে ওঠে বাবা লোকনাথের মধ্যে।

অনেকে বলতে পারেন, যার রূপ নেই, আকার নেই, সেই নিরাকার ব্রহ্মের সাকার দেহে অধিষ্ঠান কি সম্ভব ?

কিন্তু শ্বেতাশ্বেতর উপনিষদে বলা হয়েছে, সেই এক ব্রহ্ম সর্ব রূপে রূপায়িত, সর্ব গুণে গুনান্বিত, বিশ্বের সর্ব কল্যাণে কল্যাণান্বিত। আমাদের দুঃখে দুঃখিত, সর্ব পাপে পাপযুক্ত। ব্রহ্ম এত আকারে আকারিত যে তা নির্ণয় করা অসাধ্য। এই জন্যই ব্রহ্মকে নিরাকার বলা হয়। অগ্নির দাহিকাশক্তি, বায়ুর স্পর্শগুণ, শীতের শৈত্যভাব—পৃথিবীর সমস্ত কিছুর মধ্যে নির্লিপ্তভাবে লিপ্ত হয়ে আছেন তিনি।

শ্রীমদ্‌ভাগবতের একটি শ্লোকে বলা হয়েছে, ভক্তিসহকারে পদ্মনাভ নারায়ণের চরণপদ্ম সেবাদ্বারা গুণকর্মজনিত চিত্তমল ধ্বংস হয়। তখন

নির্মল চক্ষুর নিকট সূর্য প্রকাশের মত আত্মতত্ত্বের উপলব্ধি হয়।

বাবা লোকনাথের এই আত্মতত্ত্বের উপলব্ধি হয়েছিল বলেই তিনি বলতে পেরেছিলেন, আমি নিজেকে জেনেছি।

এই নিজেকে দেখাই হলো আত্মদর্শন, নিজেকে জানাই হলো আত্মজ্ঞান। নিজেকে জেনেছিলেন বলেই তিনি নিজেকে বিশ্বময় পরিব্যাপ্ত দেখেছিলেন। নিজ সত্তাকে অখণ্ড বিশ্বসত্তায় বিলীন করে দিয়ে সারা বিশ্ব 'আমিময়' দেখেছিলেন।

তাই বাবা লোকনাথ বলেছিলেন, প্রতিটি প্রাণীর মধ্যে সূক্ষ্মভাবে আমিই বর্তমান। যখনই বিপদে পড়বে আমাকে স্মরণ করো। আমি রক্ষা করব।

ঈশোপনিষদের একটি শ্লোকে আছে, বিশ্বের সমুদয় বস্তু যিনি নিজ আত্মাতে দেখেন এবং সমুদয় বস্তুকে যিনি আত্মা বলে দর্শন করেন, তিনি কখনো কাউকে ঘৃণা করতে পারেন না।

এইভাবে আত্মদর্শন করেছিলেন বলেই বাবা লোকনাথের কোন জীবের প্রতি দ্বৈতভাব ছিল না। সবাইকে সমভাবে দর্শন করতেন। তিনি ছিলেন সমদর্শনের মূর্ত প্রতীক। তিনি পশু, পাখি, পিঁপড়ে, কীট পতঙ্গ, বাঘ, সাপ—সব কিছুকে সমানভাবে আত্মজ্ঞানে দর্শন করতেন।

সর্বভূতে পরিব্যাপ্ত জ্যোতির্ময় পুরুষ বাবা লোকনাথ বলেছিলেন, যিনি স্বীয় আত্মায় 'স্ব'কে দেখেননি অর্থাৎ সর্বভূতে নিজের আত্মা দর্শন করতে পারেননি, শুধু কর্মের অনুষ্ঠান করেই নিজেকে ধন্য মনে করেন, তিনি দিনের পর দিন অন্ধকারেই ডুবে থাকেন।

তিনি আরও বলেছিলেন, যারা আমার পথের পথিক নয়, তারা যত বড় সাধক বা তপস্বীই হোক, আমি তাদের শিশু মনে করি।

বাবা লোকনাথ ব্রহ্মচারী ছিলেন সচ্চিদানন্দ পরমাত্মা। যে পরমাত্মা থেকে সমস্ত কিছু জাত হয়, সমস্ত কিছুর মধ্যে যিনি ব্যাপ্ত ও বিরাজিত আছেন, সেই পরমাত্মাকে তিনি জেনেছিলেন। তাই তিনি বলতে পেরেছিলেন, আমি ছিলাম, আমি আছি, আমি থাকব।

যখন তিনি নিজেকে বুঝতে পারেন, নিজের আত্মাকে দর্শন করেন তখন তিনি বলেন, 'আমি আছি', তখন তিনি হন সৎ। যখন তিনি নিজের

মধ্যে সেই আত্মার স্বরূপকে জানতে পারেন, তখন হন চিৎ। সেই আত্মার স্বরূপ উপলব্ধি অন্তঃকরণে ও দেহের প্রতিটি অণু পরমাণুতে যখন এক দিব্য রসানুভূতিরূপে ছড়িয়ে পড়ে, তখন তিনি হন আনন্দ।

তাই লোকনাথবাবা বলতেন, আমি সচ্চিদানন্দ পুরুষ, আমি সেই পরমাত্মা। শ্রুতি যোগীদের এই পরমাত্মভাবকে বলেছে, বৃহঃ অর্থাৎ ব্রহ্মের স্বরূপ।

গীতায় শ্রীভগবান অর্জুনকে যা বলেছিলেন, বাবা লোকনাথ ব্রহ্মচারীও ভক্তদের তাই বলতেন। ভগবান কৃষ্ণ বলেছিলেন, আমার উপর সর্বতোভাবে নির্ভরশীল হও। আমাতে মন প্রাণ সমর্পণ করে আমাকে ভক্তিভরে ভজনা করে যাও। তুমি যখন যে কোন কর্মের অনুষ্ঠান করবে, আমিই তার উপলক্ষ এই জ্ঞানে আমাতে সমস্ত কর্ম সমর্পণ করো। তাতে যেন ফলাকাঙ্ক্ষা কদাচ না থাকে। এইরূপ কর্মের জন্য আমি প্রতিজ্ঞা করে বলছি, আমি তোমাকে রক্ষা করব। সমস্ত দ্বৈতভাব ত্যাগ করে অদ্বৈত ভাবের মন নিয়ে আমার শরণাগত হও। আমার উপর নির্ভরশীল হও, আমি তোমাদের সমস্ত পাপ হতে রক্ষা করব।

বাবা লোকনাথও তেমনি ভক্তদের বলতেন, তোরা তোদের সব কিছু আমাকে সমর্পণ করে নিষ্কামভাবে কাজ করে যাবি। মনে ভাববি তোদের সব কিছু আমার। কোন ফলের প্রত্যাশা করবি না। বিপদে পড়লে আমাকে স্মরণ করবি। আমি তোদের রক্ষা করব।

ওঁ

ত্যাগ ও তপস্যার মূর্ত প্রতীক পরমপুরুষ ব্রহ্মচারী বাবা লোকনাথ নিজে আজন্ম ব্রহ্মচারী ও সন্ন্যাসী হলেও কোন সন্ন্যাসী সম্প্রদায় সৃষ্টি করলেন না। তিনি গৃহস্থ মানুষদের দীক্ষা ও ভাগবত জীবন দান করে বুঝিয়ে দিলেন, ঈশ্বরদর্শন কেবল গৃহত্যাগী সন্ন্যাসীদের একচেটিয়া অধিকারের বস্তু নয়, সদ্‌গুরুর কৃপা হলে অতি সাধারণ পাপী তাপী গৃহী ব্যক্তিও সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর থেকে উদ্ধ্বতর যোগসিদ্ধি ও অধ্যাত্মশক্তি গৃহে থেকে সাধনা করেই লাভ করতে পারে। গৃহস্থ আশ্রমের সংসারযুক্ত কত

সংসারী বিষয়াসক্ত মানুষ মাত্রেরই একটি বদ্ধমূল ধারণা—তারা পাপী, সুতরাং তাদের পক্ষে ভগবদ্ভক্তি বা ঊর্ধ্বতর অধ্যাত্ম চেতনা বা আধ্যাত্মিক শক্তিলাভ সম্ভব নয়। সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী ছাড়া ঈশ্বর দর্শন বা ঈশ্বরকৃপা-লাভ হয় না। কিন্তু এই ধারণা যে ভুল, গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তা স্পষ্ট ভাষায় বলে দিয়েছেন। আর বাবা লোকনাথ তাঁর এই ধরনের লীলার দ্বারা সে কথা অক্ষরে অক্ষরে প্রমাণ করে দিয়েছেন। গীতায় সে কথাটি হলো।

অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্য ব্যবসিতো হি সঃ॥ গীতা ৯.৩০

অর্থাৎ যদি অত্যন্ত দুরাচার ব্যক্তিও অনন্যচিত্ত হয়ে আমাকে ভজনা করে, তাহলে তাকে সাধু বলে মনে করা উচিত। কারণ সে উত্তম স্থির-বুদ্ধি সম্পন্ন।

বাবা লোকনাথ সুরথনাথের মত আরও অনেক দুরাচার ব্যক্তির সর্বপাপ হরণ করে তাঁদের সাধনজীবন দান করে ব্রহ্মচারীতে রূপান্তরিত করেন।

সদ্‌গুরুর কৃপা ও আশীর্বাদ লাভ করে সুরথনাথ গৃহের মধ্যে থেকেই ধর্মীয় জীবনে প্রবেশ করে গৈরিক বসন ও কৌপীন ধারণ করেছিলেন। সমস্ত মোহান্ধকার অতিক্রম করে আলোকময় অধ্যাত্মরাজ্যে উন্নীত করে-ছিলেন নিজেকে। যোগ সাধনাতেও উচ্চতর অবস্থা প্রাপ্ত হন তিনি। তাঁর সাধনভজন দেখে এবং তাঁর অধ্যাত্মশক্তির পরিচয় পেয়ে বহু উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি আত্মসমর্পণ করেন তাঁর কাছে। সুরথনাথও তাঁদের দীক্ষাদান করে কৃতার্থ করেন।

অবশেষে ১৩২৯ সনের ৪ঠা পৌষ তারিখে দুই স্ত্রী ও মাতাকে বর্তমান রেখে স্বেচ্ছায় মরদেহ ত্যাগ করেন সুরথনাথ।

ওঁ

বিক্রমপুর বেজগাঁও নিবাসী যামিনীকুমার মুখোপাধ্যায় সাধক বংশেই তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন। সেকালে অর্থাৎ ব্রিটিশ আমলে বেজগাঁও এর মুনসী বাড়ির বেশ নামডাক ছিল। সেই বাড়ির এবং সেই বংশের পুত্র ছিলেন যামিনীকুমার দেবশর্মা। তাঁর রচিত ধর্মসার সংগ্রহ হতে তাঁর বংশের ধারাবাহিক বিবরণ জানা যায়।

যামিনীকুমারের পিতামহরা ছিলেন আট ভাই এবং একান্নবর্তী পরিবারে বাস করে দয়া ও দান ধর্মের মধ্য দিয়ে সারা অঞ্চলে বিশেষ খ্যাতিলাভ করেন। বেজগাঁওয়ে তাঁদের বসতবাড়ি আজও মুনসীবাড়ি বলে পরিচিত। তাঁরা সকলেই ছিলেন ধর্মপরায়ণ। যামিনীকুমারের পিতামহ গৌরীনাথের এক ভাই কাশীনাথের স্ত্রী মহামায়া দেবী স্বামীর মৃত্যুতে সহমরণে প্রাণবিসর্জন দিয়েছিলেন। সেই চিতার উপর একটি মঠ নির্মিত হয়ে তাঁর সেই কীর্তির কথা ঘোষণা করে যুগ যুগ ধরে।

গৌরীনাথের একমাত্র পুত্র গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ছিলেন যামিনী কুমারের পিতা। গোপালচন্দ্র অত্যন্ত ধার্মিক ও মাতৃভক্ত ছিলেন। তিনি যদি কোনদিন সংসারের কাজকর্মের জন্য গৃহদেবতার পূজা না করতে পারতেন, তাহলে তিনি তাঁর মায়ের চরণে ফুলচন্দন দিয়ে মাতাকে পূজা করতেন এবং মাতৃ পূজাকেই দেবতাপূজা বলে গণ্য করতেন। তিনি কাশীধামে সজ্ঞানে দেহত্যাগ করেন এবং তাঁর ধর্মপ্রাণ মাতা বেজগাঁওয়ের বাড়িতে জপে বসে স্বামীর দেহত্যাগের বিষয় জানতে পারেন। তিনি পরদিন সকালে বাড়ির সকলকে বলেন, আমি গতকাল বিধবা হয়েছি।

যামিনীকুমার বারদীর ব্রহ্মচারী লোকনাথবাবার নাম শুনেই তাঁর ভক্ত হয়ে ওঠেন। একদিন তিনি রজনী ব্রহ্মচারীর সঙ্গে লোকনাথবাবাকে প্রথম দর্শন করার জন্য বারদীর আশ্রমে গিয়েছিলেন।

সেদিন ব্রহ্মচারী বাবার সঙ্গে যামিনীকুমারের প্রশ্নোত্তরের মধ্য দিয়ে ধর্মবিষয়ে যে আলোচনা হয়েছিল, যামিনীকুমার তা সব তার ধর্মসার সংগ্রহে লেখেন। এই সব আলোচনা ধর্মজগতে ও অধ্যাত্মসাধনার ক্ষেত্রে এক অমূল্য সম্পদ।

যামিনীকুমার বাবা লোকনাথকে প্রশ্ন করেন, তাপ শব্দের অর্থ কি ?

বাবা উত্তর করেন, সুখে অথবা দুঃখে, জয় অথবা পরাজয়ে মনে যে অবস্থা হয়, তাই তাপ।

যামিনীকুমার প্রশ্ন করেন, আপনার মতে আমি যা ইচ্ছা করি তাই করব—একথা যদি সত্য হয় তাহলে চুরি, পরদার গমন প্রভৃতি উৎকট পাপকার্যও ত আমি করতে পারি।

বাবা উত্তরে বললেন, তুমি তা করতে পার না, করতে চেষ্টা করে দেখবে

তা করতে পারবে না। উন্নত বিচারবুদ্ধির দ্বারা জীব যতই শ্রেষ্ঠতা লাভ করে ততই সমাজে নিকৃষ্ট বলে গণ্য কোন কাজ সে আর করতে পারে না। করলে তার তাপ লাগবে। আগে তা করলেও সে আর তা করতে পারবে না। যার কাজ শেষ হয়ে গেছে, সে আর তা করতে পারে না। তুমি আর হাঁটুতে ভর করে হামাগুড়ি দিয়ে হাঁটতে পারবে না।

এবার যামিনীকুমার প্রশ্ন করলেন, পাপ কাকে বলে ?

বাবা বললেন, যাতে তাপ লাগে। সে তাপ তোমার নিজেরও হতে পারে। তোমার সমাজেরও হতে পারে। যে কাজদ্বারা তুমি নিজেকে ও সমাজকে তাপগ্রস্ত করো, তাই পাপ কাজ।

যামিনীকুমার প্রশ্ন করলেন, আমার মাথার ব্যথায় আমি তাপগ্রস্ত হলাম। তাহলে মাথাব্যথায়ও কি পাপ হলো ?

বাবা তখন বললেন, মাথা কি ? কার মাথা ? বেদনা কি ? কে বেদনা বোধ করে ? এই সব বিষয় আলোচনা করে দেখবে অবিদ্যা অর্থাৎ মনেতেই বেদনার উৎপত্তি, স্থিতি, লয়। তখন বুঝতে পারবে, যেখানে অবিদ্যা, সেখানেই পাপ এবং সেইখানেই তাপ। বিদ্যায় পাপ বা তাপ কিছুই থাকে না।

যামিনীকুমার বললেন, আচ্ছা বাবা, তাপশূন্য ত কোন কিছুই দেখি না।

বাবা বললেন, ঠিক কথা। একথা জেনে যে কাজ করে সেই ব্যক্তিই মুক্ত। কিছু পরিমাণ তাপ ছাড়া কোন কাজই হয়না। কিছু পরিমাণ তাপ ছাড়া ঈশ্বরও সৃষ্টি করেন না।

যামিনীকুমার বললেন, ঈশ্বর তাপ ছাড়া কিছু সৃষ্টি করেন না— এ কথার অর্থ ঠিক বুঝতে পারলাম না।

বাবা বললেন, অবিদ্যা বা অজ্ঞানতাই তাপের কারণ। আবার অবিদ্যা ছাড়া কোন কাজই হয় না। সুতরাং ঈশ্বরও অবিদ্যার সাহায্য ছাড়া কোন সৃষ্টিকার্যই করতে পারেন না। কিছু পরিমাণ তাপ সব কাজের মধ্যেই আছে।

এর পর যামিনীকুমার প্রশ্ন করলেন, গুরু কে ?

বাবা উত্তর করলেন, মানুষ যেখানে ঠেকে, সেখানেই শেখে। যার আদর্শ

অনুসরণ করে শিক্ষা পাও তিনিই গুরু।

যামিনীকুমার আবার প্রশ্ন করলেন, গুরুকে সর্বদা স্মরণ করবে,—এর অর্থ কি ?

বাবা উত্তরে বললেন, গুরুকে স্মরণ করবে মানে গুরুর আদেশ স্মরণ করবে। গুরুর আদেশই গুরু।

যামিনীকুমার প্রশ্ন করলেন, গুরুর আদেশ যদি গুরু হয়, তবে তাঁর দেহকে অনাদর করতে পারি।

বাবা বললেন, না গঙ্গাজলের পাত্রকে লোকে আদর করে।

যামিনীকুমার প্রশ্ন করলেন, গুরুর চরণ ধরবে—এর অর্থ কি ?

বাবা বললেন, গুরুর আচরণ করবে। অর্থাৎ গুরু যে আচরণের দ্বারা শিবত্ব লাভ করেছেন, তার অনুরূপ আচরণ করবে।

যামিনীকুমার আবার প্রশ্ন করলেন, গুরুকে আসন বসন দেবেন একথার অর্থ কি ?

বাবা বললেন, গুরুকে আসন দেওয়ার অর্থ হলো, তাঁর আদেশ হৃদয়ে ধারণ করবে। বসন দেওয়ার অর্থ হলো, তাঁর আদেশকে আচ্ছাদন দান করবে। অর্থাৎ অভক্ত নাস্তিকদের কাছে তাঁর আদেশ প্রকাশ করবে না।

যামিনীকুমার প্রশ্ন করলেন, গুরুবৎ গুরুপুত্রেষু—এর অর্থ কি ?

বাবা উত্তর করলেন, গুরুর মত যোগ্য যে গুরুর পুত্র পৌত্রাদি, তাদের গুরুর মত ভক্তি করবে।

গুরুর পুত্র কে ? গুরুপুত্র মূর্খ হলে যদি তাকে ভক্তি করতে না পারি তাহলে কি দোষ হয় ?

বাবা উত্তর করলেন, গুরুর ঔরসজাত পুত্র অথবা গুরুর উপদেশে পরিচালিত হয়ে যার জ্ঞান জন্মেছে। আর 'যদি' শব্দ সংশয়াত্মক। গুরু-পুত্রকেতুমি ভক্তি করতে পার কিনা দেখ। না পারলে লোক দেখানো ভক্তি করলে তাতে লাভ না হয়ে ক্ষতি হবে।

আবার প্রশ্ন, গুরু শিষ্যের কি করেন ?

বাবা উত্তর করলেন, গুরু জ্ঞানরূপ অঞ্জনশলাকাদ্বারা অজ্ঞানান্ধ শিষ্যের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত করেন। আমি কে, আমার কর্ম কি, আমি কোথা থেকে এসেছি, কোথায় যাব, সৃষ্টিকৌশল কি—এই সমস্ত বুঝিয়ে দিয়ে

গুরু জ্ঞানচক্ষু খুলে দেন।

গুরুগীতাতে ভিন্ন ভিন্ন ধ্যান লেখার কারণ কি?

বাবার উত্তর, গুরু অনন্ত, ধ্যানও অনন্ত।

জীবের বন্ধন এবং মুক্তির কারণ কি?

বাবা বললেন একই কারণ মায়া।

আমি বদ্ধ না মুক্ত কিসে বুঝব?

বাবার উত্তর, তাপই তার পরীক্ষার স্থল। যখন তোমার কিছুতেই তাপ লাগবে না, যখন সুখে বা দুঃখে, মানে অপমানে, শীতে বা গ্রীষ্মে একই অবস্থায় থাকবে তখনই বুঝবে তুমি মুক্ত।

তাপ লাগবার কারণ কি?

বাবা বললেন. কামনাই তাদের কারণ। যার কামনা নেই, তার তাপও নেই।

সন্ন্যাস ভাল অবস্থা কি না?

হ্যাঁ, ভাল অবস্থা।

সন্ন্যাস কাকে বলে?

বাবা বললেন, কার্য পরিত্যাগ ও কার্য করা—এই উভয়কেই যে একই অবস্থা মনে করে, সে-ই সন্ন্যাসী। অলসতা হেতু কার্য পরিত্যাগকে সন্ন্যাস বলে না।

এই সংসারে ত্রিবিধ তাপ কি?

বাবা বললেন, এই সংসার ত্রিবিধ তাপে পূর্ণ। বাক্যবাণ, বিত্তবিচ্ছেদ বাণ, বন্ধুবিচ্ছেদ বাণ—এই তিনটি বান ত্রিবিধ তাপ। এই তিনটি বাণ বা তাপ যিনি সহ্য করতে পারেন, তিনি মৃত্যুকে জয় করতে পারেন।

যামিনীকুমার তখন প্রশ্ন করলেন, তবে কি আপনি এই সমস্ত তাপের মধ্যে থাকাই শ্রেয় মনে করেন?

বাবা বললেন, হ্যাঁ, তাই মনে করি। কর্মত্যাগ অপেক্ষা কর্ম করাই শ্রেয়।

তাপের কি কোন উপকারিতা আছে?

বাবা উত্তর করলেন, হ্যাঁ, প্রচুর উপকারিতা আছে। প্রহ্লাদ ও সীতাকে দেখ।

প্রহ্লাদ ও সীতার কথা কি বললেন বুঝলাম না।

বাবা বললেন, অবতার কেন, কি উদ্দেশ্যে হয়, তা বোঝ। ভগবান ধর্ম রক্ষা করার জন্য যুগে যুগে অবতীর্ণ হন। এবং নিজে সেই ধর্ম আচরণ করে জীবকে শিক্ষা দেন।

যামিনীকুমার বললেন, প্রহ্লাদকে ভগবানকে পাবার জন্য কত উৎকট বিপদই না সহ্য করতে হয়েছিল।

বাবা বললেন, হ্যাঁ, তা সত্য। কিন্তু তারা কখনও নষ্ট হয়নি শত তাপের মধ্যেও। এত উৎকট তাপেও অগ্নি পরীক্ষার সময় অগ্নি অনুমাত্রও প্রবেশ করতে পারল সীতার দেহে। স্বয়ং হরি এসে সীতা এবং প্রহ্লাদকে কোলে তুলে নিয়ে রক্ষা করলেন।

যামিনীকুমার আবার প্রশ্ন করলেন, আপনার চেষ্টা বা ভাবনা নেই কেন?

বাবা বললেন, কারণ আমি জ্ঞানী, তুমি অজ্ঞান। আমি জানি, আমি এখানে কাউকে খেতে দিই না। ভাগ্যে যার আহার্য আছে, সে আহার পায়। যার নেই সে আহার পায় না। তাতে আমার কোন তাপ নেই। আর তোমার ভয় আছে। তুমি তোমার আশ্রিতদের খেতে দিতে না পারলে সমাজের লোকে তোমাকে নিন্দা করবে। আমার সে ভয় নেই।

যামিনীকুমার এবার প্রশ্ন করলেন, ধর্ম কি?

বাবা বললেন, সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ—এই তিন গুণের যে কর্ম তাই ধর্ম।

সত্ত্ব গুণের লক্ষণ কি?

বাবা বললেন, প্রকৃত ব্রাহ্মণের লক্ষণই সত্ত্ব গুণের লক্ষণ। অর্থাৎ সম, দম, তপঃ শৌচ ইত্যাদি। রজঃ গুণের লক্ষণ হলো, দান, ঐশ্বর্য, বীরত্ব ইত্যাদি আর তমঃ গুণের লক্ষণ হলো, হিংসা, নিদ্রা, তন্দ্রা, দীর্ঘসূত্রতা ইত্যাদি।

যামিনীকুমার প্রশ্ন করলেন এই সমস্ত গুণ চিন্তা করলে আমাদের কি উপকার হবে?

বাবা বললেন, সূর্যোদয়ে যেমন অন্ধকার দূর হয়ে যায়, গৃহস্থ জাগলে যেমন চোর পালায়, তেমনি বারবার এই সব গুণের চিন্তা করলে নিকৃষ্ট কর্মগুলি পালিয়ে যাবে। তখন এই দেহ হয়ে উঠবে দেবমন্দির। পরে

ব্রহ্মশক্তি তোমার মধ্যে জাগ্রত হলে তুমি ব্রাহ্মণ হবে।

দেহ ও মনকে পবিত্র রাখবার কি কোন উপায় আছে ?

বাবা বললেন, হ্যাঁ আছে। সাত্ত্বিক আহারে দেহ পবিত্র হয় আর বাসনা ত্যাগে মন পবিত্র হয়। এইভাবে যখন তোমার দেহ ও মন পবিত্র হবে, তখন বুঝবে হরি কেমন। তখন জানবে হরি তোমার কে।

যামিনীকুমার আবার প্রশ্ন করলেন, ব্রহ্মশক্তি অসার হৃদয় অধিকার করবে — এর অর্থ কি ?

বাবা বললেন, কেন, মহাষ্টমীর দিন কালীপূজা হয়। সেই কালী মূর্তি কি দেখনি ?

হ্যাঁ দেখেছি। তাতে কি বুঝলাম ?

বাবা বললেন, সেই কালীই ব্রহ্মশক্তি। শবের হৃদয় অধিকার করে রয়েছেন।

শব কে ?

বাবা বললেন, তুমি যাকে শিব বলে জান।

শব ত মৃতদেহকে বলে।

বাবা বললেন, তাই শিবকে শব বলে।

শিব ত মৃত্যুঞ্জয়। তবে তাকে শব বলে কেন ?

বাবা বললেন, যে কারণে শিব মৃত্যুঞ্জয়, সেই কারণেই শব।

সেই কারণ কি তা বুঝলাম না।

বাবা বললেন, সেই কারণ হচ্ছে বাসনা ত্যাগ। বাসনা ত্যাগ হলেই জীবের অমরত্ব লাভ হয়। তার আর তখন মৃত্যু থাকে না। কামনা বাসনা না থাকলে আত্মবুদ্ধি বা অহংবোধ থাকে না। তখন কোন কার্য তার কর্তৃত্বে হচ্ছে বলে মনে হয় না। কারণ তার কোন কর্তৃত্বাভিমান থাকে না। এই অবস্থায় জীব সংসারের সব কাজ করে যান, অথচ আসলে তিনি কিছুই করেন না। ভোগবাসনার অভাবে জীব তখন মৃতবৎ সংসারে বিচরণ করেন। বাসনাশূন্য হলেই জীবের জীবত্ব শেষ হয়ে যায় এবং জীব তখন শিবত্ব লাভ করেন। অর্থাৎ তার জীবভাব ব্রহ্মসত্তায় বিলীন হয়ে যায়। সেই অবস্থায় ইচ্ছাময়ী ব্রহ্মশক্তি কালীরূপে শবদেহ অধিকার করে থাকেন। তখন সেই শব শরীর আশ্রয় করে সৃষ্টি, স্থিতি, লয়

ইত্যাদি করে থাকেন। এইভাবে ভগবানের ষড়ৈশ্বর্যশালী শক্তি গুন-সম্পন্ন হলে শব শিব নামে কথিত হয়।

যামিনীকুমার তখন প্রশ্ন করলেন, তবে কি আমার বাসনা ত্যাগ হলে হৃদয়ে কালীমূর্তির আবির্ভাব হবে ?

বাবা বললেন, সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মনো রূপকল্পনম অর্থাৎ সাধকের হিতের জন্যই ব্রহ্মরূপ পরিগ্রহ করেন। তোমার হিতের জন্য তোমাকে বুঝিয়ে দেবার জন্যই ঐ কালীমূর্তির আবির্ভাব।

যামিনীকুমার এবার প্রশ্ন করলেন, সাধক কয় শ্রেণীতে বিভক্ত ?

বাবা উত্তর করলেন. সাধক চার শ্রেণীতে বিভক্ত—জ্ঞানী যোগী, ভক্ত ও কর্মী।

চার শ্রেণীর সাধনপ্রণালীর মধ্যে কি কোন প্রভেদ আছে ?

বাবা বললেন, হ্যাঁ, আছে। জ্ঞানীর সাধন হলো সৎসঙ্গ, দান, বিচার ও সন্তোষ। যোগীর সাধন হলো, জীবাত্মাকে পরমাত্মার সঙ্গে যোগ করা অথবা কুলকুণ্ডলিনী শক্তিকে পরম শিবেতে লীন করা অথবা রাধাকৃষ্ণের মিলন করা। ভক্তের সাধন হলো, সম্পূর্ণ নিষ্কামভাবে ভগবানের আত্মবৎ পূজা ও সেবা করা। কর্মী বা কর্মযোগীর সাধন হলো, দান, যজ্ঞ, প্রভৃতি সাংসারিক কাজকর্ম অনাসক্তভাবে করা। এই চার রকমের সাধনপ্রণালী বললাম বটে, কিন্তু সব সাধকই বিচার করে কর্ম করতে করতে বাসনাশূন্য হয়ে মুক্ত হবে।

এর পরের প্রশ্ন হলো সৎ সঙ্গের ফল কি ?

বাবা বললেন, গঙ্গাস্নান ও বিভিন্ন তীর্থ ভ্রমণে যে ফল হয়, সাধুসঙ্গে সেই ফল হয়। সাধুদর্শনমাত্রেই জীবের সকল পাপ, তাপ ও দৈন্য হরণ করেন। তাই সাধুসঙ্গের গুণ ও মহিমা অনন্ত।

দানের উপকারিতা কি ?

বাবা বললেন, দান উদারতা ও বৈরাগ্য এনে দেয়।

বিচারে লাভ কি ?

বাবা বললেন, বিচারে আত্ম অনাত্ম বোধ হয়, নিত্য-অনিত্য বিবেক জন্মায়। নিত্যানিত্য বিবেক জন্মালে বিশুদ্ধ বৈরাগ্যের উৎপত্তি হয় এবং জীব শিব হয়।

সন্তোষ কিভাবে সাধন করতে হয় ?

বাবা বললেন, সাংসারিক বিভিন্ন অবস্থার মধ্যেও চেষ্টা করে মনকে তুষ্ট রাখাই হলো সন্তোষ সাধনের উপায়।

ভগবান ধর্ম রক্ষার জন্য যুগে যুগে অবতীর্ণ হন। এখানে যুগ কথার অর্থ কি ?

বাবা বললেন, কোন এক কার্যের প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত এক যুগ হয়। বাল্য, যৌবন, বার্ধক্যও এক একটি যুগ। যুগ মানে সময় জানবে।

যামিনীকুমার বললেন, আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না। ভগবান ধর্ম রক্ষার জন্য রাম, কৃষ্ণ ইত্যাদি রূপে সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলিতে জন্মগ্রহণ করেন এটা বুঝলাম। কিন্তু কোন মানুষের জীবনে বাল্যে, যৌবনে, বার্ধক্যে ভগবান তিন চার রূপে অবতীর্ণ হন—এর অর্থ বুঝলাম না।

বাবা বললেন, অবতারের অন্যতম উদ্দেশ্য হলো অসুর নিপাত করা। তোমার হৃদয়ে জ্ঞানরূপ ভগবান অবতীর্ণ হয়ে তোমার অজ্ঞানরূপ অসুরকে যুগে যুগে বিনষ্ট করেন। যখন যে কালে তোমার মধ্যে অধর্মরূপ অসুর প্রবল হয়ে ওঠে, জ্ঞানের আবির্ভাবেই তা বিনষ্ট হয়ে যায়। তা সে যৌবনে বা বার্ধক্যে যখনই হোক না কেন। এইভাবে ভগবান তিন চার, কি পাঁচ সাতবারও এক জীবনে অবতীর্ণ হতে পারেন। আবার একজনের পাঁচ সাত জন্মের পরেও জ্ঞানব্যাপী ভগবান অবতীর্ণ হতে পারেন।

যামিনীকুমার আবার প্রশ্ন করলেন, একবার যার জীবনে ভগবান অবতীর্ণ হন, সে চিরকালের জন্য মুক্ত হয় না কেন।

বাবা তার উত্তরে বললেন, ভোগ পূর্ণ না হলে প্রারব্ধ কর্ম ক্ষয় হয় না। আর প্রারব্ধ ক্ষয় না হলে জীব সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হয় না। তাছাড়া জীবকে একেবারেই মুক্ত করে দিলে ভগবানের সৃষ্টি কৌশলও থাকে না।

প্রারব্ধ কর্ম কাকে বলে ?

বাবা বললেন, শাস্ত্রকারেরা বাণের সঙ্গে প্রারব্ধ কর্মের তুলনা করেছেন। বাণ যেমন একবার ধনুক থেকে ছেড়ে দিলে কর্তার আর কোন কর্তৃত্ব থাকে না, তা আপন গতিবেগে যেখানে সেখানে গিয়ে পতিত হয়, জীবের প্রারব্ধ কর্মও তেমনি। কর্ম একবার করা হয়ে গেলে তার ফলের উপর কর্তার

কোন কর্তৃত্ব থাকে না। তার ফল ভোগ করতেই হবে। একজন্মে তা ভোগ না হলে জন্মান্তরেও তা ভোগ করতে হবে ভোগ শেষ না হওয়া পর্যন্ত কর্তার মুক্তি নেই।

যামিনীকুমার বললেন, এতে পরিষ্কার বুঝলাম না।

বাবা বললেন. ছোটবেলায় পড়েছিস ত, জন্মকালে ষষ্ঠী যার ললাটে যা লিখে দিয়েছেন, তা হরি, হর. ব্রহ্মাও খণ্ডাতে পারেন না। অর্থাৎ যা যা কর্ম নির্দিষ্ট হয়েছে, তাকে তা করতেই হবে। একেই বলে ভাগ্য বা প্রারব্ধ। এই কারণেই কারো জীবনে ভগবান জ্ঞানরূপে কয়েকবার আবির্ভূত হলেও প্রারব্ধ ভোগ শেষ না হলে জীব মুক্ত হয় না। আবার এই ভোগ শেষ হলে জীব একবারেও মুক্ত হতে পারে।

অবশেষে এই সব প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে বাবার কথামৃত শুনে যামিনীকুমারের ধর্ম বিষয়ে সব সংশয় দূরীভূত হয়ে গেল চিরতরে। এক জ্যোতির্ময় সত্য ও নির্মল জ্ঞানের আলো জ্বলে উঠল তাঁর অজ্ঞানান্ধ চিত্তে। নিত্য-অনিত্য বিবেকবোধে উদ্দীপিত হয়ে উঠল তাঁর জীবনচৈতন্য।

তাঁকে দীক্ষাদানের পর বাবা বললেন, শিষ্যের অর্থনাশকারী গুরু অনেক পাওয়া যায়। কিন্তু শিষ্যের ভবদুঃখ নাশকারী গুরু অতীব দুর্লভ।

শুধু যামিনীকুমার নয়, উপস্থিত সকল শিষ্যদের শুনিয়ে বাবা উপদেশ দিলেন, মৌচাক হতে মধু সংগ্রহ করতে হলে মৌমাছি সরিয়ে মধুকুণ্ড লাভ করতে হয়। তেমনি আমার সূক্ষ্ম আদেশ বুঝতে বা গ্রহণ করতে হলে প্রথমে আসন, প্রাণায়াম, ধ্যান, ধারণা প্রভৃতির ভিতর দিয়ে হিংসা, দ্বেষ, কামনা ও বাসনারূপী মৌমাছিগুলিকে সরাতে পারলেই তোমরা আমার সূক্ষ্ম আদেশ ধরবার অধিকারী হবে।

বাবা আরও উপদেশ দিলেন, মানুষের ধর্মপথের সবচেয়ে বড় অন্তরায় হলো অহঙ্কার। ভগবানে ভক্তি রেখে নিজেকে ভগবানের দাস বলে মনে করবি। তাহলেই তোর অহঙ্কার ক্ষয় হয়ে যাবে। অহঙ্কার ক্ষয় হলে মোহনাশ হবে। মোহনাশ হলেই চিত্তশুদ্ধি ঘটবে। চিত্তশুদ্ধি ঘটলেই আত্মজ্ঞান ও পরমার্থজ্ঞান হবে। তাহলেই জীবন্মুক্তি ঘটবে।

ওঁ

সেদিন বারদীর আশ্রমে বাবা লোকনাথকে দর্শন করে ও তাঁর কথামৃত শুনে এক অপার্থিব তৃপ্তি ও আনন্দ লাভ করেন যামিনীকুমার। বাড়িতে ফিরে মাকে বলেন, মা, বারদীর ব্রহ্মচারীর মত তুমি আমাকে ভালবাসতে পারবে না।

মা তখন জিজ্ঞাসা করলেন, ব্রহ্মচারী কেমন ?

যামিনীকুমার বললেন, মূর্তিমান গীতা, জীবন্তগীতা দেখে এসেছি।

যামিনীকুমার সেদিন বুঝতে পারেন, তাঁর গুরুদেব সাধারণ সাধক নন, তিনি মহাপুরুষ। সব বেদবেদান্ত সবধর্ম সর্বভাব মূর্ত হয়ে রয়েছে তাঁর মধ্যে। তিনি আরও বুঝতে পারেন. তাঁর কৃপা ছাড়া তাঁকে বোঝা সম্ভব নয়।

জগদ্গুরু লোকনাথবাবাকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর চরণে নিজেকে সমর্পণ করেন সর্বতোভাবে। তাঁকে দর্শন ও স্পর্শ করামাত্র তাঁর মহান স্বরূপের ছোঁয়া পেয়ে যান।

বাবা লোকনাথও পরমস্নেহে শরণাগতকে সাধন জগতের দুর্লভ বস্তু দীক্ষা দান করে তাঁর মধ্যে সঞ্চারিত করেন তাঁর কৃপা ও অধ্যাত্মশক্তি।

যামিনীকুমার বাবা লোকনাথের কৃপাধন্য হয়ে তাঁর সম্বন্ধে লেখেন, ব্রহ্মচারীবাবা প্রত্যক্ষবাদী ছিলেন। তিনি বলতেন, তুমি যা অনুভব করতে পারনি, তা কাউকে বলবে না।

একদিন তিনি গুরুর কার্য কি তা বোঝাবার জন্য এক অদ্ভুত উপায় অবলম্বন করলেন। সেদিন তাঁর আহারের পর আমাকে ডাকলেন। তারপর আমার সঙ্গে একপাত্রে আহার করতে লাগলেন। তাঁর আদেশক্রমে আমিও তাঁর সঙ্গে ভোজন করতে লাগলাম। তিনি আমার মুখে অন্ন তুলে দিতে লাগলেন আর আমি চিবিয়ে খেতে লাগলাম।

একসময় তিনি আমাকে প্রশ্ন করলেন, তুমি কি করছ ?

আমি তখন উত্তর করলাম, আপনি আমার মুখে অন্ন তুলে দিচ্ছেন আর আমি তা চিবিয়ে খাচ্ছি।

এই কথা শুনে বাবা বললেন, গুরু শিষ্যের এই পর্যন্তই করেন। তিনি শিষ্যের মুখে খাবার উঠিয়ে দেন, শিষ্য তা চিবিয়ে উদরস্থ করবে।

বাবার এই কথাগুলি গুরুতত্ত্বের সার। শুধু তাই নয়, বাবা লোকনাথ কত সহজভাবে তাঁর শিষ্যদের গুরুতত্ত্ব, আত্মতত্ত্ব শিক্ষা দিতেন, এই কথাগুলি তার অপরূপ দৃষ্টান্ত।

এই ঘটনার দ্বারা আরও বোঝা যায়, স্নেহবৎসল এক পিতৃভাব ছিল তাঁর শিষ্যদের মধ্যে। তিনি একবার আহার করার পর কখনো আর আহার করতেন না। কিন্তু সেদিন শিষ্য যামিনীর প্রতি স্নেহবশতঃ তাঁর স্বাভাবিক আচরণ লঙ্ঘন করে আহারের পর আবার তাঁকে নিয়ে আহার করতে লাগলেন। এক পাত্রে আর তাঁর মুখে আহারের প্রতিটি গ্রাস তুলে দিতে লাগলেন। সত্যই ধন্য যামিনীকুমার। তিনি পূর্ণব্রহ্ম বাবা লোকনাথের সঙ্গে একপাত্রে আহার করে বাবার যে দুর্লভ কৃপাপ্রসাদ লাভ করেন, সেই কৃপাপ্রসাদের বলেই তিনি আমাদের কাছে দিয়ে গেছেন বাবার অপূর্ব কথামৃত।

সন্ন্যাসী রামকুমার চক্রবর্তীও বাবা লোকনাথের এক স্নেহ ও কৃপাধন্য শিষ্য। রামকুমার বারদী গ্রামের অতি পরিচিত এক পুরোহিতের বাড়িতে বাস করতেন। তিনি ছিলেন ধীর, স্থির ও শান্তস্বভাব। শাস্ত্রজ্ঞান ও সদাচারব্রতের মধ্য দিয়ে ব্রাহ্মণোচিত গুণগুলি বিকশিত হয় তাঁর মধ্যে।

বাবা লোকনাথ যখন বারদীর আশ্রমে প্রথম আসেন, তখন রামকুমার গৃহস্থ আশ্রমে থেকে সবেমাত্র মধ্যবয়স অতিক্রম করেছেন। কিন্তু তখনো তাঁর সদ্‌গুরু লাভ হয়নি।

অথচ তিনি তখন বুঝতে পারেননি, তাঁর সদ্‌গুরু সবেমাত্র হিমালয় থেকে নেমে এসে তাঁরই ঘরের কাছে আসন পেতে বসেছেন। একদিন সেই সদ্‌গুরুর কৃপালাভে অসংখ্য মানুষের মত তিনিও ধন্য হবেন।

অবশেষে একদিন বারদীর আশ্রমে এসে উপস্থিত হলেন রামকুমার। বাবার দর্শনমাত্রেই জেগে ওঠে জন্মান্তরের সেই সংস্কার। ত্যাগ ও বৈরাগ্যের এক অনিকারণীয় আকাঙ্ক্ষা অনুভব করতে থাকেন অন্তরে। গৃহস্থ জীবনের সংকীর্ণ গণ্ডীর বাইরে গিয়ে উদার উন্মুক্ত প্রকৃতির কোলে বসে সাধনা করার ইচ্ছা জাগে মনে।

রামকুমারকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মধ্যে গুরু ভগবান গাঙ্গুলীকে চিনে নিতে বিলম্ব হয় না, জন্মান্তরের প্রতিশ্রুতিবন্ধ কথা মনে পড়ে যায়

বাবার। তিনি ত তাঁর গুরু ভগবানের আশাতেই এতদিন বসে আছেন এই বারদীর আশ্রমে। শুষ্ক জ্ঞানমার্গের মধ্যে সদ্‌গুরুর কৃপা দ্বারা ভক্তিরস সিঞ্চিত করে কর্মযোগে পরিচালিত করতে হবে তাঁকে। তিনি ত গুরুর দেহত্যাগের সময় এই প্রতিশ্রুতিই তাঁকে দিয়েছিলেন কাশীধামে।

আজ সেই প্রতিশ্রুতি পালনের অপূর্ব সুযোগ এসেছে। তাই রাম-কুমাররূপী ভগবান গাঙ্গুলীর মধ্যে তার গুরুসুলভ অধ্যাত্মশক্তি সঞ্চার করে জ্ঞান ও ভক্তির এক অপূর্ব সংযোগ ঘটালেন তাঁর মধ্যে।

এদিকে রামকুমারও এক অমোঘ আকর্ষণের টানে প্রায়ই ছুটে আসতে থাকেন বারদীর আশ্রমে। বাবাও গোপনে তাঁকে যোগসাধনার কত গুহ্য পদ্ধতি বলে দেন। শিখিয়ে দেন যত্ন করে। গুপ্তভাবে তাই অনুশীলন করে যেতে থাকেন রামকুমার।

এইভাবে কিছুদিন চলার পর একদিন রামকুমারকে কাছে ডাকলেন বাবা লোকনাথ। তারপর তাঁকে দীক্ষা দান করলেন। সেই সঙ্গে আদেশ করলেন, তাঁকে এবার গৃহত্যাগ করে পরিব্রাজক সন্ন্যাসীর জীবন যাপন করতে হবে।

দেহধারণের প্রারব্ধ সংস্কার এবং পূর্বজীবনের সাধনার ভুলত্রুটিকে সংশোধনের জন্য ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন ও পরিব্রাজনের আদেশ দেন বাবা। আর মাথা পেতে সে আদেশ গ্রহণ করেন শিষ্য রামকুমার।

গুরুর কৃপাশক্তির বলে বলীয়ান হয়ে গৃহত্যাগ করলেন রামকুমার। সন্ন্যাসীর বেশে পরিব্রাজনে বার হবার সময় বাবা তাঁকে বললেন, রাম, সময় হলেই আমি তোমায় কাছে ডেকে নেব। যখনই আমাকে স্মরণ করবে, আমাকে কাছে পাবে।

দীর্ঘকাল পর বাবা লোকনাথের মহাসমাধির আগের দিন সন্ন্যাসী রামকুমার সহসা আবির্ভূত হন বারদীর আশ্রমে। বাবার আদেশে রাম-কুমারই তাঁর মরদেহের অগ্নি সংস্কার ও মুখাগ্নি করেন।

এর পর রামকুমার বারদী ত্যাগ করে কাশীধামে চলে যান। ব্রহ্মচারী বাবার পরমভক্ত গৃহীসাধক নিশিকান্ত বসু মশায় তাঁর ডায়েরীতে লিখেছেন, ত্রিপুরা জেলার বিদ্যাকূট আশ্রমের অতিবৃদ্ধ অমরচন্দ্র ভট্টাচার্যের কাছে শুনেছেন, কিভাবে রামকুমার বাবার সূক্ষ্ম আদেশ পেয়ে দূর থেকে তাঁর

মহাসমাধির ঠিক আগের দিন আশ্রমে এসে উপস্থিত হন এবং তার দেহ ত্যাগের পর মুখাগ্নি করেন এবং পরে কাশীধামে গিয়ে মণিকর্ণিকা ঘাটে যোগাসনে বসে স্বেচ্ছায় দেহত্যাগ করেন।

বাবা লোকনাথের গুরু ভগবান গাঙ্গুলীই যে এ জীবনে রামকুমার চক্রবর্তী, সেকথা বাবাই নিজমুখে একদিন স্বীকার করেন ভক্তদের কাছে।

এ বিষয়ে পূর্ণ বিবরণটি নিশিকান্ত বসু মশাই তাঁর ডায়েরীতে লিখে যান।

নিশিকান্ত বসু যখন বারদীতে ডাক্তারি করতেন তখন তিনি নারিন্দা-বাসী রমণী দাসের সঙ্গে পরিচিত হন। রমণীমোহন বাবার এক পরম ভক্ত ছিলেন। একদিন তিনি বাবার এক দৈব লীলার কথা ব্যক্ত করেন নিশিকান্ত বাবুর কাছে।

একবার রমণীমোহনের নয় বছরের এক পুত্র দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়। লোকনাথবাবার কৃপায় সে নিশ্চিত মৃত্যুর কবল থেকে রক্ষা পায়। প্রাণরক্ষা পাওয়ার পর ছেলেটি তার রোগগ্রস্ত অবস্থায় অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করে। সে বলে, একদিন সে অচেতন অবস্থায় ছিল তখন বাবা লোকনাথ, ভগবান গাঙ্গুলী ও বেণী মাধবের সঙ্গে তার দেহে ভর করে কথা বলেন। ছেলেটি অচেতন অবস্থাতেই বলে, বাবা লোকনাথ এসেছেন, ভগবান গাঙ্গুলী এসেছেন।

কিন্তু চেতনা ফিরে পাওয়ার পর সে সব কথা ভুলে যায় ছেলেটি। তার কথা থেকে. উপস্থিত সকলের মনে সন্দেহ জাগে, বাবা লোকনাথের গুরু ভগবান গাঙ্গুলী অনেক কাল আগে দেহত্যাগ করা সত্ত্বেও কি করে, কি বেশে এসেছেন ? এই ভগবান গাঙ্গুলী এ জীবনে কে হয়েছেন ?

পরে এ বিষয়ে বাবা লোকনাথকে প্রশ্ন করা হয়। তখন তিনি এ প্রশ্নের উত্তরে বলেন, তাঁর পূর্ব জন্মের গুরু ভগবান গাঙ্গুলী এ জন্মে বারদীর শ্রীরামকুমার চক্রবর্তী। তাঁর উদ্ধারের জন্যই তিনি বারদীতে এসেছেন এবং এতদিন অবস্থান করছেন।

ওঁ

বাবা লোকনাথ ছিলেন স্বয়ং দেবাদিদেব মহাদেব। কৈলাস থেকে অবতরণ করে বারদী নামে সাধারণ সামান্য একটি গ্রামের ভূমিকে পরিণত করেন এক পবিত্র মহাতীর্থে। কত পাপী তাপী যে তাঁর দিব্য স্পর্শে মুক্তি পায়, কত আর্ত জীব উদ্ধার পেয়ে নতুন জীবন লাভ করে, কত মুমুক্ষু যোগী ও সাধক পায় তাদের সঠিক সাধনপথের সন্ধান, সে সব কথা বাবার প্রত্যক্ষদর্শী ভক্তদের অভিজ্ঞতা থেকে পাওয়া যায়।

বারদীনিবাসী রামরতন চক্রবর্তী কানাই কবিরাজ নামে পরিচিত ছিলেন। সদাচারী নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ হিসাবে খ্যাতি ছিল রামরতনের। জানকীনাথ নামে তাঁর একটি মাত্র পুত্র ছিল। এই জানকীনাথই পরে জানকী ব্রহ্মচারী নামে খ্যাত হন।

পিতামাতার অপার স্নেহে লালিত পালিত হয়ে শৈশব, বাল্য ও কৈশোর কাটিয়ে যৌবনে পদার্পণ করেন জানকীনাথ।

এই সময় একবার কালাজ্বরে আক্রান্ত হন জানকীনাথ। দিনে দিনে রোগ বেড়ে যায়। ডাক্তার কবিরাজের সব চেষ্টাই ব্যর্থ হয় একে একে।

এদিকে জানকীনাথ ছিলেন বাবা লোকনাথের পূর্ব নির্দিষ্ট লীলা-পার্ষদ। অন্তরঙ্গ পার্ষদকে কাছে টেনে আনার এক অপূর্ব লীলা রচনা করেন বাবা নিজে।

কালাজ্বরে ভুগে ভুগে জানকীনাথের রোগজীর্ণ ও শীর্ণ দেহটিতে কোনমতে প্রাণটি টিকে থাকে। একমাত্র পুত্র সন্তানের অকালে প্রাণ-বিয়োগের সম্ভাবনা দেখে উন্মাদের মত হয়ে যান পিতামাতা।

তখন ভক্ত রামরতন বুঝতে পারেন, তাঁর এই ঘোর বিপদে বাবা লোক-নাথের শরণাগত হওয়াই একমাত্র উপায়। এই ভেবে মৃতপ্রায় সন্তানকে নিয়ে একদিন বারদীর আশ্রমে গেলেন বাবা লোকনাথের কাছে। বাবার চরণে সঁপে দেন সন্তানকে।

রামরতন বাবাকে বললেন, বাবা, আমার একান্ত প্রাণপ্রিয় সন্তানের প্রাণ আপনিই রক্ষা করতে পারেন। আপনার অহৈতুক কৃপাই আমার একমাত্র আশ্রয়। তাই আপনার চরণে আমার সন্তানের প্রাণভিক্ষা চাই। আপনি আমাকে রক্ষা করুন।

শরণাগত বৎসল বাবা লোকনাথ সব কথা শুনে বললেন, ওকে আশ্রমে রেখে যা।

পরদিন বাবা জানকীকে আদেশ করলেন, আশ্রমের পূর্ব দিকের পুকুর থেকে জল তুলে এনে আশ্রমের সেবায় লেগে যা।

অথচ জানকীনাথ উত্থানশক্তিরহিত। বিন্দুমাত্রও বল নেই তাঁর অস্থি-চর্মসার দেহে। পুকুর থেকে জল আনা ত দূরের কথা, পুকুরঘাটে যাবারই তাঁর ক্ষমতা নেই।

কিন্তু কি আশ্চর্য! বাবা লোকনাথ আদেশ করার সঙ্গে সঙ্গেই সহসা শক্তি সঞ্চারিত হয় জানকীনাথের দেহে। তিনি তৎক্ষণাৎ পুকুরঘাটে জল আনতে চলে গেলেন অবলীলাক্রমে। তারপর সেই জল এনে আশ্রমের সেবার কাজে লেগে গেলেন। বাবার আদেশমত দিনের পর দিন এইভাবে জল এনে এনে আশ্রমসেবা করে যেতে লাগলেন জানকীনাথ। এই সেবার ফলে বাবার কৃপাশীর্বাদ বর্ষিত হয় জানকীনাথের উপর।

কর্মযোগ শুরু হয়ে যায় জানকীনাথের জীবনে। গুরুর নিত্য চরণ সেবাই হয়ে ওঠে তাঁর কাছে সবচেয়ে বড় কাজ। এইভাবে নিশ্চিত মৃত্যুর কবল থেকে মুক্তি পেয়ে ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে ওঠেন জানকী।

ছেলে সুস্থ হয়েছে শুনে ছেলেকে ঘরে ফিরিয়ে নেবার জন্য আশ্রমে ছুটে আসেন জানকীর মা।

জানকীকে মার আদেশ পালন করতে নির্দেশ দেন বাবা লোকনাথ। কিন্তু সে আদেশ পালন করতে পারেন না জানকী। জন্মান্তরের শুদ্ধ সংস্কার জেগে ওঠে তাঁর মনে।

জানকী বাবা লোকনাথকে বলেন, আমার ত বাঁচার কোন আশাই ছিল ছিল না। কেবল আপনার কৃপায় বেঁচে উঠেছি। তাই এ দেহের উপর আর কারো কোন অধিকার নেই। এ দেহ কেবল আপনার সেবা, পূজা ও সাধন ভজনের জন্যই উৎসর্গ করেছি। সংসারে আর আমি ফিরে যাব না।

কিন্তু এই কথায় মায়ের প্রাণ কেঁদে ওঠে। একমাত্র পুত্রসন্তানের মায়া তিনি কিছুতেই কাটাতে পারেন না। তাই সন্তানকে ঘরে ফিরে যাবার জন্য চোখে জল নিয়ে বারবার অনুনয় বিনয় করেন মা। কিন্তু তাঁর সিদ্ধান্ত ও সংকল্পে অটল থেকে যান জানকী।

অবশেষে পুত্রের গুরুভক্তি ও বৈরাগ্যের কাছে হার মানতে বাধ্য হন মা। প্রাণদাতা বাবা লোকনাথের চরণাশ্রয়ে পুত্রকে চিরদিনের মত রেখে একাকী ঘরে ফিরে যান তিনি।

এইভাবে গৃহস্থ জীবনের বন্ধন হতে চিরতরে মুক্ত হন জানকীনাথ। অবাধ সন্ন্যাসজীবনের সৌভাগ্য ও সুযোগ লাভ করে ধন্য হন তিনি। গুরুগতপ্রাণ জানকীনাথ গুরুর সেবায় ও সাধনমার্গে নিজেকে সঁপে দেন। যোগসাধনের ক্রিয়াগুলি তাঁকে শিখিয়ে দেন বাবা লোকনাথ।

ক্রমে অষ্টাঙ্গ যোগসাধনায় মগ্ন হয়ে পড়েন জানকীনাথ। সর্বক্ষণ গুরু লোকনাথের দিব্য দেহ স্মরণ, মনন অনুধ্যানের মধ্য দিয়ে তাঁর দেহটিও লোকনাথের অনুরূপ হয়ে ওঠে। একই সঙ্গে জ্ঞান, ভক্তি ও কর্মযোগের সাধনা করতে করতে অবশেষে গুরুর কৃপায় সাধনমার্গের উচ্চস্তরে উন্নীত হন। তাঁর চরম বৈরাগ্য, ব্রহ্মচর্য ও সাধননিষ্ঠায় প্রসন্ন হন বাবা লোকনাথ। যাতে তাঁর সিদ্ধি সহজলভ্য হয়, তার জন্য শক্তি সঞ্চারিত করেন তাঁর মধ্যে। বাবা তাঁর নিজের যোগৈশ্বর্য দান করেন।

পরে জানকীনাথকে আদেশ করেন বাবা, আমার নরলীলা অপ্রকট হলে বারদী-আশ্রমের সব গুরুদায়িত্ব তোকেই বহন করতে হবে।

একথা শুনে মহাচিন্তায় পড়লেন জানকীনাথ। এত বড় বিরাট দায়িত্ব-ভার কেমন করে তিনি বহন করবেন? গুরুদেবের এই কঠোর আজ্ঞা পালন করা তাঁর পক্ষে কি সম্ভব?

তাই নানা সংশয়াত্মক প্রশ্ন জাগে জানকীনাথের অন্তরে। নিজের সামর্থ্যকে নিজেই বিশ্বাস করতে পারেন না। আর তাঁর এই অক্ষমতার কথা মনে মনে নিবেদন করেন বাবার চরণে অতি বিনীতভাবে। কিন্তু জানকীনাথ তখন বুঝতে পারেন না, গুরুর অবর্তমানে বারদী আশ্রমের মাহাত্ম্য প্রচার তাঁকেই করে যেতে হবে। গুরুদেবের নির্ধারিত প্রতিভূ হিসাবে তাঁকেই তুলে ধরতে হবে গুরুভক্তি ও গুরুসেবার আদর্শটিকে।

একদিন জানকীকে চিন্তিত দেখে বাবা লোকনাথ তাঁকে বললেন, কিরে, এত বড় আশ্রমের ব্যয়ভার কেমন করে চলবে, তাই ভাবছিস ত? ওরে, আমার কি বিনাশ আছে? তবুও তোকে বলি, প্রত্যহ আসনঘর পরিষ্কার করার সময় আমার আসনের তলায় দুটি করে টাকা পাবি।

অতেই তোদের সব খরচ চলে যাবে।

বাবার লীলা সংবরণের পর মহাপুরুষের এই কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য প্রমাণিত হয়। জানকী ব্রহ্মচারী তাঁর জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত প্রতিদিন ঐ দুটি করে টাকা বাবার আসনের তলায় তার আশীর্বাদরূপে পেয়ে যেতে থাকেন।

বারদী গ্রামের প্রাচীন বৃদ্ধেরা জানকীনাথের অসামান্য গুরুভক্তির কথা মুখে মুখে প্রচার করেন। জানকীনাথ প্রতিদিন নিষ্ঠার সঙ্গে ভোগরান্না করতেন। তখন এক দিব্যগন্ধে গোটা আশ্রমটি ভরে যেত। গুরুকে ভোগ নিবেদনের পর প্রসাদ হাতে 'আয় আয়' বলে ডাকতেই আশ্রমের পাশের ঝোপ থেকে দুটি শেয়াল ও অন্যান্য প্রাণীরা ছুটে আসত সেই প্রসাদ গ্রহণের জন্য।

ক্রমে যোগসাধনায় উচ্চতর অবস্থা লাভ করেন জানকী ব্রহ্মচারী। সেই যোগশক্তির প্রকাশও হতে থাকে। সেই যোগশক্তির কথা ছড়িয়ে পড়ে দূর-দূরান্তরে। বহু ভক্ত তখন বারদীর আশ্রমে এসে বাবা লোকনাথের প্রতিভূ জানকীনাথকে গুরুরূপে বরণ করেন। বহু ধর্মপিপাসু ও মুমুক্ষু মানুষ তাঁর মাধ্যমে বাবা লোকনাথের কৃপা লাভ করেন।

জানকীনাথের অন্যতম শিষ্য গুরুদয়াল দাস গুরুকৃপায় এক পুত্র-সন্তান লাভ করেন। কিন্তু পুত্রসন্তানটি জন্ম থেকেই ক্ষীণকায় এবং চোখদুটি তার অন্ধ। তাই একদিন গুরুদয়াল আশ্রমে এসে পুত্রটিকে সমর্পণ করেন জানকী ব্রহ্মচারীর কাছে। ছেলের সুস্থ দেহ ও চোখ দুটি প্রার্থনা করেন।

জানকীনাথ তখন বলেন, বাবা লোকনাথের শ্রীচরণের ধূলি সর্বরোগের মহৌষধ। সেই ধূলি এই আশ্রমের মাটিতে মিশে আছে। সুতরাং এই আশ্রমের মাটি শিশুটির সর্বাঙ্গে ও চোখদুটিতে মাখাতে থাক। বাবার আশীর্বাদে সে সুস্থ হয়ে উঠবে।

প্রতিদিন শিশুটির দেহে ও চোখে আশ্রমের মাটি মাখানো চলল। অল্প দিনের মধ্যেই শিশুটি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠল। সে দেহে বল পেল, দৃষ্টিশক্তিও লাভ করল। এই শিশুর নাম ভগবান দাস। সে দীর্ঘজীবন লাভ করে।

ত্রৈলোক্যনাথ নামে এক দরিদ্র ব্যক্তি জানকী ব্রহ্মচারীর পরম ভক্ত ছিলেন। সংসারে আর্থিক অভাব অনটন ও অসচ্ছলতা লেগেই ছিল। একদিন ত্রৈলোক্যনাথ জানকীনাথের কাছে তাঁর দারিদ্র্য মোচনের জন্য প্রার্থনা করেন।

জানকীনাথ তখন তাঁকে একটি পয়সা দিয়ে বলেন, এই পয়সাটি যত্ন করে রেখো। তোমাকে আর কোনদিন অসচ্ছলতায় ভুগতে হবে না।

জানকীনাথের আশীর্বাদে অসচ্ছলতা হতে চিরতরে মুক্ত হয় ত্রৈলোক্যনাথের সংসার। সেই থেকে ত্রৈলোক্যনাথ সচ্ছল জীবনের অধিকারী হয়ে সুখে শান্তিতে পুত্র-পৌত্রীসহ সংসার করতে থাকেন।

বারদীর দীঘির পাড়ে হরিচরণ নামে এক মৎস্যজীবী বাস করত। বাবা লোকনাথের প্রতি তার ভক্তি ও বিশ্বাস ছিল অগাধ। প্রতিদিন সূর্যোদয়ের আগে স্নান করে সে আশ্রমে আসত। তারপর বাবার আসনঘরের সামনে সাষ্টাঙ্গে প্রণত হয়ে সেই ঘরের মাটি সে সর্বাঙ্গে মাখত। তারপর সে কাজে বার হত।

ক্রমে দীক্ষা নেবার এক প্রবল আগ্রহ জাগে তার অন্তরে। বাবা লোকনাথের অবর্তমানে জানকীনাথকেই সদ্‌গুরুরূপে গ্রহণ করে সে। হরিচরণের ভক্তি বিশ্বাস ও নিষ্ঠা বহুদিন ধরেই লক্ষ্য করে আসছেন জানকীনাথ। প্রথম প্রথম তিনি হরিচরণকে বলতে থাকেন, সময় হলেই দীক্ষা দেব।

অবশেষে একদিন শুভ লগ্নে হরিচরণকে দীক্ষা দান করেন জানকীনাথ। হরিচরণও নিষ্ঠা ও ভক্তির সঙ্গে গৃহে থেকে তাঁর ধর্মকর্ম করে যেতে থাকেন।

সংসারে থেকেও সংসারের প্রতি সম্পূর্ণ নিরাসক্ত ও নির্লিপ্ত হয়ে সাধনা করে যেতে থাকে হরিচরণ। গুরুর কৃপায় ত্যাগ ও বৈরাগ্যের সকল আদর্শ ফুটে ওঠে তার জীবনে। অল্পকালের মধ্যে বারদী ও তার আশপাশের অঞ্চলে হরিচরণ সাধু নামে পরিচিত হয়ে ওঠে। আদর্শ গৃহস্থ সাধু বলতে যা বোঝায় হরিচরণ ছিল তাই।

অবশেষে দেহত্যাগের সময় বাবা লোকনাথ ও জানকীনাথের নামস্মরণ করতে করতে লোকনাথের নিত্যধামে গমন করেন হরিচরণ।

পুত্রের ত্যাগ, বৈরাগ্য ও অধ্যাত্মশক্তি দর্শন করে জানকীনাথের মাতার মনেও জাগে বৈরাগ্যের আবেগ। তিনি তখন দৈহিক সুখ ও কামনা বাসনা সব ত্যাগ করে সন্ন্যাসিনীর জীবন যাপন করতে থাকেন। গৈরিক বসন ও দীর্ঘ জটা ধারণ করেন। এইভাবে দীর্ঘকাল শরীর ধারণ করে সাধনপথে অগ্রসর হতে থাকেন তিনি।

এই জানকীনাথ অতীতে একদিন এই বারদীর আশ্রমে বাবা লোকনাথের কাছে প্রাণভিক্ষা চাইতে আসেন। সেই সূত্রেই তিনি সংসার ত্যাগ করে বাবার পরম শিষ্য ও ভক্ত হয়ে ওঠেন। ক্রমে গুরুর কৃপায় এক-বিরল যোগশক্তির অধিকারী হয়ে ওঠেন তিনি। তাঁর সেই যোগশক্তি, ভক্তি, ত্যাগ ও তিতিক্ষার আদর্শ লোকমুখে ছড়িয়ে পড়তে থাকে চারদিকে। কত আর্ত ও মুমুক্ষু মানুষ তাঁর চরণে আশ্রয় নিয়ে তাঁর কৃপালাভে ধন্য হয়।

অবশেষে ১৩১৮ সনে ২৯শে চৈত্র মরদেহ ত্যাগ করে লোকনাথরূপী পরম ব্রহ্মে লীন হয়ে গেলেন তিনি। জগদগুরু লোকনাথের সমাধি মন্দিরের কাছে নির্মিত হলো তার সমাধিমন্দির। একই সঙ্গে গুরু ও শিষ্যের নিত্য সেবা প্রচলিত হলো। অভিন্নভাবে এক অমর সূক্ষ্ম আত্মারূপে বিরাজ করতে লাগলেন গুরু ও শিষ্য, ভক্ত ও ভগবান।

গুরু-শিষ্যের এমন দিব্যলীলা সত্যই দুর্লভ। বাবা লোকনাথের সূক্ষ্ম নির্দেশেই তাঁর সমাধি মন্দিরের পাশেই নির্মিত হয় তাঁর সুযোগ্য প্রতিনিধি জানকী ব্রহ্মচারীর সমাধি মন্দির। তাঁর পূজার সঙ্গেই জানকীনাথের উদ্দেশ্যে পূজা ও ভোগ নিবেদনের ব্যবস্থা হয়।

বাবা লোকনাথের যে সব শরণাগত ভক্ত তাঁর কৃপালাভে ধন্য হন তাঁদের মধ্যে কয়েকজন শক্তিমান ভক্তকে বেছে নিয়ে তাঁর অধ্যাত্ম লীলা প্রকটিত করেন।

বাবা লোকনাথের মত যাঁরা জীবমুক্ত সদ্‌গুরু তাঁরা কখনো সব শরণাগত ভক্তের জন্য একই সাধনপথের নির্দেশ দেন না। তাই আধার ও অধিকার ভেদে সাধন-নির্দেশের মধ্যে পার্থক্য দেখা যায়।

ব্রহ্মানন্দ ভারতীর মধ্যে জ্ঞান ও বিচারের এক স্বাভাবিক বৃত্তি ছিল। তাই তাঁকে জ্ঞানমার্গে পরিচালিত করেন বাবা লোকনাথ। আবার রজনী ব্রহ্মচারী ও অভয় ব্রহ্মচারীর মধ্যে ছিল স্বাভাবিক ভক্তিভাবের প্রাধান্য।

তাই তাঁদের সেই ভক্তিভাবের মধ্যে জ্ঞান ও বিচারের মিশ্রণ ঘটিয়ে তাঁদের কর্মযোগের পথে পরিচালিত করেন তিনি।

কিন্তু ইষ্টভক্তি ও ইষ্টচরণে পরিপূর্ণ ও অকুণ্ঠ আত্মসমর্পণকেই সাধন-মার্গের মূলসূত্র বলে মনে করতেন মহাযোগী লোকনাথ। এই বিশ্বাসকে প্রমাণিত করেন তিনি তাঁর সাধনজীবনে। তাই তাঁর নির্দেশিত সাধন-মার্গের মধ্যে জ্ঞানমিশ্রাভক্তি ও কর্মযোগের পন্থাই সবচেয়ে বড় স্থান অধিকার করে আছে।

ওঁ

মথুরামোহন চক্রবর্তী ঢাকার প্রসিদ্ধ শক্তি ঔষধালয়ের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি বাবা লোকনাথের অন্যতম প্রধান শিষ্য ছিলেন। বাল্যকালে তিনি এক দুরারোগ্য উৎকট ব্যাধিতে আক্রান্ত হন।

পরে তিনি লোকমুখে শুনে সেই সংকট হতে উদ্ধার পাওয়ার জন্য ব্রহ্মচারীবাবার শরণাপন্ন হয়ে বারদীর আশ্রমে আসেন। এই শারীরিক ব্যাধি ভবব্যাধি মুক্তির কারণ হয়ে ওঠে। দেহগত রোগমুক্তির জন্য ভব-রোগের বৈদ্যের নিকট এসে উপস্থিত হন। অবশেষে অচিরে তিনি রোগ-মুক্ত হন। সেই সঙ্গে বাবা লোকনাথের চরণে চিরদিনের মত সমস্ত মন প্রাণ সমর্পণ করেন।

মথুরামোহন প্রথমে ঢাকা জেলার অন্তর্গত বোয়াইল গ্রামের হাইস্কুলে প্রধান শিক্ষকের কাজ করতেন। এই সময় দেশে আয়ুর্বেদ ওষুধের প্রচারের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন।

এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য মথুরামোহন চাকরি ছেড়ে দিয়ে ঢাকায় এসে আয়ুর্বেদ ওষুধের একটি কারখানা নির্মাণ করেন।

ইতিমধ্যে তিনি বাবা লোকনাথের কাছে দীক্ষাগ্রহণ করে ঐকান্তিক গুরুভক্তি ও গুরুসেবার পরিচয় দেন। তাঁর গুরুভক্তি ও গুরুপরায়ণতায় প্রসন্ন হয়ে বাবা লোকনাথ তাঁকে সমস্ত ঐহিক কামনা পূরণের বর দান করেন। বাবা তাঁকে কর্মযোগের নির্দেশ দেন। সংসারে থেকে নিষ্কাম-ভাবে কর্ম করে যাওয়াই মুক্তির উপায়।

গুরুর কৃপায় ব্যবসায় প্রচুর উন্নতি হতে থাকে মথুরামোহনের।

অল্পকালের মধ্যেই শক্তি ঔষধালয়ের খ্যাতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়তে থাকে।

কিন্তু এই ব্যবসায়িক উন্নতি কোন মোহ সৃষ্টি করতে পারে না মথুরা-মোহনের মনে। তিনি পরম নিষ্ঠা ও ভক্তি সহকারে তাঁর গুরুদেব বাবা লোকনাথের নিত্য সেবা ও পূজা করে যেতে থাকেন।

দয়াগঞ্জে শক্তি ঔষধালয় নামে যে প্রতিষ্ঠান ছিল, সেই প্রতিষ্ঠানের ভিতরেই একটি মন্দির নির্মাণ করেন মথুরামোহন। সেই মন্দিরের মধ্যে বাবা লোকনাথের এক মূর্তি বিগ্রহরূপে প্রতিষ্ঠা করেন। আজও সেই মন্দিরটি ঢাকা লোকনাথ ব্রহ্মচর্যাশ্রম নামে খ্যাত হয়ে আছে।

মথুরামোহন তাঁর গুরুপ্রশস্তি নিজে লিখে যান। তিনি লিখেছেন, বিশ্বগুরু শ্রীশ্রী লোকনাথ ব্রহ্মচারী বাবা সিদ্ধ মহাপুরুষদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করে আছেন। লোকশিক্ষার জন্য ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণের পদগৌরব ও প্রভাব যে অবতার হতেও অধিক, তা বিশেষরূপে দেখাবার জন্যই স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ ব্রাহ্মণের যে পদচিহ্ন বক্ষে ধারণ করেছিলেন, বারদীর মহাপুরুষ সেই ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণ ছিলেন।

ব্রহ্মচারী বাবা নিজে বলে গেছেন, আমি হিমালয় পর্বত হতে নেমে নিম্নভূমিতে এসে একটি ফুলের বাগান তৈরি করে গেলাম। সময়ে এই বাগানে এক একটি ফুল ফুটবে। আর সেই ফুলের গন্ধে জগৎ আমোদিত হবে।

ব্রহ্মচারীবাবার দেহত্যাগের পর এক অলৌকিক ঘটনা ঘটে মথুরা-মোহনের জীবনে। একবার তিনি বিশ্বনাথ দর্শনের জন্য কাশীধামে যান। সেখানে গিয়ে এই মহাতীর্থে বাবা লোকনাথ ব্রহ্মচারীকে সশরীরে দর্শন করার একান্ত ইচ্ছা জাগে মনে। কিন্তু তখন তা সম্ভব নয় জেনে সে বাসনা মনের মধ্যেই চেপে রেখে দিলেন তিনি।

একদিন সন্ধ্যার সময় বিশ্বনাথের সন্ধ্যারতি দেখার জন্য মন্দিরে গেলেন মথুরামোহন। কিন্তু প্রবেশদ্বারে অতিশয় ভিড় থাকায় ভিতরে ঢুকতে পারলেন না। তাই বাইরেই করজোড়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

এমন সময় সহসা অনুভব করলেন, কে যেন তাঁর হাত ধরে টানছেন। তাকিয়ে দেখলেন, বাবা লোকনাথ। ঘটনাটি যেমন আকস্মিক, তেমনি অপ্রত্যাশিত। তাই বিস্ময়ের আবেগে অভিভূত হয়ে পড়লেন মথুরামোহন।

আবেশ কাটবার পর দেখলেন, লোকনাথবাবা তাঁর হাত ধরে মন্দিরের ভিতরে নিয়ে গেলেন। তাঁকে দেখে সকলেই পথ ছেড়ে দিলেন। বাবা লোকনাথের দিব্যকান্তি দর্শন করে মন্দিরের বিশ্বনাথের কথা ভুলে গেলেন মথুরামোহন। তিনি আনন্দে বিভোর হয়ে উঠলেন। অন্তর্যামী মহাপুরুষ বাবা যে এমন অপ্রত্যাশিতভাবে তাঁর মনের গোপন বাসনাটিকে পূরণ করবেন, তা তিনি কল্পনাও করতে পারেন নি। বাবার চরণে প্রণত হয়ে তাঁর চরণ স্পর্শ করে তাঁর পদধূলি মাথায় নিলেন।

এদিকে আরতি শেষ হয়ে গেলে বাবা আবার মথুরামোহনের হাত ধরে মন্দিরের বাইরে নিয়ে এলেন। তারপর তাঁর বাড়ির পথে অন্ধকার গলির মধ্যে পথ চলতে চলতে একসময় অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

আর একবার কাশীধামে বাবা লোকনাথের কৃপালাভ করেন মথুরামোহন। তিনি সেখানে একটি বাড়ি কেনার সময় দুতিনটি বাড়ির মধ্যে কোনটি কিনবেন সে বিষয়ে চিন্তিত হয়ে পড়েন। তিনি ভেবে পান না কোন বাড়িটি মঙ্গলজনক হবে তাঁর পক্ষে।

এমন সময় একদিন সহসা আকাশপথে আবির্ভূত হলেন লোকনাথবাবা। তারপর একটি বাড়ির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বললেন, আচ্ছা হ্যায়।

মথুরামোহন এই নির্দেশের অর্থ বুঝতে পেরে সেই বাড়িটিই কেনেন।

হরিচরণ চক্রবর্তী ঢাকার জজকোর্টে ওকালতি করতেন। এই ওকালতিতে তিনি বিশেষ প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন। স্বভাবতই তিনি ঈশ্বর-অনুরাগী ও ঈশ্বরপরায়ণ ছিলেন। ক্রমে তাঁর মধ্যে আধ্যাত্মিক জ্ঞানের উদয় হয়। তিনি বুঝতে পারেন, জন্মমৃত্যুর চক্র হতে মুক্তি পেতে হলে শুধু ঈশ্বরের ভজনা করলেই হবে না। চাই প্রকৃত সদ্গুরুর কৃপা ও আশীর্বাদ।

এই সময় প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর দ্বারা ঢাকার সর্বত্র বাবা লোকনাথের অলৌকিক যোগশক্তি ও মহিমার কথা প্রচারিত হয়। তা শুনে তাঁর প্রতি প্রবলভাবে আকৃষ্ট হন হরিচরণ। সদ্গুরু লাভের আশায় তিনি ছুটে আসেন একদিন বারদীর আশ্রমে।

বারদীর বাবা লোকনাথকে দর্শন করেই বাবার আকর্ণ বিস্তৃত অপলক

চোখদুটির উপর দৃষ্টি পড়ল তাঁর। দেখলেন, সে চোখের মধ্যে এক অলৌকিক তেজ ও দ্যুতি স্তব্ধ হয়ে আছে। তা দেখার সঙ্গে সঙ্গে তার অন্তরে জাগল অদ্ভুত এক আলোড়ন।

হরিচরণ বুঝতে পারলেন, এই সেই পুরাণ পুরুষ বাবা লোকনাথ ব্রহ্মচারী। যেন বেদের এক সত্যদ্রষ্টা ঋষি কায়াগ্রহণ করে মর্ত্যলোকের এই আশ্রমে এসে অবস্থান করছেন। কিন্তু এতদিন কেটে গেছে, তিনি এই মহাপুরুষটিকে চিনতে পারেন নি। তিনি সত্য মিথ্যার দ্বন্দ্বে ভরা এই জগতেই রয়ে গেছেন।

বাবা লোকনাথের চরণে সম্পূর্ণরূপে নিজেকে সঁপে দিলেন হরিচরণ। তাঁর এই সমর্পণের মধ্যে যে নিষ্ঠা ও শুদ্ধভাব ছিল তা লক্ষ্য করে প্রসন্ন হলেন নররূপী হরি লোকনাথ। ভক্তের জন্মান্তরের মোহঘোর কাটাবার জন্য দীক্ষা দান করলেন হরিচরণকে। তাঁকে শিষ্যরূপে স্বীকার করলেন। সেই সঙ্গে সমস্ত দ্বন্দ্ব ও সংশয়ের ঊর্ধ্বে পরম সত্য ও আধ্যাত্মিক আনন্দ লাভের উপায়স্বরূপ যোগসাধনার পথ নির্দেশ করে দিলেন সদগুরু লোকনাথ।

অল্পদিনের মধ্যেই হরিচরণের গুরুভক্তি দেখে প্রসন্ন হলেন বাবা লোকনাথ। তাই তিনি তাঁর ব্যবহৃত পাদুকাদুটি দান করলেন হরিচরণকে। তা পেয়ে হরিচরণের মনে হলো, সাক্ষাৎ হরির চরণ লাভ করেছেন তিনি, যা সকল যোগী ও ঋষির দুর্লভ কাম্যবস্তু। তাঁর 'হরিচরণ' নাম সার্থক হলো আজ।

হরিচরণ আজীবন সেই পাদুকাদুটি পরম ভক্তি ও নিষ্ঠার সঙ্গে বিগ্রহের মত পুজো করে যান। পরবর্তীকালে তাঁর সহধর্মিণী ঐ পাদুকাযুগল কাশীধামের নারদ ঘাটের কাছে একটি বাড়িতে প্রতিষ্ঠা করে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত পুজো করে যান।

বাবা লোকনাথ প্রথম তাঁর ব্যবহৃত পাদুকা দিয়েছিলেন তাঁর প্রাণপ্রিয় জীবনকৃষ্ণ গোস্বামীজীকে। আজ হরিচরণও সেই একই কৃপালাভ করলেন। তিনি এর দ্বারা প্রমাণ করলেন, গৃহী হয়েও গুরুভক্তি ও সাধননিষ্ঠার দ্বারা সদ্‌গুরুর চরণ লাভ করা যায়।

একবার হরিচরণের পুত্র সত্যচরণ এক দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হন।

তিনি প্রাণসংকটে পড়েন। ক্রমাগত দীর্ঘকাল রোগে ভুগে ভুগে উত্থানশক্তি হারিয়ে ফেলেন তিনি। তাঁর রোগজীর্ণ ও শীর্ণ দেহটি বিছানার সঙ্গে যেন মিশিয়ে যায়।

তখন হরিচরণ ঠিক করলেন, মৃতপ্রায় ছেলেকে বারদীর আশ্রমে নিয়ে গিয়ে গুরুর চরণে সঁপে দেবেন। তিনি যা করার করবেন। গুরু লোকনাথের অসামান্য যোগশক্তিতে অগাধ বিশ্বাস ছিল হরিচরণের। তাই তিনি ডাক্তারী চিকিৎসা একেবারে বন্ধ করে দিয়ে ছেলেকে নিয়ে বারদী যাত্রা করলেন।

আশ্রমে উপস্থিত হয়ে হরিচরণ মৃতপ্রায় ছেলেটিকে বাবা লোকনাথের চরণের কাছে শুইয়ে দিলেন। তার উঠে বসার ক্ষমতা নেই। হরিচরণ বাবাকে প্রণাম করে বললেন, বাবা এবার আপনি দয়া করে যা করার করুন। আমরা তো সব চেষ্টা করেই দেখলাম।

বাবা লোকনাথ একবার মুমূর্ষু ছেলেটির দিকে দৃষ্টিপাত করে বললেন, সত্যচরণ তুই ত ভাল হয়ে গেছিস। তুই উঠে একবার চলাফেরা কর।

বাবা লোকনাথের এই অমোঘ বাক্য মুহূর্তে প্রাণসঞ্চার করল মৃতপ্রায় সত্যচরণের দেহে। সে যন্ত্রচালিতের মত তৎক্ষণাৎ প্রথমে উঠে বসল! তারপর আশ্রমের সারা উঠোনময় চলাফেরা করতে লাগল সুস্থ মানুষের মত। সঙ্গে সঙ্গে সব রোগ চলে গেল তার দেহ থেকে।

এইভাবে কেবল একটি বাক্য দ্বারা ভয়ঙ্কর প্রাণসংকট থেকে সত্যচরণকে মুক্তি দান করলেন বাবা লোকনাথ।

গৃহী সাধক ও নিষ্ঠাবান ভক্ত হরিচরণকে খুবই স্নেহ করতেন বাবা লোকনাথ। তাঁর পরিবারের সকলের প্রতিই তাঁর ছিল অসীম কৃপা।

একবার হরিচরণের কনিষ্ঠ পুত্র সারদাচরণের কঠিন ব্যাধি হয়। সারদাচরণ তখন বয়সে বালকমাত্র। সারদাচরণকে খুবই স্নেহ করতেন বাবা লোকনাথ।

সারদার ব্যাধি কোন চিকিৎসায় না সারায় হরিচরণ তাকে বাবা লোকনাথের কাছে নিয়ে গেলেন। এবার রোগমুক্তির জন্য অদ্ভুত লীলা প্রদর্শন করলেন নররূপী ভগবান বাবা লোকনাথ। তিনি সারদাচরণকে

বললেন, তোর রোগ সারাবার ভার আমি তোকেই দিচ্ছি সারদাচরণ। তুই যা হোক একটা ওষুধ বেছে আন। যা তোর মন চায়।

এই কথা শুনে সারদাচরণ বালকসুলভ চপলতার সঙ্গে নিকটবর্তী একটি গাছের লতা ছিড়ে তারই একটা অনন্ত বানিয়ে তার বাহুতে ধারণ করল। অনন্ত বাহুতে পরার এক রকম গয়না।

মহাপুরুষ বাবা লোকনাথের অমোঘ ইচ্ছাশক্তিবলে সঙ্গে সঙ্গে রোগমুক্ত হয় সারদাচরণ। এইভাবে দুইভাই এর দুইটি রোগ সারাবার ব্যাপারে দুটি লীলা প্রদর্শন করেন বাবা লোকনাথ। একটিতে তার অমোঘবাক্য আর একটিতে তাঁর অমোঘ ইচ্ছাশক্তি সাক্ষাৎ ধনন্তরির মত কাজ করে।

বাবা লোকনাথ একটা কথা প্রায়ই বলতেন, কোন শরণাগত তাঁর কাছে এসে প্রার্থনা করলে তাঁর দয়া হয় আর ঐ দয়ার মধ্য দিয়ে তাঁর একটা শক্তি প্রবাহিত হয়ে শরণাগতকে রোগ বা সংকট হতে মুক্ত করে।

এই কথার সত্যতা শুধু তাঁর জীবনকালেই যে অসংখ্য শরণাগতের জীবনে প্রমাণিত হয় তা নয়, তাঁর মহাপ্রয়াণের পরেও কত মানুষ তাঁকে আকুলভাবে স্মরণ করামাত্রই তাঁর অমর সর্বব্যাপী আত্মার মধ্যে দয়া জাগে। আর দয়া হলেই সেই দয়ার মধ্য দিয়ে তাঁর অলৌকিক শক্তি প্রবাহিত হয়ে তাদের সংকটমুক্ত করে।

একদিন লীলা আস্বাদনের এক অদ্ভুত ইচ্ছা জাগে যোগেশ্বর বাবা লোকনাথের মনে। তিনি তখন ভক্ত হরিচরণকে বললেন, হরিচরণ, আজ আমি কল্পতরু হলাম। আমার নিকট হতে যা ইচ্ছা গ্রহণ করতে পার।

এমন দুর্লভ সৌভাগ্য খুব কম ভক্তের জীবনেই ঘটে। বহু জন্মের তপস্যা বলেই তা একমাত্র সম্ভব। নররূপী ভগবান আজ কল্পতরু হয়ে বর দান করতে চেয়েছেন ভক্তকে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যে কোন ঐশ্বর্য একবার চাইলেই পাওয়া যাবে।

বাবার এই কথা শুনে ভাবতে লাগলেন হরিচরণ। তিনি জানেন তাঁর ও তাঁর ধর্মপত্নীর কাছে গুরুদেবের অদেয় কিছুই নেই। তিনি ভাবলেন, মানবজীবনের সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি শ্রীগুরুচরণ। তা ত তিনি না চাইতেই পেয়েছেন। গুরুর কৃপায় তিনি সতত পরমানন্দে লীন হয়ে সংসারে

বিচরণ করছেন। তাই তিনি ভেবে পেলেন না, এই পার্থিব জগতে আর কি ঐশ্বর্য আছে যা তিনি গুরুর কাছে চাইবেন।

অবশেষে হরিচরণ ও তাঁর স্ত্রী দুজনেই সাষ্টাঙ্গ প্রণত হয়ে গুরুদেবের চরণ বন্দনা করলেন। তারপর হরিচরণ বললেন, তোমার প্রসন্নতাই আমাদের একমাত্র কাম্য। তোমার যা খুশি দাও।

এই কথায় প্রসন্ন হলেন বাবা লোকনাথ। তিনি বুঝলেন, গুরু ভক্তিই একমাত্র মানুষকে শুদ্ধসত্ত্ব ও পবিত্র করে তুলতে পারে। তাকে পরমসত্য ও আনন্দের অধিকারী করে তুলতে পারে। এই আনন্দের কাছে ইন্দ্রিয়সুখ ও পার্থিব জগতের সব ঐশ্বর্য ম্লান হয়ে যায়। তাই হরিচরণের কাছে গুরুভক্তি ও গুরুর প্রসন্নতাই একমাত্র কাম্য।

হরিচরণের মনের এই কামনার কথা জানতে পেরে তাঁকে সজ্ঞানে ব্রহ্ম-চিন্তা করতে করতে সংসারাশক্তিবিহীন অবস্থায় দেহত্যাগ করার বর দান করলেন।

ওঁ

নিঃস্বার্থভাবে দান করতে পারলে আধ্যাত্মিক রূপান্তর ঘটে দাতার মনোজগতে। কিন্তু দান সম্পর্কে ভক্ত শিষ্যদের সতর্ক করে দিতেন বাবা লোকনাথ। তিনি বলতেন, দান করো, কিন্তু দানের অহঙ্কারকে পরিত্যাগ করো। এই পবিত্র সাত্ত্বিক দানের ভাব প্রভুর কৃপাকে আকর্ষণ করে আনে দাতার কাছে। এই দান তাকে কেবল পার্থিব ভোগ্যবস্তুই দান করে না, তার আধ্যাত্মিক জাগরণের পথকে সহজ করে তোলে।

যিনি ঈশ্বর তিনি সতত স্বয়ংসম্পূর্ণ। মহাশূন্য মহাচৈতন্যময় ব্রহ্মাণ্ড ব্রহ্মভূত মহাপুরুষ বাবা লোকনাথ ছিলেন স্বয়ংসম্পূর্ণ। জাগতিক কোন আকাঙ্ক্ষাই ছিল না তাঁর মধ্যে। তবু মাঝে মাঝে ভক্তের কাছে তিনি হাত পেতে কিছু চাইতেন। ভক্ত হাতে তুলে কিছু দিলে তিনি শিশুর মত মহানন্দে অভিভূত হয়ে উঠতেন। ভক্তের উপর কৃপাবর্ষণ করার জন্যই এ লীলা তিনি করতেন। এ এক বড় মধুর লীলা।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ভক্তদের বলতেন, আমাকে একটু প্রাণের ছোঁয়া দিয়ে আন্তরিকভাবে পত্র, পুষ্প, ফল, জল যা দেবে, আমি তাই গ্রহণ করব।

তেমনি ভগবান লোকনাথবাবাকে আপন জ্ঞান করে আন্তরিকভাবে ভক্ত কিছু দিলে তাতে সন্তুষ্ট হতেন তিনি। ভক্ত লাভ করত তাঁর প্রসাদ। কিন্তু ভক্ত কিছু দিয়ে তাঁকে ধন্য করত না, ভক্ত নিজেই ধন্য হত।

বাবা লোকনাথের জীবন ও আচরণ লক্ষ্য করলে আমরা দেখতে পাই, একমাত্র ভক্তের আর্তি ও প্রার্থনার মধ্য দিয়েই তাঁর যোগবিভূতি প্রকাশ পেত। তাঁর অবস্থা একটি বৃক্ষের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। বৃক্ষ কখনো নিজের ইচ্ছায় আন্দোলিত হতে পারে না। বাতাস বইলেই তার শাখা প্রশাখা ও পাতার মধ্যে একটা ক্রিয়া দেখতে পাই।

তেমনি ইচ্ছা অনিচ্ছার অতীত মহাযোগী বাবা লোকনাথের নিজস্ব কোন অভাববোধজনিত ইচ্ছা অনিচ্ছা ছিল না। ঈশ্বরের পরম অস্তিত্বের সঙ্গে যুক্ত হয়ে তিনি সর্বদাই সমাধিস্থ অবস্থায় অবস্থান করতেন। তবু আমরা সাধারণ মানুষের মত ইচ্ছা অনিচ্ছার খেলা দেখতে পাই তাঁর মধ্যে। কিন্তু তাঁর সে ইচ্ছা ভক্তের ইচ্ছারই প্রতিধ্বনি মাত্র। ভক্তদের ছোট বড় আশা আকাঙ্ক্ষা ও সুখ দুঃখের ভাবগুলি প্রতিফলিত হত তাঁর মধ্যে। একই সঙ্গে জাগতিক কর্মের মধ্য দিয়ে তাঁর পার্থিব দেহ পার্থিব জগতের সঙ্গে যুক্ত থাকত, আবার উচ্চতর আধ্যাত্মিক চৈতন্যযুক্ত তাঁর আত্মা সমাধির গভীরে নিমজ্জিত থাকত।

এ অবস্থা সাধারণের বুদ্ধিগম্য নয়। উচ্চকোটির সাধক ও যোগীরাই কেবল এ অবস্থার তত্ত্ব ও এই লীলা বুঝতে সক্ষম।

তাঁর দিব্যদেহটি অস্বাভাবিক দীর্ঘ ছিল। এই দেহের মধ্যে চোখ দুটিই সবচেয়ে আকর্ষণীয়। তাঁর দীর্ঘ দেহটি পাথরের মূর্তির মত নিশ্চল নিষ্পন্দভাবে ধ্যানমৌন অবস্থায় উপবিষ্ট থাকত আসনে। সে দেহে মাংস ছিল না বললেই হয়। কিন্তু সেই অস্থিচর্মসার দেহের মধ্যে ছিল এক নবনীত কমনীয়তা, ছিল এক স্নিগ্ধ জ্যোতি। তাঁর হাত পায়ের কোমলতা ও রক্তাভ ছটা একমাত্র শাস্ত্রবর্ণিত ভগবানের অঙ্গলাবণ্য ও অঙ্গ-জ্যোতির সঙ্গেই তুলনা করা যেতে পারে।

বহু বৎসরকালীন যোগসাধনার দ্বারা দেহটিকে অর্থাৎ দেহের প্রতিটি জীবকোষ ও অনুপরমাণুকে দিব্যভাবে রূপান্তরিত করতে পেরেছিলেন বাবা লোকনাথ।

ওঁ

১২৭০ সনে মহাযোগী বাবা লোকনাথ হিমালয় থেকে নিম্নভূমিতে অবতরণ করে ত্রিপুরা হয়ে ঢাকা জেলার অন্তর্গত বারদীগ্রামে পদার্পণ করেন। এর পর থেকে দীর্ঘ ছাব্বিশ বছর ধরে তিনি তাঁর অপরূপ ও অলৌকিক যোগৈশ্বর্য ও লীলারদ্বারা সারা বাংলার অসংখ্য নরনারীকে কৃতার্থ করেন।

বাবা লোকনাথের করুণা অপরিসীম। সেই করুণাধারায় শুধু অসংখ্য মানুষ না, পশুপাখি, কীটপতঙ্গ প্রভৃতি সমস্ত জীব অভিসিঞ্চিত ও কৃতার্থ হয়েছে। পরম করুণাময় মহাযোগী বাবা লোকনাথ দেশ কাল পাত্র বিচার না করে তাঁর অনন্ত করুণা অকাতরে বিতরণ করে গেছেন সকলের মধ্যে।

শরণাগত ব্যক্তিরা তাঁর কাছে যে যা কামনা করেছে সে তাই পেয়ে ধন্য হয়েছে। ধনার্থী পেয়েছে ধন, ধর্মার্থী পেয়েছে ধর্ম, জ্ঞানার্থী পেয়েছে জ্ঞান, বিদ্যার্থী পেয়েছে বিদ্যা, ক্ষুধার্ত পেয়েছে ক্ষুধার অন্ন, নিরাশ্রয় পেয়েছে আশ্রয় আর ব্যাধিগ্রস্ত পেয়েছে ব্যাধি থেকে মুক্তি।

বাবা লোকনাথ ছিলেন অপার্থিব যোগৈশ্বর্যরূপ অক্ষয় অনন্ত ধনের অধিকারী। সে ধন তিনি বারদীর আশ্রমে থেকে বিলিয়ে গেছেন সকলের মধ্যে। তিনি সকলকে আহ্বান করে মাঝে মাঝে বলতেন, তোরা আয়। যে যা পারিস কুড়িয়ে নিয়ে যা।

এইভাবে দীর্ঘ ছাব্বিশ বছর ধরে চলে তাঁর অলৌকিক ভবলীলা। তারপর বাবা অন্তরঙ্গ ভক্ত ও শিষ্যদের কাছে তাঁর ভবলীলা সংবরণের আভাস দিতে থাকেন।

একদিন পশ্চিমদী গ্রামের বাসিন্দা এক বিধবা মহিলা বারদীর আশ্রমে এলেন বাবাকে দর্শন করতে। এই মহিলা বাবার একজন পরম ভক্ত। বাবা তাঁকে মা বলে ডাকতেন।

বাবা তাঁর সঙ্গে কথা বলতে বলতে একসময় বললেন, এ দেহটা একটা পাখির খাঁচা। জানিস মা, ওরা আমাকে মানুষ ভাবে।···কোন ভবরোগী পেলাম না।

এই কথা শুনে মহিলাটি বিস্মিত হয়ে বললেন, বাবা, আপনি কি

বললেন? মানুষ আপনাকে কি ভাবে?

মহিলার কথায় হঠাৎ চমকে উঠলেন বাবা লোকনাথ। তিনি কথাটা ভাবের ঘোরে বলেছিলেন! কি বলেছিলেন সে বিষয়ে তাঁর যেন খেয়াল ছিল না। তাই মহিলার কথায় সম্বিৎ ফিরে পেয়ে নিজেকে সামলে নিলেন। বললেন, ঐ দেখেছিস মা, ভুল হয়ে গিয়েছিল। এই দেহটা যে আছে তা স্মরণ ছিল না।

বাবা লোকনাথের এই কথাটির মধ্যে দুটি অর্থ আছে। প্রথমতঃ এই কথার মধ্য দিয়ে তাঁর ইহলোকের লীলা অবসানের ইঙ্গিত দিয়েছেন। এই নরদেহের প্রতি বিস্মৃতি জন্মালে সে দেহ আর বেশীদিন থাকে না বা থাকতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ ভাবাবিষ্ট অবস্থায় তাঁর মুখ থেকে একটি সত্য কথা বেরিয়ে গেছে যে কথাটি তিনি সচেতনভাবে গোপন রাখতেন। তিনি নিজের অজান্তে বলে ফেলেছেন, লোকে তাঁকে মানুষ ভাবে, কিন্তু আসলে তিনি মানুষ নন, আসলে তিনি নরদেহ ধারণ করে ভবরোগ সারানোর বৈদ্যরূপে এই ধরাধামে অবতীর্ণ হয়েছেন।

জীবন্মুক্ত মহাপুরুষই সাক্ষাৎ নারায়ণ। কারণ তিনি জীবের কল্যাণের জন্য, ধর্ম সংস্থাপনের জন্য মনুষ্যদেহ ধারণ করলেও সাধারণ মোহবদ্ধ মানুষের মত দেহাভিমানী নন, দেহাতীত। তিনি পরমাত্মারূপে পরম সত্তায় নিত্যযুক্ত।

একবার কথা প্রসঙ্গে বাবা লোকনাথ তাঁর অন্তরঙ্গ শিষ্য ব্রহ্মানন্দ ভারতীকে বলেছিলেন, আমি মৃত্যুর সময় অতিক্রম করে বেঁচে আছি। এ অবস্থায় আমার মোহনিদ্রা এলেই আমার নিপাত ঘটবে।

তাই কোন ভক্ত বা আশ্রমবাসী কোন শিষ্য তাকে কোন সময়ে চোখের দুটি পাতা এক করতে দেখেনি। চোখদুটি তাঁর দিনেরাতে সব সময়ই অপলক থাকত। রাত্রিতে কিছুক্ষণের জন্য বিছানায় জাগ্রত অবস্থায় বিশ্রাম করতেন।

জীবন্মুক্ত বৃদ্ধ পুরুষ মোহান্ধ জীবের উদ্ধারের জন্য শরীরে লীলায় প্রকট হন। আবার কাজ শেষ করে সময় হলেই স্থূল শরীরটিকে স্ব ইচ্ছায় ত্যাগ করে অপ্রকট হন। তখন তিনি সূক্ষ্মভাবে তাদের হৃদয়ে নিত্যযুক্ত

হয়ে লীলা করেন।

প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী বাবা লোকনাথের এই নিত্যসত্তাটি দর্শন করতে পেরেছিলেন। তাই তিনি বলেছিলেন, ব্রহ্মচারীবাবা ইচ্ছাময় পুরুষ। ইচ্ছা করলে তিনি এখনই শরীর ত্যাগ করতে পারেন, আবার অনন্তকাল পর্যন্ত দেহ ধারণ করতে পারেন।

জীবন্মুক্ত পুরুষরূপে প্রকৃতির নিয়মের অতীত সত্তায় অধিষ্ঠিত হয়েও প্রকৃতির নিয়ম তিনি মেনে চলতেন। তা শুধু সত্য রক্ষার জন্য। লোককে শিক্ষা দেবার জন্য।

অবশেষে ১৬০ বছর পর স্বেচ্ছাময় পরমপুরুষ বাবা লোকনাথ বুঝতে পারেন, তাঁর লীলা সংবরণের দিনটি এগিয়ে আসছে। তাই আজকাল যোগসিদ্ধ মরদেহটার অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোন খেয়ালই থাকে না। আজকাল দেহ থেকে 'আলগা' হয়ে প্রায়ই সমাধিতে নিমগ্ন হয়ে থাকেন তিনি।

বাবা তাই ভক্তদের প্রায়ই বলেন, ওরে, আজকাল এই হাড়মাংসের খাঁচাটার কথা মনেই থাকে না। এবার যাবার পালা।

ভক্তদের মনেও সন্দেহ জাগে, তবে কি বাবা আমাদের ছেড়ে চলে যাবেন?

এমন সময় একদিন এক ভক্ত এল আশ্রমে। তার একমাত্র পুত্রসন্তান যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হয়ে মৃতপ্রায় হয়ে পড়েছে। কোন চিকিৎসাতেই সারেনি। ভক্তটির একান্ত বিশ্বাস, একমাত্র বাবা লোকনাথ ছাড়া আর কেউ তার ছেলের রোগ সারাতে পারবে না।

ভক্তটি তাই সেদিন আশ্রমে এসে বাবার চরণদুটি ধরে কাঁদতে লাগল।

তার আকুল প্রার্থনা শুনে করুণাময় বাবা একবার মৃত প্রায় ছেলেটির দিকে তাকিয়ে বললেন, তোর সন্তানের যে প্রারব্ধ ফুরিয়েছে। ওকে যে আর বাঁচিয়ে রাখা যাবে না।

কিন্তু মায়ামুগ্ধ পিতার বিশ্বাস হলো না এ কথায়। কারণ ছাব্বিশ বছর ধরে অগণিত ভক্তের সঙ্গে সে নিজেও দেখেছে, যে রোগ শিবের অসাধ্য, এই পরমপুরুষের কৃপাকটাক্ষে এক মুহূর্তে তা সেরে গেছে।

তাই অকুণ্ঠ বিশ্বাসের সঙ্গে ভক্তটি বাবার কৃপায় অপার লীলামাহাত্ম্যের কথা বলে যেতে থাকে। সে বলল, তুমি চাইলে অসম্ভবও সম্ভব হবে।

অবশেষে করুণাময় বাবার হৃদয় বিগলিত হলো। তিনি বললেন, ঠিক

আছে, তোর সন্তানের রোগ আমি আমার শরীরে গ্রহণ করলাম। তোরা ফিরে যা।

ছেলেটি সঙ্গে সঙ্গে যক্ষ্মারোগ থেকে মুক্তি পেল। সে সম্পূর্ণ সুস্থ হলো। এদিকে তার রোগ নিজ শরীরে গ্রহণ করে কষ্ট পেতে লাগলেন বাবা।

কিন্তু বাবার বাক্য অমোঘ। তাঁর ভবিষ্যৎ বাণী কখনো বৃথা যায় না। তাই দেখা গেল, ছেলেটি তখনকার মত যক্ষ্মারোগ থেকে আরোগ্য লাভ করলেও কয়েকমাস পর হঠাৎ তার মৃত্যু হলো! বাবা আগেই বলেছিলেন, ওর সময় ফুরিয়েছে। ওকে যেতে দে।

স্বেচ্ছাময় জীবন্মুক্ত যোগসিদ্ধ মহাপুরুষের পক্ষে সব কিছুই সম্ভব। তাঁর দিব্যশরীরে ছেলেটির ব্যাধিগ্রহণ বাবা লোকনাথের এক লীলামাত্র।

এর আগেও ত কতবার বাবা লোকনাথ কত শরণাগত ভক্তের কত দুরারোগ্য ব্যাধি স্বেচ্ছায় নিজ শরীরে গ্রহণ করে তা ভোগ করেছেন। কিন্তু সে ভোগ ছিল নিতান্ত সাময়িক। সে ভোগের কথা কেউ জানতে পারেনি। তার জন্য কোন বিকার দেখা যায়নি তাঁর দেহে। দু একদিন একটু কষ্ট ভোগ করেই সুস্থ হয়ে উঠেছেন তিনি। তাঁর অমিত যোগশক্তি ও অমোঘ ইচ্ছাশক্তির প্রভাবে এর আগে সব দুরারোগ্য ব্যাধিকে আত্মসাৎ করে নিয়েছেন তাঁর দিব্যদেহের মধ্যে।

কিন্তু এবার তার ব্যতিক্রম ঘটল। এবার তিনি তাঁর অতি পুরাতন পার্থিব দেহটি ত্যাগ করার এক লৌকিক হেতু হিসাবেই ইচ্ছা করে এই ব্যাধি গ্রহণ করলেন। সে ব্যাধির প্রকোপকে নষ্ট করার জন্য কোন যোগ-শক্তি প্রয়োগ করলেন না ইচ্ছা করে। এবার যক্ষ্মারোগের প্রাণান্তক লক্ষণ-গুলি ফুটে উঠল তাঁর দেহে। ভয়ংকর কাশি ও সর্বশরীরে কষ্ট দেখা দিল।

দেহটি অবনতির পথে এগিয়ে গেলেও বাবার মধ্যে কোন বিকার নেই। সমস্ত রোগযন্ত্রনাকে জয় করে আকাশের মত নির্বিকার ভাবে অবস্থান করে যেতে লাগলেন। যেন কিছুই হয়নি। এইভাবে ভবলীলা সাঙ্গ করে নিত্যলীলায় গমণের জন্য প্রস্তুত হয়ে উঠতে লাগলেন মনে মনে।

মহাপ্রয়াণের আটদিন আগে হঠাৎ একদিন উপস্থিত ভক্তদের কাছে

এক প্রশ্ন করে বসলেন বাবা লোকনাথ। তিনি বললেন, আচ্ছা, তোরা বল দেখি, দেহের পতন হলে কিভাবে দেহের সৎকার করা উচিত ?

একথা শুনে ভক্তদের মধ্যে কেউ কেউ বললেন, অগ্নিদ্বারা সৎকার করা উচিত অর্থাৎ দেহটি আগুনে পুড়িয়ে ফেলা উচিত।

আবার কেউ কেউ বললেন, সমাধি দেওয়া উচিত।

আবার কোন কোন ভক্ত বললেন, পবিত্র জলে ভাসিয়ে দেওয়া উচিত।

একথা শুনে বাবা লোকনাথ বললেন, এ ছাড়াও সন্ন্যাসীদের আর এক রকম ব্যবস্থা আছে। তা হলো কোন প্রান্তরে ঐ শব ফেলে দেওয়া যাতে পশুপাখি তা আহার করতে পারে। যাক এসব কথা। এখন বল ত, এই চার রকমের সৎকারের মধ্যে কোন উপায়ে দেহ শীঘ্র লয়প্রাপ্ত হয় ?

ভক্তরা বললেন, আগুনে পোড়ালেই দেহ শীঘ্র লয় পায়।

তখন বাবা বললেন, শোন তাহলে। আমি দেহত্যাগ করলে আমার দেহ তোরা আগুনেই পোড়াবি। আর শোন। উত্তরায়ণে দিনের বেলায় সূর্য যখন নির্মল আকাশে কিরণ দেবে তখনই আমি এ দেহ ত্যাগ করব। সূর্যরশ্মি অবলম্বন করে আমি ব্রহ্মলোকে চলে যাব। আর প্রলয়কাল পর্যন্ত সেখানে অপেক্ষা করে প্রলয়ের সময়ে আমি ব্রহ্মার সঙ্গে লীন হব।

একথা শুনে উপস্থিত ভক্তেরা হতবাক হয়ে গেলেন। তাঁদের চোখে জল এল। বাবার আসন্ন বিচ্ছেদ বেদনায় কাতর হয়ে উঠলেন তাঁরা সবাই।

তা লক্ষ্য করে বাবা লোকনাথ বললেন, চোখের জল মুছে ফেল। জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে বিপদে পড়লে আমায় স্মরণ করবি, যে যখনই আমাকে স্মরণ করবে আমি তখনই তার কাছে উপস্থিত হব।

বাবা লোকনাথ তাঁর মহাপ্রয়াণের পর তাঁর গন্তব্যস্থল সম্বন্ধে যা বললেন তাতে তাঁর ব্রহ্মালোকপ্রাপ্তির কথাই বোঝা যায়।

ছান্দোগ্য উপনিষদে ব্রহ্মালোকপ্রাপ্তির প্রণালী ও সময় সম্বন্ধে বিশদ বিবরণ দেওয়া আছে। তাতে বলা হয়েছে, সূর্যদেব তাঁর উদয় ও অস্ত গমনদ্বারা সমস্ত প্রাণীর কর্মফলজনিত ভোগসকল দান করেন। সূর্যদেব মানুষের কর্ম অনুযায়ী তার জীবন ধারণের উপযোগী ভোগ্য বস্তু দান করেন। মানুষের কর্মভোগ শেষ হলে সূর্য উদিতও হন না, অস্তগমনও করেন না। তখন কোন প্রাণী না থাকায় সূর্য আকাশের মধ্যস্থলে

অবস্থান করেন।

একবার ব্রহ্মলোক থেকে ফিরে আসা এক যোগীপুরুষকে এক পণ্ডিত ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করলেন, আচ্ছা, এখানে যেমন সূর্যদেব উদয়াস্তদ্বারা আমাদের কর্মফল দান করে আমাদের আয়ুক্ষয় করেন, ব্রহ্মলোকেও কি তিনি তেমনটিই করে থাকেন ?

এই প্রশ্ন শুনে যোগীপুরুষ উত্তর করলেন, ব্রহ্মলোকে উদয়াস্ত নেই। সেখানে সূর্যদেব কখনো অস্তও যান না, উদিতও হন না। সেখানে সব সময়ই দিন।

এর থেকে বোঝা যায়, যাঁর কর্মফল শেষ হয়ে গেছে, তিনি ক্ষয়িত কর্মযোগী। তিনি ব্রহ্মলোকের অধিকারী।

তাই ত ক্ষয়িত কর্মযোগী বাবা লোকনাথ বলেছেন, দেহত্যাগের পর আমি সূর্যরশ্মি অবলম্বন করে ব্রহ্মলোকে যাব।

তাই ত ভক্তযোগী রামপ্রসাদ এই মর্ত্যভূমিতেই চির উজ্জ্বল ব্রহ্মলোকের অবস্থা প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করে একটি গানে বলেছেন।

যে দেশে রজনী নেই মা, সেই দেশের এক লোক পেয়েছি।

আমার কিবা দিবা, কিবা সন্ধ্যা, সন্ধ্যাকে বন্ধ্যা করেছি।

আবার ছান্দোগ্য উপনিষদে ক্ষয়িত কর্মযোগীরা কিভাবে ব্রহ্মলোকে যান তার পথ নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই ব্রহ্মলোক সূর্য রশ্মিরও অতীত। ব্রহ্মবিদদের দেহত্যাগের পর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া হোক বা না হোক, তাঁরা অর্চিতে বা জ্যোতিতে গমন করেন। অর্চি থেকে দিবসে, দিবস থেকে শুক্লপক্ষে, শুক্লপক্ষ থেকে উত্তরায়ণের ছ'মাস, সে ছ'মাস থেকে সম্বৎসরে, সম্বৎসর থেকে আদিত্যে, আদিত্য থেকে চন্দ্রমাতে, চন্দ্রমা থেকে তাঁরা বিদ্যুতে গমন করেন। তখন সেই বিদ্যুৎলোকে অবস্থিত এক অমানব পুরুষ তাঁদের ব্রহ্মলোকে নিয়ে যান।

এই হলো দেবযান বা দেবপথ, এই হলো ব্রহ্মপথ। এ পথে গমন করলে আর তাঁদের সংসাররূপ আবর্তে ফিরে আসতে হয় না।

যাঁরা পঞ্চাগ্নি বিদ্যা জানেন, আর যাঁরা অরণ্যে শ্রদ্ধা ও তপস্যার উপাসনা করেন, তাঁরা দেহত্যাগের পর অর্চিতে গমন করেন। তারপর ক্রমে ক্রমে দেবযান পথ অতিক্রম করে ব্রহ্মলোকে গমন করেন। তাঁরা এই ব্রহ্ম-

লোকে গমন করে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করে চিরকাল বাস করেন সেখানে। সেখান থেকে আর তাঁদের পুনরাবর্তন হয় না।

যে সব সাধক ও যোগীর ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়, তাঁরা সকলেই ঐ দেবযান অবলম্বন করে ব্রহ্মালোকে গমন করতে পারেন। তখন ঐ অর্চি, দিন, শুক্লপক্ষ, উত্তরায়ণ প্রভৃতি এক একটি পথপ্রদর্শক দিব্যপুরুষ হয়ে ব্রহ্মজ্ঞানীকে আপন আপন অধিকৃত ভূমি দান করেন।

ঐ দেবযানপথে গমনের নাম উৎক্রান্তি। ব্রহ্মজ্ঞানিগণের প্রাণ ও চিত্তাদিসহ ব্রহ্মালোকে উৎক্রান্তি হয়।

শংকরাচার্য বলেছেন, যাঁরা জ্ঞানমার্গের নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসক, তাঁদের ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হলে ঐভাবে উৎক্রান্তি হয় না। অর্থাৎ দেবযানপথে গমন করে ব্রহ্মালোকে যাওয়ার দরকার হয় না। কারণ তাঁদের প্রাণাদি এখানে থেকেই ব্রহ্মেতে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। এই হলো চরম বা আত্যন্তিক মুক্তি বা নির্বাণ।

কিন্তু যাঁরা সগুণব্রহ্মের উপাসক, তাঁদেরই প্রাণাদিসহ ব্রহ্মালোকে উৎক্রান্তি হয়। এই ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি হলো আপেক্ষিক মুক্তি। তাঁরা প্রলয়কাল পর্যন্ত ব্রহ্মালোকে অবস্থান করে কল্পান্তে অর্থাৎ মহাপ্রলয়ে ব্রহ্মার সঙ্গে লীন হন।

পৃথিবী থেকে তৃতীয় স্বর্গে ব্রহ্মালোকে অর ও ণ্য নামে দুটি সমুদ্র আছে। যেখানে ঐরাম্মদীয় নামে অন্নময় এক সরো বর আছে। আছে সোমরসস্রাবী এক অশ্বত্থবৃক্ষ আর অপরাজিতা নামে এক ব্রহ্মের পুরী ও ব্রহ্মানির্মিত এক হিরন্ময় বা সুবর্ণময় মণ্ডপ। যাঁরা ব্রহ্মচর্য দ্বারা ব্রহ্মালোকে অবস্থিত অর ও ণ্য নামে দুটি অর্ণব বা সমুদ্রকে প্রাপ্ত হন, তাঁদেরই ব্রহ্মালোকপ্রাপ্তি হয়।

যিনি ব্রহ্মচর্যে সিদ্ধ হয়ে হৃদয়পদ্মস্থিত ব্রহ্মের উপাসনা করেন, তিনি দেহত্যাগ করলে মুখাভিমুখে প্রসারিত সুষুম্না নাড়ী অবলম্বন করে ঊর্ধ্বদিকে গমন করেন। হৃদয়পদ্মস্থিত নাড়ীগুলি আদিত্যের সঙ্গে সম্পর্ক থাকার জন্য পিঙ্গল, শুক্ল, নীল, পীত ও লোহিতবর্ণের সূক্ষ্মরস দ্বারা পরিপূর্ণ।

যিনি যোগবলে ব্রহ্মরন্ধ্রস্থিত সুষুম্না নাড়ীদ্বারা উৎক্রমণ পদ্ধতি জানেন,

তিনি সুষুম্না নাড়ী অবলম্বন করে ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করে সূর্যমণ্ডলে প্রবেশ করেন। তারপর ক্রমশঃ ব্রহ্মলোকে গমন করেন।

একেই বলে ভগবৎ সাযুজ্যলাভ।

বাবা লোকনাথ উত্তরায়ণে দিনের বেলায় দেহত্যাগ করার সংকল্প করেন।

গীতায় ভগবান কৃষ্ণ বলেছেন, যে মার্গে দিন শুক্লবর্ণ অগ্নিতুল্য প্রভাময় ও ছয়মাস উত্তরায়ণ, সেই মার্গে সগুণব্রহ্মের উপাসকগণ গমন করলে শেষে ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন।

তাছাড়া বাবা লোকনাথ পঞ্চাগ্নি বিদ্যার সম্যক পরিচয় জানতেন বলেই বলেছিলেন, দেহত্যাগের পর তাঁর দেহ যেন অগ্নিতে দাহ করা হয়। তিনি জানতেন, অগ্নি থেকেই তিনি এসেছেন এবং অগ্নি থেকেই উৎপন্ন হয়েছেন। তাই যে দেহ অগ্নি থেকে উদ্ভূত হয়েছে, সে দেহের অগ্নিতেই লীন হওয়া উচিত।

ওঁ

বাবা লোকনাথের মহাপ্রয়াণের আগের দিন রাত্রিতে এক অলৌকিক ঘটনা ঘটে। প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী তখন বৃন্দাবনধামে ছিলেন। সেদিন ছিল ১২৪৭ সালের ১৮ই জ্যৈষ্ঠ।

সেদিন সন্ধ্যার সময় বিজয়কৃষ্ণ বৃন্দাবনে তাঁর আসনে বসেছিলেন। হঠাৎ এক পরিচিত কণ্ঠস্বর শুনে চমকে উঠলেন তিনি। কে যেন তাঁকে বলল, জীবনকৃষ্ণ, আমি এসেছি তোর কাছে।

এ কথা শুনে অপার বিস্ময়ে চমকে উঠলেন গোঁসাইজী। একমাত্র বারদীর ব্রহ্মচারী বাবা ছাড়া এ নামে তাঁকে আর কেউ ডাকে না।

বিজয়কৃষ্ণ তাঁর সামনে তাকিয়ে দেখলেন, বারদীর বাবা লোকনাথ ব্রহ্মচারী তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে।

গোঁসাইজী তখন দারুণ বিস্ময়ে বিহ্বল হয়ে বাবা লোকনাথের চরণ স্পর্শ করে জিজ্ঞাসা করলেন, কোন খবর না দিয়েই এভাবে এখানে এলেন?

বাবা লোকনাথ বললেন, জীবনকৃষ্ণ, আমি আগামী কালই দেহত্যাগ করব। তুই আমার বারদীর আশ্রমে গিয়ে বোস। ঐ আসনে বসবার মত

তোকে ছাড়া আর কাউকেই দেখতে পাচ্ছি না।

একথা শুনে গোঁসাইজী বললেন, আমার এখন বৃন্দাবনধাম ছেড়ে যাবার যো নেই। এখানে এক বছর থাকব বলে সংকল্প করে আসন পেতে রয়েছি।

বাবা লোকনাথ বললেন, তবে আমি এ দেহ ছেড়ে দিই ?

গোঁসাইজী বললেন, আপনার যা ইচ্ছা করুন। আপনার দেহের জন্য আমার এতটুকুও মায়া নেই।

বাবা লোকনাথ বললেন, একথা বলছিস কেন ?

গোঁসাইজী বললেন, আপনি এর মধ্যে অনেক ক্ষতি করেছেন।

লোকনাথবাবা জিজ্ঞাসা করলেন, কি ক্ষতি আমি করেছি বল।

গোঁসাইজী বলতে লাগলেন, আপনি অদ্বৈতবাদ শিক্ষা দিয়ে অনেককেই অদৃষ্ট প্রারব্ধ বলে বলে তাদের মন বিগড়িয়ে দিয়েছেন। তারা সব সাধন ভজন ছেড়ে দিয়ে অন্যরকম হয়ে গেছে। তাদের সংশোধন করা কষ্ট সাপেক্ষ ব্যাপার। তাছাড়া আপনার কথা বুঝতে পারে না। তাই তারা ভুল পথে যাচ্ছে।

সেদিন বারদীর একদল লোক খোল, করতাল, বাতাসা নিয়ে আপনার কাছে গিয়ে বলে, বাবা, আমরা আশ্রমে হরির লুট দিতে এসেছি।

কিন্তু তাদের কথা শুনে আপনি বললেন, এখানে হরি নেই। যেখানে হরি আছে, সেখানে গিয়ে তোরা হরির লুট দে।

আপনার কথায় তারা অসন্তুষ্ট হলে আপনি তাদের বললেন, আমি তোদের হরির মুখে প্রস্রাব করি।

এই কথা শুনে তারা ক্ষুব্ধ হয়ে চলে যায়।

কিছুদিন আগে আমার অন্তরঙ্গ শিষ্য শ্রীধর চন্দ্র ঘোষ আপনার কাছে গেলে আপনি তাকে বলেন, তুই এতদিন গোঁসাইজীর কাছে থেকে কি পেয়েছিস ? যে নিজে অন্ধ, সে কিকরে অন্ধকে পথ দেখাবে ? অন্ধ গুরুর সঙ্গ ছেড়ে দে। ছ' মাস তুই আমার কাছে থাক। তোকে আমি ব্রহ্মজ্ঞান দেব আর উর্ধ্বরেতা করে দেব।

আর একদিন একটি লোক আপনার কাছে গিয়ে বলে, বাবা, আপনি আমাকে আশীর্বাদ করে সংসার করতে বলেছিলেন। কিন্তু আমি এর

ত পারব না, আমার কাম বড় বেশী। বলুন এখন আমি তাহলে কি করি?

তা শুনে আপনি তাকে বলেন, বেশ ত। যদি তা নাই পারিস, কি আর করবি? বেশ্যাগমন কর। ব্যভিচার কর গে।

পরে লোকটি আমার কাছে এসে বলে, বারদীর ব্রহ্মচারী আমাকে বেশ্যাগমন করতে বলেছেন। মহাপুরুষের কথামত তা করলে আমার কখনও পাপ হবে না।

তাহলে বলুন, এসব আপনি কি করছেন? আপনার উপদেশে যে সাধারণ লোকের সর্বনাশ হবে। ধর্মকর্মে সবাই জলাঞ্জলি দেবে। স্বেচ্ছাচারে ব্যভিচারে সমাজ উৎসন্নে যাবে।

মাসকয়েক আগে এক ব্রাহ্ম যুবক আপনার কাছে গিয়ে ঈশ্বর সাকার কি নিরাকার সে বিষয়ে আলোচনা করতে চায়। তার সব কথা শুনে আপনি বলেন, তোর ঈশ্বরের মুখে আমি হাগি, তার মুখে মুতি।

একথা শুনে যুবকটি অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে চলে যায়। দশ জনের কাছে বলতে লাগল, বারদীর ব্রহ্মচারী ভয়ানক পাষণ্ড, নাস্তিক।

এ রকম বহু ঘটনা ঘটেছে। আর তা সমাজের উপকার না করে অপকারই করে চলেছে। তাহলে বলুন, কেন আপনার দেহের জন্য আমার মায়া থাকবে? আপনার ভাব ও ভাষা বুঝতে না পেরে কত লোক বিপন্ন হচ্ছে। যে ভাবে যেমন করে কথা বললে সাধারণ লোকে আপনার যথার্থ ভাব বুঝতে পারে, তেমনটি করে কেন বলছেন না?

এই সব অভিযোগ শুনে ব্রহ্মচারী বাবা বললেন, বটে, এখন কি আমি তাদের ভাষা শিখতে যাব নাকি? ও সব লোক আমার কাছে আসে কেন? আমি ত তাদের ডেকে আনি না। থাক, এসব কথা। এবার তোর অভিযোগগুলি খণ্ডন করছি, শোন।

বারদীর যে সব লোক খোল করতাল, বাতাসা নিয়ে এসেছিল, তারা আমার কথা অমান্য করায় আমি তাদের বলেছিলাম, তোদের হরির মুখে আমি প্রস্রাব করি। একথা শুনে তাঁরা রেগে চলে গিয়েছিল। কিন্তু আমি কোন অশাস্ত্রীয় কথা বলিনি। শাস্ত্রে আছে হরি হাঁ করে যশোদাকে নিজের মুখের মধ্যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড দেখিয়েছিলেন। মহাভারতে বর্ণিত ভগবান কৃষ্ণ অর্জুনকেও মুখের মধ্যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড দেখিয়েছিলেন। আমি

যখন ব্রহ্মাণ্ডের একজন এবং ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যেই প্রস্রাব করে থাকি, তখন হরির মুখে প্রস্রাব করি বলাতে অসঙ্গত বা দোষের কি হয়েছে ?

এ কথার পরে গোঁসাইজী আর কোন কথা বলতে পারলেন না। আসলে লোকগুলি তাদের কপট হরিভক্তি দেখাবার জন্য আশ্রমে হরির লুট দিতে এসেছিল। তাদের অন্তরে কোন ভক্তিভাব ছিল না। বাবা লোকনাথ তা বুঝতে পেরে প্রথমে তাদের বলেছিলেন, যেখানে তোদের হরি আছে, সেখানে গিয়ে হরিরলুট দে। এ কথার তাৎপর্য এই যে, তোদের অন্তরে যখন ভক্তি নেই, তোদের হরি তখন কোথাও নেই। তাই তাঁর আশ্রমে হরির লুট দিলে হরি তা গ্রহণ করবেন না। সত্যিই প্রাণে যদি হরির জন্য ব্যাকুলতা থাকে, অন্তরে যদি ঐকান্তিক ভক্তি থাকে, তবে যে কোন জায়গায় হরির লুট দিলে হরি তা অবশ্যই গ্রহণ করেন।

এরপর বাবা লোকনাথ বললেন, ঐ ব্রাহ্মযুবক নিজেই ত খুব উচু অবস্থার কথা বলেছিল। তাহলে আবার আমার কথা শুনে রাগ করল কেন ? যুবকটি বলল, ঈশ্বর সর্বব্যাপী। তখন আমি বললাম, সেই ঈশ্বরের মুখেই আমি হাগি, আমি মুতি। আচ্ছা তুই বলনা, ঈশ্বর যদি সর্বব্যাপী হন, তাহলে আমি হাগি মুতি কোথায় ?

বাবা লোকনাথ আরও বললেন, শ্রীধরের গুরুভক্তি ও গুরুনিষ্ঠা পরীক্ষা করার জন্যই ওকথা বলেছিলাম তাকে। আমার কথা শুনে সে চেঁচামেচি ও কটূক্তি করতে করতে তার লেংটি খুলে আমার গায়ে ছুঁড়ে মারে। আমি তখন আসন থেকে উঠে দুহাত দিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরে বললাম, শ্রীধর, তুই ঠিক বলেছিস। তোর গুরুভক্তি দেখে খুবই আনন্দ পেলাম। আচ্ছা, তোর না ব্রহ্মজ্ঞান হয়েছে ? ঐ দরজার কাছে একটা কুকুর বমি করেছে যা, তুই ঐ বমিটা খেয়ে আয়।

শ্রীধর আমার কথা শুনে সেই বমিটা সব খেয়ে এল। আমি তখন আদর করে কাছে বসিয়ে ভজলেরামকে খাবার আনিয়ে খেতে বললাম। তারপর শ্রীধরকে বললাম, তোর যথার্থ ব্রহ্মজ্ঞান হয়েছে। তুইও যা, আমিও তাই। আয়, আজ আমি তোর সঙ্গে যাব।

তোকে অন্ধ বলেছি, মুর্খ বলেছি বেশ করেছি। তুই ত দেশ বিদেশে আমার মহাপুরুষ বলে বলে আমার সর্বনাশ করেছিস। বারদীতে এসে

বছর পাঁচেক বেশ ছিলাম। আর এখন রোগীদের চেঁচামেচি আর মামলা মোকদ্দমার কথা উদয়াস্ত শুনতে হচ্ছে। এইজন্যেই কি আমার বারদীতে থাকা? শালা অন্ধ, মূর্খ। কচি কচি ছেলেগুলোকে যোগশিক্ষা দিচ্ছিস আর মুখে গুরু গুরু করছিস।

বাবা লোকনাথ গোঁসাইজীকে অন্ধ ও মূর্খ বলেছেন। কারণ গোঁসাইজী বাছ বিচার না করে যাকে তাকে যোগশিক্ষা দিচ্ছেন। কিন্তু যোগসাধনা সাধারণ দেহে সম্ভব নয়। ভগবানের বিভূতি দর্শনের জন্য যেমন অর্জুনের দিব্যদৃষ্টির প্রয়োজন হয়েছিল, তেমনি যোগে সিদ্ধিলাভ করতে গেলেও দিব্য দেহের প্রয়োজন। এজন্য উপযুক্ত ও দক্ষ গুরু চাই, আবার উপযুক্ত শিষ্যও চাই। যে শিষ্যের মধ্যে নিষ্ঠা, শ্রদ্ধা, ব্যাকুলতা ও বিশ্বাস আছে, সেই শিষ্যই হচ্ছে উপযুক্ত শিষ্য। মহাভারতের একলব্য, উপমন্যু ও উতঙ্কের মত যার মধ্যে গুরুভক্তি ও গুরুনিষ্ঠা আছে, সে-ই উপযুক্ত শিষ্য। যোগশিক্ষার প্রস্তুতির জন্য কঠোর কৃচ্ছ্রব্রত অনুষ্ঠান করতে হয়। একনিষ্ঠ সাধনা ও চরম আত্মত্যাগের জন্য সচেষ্ট থাকতে হয়। তা না হলে অপরিপক্ক দেহে যোগশিক্ষা করতে গেলে দেহের অনিষ্ট হয়।

তাছাড়া বাবা লোকনাথ বিজয়কৃষ্ণকে স্নেহ করতেন। তাঁকে আদর করে জীবনকৃষ্ণ বলে ডাকতেন। তাই তাঁর নামযশ শুনে অনেক লোক তাঁর কাছে ভিড় করলে, তাতে তাঁর সাধনার ব্যাঘাত ঘটবে। এই জন্যই তিনি তাঁর নিন্দা করতে থাকেন। তাঁর নিন্দা শুনে বেশী লোক তাঁর কাছে যাবে না।

বাবা লোকনাথ এর পর বললেন, বিধিমত যারা স্ত্রীসঙ্গ করতে পারে না, তাদেরই বলেছি, ব্যভিচার করগে, বেশ্যাগমন করগে। এতে দোষের কি হয়েছে? শাস্ত্র বিরুদ্ধ আচারই ত ব্যভিচার। শাস্ত্রবিধি না মেনে নিজের স্ত্রীগমনও ত বেশ্যাগমন। ও শালারা আমার কথার মানে যখন বোঝে না, তখন আমার কাছে আসে কেন?

গভীরভাবে চিন্তা করেননি বলেই গোঁসাইজীর মত পুরুষও বাবা লোকনাথের কথার প্রকৃত অর্থ বুঝতে পারেননি।

বাবা লোকনাথের কথা বলার ভঙ্গিটি সত্যিই বড় রহস্যময়। একদিন

বাবার এক ভক্ত একটি রামপ্রসাদী গানের মানে জানতে চায়। বাবা তখন তাকে কিছু বললেন না। পরে অন্য একদিন তাকে ডেকে বললেন, দেখ বাপু, ভাষায় ভাসে ভাবে ডোবে। তাই ভাষা ও ভাব পরস্পর বিরোধী বলে ভাষায় ভাবকে সম্যক প্রকাশ করা যায় না। যখন তুই ঐ ভাবের ভাবুক হবি, তখন ঐ ভাষার মানে বুঝতে পারবি। আধ্যাত্মিক ভাব অনেক সময় ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। তা অনুভূতির দ্বারাই বুঝতে হয়। যখন তোর মন ঐ ভাবে পূর্ণ হবে, তখন তোর মন ঐ ভাষার অভিমুখী হবে।

বাবা লোকনাথ যেভাবে কঠোর বাক্যবাণ দ্বারা ভক্তগণকে পরীক্ষা করেছেন, তেমন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া ত্যাগী ও যোগী ছাড়া সাধারণ মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। এই পরীক্ষার মধ্য দিয়ে তাদের ভক্তি, নিষ্ঠা ও অধ্যাত্ম-সাধনার নিবিড়তা যাচাই হয়ে যেত।

একমাত্র রজনী ব্রহ্মচারী এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। বাবা রজনী ব্রহ্মচারীকে আদেশ করেন, রজনী, তুই যখন বাড়িতে থাকবি তখন লেংটি পরবি আর যখন বাইরে বেরোবি তখন শাল দোশালা ব্যবহার করবি।

বাবার এই আদেশমত রজনী ব্রহ্মচারী ঢাকা ফিরে গিয়ে বাড়িতে থাকার সময় লেংটি বা কৌপীন পরতে লাগলেন এবং বাইরে বেরোবার সময় অফিসে যাবার জন্য পরিধেয় দামী পোশাক ব্যবহার করতে লাগলেন। এতে কেউ কেউ বলতে লাগলেন, রজনী অশাস্ত্রীয় কাজ করছেন একই দেহে কৌপীন ও কোট প্যাণ্ট ব্যবহার করে।

কিছুদিন পর রজনী বাবা লোকনাথের কাছে এসে বিষয়টি উত্থাপন করলেন।

বাবা তখন বললেন, হ্যাঁরে রজনী, তুই বলতে পারিস না যে এক গর্ভ-স্রাবের পরামর্শে তোর এই দুর্দশা হয়েছে।

একথা শুনে হকচকিয়ে গেলে অন্তর্যামী বাবা লোকনাথ বুঝলেন, রজনী তাঁর কথার অর্থ অনুধাবন করতে পারেননি। তাই তিনি বললেন, শোন রজনী, স্রব শব্দ থেকেই স্রাব কথাটির উৎপত্তি। এর মানে হলো বের হওয়া। তাই গর্ভ থেকে যে বার হয় অর্থাৎ স্রব হয়, সে-ই হলো গর্ভস্রাব। এই অর্থে তুইও গর্ভস্রাব আর আমিও গর্ভস্রাব। তাহলে

গর্ভস্রাব খালি হলো কিকরে ? আমার পরামর্শ শুনে তোর এই দুর্দশা। তার মানে বহু যুগযুগান্ত তপস্যা করলে যে অবস্থায় পেঁছানো যায়, তুই সেই অবস্থায় পেঁছেছিস। অর্থাৎ একদেহে কৌপীন ও পেন্টুলুন পরা বহু যুগ যুগান্তের তপস্যার ফল।

বাবা লোকনাথের এই কথাগুলি বিশ্লেষণ করলে এই কথাই বোঝা যায় যে, যাঁর ভালমন্দ, মান অপমান ও নিন্দাস্তুতিতে সমজ্ঞান জন্মায় তিনিই সময় বিশেষে একদেহে কৌপীন ও প্যাণ্ট কোট প্রভৃতি দামী পোশাক ব্যবহার করতে পারেন। যাঁর সামাজিকতা বোধ আছে, তাঁকে সমাজগত রীতি-নীতি মেনে চলতে হয়। সংসারী ও সামাজিক মানুষ লোকাচার বা সমাজবহির্ভূত কোন কাজ করতে পারেন না। কিন্তু যিনি এই সমাজ ও সংসারের উর্দ্ধে, তাঁর পক্ষে অসামাজিক কাজ করা সম্ভব। বাবা লোকনাথ আরও বোঝাতে চেয়েছেন, বহু যুগ যুগান্তরের তপস্যায় যাঁর চিত্ত নির্মল ও নিষ্পাপ না হয়েছে তাঁর পক্ষে সমাজে সংসারে বাস করে লোকাচার-বহির্ভূত কাজ করা সম্ভব নয়। সে সাহস তাঁর হবে না।

সবশেষে বৃন্দাবনে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর সামনে সূক্ষ্মদেহে আবির্ভূত বাবা লোকনাথ বললেন, যাদের জন্য থাকা, তারাই যখন আমাকে চিনলেন না, আমার দ্বারা তাদের যখন কোন উপকারই হবে না। তখন আর থেকে লাভ কি ? আমি দেহ ছেড়ে দিচ্ছি।

এসব শুনেও বাবাকে দেহ ছেড়ে দিতে নিষেধ করলেন না গোঁসাইজী। শুধু বললেন, আপনার যা ইচ্ছে করুন, আমার কিছু বলার নেই।

পরমুহূর্তেই ঘরের মধ্যে এক দমকা হাওয়া ঢুকে যেন সব কিছু ওলট-পালট করে দিল। সঙ্গে সঙ্গে অন্তর্হিত হলেন বাবা লোকনাথ। গোঁসাইজী তখন ব্রহ্মচারী বাবা, ব্রহ্মচারী বাবা বলে ব্যস্ত ও ব্যাকুলভাবে অনেকক্ষণ ডাকলেন। কিন্তু আর কোন সাড়া পাওয়া গেল না।

এদিকে কিছুদিন আগেই বাবা লোকনাথ তাঁর প্রিয় শিষ্য পরিব্রাজক রামকুমার চক্রবর্তীকে অবিলম্বে বারদীতে আসার জন্য সূক্ষ্ম নির্দেশ দান করেন। বহু দূরে থেকে পরিব্রাজনরত রামকুমার অন্তরে বাবার সে নির্দেশ পাবার সঙ্গে সঙ্গে বারদীর পথে রওনা হন। মহাপ্রয়াণের আগের দিন ১৮ই জ্যৈষ্ঠ শনিবার তিনি ব্রাহ্মমুহূর্তে বারদীর আশ্রমে উপস্থিত হন।

সন্ন্যাসী পরিব্রাজক শিষ্য গুরুচরণে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করতেই তাঁকে বুকের মধ্যে টেনে নিলেন বাবা লোকনাথ। দীর্ঘ পরিব্রাজন জীবনের কঠোর তপশ্চর্যার ফলে অধ্যাত্ম সাধনার যে উচ্চভূমি শিষ্য রামকুমার লাভ করেছেন, বাবা তাঁর যোগদৃষ্টিতে তা বুঝতে পারেন। রামকুমারও বুঝতে পারেন, এ অবস্থালাভ তাঁর একমাত্র বাবার কৃপাবলেই সম্ভব হয়েছে। বুঝলেন, বাবার অসীম কৃপা ও করুণা তিনি দূর থেকে লাভ করেছেন। তথাপি আজ গুরুর দেহত্যাগের কথা শুনে আসন্ন বিচ্ছেদ-ব্যথায় কাতর না হয়ে পারলেন না রামকুমার।

এমন সময় গুরু তাঁর প্রিয় শিষ্যকে নির্দেশ দিলেন, তাঁর দেহের অগ্নি-সংস্কারকালে রামকুমারই মুখাগ্নি ক্রিয়া সম্পন্ন করবে।

১৯শে জ্যৈষ্ঠ রবিবার সকাল হতেই সূর্যদেব মেঘমুক্ত নির্মল আকাশে উদিত হয়ে কিরণজাল বিস্তার করতে লাগলেন যাতে তাঁর উজ্জ্বল রশ্মি-গুলি মহাপুরুষের মহাপ্রয়াণের বাহন হয়ে তাঁকে ব্রহ্মলোকে নিয়ে যেতে পারে।

বাবা লোকনাথ পূর্ণব্রহ্ম। অমোঘ তাঁর ইচ্ছাশক্তি। প্রকৃতির ঊর্ধ্বে তিনি নিত্য সনাতন পুরুষ। সূর্য, চন্দ্র, গ্রহতারা প্রভৃতি প্রকৃতির ছোট বড় সব বস্তুই যেন তাঁর সেই অমোঘ ইচ্ছাশক্তির বশীভূত। সেই ইচ্ছার প্রতিকূলতা সাধনের শক্তি যেন তাদের নেই।

বারদীর সচল জীবন্ত শিবকে পার্থিব শরীরে শেষবারের মত দর্শন করার জন্য ভোর হতেই শত শত নরনারী দূর দূরান্তে হতে এসে উপস্থিত হলেন আশ্রমে। সকলেরই চোখে মুখে ফুটে উঠেছে আসন্ন বিরহের এক গভীর বিষাদ আর হতাশা।

বাবার পাশেই উপবিষ্ট তাঁর পরিব্রাজক শিষ্য রামকুমারের তেজোদীপ্ত দিব্যকান্তি দর্শন করলেন ভক্তগণ। বাবার মহাসমাধির পূর্বমুহূর্তে অকস্মাৎ তাঁর আবির্ভাব দেখে সকলের মনেই প্রশ্ন জাগল, তবে কি ইনিই সেই ভগবান গাঙ্গুলী যিনি তাঁর পূর্বজন্মে বাবার গুরু ছিলেন এবং যাঁর উদ্ধারের জন্য বাবা ছিলেন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

অন্যদিনকার মত গোয়ালিনী মা ভোগ রান্না করে এনে নিবেদন করলেন বাবাকে। তাঁর দু চোখ বেয়ে অশ্রু ঝরে পড়ছিল অঝোরধারে। বাবা সে

ভোগ গ্রহণ করে প্রসাদ করে দিলেন।

শোকে দুঃখে কাতর ভক্তদের প্রসাদ মুখে দিতে ইচ্ছা হচ্ছিল না। তবু গোয়ালিনী মা আশ্রমে সমাগত প্রতিটি ভক্তকে ডেকে ডেকে বাবার মহা-প্রসাদ খাওয়ালেন।

ভক্তদের প্রসাদগ্রহণ সমাপ্ত হয়েছে জানতে পেরে বাবা লোকনাথ তাঁর ঘরের ভিতরে ধীর পদক্ষেপে প্রবেশ করলেন। তারপর তাঁর আসনে উপ-বেশন করলেন। ভক্তেরা সকলে নির্বাক হয়ে বসল চারদিকে।

অপরিসীম প্রেম ও করুণার মূর্ত বিগ্রহ বাবা লোকনাথ বিরহকাতর ও মৌন ভক্তদের মনের অব্যক্ত ভাবটি বুঝতে পারলেন। তখন তিনি তাঁর অপলক দিব্যদৃষ্টি সকলের উপর ছড়িয়ে দিয়ে স্নেহভরা কণ্ঠে তাদের বললেন, ওরে তোরা চিন্তায় এত কাতর হচ্ছিস কেন? আমি মরে যাব? কেবল আমার এই জীর্ণ পুরাতন দেহটা পাত হবে। আমি যেমন আছি, যেমন তোদের কাছে ছিলাম, তেমনিই তোদের কাছেই থাকব। আমার মৃত্যু নেই। তোরা ভক্তি বিশ্বাস নিয়ে আমাকে একটু আদর করে ডাকলেই দেখবি আমি তোদের কত কাছটিতে আছি। এখন যেমন তোদের কথা শুনছি, তেমনি তখনও শুনব। এখন যেমন আপদে বিপদে আমার কৃপা পাচ্ছিস, তখনও তেমনি পাবি। একথা মিথ্যা হবে না।

বাবা আরও বলে যেতে লাগলেন, তাছাড়া আমি যাবই বা কোথায়? সমস্ত অস্তিত্বের মধ্যেই যে আমি পূর্ণ হয়ে বিরাজ করছি। তোরা কেবল সত্য ধরে থাক। নিষ্ঠা নিয়ে, ভগবানের শরণাগতি নিয়ে গুরুপ্রদর্শিত পথে এগিয়ে চল।

আত্মনিষ্ঠ যোগই মুক্তির পথ। ভক্তির সার। মন্ত্রাদি সহায়ক মাত্র। ভক্তিকে সঙ্গে নিয়ে এগিয়ে চল। তোদের বাধা দেবে কে? তোরা যে আমারই সন্তান। আমার সন্তানদের উপর কারোরই শাসন চলবে না। আমি কোনদিন উপদেশ করিনি। এ আদেশের স্থল।

তোরা আমায় ছাড়া নস, এই ভাবটি ভুলিস না। আমি তোদের মধ্যেই, আছি, তোদের মধ্যেই থাকব। আমি নিত্য, আমি অবিনাশী।

মানুষ অমৃতের পুত্র—একদিন বেদে যে অমৃতত্ব ধ্বনিত হয়েছিল, আজ বাবার শ্রীমুখ থেকে সেই অমৃতের বাণী শেষবারের মত শুনল

সমবেত ভক্তেরা। সেই অমৃতবাণী শোনার সঙ্গে সঙ্গে শান্তির ধারা নেমে এল যেন তাদের সংসারাবদ্ধ ত্রি-তাপদগ্ধ হৃদয়ে।

মহাযোগী বাবা লোকনাথ এবার পার্থিব শরীরে তাঁর অপরূপ অপলক দিব্যদৃষ্টি শেষবারের মত প্রসারিত করলেন সমবেত ভক্ত শিষ্যদের উপর। তারপর চিরনিমগ্ন হন মহাসমাধিতে।

বাবার মহাপ্রয়াণের লীলাটিও বড় অদ্ভূত ও অলৌকিক। ভক্তগণ দেখছেন, বাবা মহাসমাধিতে লীন হয়েছেন, কিন্তু তাঁর দেহখানি আসনে যেমনভাবে উপবিষ্ট থাকে, তেমনিই আছে। তাঁর বিস্ফারিত অপলক চক্ষু দুটি যথারীতি উন্মীলিত আছে।

তা দেখে কোন কোন ভক্ত ভাবলেন, বাবা হয়ত আগের মতই এই দেহ ছেড়ে ঊর্ধ্বলোকে কোথাও গেছেন, আবার ফিরে আসবেন। তা না হলে তাঁর আত্মা চিরদিনের মত মরদেহ ত্যাগ করে গেলে তাঁর দেহটি ঢলে পড়ত, এমন উপবিষ্ট অবস্থায় থাকতে পারত না।

আবার অনেকে ভাবলেন, এতক্ষণ যখন কেটে গেছে, তাহলে বাবা আর কখনই ফিরবেন না।

অবশেষে বেলা পৌনে বারোটা বাজলে একজন ভক্ত বাবার উপবিষ্ট দেহটি স্পর্শ করতেই তা ঢলে পড়ে গেল। তখন উপস্থিত সকলেই বাবার মহাপ্রয়াণ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হলেন।

সঙ্গে সঙ্গে অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠেই অসংখ্য ভক্ত সমস্বরে বাবা লোকনাথের জয়ধ্বনি করতে লাগল। আকাশ বাতাস মুখরিত হয়ে উঠল সেই জয়-ধ্বনিতে। মহাতীর্থ বারদীর প্রাণপুরুষ ব্রহ্মচারী বাবা আর নেই। আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই শোকে বিহ্বল হয়ে অশ্রুবিসর্জন করতে লাগল।

তাঁর সন্তানসম প্রাণের ধনকে হারিয়ে গোয়ালিনী মাও শোকে আকুল হয়ে কাঁদতে লাগলেন। বাবার চরণদুটিকে বুকে ধরে বাবাকে ডাকতে লাগলেন। তিনি ভুলে গেলেন, এ সমাধি মহাসমাধি, এ সমাধি ভঙ্গ হবার নয়।

ভক্তেরা এবার বাবার দিব্য দেহটি বহন করে আশ্রমের উঠোনের সেই বেলগাছতলায় আনলেন। মহাযোগী মহাপুরুষের দেহত্যাগের সংবাদ চারদিকে ছড়িয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে সকল

সম্প্রদায়ের লোক ছুটে এল আশ্রমে বাবার দেহটিকে শেষবারের মত দর্শন করার জন্য।

বারদী গ্রামের চারদিকে প্রতিটি ঘরে ও হাটেবাজারে যত ঘি আর চন্দনকাঠ ছিল তা নিয়ে এলেন ভক্তের দল। বাবার পূর্বনির্দেশমত আশ্রমের দক্ষিণদিকে পূর্বকোণে রচিত হলো চন্দনকাঠের চিতা। তারপর বাবার দিব্যদেহটিকে শয়ন করানো হলো সেই চিতার উপরে। অগণিত ভক্তের অন্তরের শ্রদ্ধার অর্ঘ্যস্বরূপ ফুল ও মালায় গোটা দেহটি ঢেকে যায়। 'জয় বাবা লোকনাথ, জয় বাবা বারদীর ব্রহ্মচারী' প্রভৃতি ধ্বনি উচ্চারিত হয় অগণিত ভক্তের সববেত কণ্ঠে।

রামকুমার শাস্ত্রীয় বিধি অনুসারে মন্ত্র উচ্চারণ করে মুখে অগ্নিসংযোগ করে গুরুর শেষ আদেশ পালন করলেন। অবশেষে চিতাগ্নি প্রজ্বলিত হলো। দেখতে দেখতে ব্রহ্মচারী বাবার নশ্বর মরদেহটি ভস্মীভূত হয়ে গেল জ্বলন্ত আগুনের শিখায়। কিন্তু এই বিনাশশীল দেহের মধ্যে যে অবিনাশী দেহী আত্মা এতদিন বিরাজমান ছিল, সে আত্মা ত ভস্মীভূত হবার নয়। সেই নিত্যসত্তাময় আত্মা এই মরদেহ ত্যাগ করে সূর্যরশ্মি অবলম্বন করে ব্রহ্মলোকে গিয়ে নিত্যলীলায় প্রবৃত্ত হলেন শুধু।

তিনি অপ্রকট হবার পরই ব্যাপ্ত হলেন সমগ্র জগতের জীবের হৃদয়ে সূক্ষ্মভাবে অনুপ্রেরণা দিয়ে তাদের আধ্যাত্মিক চেতনার উন্মেষ ঘটানোর জন্য। তাঁর এই নিত্যলীলার অন্ত নেই। মৃত্যু এ লীলার অবসান ঘটাতে পারবে না কোনদিন। কাল মুছে দিতে পারবে না কখনো তাঁর দিব্য প্রভাব। এই জীবজগতে যুগে যুগে ফল্গুধারার মতই অনন্তকাল ধরে নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রবাহিত হয়ে চলবে তাঁর অসীম করুণার ধারা।

৬

মহাপ্রয়াণের পর সাধক, যোগী ও গুরুর সব লীলার অবসান হয়। কিন্তু মহাপ্রয়াণের দীর্ঘকাল পরেও ভগবান লোকনাথের দিব্যলীলার শেষ নেই। আজও তিনি সূক্ষ্মভাবে প্রতিটি ভক্তের হৃদয়ে অবস্থান করে যেন

বলছেন, ওরে তোরা কবে বিশ্বাস করবি যে আমিই সর্বময় কর্তা? আমার উপর নির্ভর কর। সব কর্তৃত্ব আমার উপর ছেড়ে দিয়ে কেবল নিজের কর্তব্যটুকু নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে যা। তাহলেই জীবনে শান্তি পাবি। যে যেভাবে যখন আপদে বিপদে আমায় শরণ নেবে, সেইভাবেই আমার কৃপালাভ করবে।

আমি শরীর ছেড়ে দিয়েছি। কিন্তু ভক্তকে রক্ষা করার জন্য সর্বদাই ভক্তের সঙ্গে সঙ্গে রয়েছি। তোদের চোখ নেই, তাই ত তোরা আমায় চোখে দেখিস না। আমার উপর তোদের আস্থা এবং বিশ্বাস যত বাড়বে, ততই তোদের সব অভীষ্ট সফল হবে। বারদীতে অবস্থান কালে যেমন আমার কাছ থেকে কেউ শূন্য হাতে ফেরেনি, আজও আমার শরণাগত অভীষ্ট ফল লাভে বিফল হয় না, হবে না। তবে তোরা কেবল জাগতিক চাওয়া নিয়েই ভুলে থাকিস না। সত্যলাভ করার জন্য চেষ্টা কর। আমার কৃপা অচিরেই তোদের সাধনপথকে সুগম করে তুলবে।

জানবি, ভক্তের বোঝা আমি নিজ স্কন্ধে বহন করে বেড়াই। তোদের সব দায়িত্বই আমার। কেবল তোদের সহজ সরল মনটুকু আমায় দে। আমি যে তোদের প্রেমের কাঙাল।

আমার দয়া বিশ্বময় ছড়িয়ে আছে। তোরা শ্রদ্ধার সঙ্গে চেয়ে কুড়িয়ে নে। যে তার নিজের মনপ্রাণ সবটুকু আমায় দিতে পেরেছে, আমি তারই হয়ে গেছি। তোদের মধ্যে সত্যরূপে আমি আছি, চিরকাল থাকব।

আমি নিত্য জাগ্রত। তোদের সুখে সুখী, তোদের দুঃখে দুঃখী। আমার বিনাশ নেই। আমি আছি, আছি, আছি।

ওঁ

সেবার প্রয়াগে কুম্ভমেলা বসেছে। কুম্ভমেলায় বহু নাগা সন্ন্যাসীর সমাগম হয়। সেবার বাবা লোকনাথের কয়েকজন ভক্তও গিয়েছিলেন কুম্ভমেলায়। এক ভক্তের হাতে বাবা লোকনাথের একখানি ছবি ছিল। ঘটনাচক্রে ছবিটি সহসা একজন নাগা সন্ন্যাসীর চোখে পড়ে। ছবিটি দেখার সঙ্গে সঙ্গে বিস্মিত হয়ে যান তিনি। ছবি দেখে সন্ন্যাসী মহাযোগী লোকনাথের অসামান্য যোগশক্তির পরিচয় পেয়ে তাঁর প্রতি কৌতূহলী হন।

সন্ন্যাসী তখন কিছুক্ষণ স্থিরদৃষ্টিতে ছবিটির দিকে তাকিয়ে থেকে সেই ভক্তকে হিন্দী ভাষায় বলেন, এই ব্রহ্মভূত মহাত্মার ছবি কোথায় আপনি পেলেন? এই মহাত্মার যে দৃষ্টি তা সমগ্র জগৎসংসারকে দেখার জন্য। যে মহাপুরুষের এমন অপার্থিব অলৌকিক দৃষ্টি, তিনি লোকসমাজে কিকরে ছিলেন? এই শ্রেণীর মহাপুরুষ লোকসমাজে কখনো আসেন না। আপনি বড় ভাগ্যবান যে এমন মহাত্মার সঙ্গলাভ করেছেন।

নাগা সন্ন্যাসীর এই কথা থেকে বুঝতে পারা যায়, বাবা লোকনাথ যে একজন ব্রহ্মভূত যোগসিদ্ধ মহাপুরুষ, তা তাঁর ছবিটি একবার দেখেই তিনি তা বুঝতে পারেন।

পূর্ণ অষ্টসিদ্ধি একমাত্র সেই দেহেই ধারণ সম্ভব, যে দেহ সম্পূর্ণরূপে দিব্যদেহে রূপান্তরিত হয়েছে। অখণ্ড ব্রহ্মচর্য ও একনিষ্ঠ কঠিন তপশ্চর্যার মাধ্যমে বাবা লোকনাথ তাঁর প্রাণ মন ও দেহের প্রতিটি কোষের অণু পরমাণুগুলিকে রূপান্তরিত করেন।

তাই তাঁর ভক্ত ও শিষ্যেরা তাঁর নশ্বর পরিবর্তনশীল দেহের মাঝে অবিনশ্বর অপরিবর্তনীয় আত্মার ভাব দর্শন করেন। তিনিই পরমাত্মারূপী ষড়ৈশ্বর্যময় ভগবান। তাই তাঁর মধ্যে দেখতে পওয়া যায় ভগবানের সকল বিভূতি। তিনি একাধারে সর্বশক্তিমান পরম পিতা। আবার তাঁর মধ্যে ফুটে ওঠে প্রেম ও করুণার রসঘন মাধুর্যময় রূপ। তাঁর লীলায় অসংখ্য ভক্তের আর্তি ও প্রার্থনার মধ্য দিয়েই তাঁর ঐশ্বর্য ও যোগবিভূতির প্রকাশ ঘটে।

ওঁ

মানুষ আজ ঘোর কলির প্রভাবে পথভ্রষ্ট, দিশেহারা। মন্দিরে মঠে, ধর্মক্ষেত্রের বিশৃংখলাময় পরিবেশের মধ্যে মানুষ আজ প্রকৃত সত্য ও সদ-গুরুর সন্ধান পাচ্ছে না। অনেকেই হয়ে পড়েছেন বিভ্রান্ত। মানসিক দ্বন্দ্ব ও সংশয়ের ফলে ধর্মে অবিশ্বাস, গুরুকে অবিশ্বাস এবং মন্দিরে বিগ্রহ প্রভৃতি বাহ্যিক অনুষ্ঠানের প্রতি মানুষের বিতৃষ্ণার ভাব বেড়ে চলেছে দিনে দিনে।

এই যুগসন্ধিক্ষণে পরম পুরুষ লোকনাথ রয়েছেন নিত্যলীলার মর্তে।

তিনি মানুষকে আজও দিয়ে চলেছেন প্রকৃত পথের সন্ধান। ধর্মের প্রকৃত সত্যকে সহজ করে তুলে ধরেছেন সকলের সামনে। আজ মানুষকে কোন বিশেষ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ভগবানের অনুগ্রহ লাভ করতে হয়না। কেবল পরমপুরুষ বাবা লোকনাথকে স্মরণ করলেই সকলে পাবে ভগবানের অলৌকিক কৃপা।

বারদীর অন্যতম জমিদার আনন্দকান্তি নাগ ছিলেন বাবা লোকনাথের কৃপাধন্য। তাঁর পৌত্র প্রেমরঞ্জন নাগের স্ত্রী রেণুকণা নাগ ছিলেন লোকনাথগতপ্রাণা। বাবা লোকনাথের প্রতি তাঁর ভক্তি ও বিশ্বাস ছিল অগাধ ও অতুলনীয়। তিনি তাঁর সারাজীবন ধরে বাবা লোকনাথের সেবা, পুজো, ধ্যান ও ধারণায় অতিবাহিত করেন। কিন্তু একটা দুঃখ ও চাপা ক্ষোভ তাঁর মনকে প্রায়ই পীড়া দেয়। সে দুঃখ হলো এই যে, তিনি সারা-জীবন পরম নিষ্ঠা ও ভক্তির সঙ্গে বাবার সেবা করে আসছেন, তবু এক বারও বাবার সূক্ষ্মদেহের দর্শন পেলেন না।

তিনি অলৌকিকভাবে একদিন বাবার একটি পূর্ণ অবস্থার মূর্তির চিত্র পান। সেই চিত্রটি পুজোর ঘরে রেখে রোজ নিয়মিত পুজো করেন। প্রতিদিন পুজোর পর প্রায়ই তিনি সেই চিত্রটির সামনে তাঁর অন্তরের আর্তি ও আকুল প্রার্থনা জানান, হে বাবা, চিরকাল তোমার নাম করেই গেলাম, কিন্তু একদিনও তুমি ত দেখা দিলে না। তুমি কি সত্যিই আছ? তুমি যে বলেছিলে তুমি যেমন ছিলে, তেমনিই চিরকাল থাকবে। তোমার নিত্যলীলার শেষ হবে না কোনদিন।

১৯৮৮ সালের শেষের দিকে হঠাৎ তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। তিনি অচেতন হয়ে পড়েন। তাঁর শরীরের বর্ণ নীল হয়ে যায়। তখন তাঁর জামাতা ও কন্যা বাবা লোকনাথের ও তাঁদের গুরুদেব লোকনাথ কৃপাধন্য শ্রীনিশিকান্ত বসুর দুটি ছবি রেণুকনার মাথার নিকট রেখে দেন। তাঁরা ব্যাকুলভাবে বাবাকে স্মরণ করতে থাকেন।

হঠাৎ একদিন চেতনা ফিরে পান রেণুকণা। তিনি বিছানায় উঠে বসেন এবং 'বাবা বাবা' বলে কেঁদে ওঠেন। তারপর পরমুহূর্তেই অচেতন হয়ে পড়েন। তাঁর দেহটি বিছানায় ঢলে পড়ে।

ডাক্তার এসে রোগিনীকে পরীক্ষা করে বলেন, এ হচ্ছে 'ডীপ কমা'

অর্থাৎ গভীর অচৈতন্য অবস্থা। অক্সিজেন ও প্রাণরক্ষার শেষ ওষুধ দেওয়া হলো। কিন্তু তাতে কোন ফল হলো না।

ডাক্তারেরা জানালেন, এই অচৈতন্য অবস্থাতেই রোগিনীর প্রাণ বিয়োগের সম্ভাবনা আছে।

কন্যা প্রতিমা এই ঘটনায় বিহ্বল ও শোকে আকুল হয়ে পড়েন। অকস্মাৎ এই ঘটনা বিনামেঘে বজ্রাঘাতের মত পরিবারের সকলেরই মাথার উপর এসে পড়ে। বাবার প্রতিকৃতির সামনে আকুলভাবে আছড়ে পড়ে কাঁদতে থাকেন প্রতিমা। কাঁদতে কাঁদতে বলেন, হে বাবা, বিনা চিকিৎসায় মা এমনভাবে অকালে চলে যাবেন, এ আঘাত আমি জীবনে কখনো ভুলতে পারব না।

রেণুকণাকে সবাই দুদুমা বলে ডাকত। দুদুমার অসুখ সারবার নয়। এই খবর পেয়ে আত্মীয় স্বজনেরা শেষবারের মত তাঁকে দেখবার জন্য ছুটে আসেন।

কিন্তু ডাক্তারদের ও বাড়ির লোকজনদের সকলকে বিস্ময়ে অবাক করে দিয়ে দ্বিতীয় দিনে সম্পূর্ণ সুস্থ অবস্থায় উঠে বসেন রেণুকণা। তিনি তাঁর আত্মীদের কাগজ কলম নিয়ে তাঁর কাছে এসে বসতে বলেন।

তিনি তাঁর কন্যা প্রতিমাকে কাছে ডেকে বলেন, আমি দেহে এসেছি শুধু তোদের এই কথা বলতে যে, বাবা আছেন। তিনি সদা সর্বদাই আমাদের সকলের সাথে সাথেই আছেন। জানিস, কেন আমি নেমে এলাম ? তুই বাবার কাছে কেঁদেছিলি, আমি বিনা চিকিৎসায় মারা যাচ্ছি বলে। বাবা তাই আমাকে পাঠিয়ে দিলেন চিকিৎসা করাবার জন্য। তবে আমি কয়েকদিন মাত্র থাকব।

কথাটা শুনে আশ্চর্য হয়ে যান কন্যা প্রতিমা। তিনি যে বাবার প্রতিকৃতির সামনে আকুলভাবে কাঁদতে কাঁদতে প্রার্থনা জানিয়েছিলেন বাবার কাছে, তা তাঁর মা গভীর অচৈতন্য অবস্থাতে কিকরে জানলেন ? তখন ত তাঁর কোন জ্ঞানই ছিল না। তাছাড়া যে গভীর অচৈতন্য অবস্থা কাটার কোন সম্ভাবনাই ছিল না ডাক্তারী মতে, সে অবস্থা সহসা কাটল কিকরে, রোগিনীই বা হঠাৎ সুস্থ হয়ে উঠলেন কেমন করে ?

এই বিস্ময়কর ঘটনাটি যে বাবা লোকনাথেরই এক অলৌকিক লীলা,

তা বুঝতে বাকি রইল না কারো।

প্রতিমার ছেলে বাদশা রেণুকণাকে প্রশ্ন করলেন, আচ্ছা দিদু, তুমি কি বাবা লোকনাথকে দর্শন করেছ ?

এক অপরূপ দিব্য দ্যুতিতে সহসা উজ্জ্বল হয়ে উঠল রেণুকণার বিবর্ণ মুখখানি। তিনি বললেন, তোরা কি শুনতে চাস সে কথা ? তবে শোন। আমি দেখলাম আমার দেহ থেকে আমি বেরিয়ে এলাম। তারপর ঊর্ধ্বদিকে উঠতে থাকলাম। তোরা তখন আমার দেহটিকে ঘিরে বসে আছিস। মনে হলো, আমার মাথাটা যেন দুখণ্ড হয়ে ভেঙ্গে গেল এবং তার মধ্য দিয়ে আমি শরীর ছেড়ে উপরে উঠতে লাগলাম। উপরে উঠতে উঠতে আমি এত ঊর্ধ্বে উঠে গেলাম যে পৃথিবীটা একটা ছোট্ট বস্তুর মত মনে হলো। আমি নীল আকাশ ভেদ করে উপরে উঠতে থাকলাম। নীচে নীল সমুদ্র দেখতে পেলাম। নিচের পৃথিবীটা দেখে মনে হলো কি নোংরা আর দুঃখে ভরা। আরও ঊর্ধ্বে উঠে এক জায়গায় দেখলাম, ভগবান শিব বসে আছেন ধ্যানাসনে আর তাঁর পাশেই বসে আছেন বাবা লোকনাথ।

আমাকে দেখে বাবা আসন ছেড়ে উঠে এলেন এবং অসীম করুণায় তাঁর বক্ষের মধ্যে আমাকে টেনে নিলেন। আমার মাথায় ও মুখে তাঁর কৃপাহস্ত বুলিয়ে দিলেন।

তাঁর এই উপলব্ধি রেণুকণা যখন বলছিলেন, তখন উপস্থিত সকলেই দেখলেন তাঁর সর্বাঙ্গে এক দিব্য জ্যোতির ঢেউ খেলে যাচ্ছে। তিনি তাঁর দক্ষিণ হস্তটি প্রসারিত করে তালুর মাঝখানে এক গোলাপী রঙের বৃত্ত দেখালেন। এমন রক্তিম আভা কেউ দেখেনি কোনদিন তাঁর অঙ্গে।

তিনি বললেন, এটা আমার হাত নয়, এ হাত বাবার। এস, এই হাত তোমরা স্পর্শ করো। তাঁর আশীর্বাদ মাথায় নাও। আমি বাবার কাছ থেকে তোমাদের সকলের জন্য এক দিব্য বাণী নিয়ে এসেছি।

আমার নিম্ন অঙ্গের কোন অনুভূতি নেই। ওটা জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। আমার সমস্ত শক্তি কেবল ঊর্ধ্বাঙ্গে এবং হাতের মধ্যে আছে। এই হাতটি বাবার কৃপাহস্ত। বাবা আমাকে তোদের কাছে পাঠিয়েছেন এই অভয়বাণী শোনাবার জন্য যে, তিনি আছেন, আজও জীবন্ত হয়ে আছেন।

এই খবর লোকমুখে ছড়িয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে দলে দলে লোকনাথভক্ত

আসতে লাগল তাঁর কাছে। তিনি তাঁর দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত করে সকলকে স্নেহভরে আশীর্বাদ করলেন।

কয়েকদিন এইভাবে কাটতে লাগল। তিনি সব সময় সৎ প্রসঙ্গ আলোচনা করতে লাগলেন। কিভাবে সংসারে থেকে সংসারী জীবন যাপন করে মানুষ ঈশ্বরলাভ করতে পারে এবং তাঁর কৃপা পেয়ে ধন্য হতে পারে, সেই কথা তিনি সকলকে সহজভাবে বুঝিয়ে দিতে লাগলেন।

তাঁর কথা শুনে উপস্থিত সকলের মনে হচ্ছিল, তিনি যেন নিজে কিছুই বলছেন না, কে যেন সূক্ষ্মভাবে তাঁর শরীরকে আশ্রয় করে এই ধর্মতত্ত্ব সহজ করে বুঝিয়ে দিচ্ছে।

অসুখের আগে তাঁর দুই চোখে ছানি পড়ার জন্য ভাল দেখতে পেতেন না। কিন্তু এই সময় তিনি তাঁর দুটি চোখেরই দৃষ্টিশক্তি অলৌকিকভাবে ফিরে পান। তিনি দূরের যত সব বস্তু ও ঘটনা স্পষ্টভাবে প্রত্যক্ষ করতে লাগলেন এবং যথাযথ ভাবে তা সব বলতে লাগলেন।

এই সব দেখে ডাক্তারেরা আশ্চর্য হয়ে গেলেন। তাঁরা বাবা লোকনাথের লোকোত্তর মহিমা ও নিত্যলীলার পরিচয় পেয়ে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। তাঁরা ভাবতে লাগলেন, তবে কি বিজ্ঞান মিথ্যা, অথবা এই লৌকিক বস্তু-জগতের ঊর্ধ্বে এক অলৌকিক অধ্যাত্ম জগৎ আছে যার রহস্য বিজ্ঞান ভেদ করতে পারে না, কোনদিন পারবেও না।

লোকনাথ সম্বন্ধে কেউ তাঁকে কোন প্রশ্ন করার সঙ্গে সঙ্গেই এক দিব্য আনন্দের উজ্জ্বলতায় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে তাঁর মুখমণ্ডল।

তবু ডাক্তারেরা কিভাবে তাঁকে দীর্ঘদিন বাঁচিয়ে রাখা যায়, তার জন্য চেষ্টা করতে লাগলেন। নানা ওষুধপত্রের ব্যবস্থা করতে লাগলেন।

কিন্তু রেণুমা বারবার একই কথা বলতে লাগলেন, আমার সময় হয়ে গেছে। আমাকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা বৃথা। আমাকে বাবা মাত্র দিনকতকের জন্য পাঠিয়েছেন। তাঁর কাছে থাকার আনন্দ আমি পেয়েছি। তোমরা আমাকে এই জ্বালা যন্ত্রণাময় পৃথিবীতে কেন টেনে রাখবার চেষ্টা করছ? সেখানে কী আনন্দ! কত শান্তি, কী পবিত্রতা! আমাকে বাবার কাছে ফিরে যাবার অনুমতি তোমরা দাও।

তবু ডাক্তারদের চিকিৎসা চলতে লাগল। কিন্তু এ চেষ্টা ভাল লাগত

না রেণুমার। এই চিকিৎসা যখন চলতে থাকে তখন তিনি বিষাদের কালিমায় আচ্ছন্ন ও ভার হয়ে ওঠে তাঁর মুখমণ্ডল। তিনি তখন কেবলি ভাবতে থাকেন, যদি এই সব চিকিৎসার ফলে তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ওঠেন, তাহলে তিনি আর বাবার কাছে যেতে পারবেন না। কিন্তু বাবা লোকনাথের প্রতি তাঁর গভীর বিশ্বাস তাঁর সব বিষাদকে ছিন্নভিন্ন করে দেয়। তিনি মনকে বোঝান, বাবা যখন কিছুদিনের জন্য তাঁকে এই মর্ত্য-ভূমিতে এই সংসারে পাঠিয়েছেন তখন তিনি যথাসময়ে তাঁকে এখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যাবেন। কোন চিকিৎসাই তাঁকে এখানে দীর্ঘকালের জন্য আটকে রেখে দিতে পারবে না। এই সময় অক্সিজেন সিলিণ্ডার প্রভৃতি নানারকম চিকিৎসার সরঞ্জামে ও ওষুধপত্রতে তাঁর ঘরখানি ভরে থাকে। রেণুমাকে নিয়ে বাড়ির সকলেই সব সময় ব্যস্ত হয়ে আছেন।

একদিন রাত দশটার সময় হঠাৎ ঘুম থেকে জেগে উঠে রেণুমা তাঁর মেয়ের ছেলে বাদশার স্ত্রী গুরিয়াকে ডেকে বলেন, তুমি ভিজে তোয়ালে দিয়ে বাবার গা মুছিয়ে দাওনি। তুমি তাঁকে খেতে দাওনি। বাবা আমাকে বললেন, তিনি অভুক্ত, ক্ষুধায় কাতর। তুমি এখনি তাঁকে ভোগ দাও।

এই কথা শুনে বাদশা, গুরিয়া ও পরিবারের সকলেই অশ্চর্য হয়ে যান। তাঁরা ভেবে দেখেন, সত্যিই ত। তাঁরা তাঁদের দিদিমাকে নিয়ে ব্যস্ত থাকায় বাবার সেবা ও পূজার কথা ভুলে গেছেন। সকাল থেকে এখনো পর্যন্ত বাবাকে ভোগ দেওয়া হয়নি। কিন্তু রেণুমা অন্য ঘরে শুয়ে থেকে একথা জানলেন কি করে? তাঁরা বুঝতে পারলেন, এ হচ্ছে বাবার অলৌকিক লীলা।

যাই হোক, তৎক্ষণাৎ গুরিয়া ছুটে গেলেন বাবাকে ভোগ রান্না করে দেবার জন্য।

এইভাবে আরও সাতদিন সজ্ঞানে মরদেহে বিরাজ করেন রেণুমা। একদিন তিনি বললেন, আমি আমার বড় মেয়ে পুতুল আর আমার কনিষ্ঠ দৌহিত্র আমেরিকাবাসী রাজার জন্য অপেক্ষা করে আছি। তারা এলে তাদের আশীর্বাদ করে চলে যাব।

এর পর থেকে বারবার রেণুমা খোঁজ নেন, তারা এসেছে কি না।

একদিন বাদশাকে জিজ্ঞাসা করতে বাদশা বলল, রাজা জানিয়েছে, আসতে পারবে না। তবে পুতুলমাসি আসছেন।

রেণুমা বললেন, আচ্ছা, তবে আমি আরও দু একটা দিন থাকব। পুতুলকে দেখে চলে যাব।

অবশেষে বড় মেয়ে পুতুল এলে তাকে আশীর্বাদ করে সজ্ঞানে বাবা লোকনাথকে স্মরণ করতে করতে মরদেহ ত্যাগ করে ধরাধাম থেকে নিত্যধামে চলে গেলেন রেণুমা। সেদিন ছিল ১৯৮৮ সালের ১১ই মার্চ।

রেণুমার দেহত্যাগের পর পরিবারের সকলের মনেই প্রশ্ন জাগে, রেণুমা কি সত্যি সত্যিই লোকনাথবাবার কাছে চলে গেছেন? তিনি এখন কোথায়?

সেই বছরই ৬ই ডিসেম্বর তারিখে শেষ রাত্রিতে গুরিয়া এক স্বপ্ন দেখলেন, বাড়িতে বাবা লোকনাথের নাম সংকীর্তন হচ্ছে। অনেকেই এসেছেন। হঠাৎ রেণুমাও সেখানে এসে উপস্থিত হলেন।

গুরিয়া তখন তাঁকে প্রশ্ন করলেন, দিদু, তুমি এখানে কি করছ?

রেণুমা উত্তর দিলেন, যখনই এই বাড়িতে বাবার নাম কীর্তন হয়, তখনই আমি চলে আসি।

গুরিয়া আরও প্রশ্ন করলেন, তোমার নিকট আত্মীয়া বাসুদি তোমাকে স্বপ্নে দেখেছেন, তুমি কোন এক বরফে ঢাকা পাহাড়ের উপর বাবা লোকনাথের কাছে আছ। দিদু, সত্যিই কি তুমি বাবার কাছে থাক?

রেণুমা বললেন, হ্যাঁ, আমি তাঁর কাছেই আছি। ভোর হয়ে আসছে। আমি এখন যাই।

এই বলে তখনই অন্তর্হিত হলেন রেণুমা।

রেণুকণা নাগের মত অনেক ভক্তেরই বাবার দর্শন না পাওয়ার জন্য অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা থাকে মনে। থাকে এক চাপা ক্ষোভ। কিন্তু হতাশ হয়ে ভক্তির সাধনায় পিছিয়ে পড়লে হবে না। পরম করুণাময় মঙ্গলময় বাবা সারা জীবনের মধ্যে একদিন না একদিন দর্শন অবশ্যই দেবেন—এই বিশ্বাসকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে থাকতে হবে অন্তরে ভক্তি ও আকুতি নিয়ে।

বাবা লোকনাথ যে আজও শরণাগত ভক্তকে সর্বদাই রক্ষা করছেন, তার

অবিনাশী আত্মা যে এই বিশ্বের মধ্যেই বিরাজিত আছে, সেই পরম সত্যটি ভক্তদের জানাবার জন্যই ত বাবা কিছুদিনের জন্য রেণুকণাকে নিত্যধাম হতে এই মর্ত্যধামে পাঠিয়ে দেন।

ওঁ

বাবা লোকনাথের অসীম কৃপা ও করুণাময় নিত্যলীলার আর একটি ঘটনার কথা শোনা যায় এক বিলাত ফেরত এঞ্জীনীয়ারের মুখ থেকে। তাঁর বর্তমান ঠিকানা কলকাতার অন্তর্গত পর্ণশ্রী, বেহালা। তিনি নিজমুখে ঘটনার যে বিবরণ দেন তা যথাযথ লিখিত হলো।

আমার পিতৃদেব ছিলেন ভারত সরকারের এক উচ্চপদস্থ অফিসার। তিনি আচার বিচার, চালচলন ও জীবনযাত্রায় ছিলেন পুরোদস্তুর সাহেব। ধর্ম, ঈশ্বর, পূজাপার্বণ ইত্যাদিতে তাঁর কোন আগ্রহ ছিল না। কিন্তু আমার মা ছিলেন সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। আচার আচরণ ও চালচলনে তিনি ছিলেন খাঁটি হিন্দু। পূজা পার্বণ, তিথি নক্ষত্র ও শুভাশুভ মানা ও বিচার করে চলা ছিল তাঁর দৈনন্দিন জীবনের অঙ্গ। তিনি ছিলেন বাবা লোকনাথের একনিষ্ঠ ভক্ত।

কিন্তু কোন সূত্রে বাবা লোকনাথ মাকে আকর্ষণ করতেন এবং কেনই বা তিনি তাঁর একনিষ্ঠ ভক্ত হয়ে উঠেছিলেন, সে ইতিহাস আমার জানা নেই। শুধু জ্ঞান হওয়ার পর থেকেই দেখছি, এই মহাপুরুষ আমাদের পরিবারেই একজন এবং আমার মায়ের গুরু ও আরাধ্য দেবতা।

আমার পিতৃদেব ও জননী দুজনে দুই বিপরীত মেরুর মানুষ হয়েও কিভাবে দীর্ঘকাল সব দ্বন্দ্ববিবাদ পরিহার করে মিলে মিশে সংসার করে গেলেন, সে এক আশ্চর্য ব্যাপার। পরিণত বয়সে ভেবেছি, এও হয়ত বাবা লোকনাথের দয়াতেই সম্ভব হয়েছে।

আমার পিতৃদেব বেশীর ভাগ সময়ই বিদেশে থাকতেন। কখনো আমেরিকা, কখনো ইংলণ্ড ও রাশিয়ায় থাকতে হত তাঁকে। আমরা ভাই বোন মায়ের তত্ত্বাবধানে দিল্লীতে থাকতাম। যে কোন কাজে আমার মা বাবা লোকনাথকে না ডেকে বা তাঁর পদধূলি না নিয়ে কিছু করতেন না। আমাদের পরীক্ষায় বসার আগে বা বিদেশে যাবার সময় বাবা লোকনাথের

পট ছুঁয়ে প্রণাম করে বেরোতে হত। ক্রমে এটা আমাদের অভ্যাসে দাঁড়িয়ে যায়।

আমার পিতৃদেব মাঝে মাঝে বাড়ি ফিরে মায়ের সব কাণ্ড-কারখানা দেখে মুচকি হাসতেন। হয়ত বাবা জানতেন, মাকে ঐ পথ থেকে ফিরিয়ে আনা অসম্ভব। তাই তিনি কোনদিন বাধা দিতেন না।

অন্তিম অবস্থায় মা সারাদিন বাবা লোকনাথের পুজা, ধ্যান, স্মরণ, মনন ও সেবায় নিমগ্ন থাকতেন। এইভাবে একদিন বাবার চরণে লীন হয়ে যান মা। এ আমার স্বচক্ষে দেখা।

আমি যখন কেমিক্যাল এঞ্জিনীয়ারিং পড়তে বিলেত যাই, তখন মা আমাকে বাবার মূর্তির একটি লকেট দিয়ে বলেছিলেন, বিপদে বাবাকে ডাকবে, সব বিপদ কেটে যাবে। মার কথাই শিরোধার্য করেছি, প্রতিবাদের সব ভাষা হারিয়ে গেছে। মার আন্তরিকতা, ভক্তি ও নিষ্ঠা আমায় মুগ্ধ করেছে।

ইতিমধ্যে আমাদের সংসারে এসেছে এক বিরাট পরিবর্তন। আমার বোনের বিয়ে হওয়ায় জব্বলপুর চলে গেছে। মা স্বর্গতা। আমার পিতৃদেব তৎকালীন, রাষ্ট্রপতির সাথে এক বিরাট দল নিয়ে রাশিয়ায় গেছেন। যাবার আগে আমাকে বলে গেলেন, দিল্লীতে চিত্তরঞ্জন পার্কে যে নূতন বাড়ি তৈরি হচ্ছে, তার যেন যথার্থ তদারকি হয়। একটা চাকরও ঠিক করে গেলেন। আমি বাড়ি তৈরির কাজের দেখাশোনা করি এবং একটি প্রায়-সমাপ্ত ঘরে চাকরকে নিয়ে থাকি। চাকর রান্না করে, দুজনে খাই। এই সময় একদিন পিতৃদেবের একখানি চিঠি পেলাম। জানলাম, তার ফিরতে দেরি হবে। মনটা খারাপ হয়ে গেল। আকাশ পাতাল ভাবছি। রাত্রে জ্বর হলো।

পরদিন সকালে দেখি, সারা দেহে গুটি বসন্ত বেরিয়েছে। চাকর দেখে ভয় পেয়ে গেল। ভয় পাওয়া অস্বাভাবিক নয়। তবে দুবেলা এসে আমায় জল ও দুধ সাবু দিয়ে যেত। সারা দিনরাত একা ঘরে থাকি আর অসহ্য যন্ত্রণায় ছটফট করি।

এইভাবে দুই দিন যাওয়ার পর আমার মার কথা মনে পড়ে গেল। তিনি আমাকে বিপদে বাবা লোকনাথকে ডাকতে বলেছিলেন। তাহলে সব

বিপদ কেটে যাবে।

এবার আমি কায়মনোবাক্যে বাবা লোকনাথকে ডাকতে লাগলাম। বার বার প্রার্থনা করতে লাগলাম, বাবা, তুমি আমাকে এ যন্ত্রণা থেকে বাঁচাও, আমার জীবন রক্ষা করো।

সেইদিন সন্ধ্যার সময় আমার যেন একটু ঘুমের ঘোর এল। এমন সময় বাবা লোকনাথ স্বয়ং জানালা দিয়ে ঘরে ঢুকে আমার মাথা থেকে পা পর্যন্ত হাত বুলিয়ে দিলেন পরম স্নেহভরে। আমি পরিষ্কার চোখ মেলে তাকিয়ে আছি। তাঁকে আমি স্পষ্ট দেখলাম। আমার সর্বাঙ্গ বরফের মত ঠাণ্ডা হয়ে গেল। মুখ দিয়ে একটা কথাও বলতে পারলাম না। চোখের পলকে সেই জ্যোতির্ময় মূর্তি অন্তর্হিত হয়ে গেল। আমি গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়লাম। মনে হলো, কে যেন আমাকে সম্মোহিত করে চলে গেল। আমার কোন শক্তি নেই।

পরদিন সকালে সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গে ঘুম ভেঙ্গে গেল। আমি বিছানায় উঠে বসলাম। এবার নিজের দেহের দিকে চোখ পড়ামাত্র এক বিস্ময়কর অনুভূতিতে সমস্ত মন ভরে গেল আমার। দেখলাম, আমার দেহের কোথাও গুটি বসন্তের চিহ্নও নেই। দেহ আগে যেমন ছিল, তেমনি মসৃণ। আমি তখন সম্পূর্ণ সুস্থ।

ভাবলাম, তবে মার কথাই সত্য। আমার কাতর ডাক শুনে পরম করুণাময় বাবা লোকনাথ এসেছিলেন, আমাকে রোগমুক্ত করে দিয়ে গেলেন তাঁর অলৌকিক শক্তির দ্বারা।

বুঝলাম, বাবার ভক্তের কোন অমঙ্গল হয় না। আজও তিনি নিজে এসে শরণাগতকে রক্ষা করেন। অপার তাঁর করুণা।

এই ঘটনার একমাস পর আমার পিতৃদেব দিল্লী ফিরে আসেন। আমার মুখ থেকে সমস্ত বৃত্তান্ত শুনে কেঁদে ফেললেন। জীবনে তাঁর চোখে প্রথম জল দেখি। তাঁর একমাত্র পুত্রের জীবন রক্ষা পেয়েছে বাবা লোকনাথের দয়ায়।

এর পর আমার পিতা রাজমিস্ত্রী এনে শ্বেতপাথর দিয়ে ঐ বাড়ির একটি ঘরকে মন্দিরে রূপান্তরিত করলেন। তারপর বাবা লোকনাথের এক অপরূপ শ্বেত পাথরের মূর্তি প্রতিষ্ঠা করলেন। ঐ ঘরেই আমার

মার একটি পূর্ণাবয়ব মূর্তিও স্থাপন করা হয়। তাঁর চোখের দৃষ্টিতে বিচ্ছুরিত হতে থাকে ভগবৎ প্রেমের অপূর্ব মহিমা।

অবসর জীবনে আমার পিতা ঐ মন্দিরে বাবা লোকনাথের মূর্তির সামনে বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে ধ্যানমগ্ন হয়ে থাকতেন। পরে মার মূর্তির সামনে গিয়ে তাকাতেই দুচোখে জল ঝরে পড়ত।

হয়ত অতীতে একদিন যে ভুল করেছিলেন, সে ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করতেন।

ওঁ

উত্তরপ্রদেশে হিমালয়ের পাদদেশে আলমোড়ার অন্তর্গত বাগেশ্বরে শ্রীমৎ স্বামী শুদ্ধানন্দ ব্রহ্মচারী একটি ছোট পাহাড়ের উপর যেভাবে বাবা লোকনাথের মন্দিরসহ একটি আশ্রম নির্মাণ করেন তা সত্যিই এক অলৌকিক ব্যাপার।

জায়গাটি জনমানবশূন্য। শুধু পাহাড় আর জঙ্গলে ভরা। সেখানে জলের কোন ব্যবস্থা নেই। কিছুদূরে আছে শুধু তিউমারা নামে ছোট্ট একটি গ্রাম।

তবু বাবা লোকনাথের পরম ভক্ত স্বামীজীর বড় ভাল লেগে গেল জায়গাটি দেখে। তাঁর মনে হলো, এই জায়গাই হলো বাবার মন্দির নির্মাণের উপযুক্ত স্থান। যেমন মনোরম, তেমনি নির্জন।

গ্রামের অধিবাসীদের কাছে কথাটা তুলতেই তারা একযোগে সাহায্যের জন্য উৎসাহভরে এগিয়ে এল। বাবা লোকনাথের নাম শুনেই তারা উৎসাহিত হয়ে উঠল বিশেষভাবে। অথচ আগে তারা কখনও এ নাম শোনেনি। বাবার নামের এমনই মহিমা। তারা সকলে বলল, মহারাজ, আমরা গরীব। কিন্তু মন্দির নির্মাণ করার জন্য যতদূর খাটাখাটুনির দরকার আমরা তা করব।

উচু পাহাড়ের এক জায়গা থেকে পাথর কেটে বয়ে আনতে লাগল তারা। তারপর টিলার উপর মন্দির নির্মাণের সময় কোন কষ্টকেই তারা কষ্ট বলে মনে করল না। সবাই বলাবলি করতে লাগল, লোকনাথ বাবাকা বহুত শক্তি হ্যায় অর্থাৎ লোকনাথ বাবার প্রচুর শক্তি। তিনি শক্তিধর সিদ্ধ মহা-

পুরুষ। এইভাবে বাবার মহিমা ও অলৌকিক শক্তি অনুভব করল তারা।

অবশেষে মন্দির ও আশ্রম নির্মানের পর সেইখানে বাবার সাধন ভজন ও জপ তপ নিয়ে মগ্ন হয়ে পড়লেন স্বামীজী। এই আশ্রমে অবস্থানকালে বাবা লোকনাথের লোকোত্তর কত নিত্য লীলা দর্শন করেন তিনি।

একদিন স্বামীজী তাঁর আসনে বসে আছেন, এমন সময় এক বৃদ্ধা তার কুড়ি বছরের একটি মেয়ে ও পাঁচ বছরের এক শিশুকন্যাকে নিয়ে আশ্রমে এসে উপস্থিত হলো। তারা পাহাড়ের উপরদিকে অবস্থিত যাপেলি নামে একটি গ্রামে বাস করত।

বৃদ্ধা মা কাঁদতে কাঁদতে বলল, বাবা, আমি আর দুঃখ সহ্য করতে পারছি না। আমার এই মেয়েকে আমি দেখে শুনে ভাল ঘরে বিয়ে দিয়ে দিয়েছিলাম। কিন্তু বিয়ের পর একটি কন্যা সন্তান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমার কাছে মেয়েকে রেখে জামাই কোথায় যে চলে গেল, তার আর কোন খোঁজ খবর পাওয়া গেল না। সে বেঁচে আছে কি মরে গেছে তা জানি না। পাঁচ বছর পার হয়ে গেল। আমার মেয়ে কেঁদে কেঁদে পাগল হয়ে যেতে চলেছে। তার জন্য আমাদের সংসারে দুঃখের সীমা নেই। আপনি আমাদের এই দুঃখের হাত থেকে বাঁচান।

মেয়েটির বৃদ্ধা মা এই সব কথা বলল। কিন্তু মেয়েটির মুখে কোন কথা নেই। তার চোখ দিয়ে শুধু নীরবে জল ঝরে পড়ছে আঝোরে।

স্বামীজী তখন ভাবলেন এই ত বাবা লোকনাথের কৃপা ও করুণা উপলব্ধি করার অমূল্য সুযোগ এসে গেছে। তিনি তখন বাবার একখানি ছবি মেয়েটির হাতে দিয়ে বললেন, মা, তুই এই ছবি নিয়ে ঘরে যা। আজ পাঁচ বছর ধরে কত লোকের কাছে দুঃখের কথা জানিয়ে বৃথা কত চোখের জল নষ্ট করেছিস। আজ থেকে মনের সব দুঃখ বাবা লোকনাথকে জানাবি। তোর ঐ চোখের জলে দুবেলা বাবার চরণ ধুইয়ে দিবি। বলবি, তুমিই তোমার ছেলেকে ফিরিয়ে দাও। তোমার অসাধ্য কিছু নেই। যদি কখনো ভুল করেও কোন অপরাধ করে থাকি তবে তা তুমি ক্ষমা করে আমার প্রাণ রক্ষা করো। এই ছোট্ট শিশুটির ভবিষ্যৎ তোমার চরণে সঁপে দিলাম।

দেখবি, বাবা ঠিক তোর প্রাণের আর্ত প্রার্থনা শুনতে পাবেন। তুই ঠিক তাঁর কৃপা পাবি।

আমার কথা শুনে ছবিটি নিয়ে মেয়েটি তার মার সঙ্গে শিশুকন্যাটিকে নিয়ে চলে গেল।

পনের দিন পর স্বামীজীর কাছে খবর এল, বৃদ্ধার নিখোঁজ জামাই তার কাজের যায়গা মিরাট থেকে চিঠি দিয়েছে। মেয়েটির খেয়ালী নামে এক যুবক ভাই ছিল। জামাই খেয়ালীকে লিখেছে, সে যেন তার বোনকে অবিলম্বে মিরাটে নিয়ে আসে।

চিঠি পেয়ে তাদের আনন্দ আর ধরে না। যেন মরা প্রিয়জনকে জীবন্ত ফিরে পেয়েছে দীর্ঘদিন পরে। সঙ্গে সঙ্গে খেয়ালী তার বোনকে নিয়ে ট্রেনে করে রওনা হয়ে পড়ে।

খেয়ালী বেকার যুবক। সংসারে অভাব। তাই যে ভেবেছিল বোনকে মিরাটে পেঁৗছে দিয়ে তার ভগ্নিপতিকে ধরে একটা চাকরি জুটিয়ে নিয়ে সেখানেই থাকবে। এখন বাড়ি ফিরবে না। কিন্তু ট্রেনে যাবার সময় সহসা বাবা লোকনাথকে স্বপ্নে দেখে। বাবা তাকে নির্দেশ দেন, তুই বোনকে পেঁৗছে দিয়ে গ্রামে ফিরে আসবি। তোর মা চিন্তা করছে।

স্বপ্নযোগে বাবা লোকনাথের এই নির্দেশ পেয়ে তার মত পরিবর্তন করে খেয়ালী। সে তার বোনকে মিরাটে ভগ্নিপতির কাছে পেঁৗছে দিয়ে গ্রামে ফিরে আসে।

একদিন সন্ধ্যাবেলায় খেয়ালী আশ্রমে এল স্বামীজীর কাছে। তাকে খুব চিন্তিত দেখে স্বামীজী জিজ্ঞাসা করলেন, কি হয়েছে ?

খেয়ালী উত্তর করল, চাকরি নেই, ঘরসংসার চলবে কি করে ?

তার কথা শুনে স্বামীজী তাকে বললেন, বাবার কাছে এই মুহূর্তে স্থিরাসনে সোজা হয়ে বস। চোখ বন্ধ করে এক মনে এক প্রাণে প্রার্থনা কর। বাবা ঠিক তোর ডাকে সাড়া দেবেন।

সত্যি সত্যিই তাই হলো। সাতদিনের মধ্যেই জল নিগমে চাকরি পেয়ে গেল খেয়ালী।

এর পর খেয়ালীর বোনকে একদিন বাবা লোকনাথ স্বপ্ন দেন, তুই রোজ রোজ আমাকে বাসি ফুল দিস কেন ? তাজা ফুল নিতে পারিস না ?

সেই থেকে মেয়েটির আর ভুল হয়নি এ বিষয়ে। সে বুঝতে পারে লোকনাথবাবা এক জীবন্ত বিগ্রহ। তিনি সর্বদর্শী ভগবান। সকলের

অলক্ষ্যে তিনি সব দেখেন, সব শোনেন। সেই থেকে প্রতিদিন বাবার চরণে তাজা ফুল নিবেদন করত মেয়েটি।

ওঁ

একদিন বাগেশ্বরের আশ্রমে একটি পনের ষোল বছরের ছেলে এসে উপস্থিত হলো। সে আলমোড়ার কলেজে পড়ে। নাম শরৎ সাহা। তাদের বাড়ির অবস্থা ভাল। বাগেশ্বরের বাজারে তার বাবার একটি দোকান আছে। সে চক বাজারে কাকার বাড়িতে থেকে পড়াশুনো করে।

ছেলেটি আশ্রমে এসে স্বামীজীকে বলল, বাবা আমি বড় বিপদে পড়ে আপনার কাছে এসেছি। কিছুদিন আগে আমার কাকার বাড়ির পাশের বাড়িতে একটি মেয়ে আত্মহত্যা করে। ঐ সময় আমি মেয়েটিকে গলায় দড়ি বাঁধা অবস্থায় ঝুলতে দেখেছি।

তার পর থেকে রোজ সন্ধ্যা হলেই অদ্ভুত এক ভয় আমায় পেয়ে বসে। রাতে আমি পড়তে বা ঘুমোতে পারি না। রাত আমার বিভীষিকা হয়ে উঠেছে। এমনভাবে চলতে থাকলে আমি আর বাঁচব না।

তার সব কথা শোনার পর স্বামীজী তাকে বললেন, শরৎ তুই ত ঠিক জায়গায় এসেছিস। তোর আর কোন ভয় নেই।

এই বলে স্বামীজী তাকে বাবা লোকনাথের একটি লকেট দিয়ে বললেন, এটি তুই সর্বদা ধারণ করবি। মনে রাখবি, আজ থেকে বাবা লোকনাথ তোর সঙ্গে আছেন। কোন অশুভ শক্তি তোর কোন অনিষ্ট করতে পারবে না। তুই নির্ভীকভাবে বাবার নাম স্মরণ করবি এবং আনন্দের সঙ্গে যথারীতি পড়াশুনো করবি। তোকে বড় হতেই হবে।

বাবার লকেট নিয়ে ছেলেটি চলে গেল।

দিনকতক পর ছেলেটি আশ্রমে এসে তার অভিজ্ঞতার কথা সব বলল। সে বলল, দেখুন স্বামীজী, বাবার কি কৃপা। যেদিন থেকে আপনি লকেটটি আমাকে দিয়েছেন, সেদিন থেকে মনে আমার কোন ভয় নেই। ভয় কি জিনিস তা আমি জানি না। সব থেকে আশ্চর্যের কথা, একদিন এক বিয়ে উপলক্ষে আমার কাকা কাকিমা পিথড়াগড় যাবার সময় আমাকে বাড়িতে একা রেখে কেমন করে যাবেন তা নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়েন।

কিন্তু বাবার লকেটটি আমার কাছে থাকায় আমার মনে জোর এল। আমার কেবলি মনে হতে লাগল, আমি ত একা নই। বাবা লোকনাথ সব সময় আমার কাছে আছেন। সুতরাং ভয়ের কিছু নেই। এই ভেবে আমি আমার কাকাকে বললাম, তোমরা যাও। আমার জন্য কোন চিন্তা করবে না।

এই বলে আমি তাদের জোর করে পাঠিয়ে দিলাম। আমি একা বাড়িতে রয়ে গেলাম। কিন্তু কোন ভয় লাগল না। যে বাড়িতে একদিন সবাই থাকা সত্ত্বেও ভয়ে আমি রাতে ঘুমোতে পারতাম না, সেই বাড়িতে আমি একা নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে রাত কাটাতে লাগলাম। বাবার এমনই মহিমা।

কথা বলতে বলতে সন্ধ্যা হয়ে গেল। পাহাড় থেকে নেমে ওকে বাড়ি যেতে হবে। সে পথ ভাল নয়। বাঘের উপদ্রব আছে। তাই শরৎকে স্বামীজী বললেন, শরৎ, তুই এত দেরি করছিস কেন? সন্ধ্যার পর একা কিকরে বাড়ি ফিরবি? তোর জন্য আমার চিন্তা হচ্ছে। সঙ্গে ত টর্চও নেই।

শরৎ তখন নির্ভীকভাবে উত্তর করল, বাবাজী, আপনিই শিখিয়েছেন, বাবা যার সঙ্গে থাকেন, তার অনিষ্ট কেউ করতে পারে না। বাবা ত সর্বদাই আমার সঙ্গে আছেন। সুতরাং আমার কোন ভয় নেই।

এই বলে শরৎ অন্ধকারের মধ্যেই পাহাড় থেকে নেমে বাড়ি চলে গেল।

একদিন স্বামীজী সবেমাত্র পুজোয় বসেছেন। এমন সময় হঠাৎ নারী-কণ্ঠের জোর কান্নার শব্দ শুনে আসন ছেড়ে বাইরে এলেন তিনি। দেখলেন এক গ্রাম্য মহিলা কয়েকজন গ্রামবাসীকে সঙ্গে নিয়ে তাঁর কাছে এসে শোকে আকুল হয়ে কাঁদছে।

স্বামীজীকে দেখে তাঁর পায়ের উপর আছাড় খেয়ে পড়ে পাহাড়ী ভাষায় কি সব বলতে লাগল। তার ভাষা বুঝতে না পেরে গ্রামবাসীদের কাছে তার দুঃখের কারণ জানতে চাইলেন স্বামীজী। তাদের থেকে জানতে পারলেন, মহিলার স্বামীর মৃত্যুর পর তার একমাত্র পুত্রসন্তান দশ দিন আগে নিখোঁজ হয়েছে। সে কোথায় গেছে তার কোন খবর পাওয়া যায়নি। পুলিশে খবর দেওয়া হয়েছে। অনেক জায়গায় খোঁজ খবর দেওয়া হয়েছে। কিন্তু কোন সন্ধান পাওয়া যায়নি।

স্বামী বিয়োগের শোক কাটতে না কাটতে একমাত্র পুত্রসন্তানের কোন

খোঁজ না পেয়ে মহিলাটি উন্মাদের মত হয়ে গেছে। কাঁদতে কাঁদতে সে স্বামীজীকে বলল, তুমি সাধুবাবা, তোমাকে আমার ছেলেকে ফিরিয়ে এনে দিতে হবে। তা না হলে আমার যেন মৃত্যু হয়।

মহিলার মাথায় হাত বুলিয়ে তাকে শান্ত করার চেষ্টা করে স্বামীজী তাকে বললেন, মা, তোমার প্রারব্ধ ফুরিয়েছে। তাই তুমি শেষে বাবা লোকনাথের শরণাপন্ন হয়েছ। তাঁর দুয়ারে এসেছ। সাতদিন তুমি কিছু খাওনি। আজ তুমি বাড়ি গিয়ে অন্ন গ্রহণ করো।

এই বলে স্বামীজী তার হাতে বাবার একটি ফটো দিয়ে বললেন, বাবার এই ফটো তোমাকে দিলাম। যতক্ষণ না তোমার ছেলে ঘরে ফিরে আসে, ততক্ষণ বাবার চরণ ছেড়ো না। বাবা তোমাকে ঠিক কৃপা করবেন।

তিন দিন পর মহিলার ছেলে ঘরে ফিরে এল। মহিলা আনন্দে উল্লসিত হয়ে ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে স্বামীজীর সঙ্গে আশ্রমে দেখা করতে এল। তার সঙ্গে গ্রামবাসীরাও ছিল। তারা উল্লাসে বাবা লোকনাথের নামে জয়ধ্বনি দিতে লাগল।

স্বামীজী তখন ছেলেটির গলায় বাবার একটি লকেট পরিয়ে দিয়ে স্বামীজী তাকে বললেন, আজ থেকে তুই বাবা লোকনাথের ছেলে। মাকে এইভাবে কোনদিন কষ্ট দিবি না। বাবা তোর মঙ্গল করবেন।

আর একদিন আশ্রমে স্বামীজীর কাছে স্থানীয় গ্রামবাসী এক যুবক অন্য এক যুবককে নিয়ে এল। যুবকটিকে দেখেই স্বামীজী লক্ষ্য করলেন, ছেলেটির মধ্যে মানসিক ভারসাম্য নেই। উন্মাদের লক্ষণ দেখা যাচ্ছে।

তার সঙ্গের যুবকটির কাছ থেকে স্বামীজী জানতে পারলেন, ছেলেটির পিতা সেনাবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত সুবেদার। বাগেশ্বরের বাজারে দোকান আছে তার। ছেলেটি স্থানীয় একটি কলেজে পড়ত। এই সময় পড়াকালে অসৎসঙ্গে পড়ে সর্বনাশা ড্রাগের নেশায় নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে সে। তার বাবা ছেলেকে ড্রাগের নেশা ও সম্ভাব্য মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাবার জন্য দিল্লী পর্যন্ত ঘুরে বহু চিকিৎসা করিয়ে এসেছে। কিন্তু কোন ফল হয়নি।

এর মধ্যে আবার ছেলেটির মধ্যে আত্মহত্যার প্রবণতা দেখা দেয় এবং সে প্রবণতা দিনে দিনে খুব বেড়ে যেতে থাকে। একদিন সে একটি ছতলা বাড়ির ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়ে আহত হয়। কোনরকমে প্রাণে বেঁচে

যায়।

যে যুবকটি ছেলেটিকে সঙ্গে করে এনেছিল, তার কাছে স্বামীজী জানতে পারলেন, ছেলেটি আশ্রমে আসার পথে পাহাড় থেকে লাফিয়ে পড়ার চেষ্টা করেছিল। অতি কষ্টে সে তাকে মন্দিরে আনতে পেরেছে। ছেলেটির দৃঢ় বিশ্বাস, বাবা লোকনাথের কৃপা হলে তার বন্ধুটি নিশ্চয় ভাল হয়ে যাবে।

ছেলেটির মানসিক অবস্থা দেখে স্বামীজী চিন্তায় পড়ে গেলেন। তিনি মুখে কিছুই বলতে পারলেন না। কারণ তিনি লক্ষ্য করলেন, সর্বনাশা ড্রাগের নেশা তাকে শেষ অবস্থায় নিয়ে এসেছে। তার বাঁচার কোন উপায় নেই। তার গায়ের চামড়ার উপর ড্রাগের সর্বনাশা প্রভাবের লক্ষণ ফুটে উঠেছে। বাবা লোকনাথের ছবি তাকে দেওয়ার কোন অর্থ হয় না। কারণ মনের দিক থেকে সে একেবারে অপ্রকৃতিস্থ।

এ অবস্থায় স্বামীজী কি করবেন তা বুঝে উঠতে পারলেন না। তিনি তখন একমনে একাগ্রচিত্তে বাবার কাছে ছেলেটির জন্য প্রার্থনা জানাতে লাগলেন।

তিনি বাবার উদ্দেশে বললেন, বাবা, তুমি যখন ওকে তোমার চরণদর্শনে টেনে এনেছ, তখন তোমার দয়া হবেই। ওকে তুমি কৃপা করো।

তারপর ছেলেটির বন্ধুর হাতে বাবা লোকনাথের একখানি ছবি দিয়ে স্বামীজী তাকে বললেন, বাবার এই ছবিটি ওর বাড়িতে বাবা মার কাছে পেঁছে দেবে। তারা যেন প্রতিদিন বাবার উদ্দেশে তাদের ছেলের রোগ-মুক্তির জন্য তাদের অন্তরের আকুতি ও প্রার্থনা জানায়।

এর পর তাকে বললেন, তোমার বন্ধুটিকে খুব সাবধানে বাড়ি পেঁছে দেবে।

তখন তারা দুজনে চলে গেল।

প্রায় একমাস কোন খবর নেই। মাঝে মাঝে ছেলেটির জন্য চিন্তা হয় স্বামীজীর। পরে একদিন হঠাৎ ছেলেটির বন্ধু এসে হাজির। সে আনন্দের সঙ্গে জানাল, বাবাকী, শক্তিমে মেরা দোস্ত বিলকুল ঠিক হো গয়া হ্যায়। অর্থাৎ বাবার কৃপাশক্তিতে আমার বন্ধু সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠেছে। তাঁর আশীর্বাদে আমার বন্ধু এখন ড্রাগশত্রুর নেশা থেকে একেবারে মুক্ত।

৬

তমাল ভট্টাচার্য নামে একটি যুবকের বাবা মারা যাওয়ার পর সংসারের সব দায়দায়িত্ব তার মাথার উপরে পড়ে। অভাব অনটনের সংসার। তাই বিধবা মা'র চিন্তার অন্ত নেই। তমাল তার একমাত্র পুত্র, কিন্তু তার চাকরি নেই। কি করে সংসার চলবে?

তমালের মার লোকনাথবাবার উপর ভক্তিশ্রদ্ধা ছিল। তাই এই বাবা লোকনাথই তাঁর একমাত্র আশা ভরসা। তমাল লেখাপড়াও শেখেনি। এতে তার মার আরো দুশ্চিন্তা বেড়ে যায়।

অবশেষে বাবা লোকনাথের কৃপায় একটি ওয়েল্ডিং কারখানায় হাতের কাজ শেখার জন্য একটি চাকরি পায়। অতি কষ্টে কোন রকমে সংসার চলতে থাকে।

একদিন কারখানায় তমাল পঞ্চাশ ষাট ফুট উচুতে একটি লোহার বিমের উপর বসে ওয়েল্ডিংএর কাজ করছিল। নিচে থেকে লোহার বিমকে তুলতে হবে। অনেক উচুতে যেখানে বসে কাজ করছিল তমাল তার নিচে ছিল লোহার স্ক্র্যাপ ইয়ার্ড। অর্থাৎ সেখানে জংধরা অনেক ছোট ছোট লোহাও ছড়িয়ে ছিল। একটি ক্রেন নিচ থেকে ওয়েল্ডিং এর কাজের জন্য প্রয়োজনীয় জিনিস তমালের হাতে পেঁছে দিচ্ছিল।

তমাল একবার নিচে তাকিয়ে দেখল হঠাৎ ক্রেনচালক ক্রেন বন্ধ করে কোথায় যাচ্ছে। ক্রেন বন্ধ আছে ভেবে তমাল কোন দিকে না তাকিয়েই ক্রেনের সাঁড়াসির মত অংশে তার হাত চালিয়ে দেয়। এমন সময় অন্য এক চালক ক্রেনটি চালাতে থাকে। তমাল তা লক্ষ্য করেনি।

মুহূর্তের মধ্যে ঘটে যায় এক দুর্ঘটনা। তমালের হাতটি তখন ক্রেনের সেই সাঁড়াসির মত হাতলের মধ্যে ঢুকতে শুরু করেছে। এ অবস্থায় মৃত্যু অবধারিত। তার গোটা দেহটাই ঢুকে যাবে তার মধ্যে।

সহসা কে যেন তার মধ্যে থেকে বাবা লোকনাথকে স্মরণ করতে বলে তাকে। তমাল তখন তার বুকে ঝোলানো বাবার লকেটটি অন্য হাতে সজোরে চেপে ধরে প্রাণপণে 'বাবা' বলে চিৎকার করে জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। কিন্তু চেতনা হারিয়ে যাবার আগেই অলৌকিকভাবে তার হাতটি ক্রেনের হাতলের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসে। কিন্তু অত উচুতে দেহের ভার

সাম্য বজায় রাখতে না পেরে সেই পাঁচতলা সমান উঁচু থেকে পড়ে যায় তমাল। পড়ার আগে অর্ধচেতন অবস্থায় সে দেখতে পায়, নিচে জটাধারী দীর্ঘকায় এক নগ্ন সন্ন্যাসী দুহাত বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আর কিছু স্মরণ নেই তার।

কিন্তু তমালের দেহটা নিচে সেই ভংঘরা টুকরো লোহার স্তূপের উপর না পড়ে রবারের এক কনডেয়ার বেল্টের উপর পড়ে স্প্রিং করে লাফিয়ে পাশের মাটিতে পড়ে।

চেতনা ফিরে পেয়ে তমাল দেখে সে একটি এ্যাম্বুলেন্সের মধ্যে শুয়ে আছে। কিন্তু গুরুতর কিছু হয়নি তার। শুধু কপালের কাছে আর হাতের কনুইয়ের কাছে একটু কেটে গেছে। প্রাণে বেঁচে গেছে সে।

কারখানার লোকেরা সমস্ত ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে যায়। চালু ক্রেনের হাতল থেকে তমালের হাতটির বেরিয়ে আসা এবং তার পতনশীল দেহটির লোহার উপর না পড়ে রবারের কনডেয়ার বেল্টের উপর পড়া—দুটি ঘটনাই অলৌকিক এবং বুদ্ধি দিয়ে তারা তা কিছুতেই ব্যাখ্যা করতে পারে না।

তাদের কথা শুনে তমাল তার গলার লকেটটি তাদের দেখিয়ে বলল, এ হচ্ছে পরমপুরুষ বাবা লোকনাথের লীলা। আমি স্পষ্ট দেখেছি আমি যখন পড়ে যাই তখন বাবা দুহাত বাড়িয়ে দাঁড়িয়েছিলেন নিচে। তিনিই কৃপা করে নিশ্চিত মৃত্যুর করাল গ্রাস থেকে আমার প্রাণরক্ষা করেছেন।

উপস্থিত সকলেই একথা একবাক্যে স্বীকার করল। সকলেই জয় জয়-কার করতে লাগল বাবা লোকনাথের।

সুস্থ হবার পর তমাল একদিন আশ্রমে এসে স্বামীজীকে এই দুর্ঘটনার কথা সব বলে। বলতে বলতে চোখে জল আসে তার। সে তার কপালের ব্যাণ্ডেজটি দেখিয়া বলে, বাবা আমার কপালে রাজতিলক এঁকে দিয়েছেন। আমরা গরীব মানুষ। আমাদের কেউ নেই। কিন্তু আজ বুঝতে পারছি বাবা লোকনাথ আমাদের সহায় আছেন।

ওঁ

১৯৮০ সালের শ্রাবণ মাসের শেষ দিনটি ছিল মনসা পূজার দিন। ঐ

দিন শান্তিময় দাসের স্ত্রী বাড়ির টিউবওয়েলে পাম্প করতে গিয়ে কলের উপর পড়ে যান। গলায় জোর আঘাত লাগে। তাঁর আর্তনাদ শুনে বাড়ির সকলে ছুটে আসে। তাঁকে ধরে ঘরে নিয়ে যায়। দেখা গেল তাঁর গলার কাছটা বেশ ফুলে উঠেছে। তিনি যন্ত্রণায় ছটফট করছেন।

শান্তিময়বাবু স্ত্রীকে তৎক্ষণাৎ বড় ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেলেন। ডাক্তার তখনকার মত কিছু ওষুধ দিলেন। কিন্তু তিনি বলে দিলেন, অবিলম্বে গলার এক্সরে প্লেট তুলতে হবে।

এক্সরে প্লেটে দেখা গেল, গলার হাড় ভেঙ্গে তিন টুকরো হয়ে গেছে। ডাক্তারবাবু বললেন, ঐ জায়গাটা প্ল্যাস্টার করে ছয় মাস বিছানায় শুয়ে থাকতে হবে।

এই সব শুনে কাঁদতে লাগলেন শান্তিময়বাবুর স্ত্রী।

রাত্রিকালে রোগিণী বাবা লোকনাথের কাছে কাতর প্রার্থনা জানালেন, বাবা, কি কারণে তুমি এত শাস্তি দিলে? তুমি কৃপা করে আমার নিরাময় করে দাও।

ভক্তের কাতর প্রার্থনায় বিগলিত হলো পরম করুণাময় বাবার চিত্ত। তিনি রাত্রিশেষে আদেশ করলেন, তুই চিন্তা করিস না। তোদের বাড়ির পূর্বদিকে এক মসজিদ আছে। সেখানে এক মুসলমান বুড়ীমা আছেন, নাম তাঁর নুরনিহার। তিনি তোকে ভাল করে দেবেন। তুই তাঁর কাছে যা।

রোগিণী তখন তাঁর স্বামীকে ডেকে বললেন, তুমি মসজিদের বুড়ী-মাকে ডেকে আন। বাবা বলেছেন, তিনি আমাকে ভাল করে দেবেন।

শান্তিময়বাবু বুড়ীমার কাছে গিয়ে সব কিছু জানালে তিনি বললেন, আমি রাত্রিকালে নমাজ পড়ে পীরবাবার আদেশ পেলে তবে কাজে হাত দেব।

সেদিন আর ডাক্তারের কাছে যাওয়া হয়নি।

পরদিন সূর্য ওঠার আগেই বুড়ীমা বাড়িতে এসে জানালেন, তিনি পীরবাবার আদেশ পেয়েছেন।

এরপর বুড়ীমা রোগিণীর কাঁধের ব্যাণ্ডেজ খুলে সেখানে নিজের ওষুধ লাগিয়ে সেই স্থানটি বেঁধে দিলেন। তারপর রোগিনীকে ছয়দিন নিরামিষ আহার করতে বলে বিদায় নিলেন।

আশ্চর্যের কথা, ছয়দিন মাত্র বুড়ীমার দেওয়া সেই ওষুধ ব্যবহার করে রোগিণী সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠলেন। ছয়দিন পর হতেই তিনি যথারীতি বাড়ির সব কাজ করতে লাগলেন। শ্রমসাধ্য ভারী কাজগুলি করতেও তাঁর কোন কষ্ট হলো না। সেই সব কাজ করেও তিনি সুস্থ রয়ে গেলেন। শরীরে কোন ব্যথা বা অস্বস্তি অনুভব করলেন না।

বাবা লোকনাথের এ এক অদ্ভুত লীলা। তিনি তাঁর শরণাগত ভক্তকে এক মুসলমান বৃদ্ধার মাধ্যমে আরোগ্য করে তুললেন। আসলে তাঁর এই লীলার মধ্যে আছে সর্বধর্মসমন্বয়ের সূক্ষ্ম নির্দেশ। হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে সকল ধর্মের লোকই যে এক ঈশ্বরের সন্তান, তাঁর অদ্বৈত দৃষ্টিতে যে কোন ভেদাভেদ নেই এবং সকল ধর্মকে সমান মর্যাদা দেওয়াই যে প্রকৃত মানবধর্ম—এই শিক্ষা দেবার জন্যই এই লীলার অবতারণা করেন সমদর্শী বাবা লোকনাথ।

এর পর ১৯৮৭ সালে পৌষমাসে আর একটি ঘটনা ঘটে শান্তিময়ের স্ত্রীর জীবনে। সেবার হঠাৎ তিনি পেটের মধ্যে এক দারুণ যন্ত্রণা অনুভব করতে থাকেন। ডাক্তারের কাছে গেলে তিনি বলেন, রোগটি হলো অ্যাপেন্ডিসাইটিস। অবিলম্বে অপারেশন করতে হবে। তা না হলে বিপদের সম্ভাবনা আছে।

রোগিণী কিন্তু অপারেশান করতে রাজী হলেন না। কারণ তিনি শুধু বাবা লোকনাথকেই জানেন। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস, এবারও বাবাই তাঁকে রোগমুক্ত করবেন।

তাই তিনি কাতর প্রাণে বাবা লোকনাথকে স্মরণ করতে লাগলেন। পণ করলেন, বাবা তাঁকে আরোগ্য করে না দিলে সে বছর মাঘী পূর্ণিমার উৎসবের আয়োজন করবেন না।

স্ত্রী অসুস্থ, তার উপর মাঘী পূর্ণিমার উৎসব হবে না—এই ভেবে মনে ব্যথা পেলেন শান্তিময়বাবু। মনোকষ্টে দিন কাটাতে লাগলেন।

উৎসবের দিনকতক আগে একদিন ভোরবেলায় রোগিণী ঘুম থেকে উঠে স্বামীকে বললেন, বাবা আমার প্রার্থনা শুনেছেন, তোমরা উৎসবের আয়োজন করো।

সেইদিন হতে বাবার আদেশে প্রতি মঙ্গলবার নিরামিষ আহার করতে

থাকেন তিনি। সারা গায়ে বাবার আশ্রমের মাটি মাখতে থাকেন। ধীরে ধীরে তাঁর পেটের সব যন্ত্রণা দূর হয়ে গেল। তিনি সম্পূর্ণরূপে আরোগ্যলাভ করলেন।

বাবা লোকনাথ তাঁর বাণীর মধ্যেই সূক্ষ্মদেহে নিত্য বিরাজ করছেন। তিনি জাগ্রত দেবতা। তাঁর আশ্বাসবাণী অমোঘ, তা কখনও বিফল হয় না। তিনি বলেছিলেন, বিপদে পড়লে আমাকে স্মরণ করিবে। আমি রক্ষা করব।

তাঁর এই অভয়বাণী সত্য হয়েছে। তিনি তাঁর প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছেন। তাঁকে মন প্রাণ দিয়ে ডাকলে সহজেই তিনি ধরা দেন। আমরা তাঁকে ঠিকমত ভালবাসতে না পারলেও কৃপা ও করুণার অন্ত নেই তাঁর।

বিশ্বনাথ সেনগুপ্ত কলকাতার বেদিয়াপাড়া লেনে বাস করতেন। তিনি ছিলেন লোকনাথবাবার পরম ভক্ত। তিনি জাগৃহী নামে এক ধর্মগোষ্ঠীর সদস্য ছিলেন। এই গোষ্ঠীর লোকেরা বিভিন্ন ধর্মসভাতে বাবা লোকনাথ ব্রহ্মচারীর দিব্যজীবন ও লীলাবিষয়ক গান ও অন্যান্য ধর্মসঙ্গীত গেয়ে বেড়াতেন।

সেবার বিশ্বনাথবাবু বাবা লোকনাথের তিরোধান বার্ষিকী উপলক্ষে দমদমে সমীর কুমার দাসের বাড়িতে ধর্মসঙ্গীত গাইতে গিয়েছিলেন জাগৃহী গোষ্ঠীর লোকদের সঙ্গে। সেই অনুষ্ঠানে বিশ্বনাথবাবু ভাবে বিভোর হয়ে বাবা লোকনাথের গানের সঙ্গে শ্যামাসঙ্গীত ও জয়দেবের গীতগোবিন্দের গান গাইতে থাকেন গোষ্ঠীর লোকদের সঙ্গে।

বাড়ি থেকে আসার সময় বিশ্বনাথবাবু ভুল করে তাঁর অফিসের আলমারীর ও টেবিলের ড্রয়ারের চাবির থোকাটি প্যান্টের পকেটে নিয়ে আসেন। গান শেষ করে বাড়ি ফিরে তিনি দেখেন, তাঁর প্যান্টের পকেটে চাবির থোকাটি নেই।

তখন তিনি চাবির সন্ধানে যে বাড়িতে অনুষ্ঠান হয়েছিল সেখানে ছুটে গেলেন। পথের সব জায়গাও তিনি তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখলেন। কিন্তু চাবির থোকাটি কোথাও পেলেন না।

মহাবিপদে পড়লেন বিশ্বনাথবাবু। কারণ ঐ চাবিগুলির কোন দ্বিতীয়

চাবি নেই। চিন্তায় পরদিন অফিস যেতে পারলেন না। পরের দিন দিনের আলোয় আরো ভাল করে পথের সর্বত্র খোঁজ করলেন। কিন্তু চাবির থোকাটি কোথাও দেখতে পেলেন না।

সেদিন বেলা তিনটের সময় বিশ্বনাথবাবু তাঁর মাকে বললেন, বাবা লোকনাথের গান গাইতে গিয়ে চাবির থোকাটি হারালাম। বাবা কি দয়া করে সেটি পাইয়ে দেবেন না ?

তাঁর মা বললেন, বাবা লোকনাথ ব্রহ্মচারীর দয়া অপরিসীম। পৃথিবীতে অসাধ্য কিছুই নেই তাঁর। তুই ভক্তিভরে বাবাকে ডাক। চাবির তোড়া নিশ্চয়ই পাবি।

মার কথা শুনে বিশ্বনাথবাবু ঘর থেকে বারান্দায় এসে দাঁড়াতেই দেখলেন, একটি শালিক পাখি যেখানে গানের অনুষ্ঠান হয়েছিল সেই দিক থেকে চাবির তোড়াটি ঠোঁটে করে এনে বারান্দার ধারে পাঁচিলের উপর ঠক করে ফেলে দিয়ে উড়ে চলে গেল।

এই ঘটনায় আশ্চর্য হয়ে যান বিশ্বনাথবাবু। পরে বুঝতে পারলেন, এ হচ্ছে পরম করুণাময় বাবা লোকনাথের অলৌকিক লীলা। যে চাবির তোড়া পাবার কোন সম্ভাবনা ছিল না, একটা পাখির মাধ্যমে সেই চাবির থোকাটি আনিয়ে দিয়ে তাঁর অলৌকিক কৃপাশক্তির পরিচয় দিলেন।

ওঁ

নির্মলকুমার মিত্র কলকাতার বেহালা অঞ্চলের বাসিন্দা। তিনি বি. ও. সি-র ক্যান্টিন ম্যানেজার হিসাবে চাকরি করতেন। মধ্যবিত্ত পরিবার। একমাত্র নির্মলবাবুর একার রোজগারের উপরে সংসার নির্ভর করত।

কিছুদিন হলো মাঝে মাঝেই শরীর খারাপ করে। গুসগুসে জ্বর, কাশি প্রভৃতি উপসর্গে ভুগতে থাকেন। দিনে দিনে শরীর দুর্বল হয়ে পড়ে। ডাক্তার রোগ পরীক্ষা করে বুকের ফটো তুলতে বলল। শারীরিক অসুস্থতার জন্য নিয়মিত কাজে যেতে পারতেন না।

অগত্যা বাধ্য হয়ে এক্সরে করতে হলো। এক্সরে রিপোর্টে দেখা গেল, টি. বি. অর্থাৎ ক্ষয়রোগ হয়েছে। দুটি ফুসফুসই বিশেষভাবে আক্রান্ত।

মধ্যবিত্ত পরিবার। অল্প আয়। একদিকে খাওয়া পরা ও সংসারের ব্যয়ভার বহনের চিন্তা,। তার উপর টি. বি রোগের চিকিৎসা। চোখে অন্ধকার দেখলেন নির্মলবাবু। দুঃখে ও দুশ্চিন্তায় কাতর হয়ে পড়লেন স্ত্রী।

স্থানীয় প্রফুল্ল ব্যানার্জী ছিলেন নির্মলবাবুর বিশেষ পরিচিত। তিনি নির্মলবাবুর অসুখের কথা জানতেন না। একদিন তিনি ঐ রাস্তা দিয়ে কোথায় যাচ্ছিলেন। তাঁকে দেখতে পেয়ে নির্মলবাবুর স্ত্রী তাঁকে ডেকে বাড়ীতে নিয়ে আসেন।

সমস্ত বৃত্তান্ত প্রফুল্লবাবুকে বলা হলো। সব কিছু শোনার পর তিনি নির্মলবাবুকে বললেন, এ অবস্থায় আমার কিছু করার নেই। কোন উপায় দেখছি না। তবে আমি আপনাকে বাবা লোকনাথের একটি ছবি দিচ্ছি। আপনি এটি বিছানায় বালিশের তলায় রেখে দেবেন আর রোজ রোগবৃত্তান্ত বাবাকে জানাবেন। কাতর কণ্ঠে রোগমুক্তির প্রার্থনা করলে বাবার কৃপা হতে পারে।

প্রফুল্লবাবু ছিলেন বাবা লোকনাথের পরম ভক্ত। সব কথা বুঝিয়ে বলে তিনি বিদায় নিয়ে চলে গেলেন।

সহসা নির্মলবাবুর মধ্যেও বাবা লোকনাথের প্রতি ভক্তিভাব জাগল। তিনি প্রফুল্লবাবুর নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করে যেতে লাগলেন।

পরদিন হতেই দেখা গেল, রোগ দ্রুত আরোগ্যের পথে চলেছে। নির্মলবাবু নিয়মিত বাবা লোকনাথকে স্মরণ করে প্রার্থনা করে যেতে লাগলেন। ক্রমশই উপশম হতে লাগল রোগের।

দু সপ্তাহ পর প্রফুল্লবাবু একদিন নির্মলবাবুর বাড়িতে এলেন খবর নেবার জন্য। তিনি দেখলেন অনেকটা সুস্থ হয়ে উঠেছেন নির্মলবাবু।

প্রফুল্লবাবু তখন নির্মলবাবুর স্ত্রীকে বললেন, বাবার ফটোটি কাল থেকে পুজার আসনে বসিয়ে পুজো করবেন।

পরদিন থেকে বাবার ফটোটি পুজার আসনে বসিয়ে স্বামী স্ত্রী দুজনেই ভক্তিভরে দেবতাজ্ঞানে বাবা লোকনাথের পুজো করে যেতে লাগলেন। তিন মাসের আগেই সম্পূর্ণরূপে সুস্থ ও আরোগ্য হয়ে উঠলেন তিনি।

এদিকে প্রায় তিনমাস কাজে না যাওয়ার জন্য মাইনে পাননি। অল্প

যা পুঁজি ছিল সব অসুখে ও সংসার চালাতে খরচ হয়ে গেছে। তাই সংসার প্রায় অচল। তাই এবার অবিলম্বে কাজে যোগদান করা দরকার।

কিন্তু ভয় ও কুণ্ঠাবোধ করছিলেন নির্মলবাবু। এতদিন পর কাজে যোগদান করতে গেলে অফিসারেরা কে কি বলবেন তা ভাবতে লাগলেন। তাঁর জায়গায় কোন লোক ইতিমধ্যে নেওয়া হয়েছে কিনা এবং তাঁকে আদৌ কাজে যোগদান করতে দেওয়া হবে কি না তা বুঝে উঠতে পারলেন না।

তবু লোকনাথবাবাকে স্মরণ করে মনে কিছুটা বল পেলেন নির্মলবাবু। বাবার কৃপায় বিনা ডাক্তারী চিকিৎসা ও কোনরূপ ওষুধপত্র ব্যবহার না করে সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ করে বাবার প্রতি ভক্তি ও বিশ্বাস অনেক বেড়ে গেছে তাঁর। তাঁর একান্ত বিশ্বাস, যে বাবা তাঁকে এত বড় রোগ থেকে মুক্ত করেছেন, সেই বাবাই তাঁকে চাকরি যাওয়ার এই সম্ভাব্য বিপদ থেকে অবশ্যই উদ্ধার করবেন।

অবশেষে একদিন বাবা লোকনাথকে ভক্তিভরে স্মরণ ক'রে অফিসে চলে গেলেন নির্মলবাবু। কিন্তু কি আশ্চর্য! তিনি অফিসে গিয়ে অবাধে ক্যান্টিনের কাজে যোগদান করলেন। অফিসার মহলে কেউ কোন কৈফিয়ৎ তলব করলেন না।

নির্মলবাবু এবার বেশ বুঝতে পারলেন, অগতির গতি শরণাগত বৎসল বাবা লোকনাথই তাঁর অলৌকিক শক্তির প্রভাবে অফিসারদের মন ঘুরিয়ে তাঁর সকল দুশ্চিন্তা ও উদ্বেগকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে দিয়েছেন।

বেহালাতেই আর একটি আশ্চর্য ঘটনা ঘটে। সুধীর কুমার গাঙ্গুলী বেহালায় পশুপতি ভট্টাচার্য রোডের বাড়িতে থাকতেন। তিনি হাওড়ায় হনুমান জুট মিলে এক উচ্চ পদে কাজ করতেন। তখন তিনি অবসর জীবন যাপন করছিলেন।

সুধীরবাবু পূর্ববাংলার অধিবাসী ছিলেন। দেশবিভাগের পর তিনি সপরিবারে কলকাতায় চলে এসে বেহালায় বসবাস করতে থাকেন। দেশে থাকাকালে তাঁদের পরিবারের বিত্তবান ও বনিয়াদী বংশরূপে খ্যাতি ছিল। দেশ থেকে আসার সময় তাঁরা অনেক বড় বড় কাঁসার থালা ও অন্যান্য বাসন-পত্র সঙ্গে নিয়ে আসেন।

একদিন সকালে সুধীরবাবুর স্ত্রী দুই আড়াই কেজির একখানি

কাঁসার থালায় ডালের বড়ি দিয়ে রোদে শুকাতে দেন। কিছু সময় পরে দেখা গেল, থালাখানা সেখানে আর নেই।

সুধীরবাবুর স্ত্রী সারা বাড়ি তন্ন তন্ন করে খুঁজেও থালাখানির কোন সন্ধান পেলেন না। বহুদিনের সঞ্চিত থালাখানা না পাওয়ায় সেদিন তাঁর আর খাওয়া হলো না।

বাড়িতে রোজ বাবা লোকনাথের ভোগ দেওয়া হত। রাত্রিতে বাবার পূজাবেদীর সামনে থালাটি সম্বন্ধে অনেক কাতর প্রার্থনা জানালেন সুধীর-বাবুর স্ত্রী। তারপর কিছু না খেয়েই শুয়ে পড়লেন।

ভোর রাতে তিনি স্বপ্নে দেখলেন, জটাজুটধারী লেংটিপরা দীর্ঘকায় এক সন্ন্যাসী এসে তাঁকে ঘুম থেকে উঠিয়ে তাঁর সামনে দাঁড়ালেন। তাঁর হাতে ছিল একখানি কাঁসার থালা।

তারপর সেই সন্ন্যাসী মহাপুরুষ তাঁকে বললেন, তুই তোর থালার শোকে না খেয়ে শুয়ে রয়েছিস! এই নে তোর থালা।

এই বলেই তিনি হাতের সেই থালাটি মেঝের উপর সজোরে ফেলে দিলেন। কিন্তু কি আশ্চর্য, থালাটি ফেলার সময় কোন শব্দ হলো না। স্বভাবে থালাটি ফেলে দিয়েই অন্তর্হিত হলেন সেই সন্ন্যাসী।

এদিকে সঙ্গে সঙ্গে ঘুম ভেঙ্গে গেল সুধীরবাবুর স্ত্রীর। তিনি বিছানা হতে শশব্যস্ত হয়ে উঠেই দেখলেন, তাঁর হারানো থালাখানি পড়ে রয়েছে সজোরে উপর।

একই সঙ্গে বিস্ময় ও আনন্দে অভিভূত হয়ে পড়লেন গাঙ্গুলী মশাইএর স্ত্রী। বাড়ির সবাইকে জাগিয়ে তখনি এই অলৌকিক ঘটনাটির কথা বললেন। সকলেই আশ্চর্য হয়ে গেল। সকলেই একবাক্যে বলাবলি করতে লাগল, এ হচ্ছে বাবা লোকনাথেরই অলৌকিক লীলা। সেই মহাপুরুষের অসাধ্য কিছু নেই। কোন ভক্ত বা শরণাগতের দুঃখ তিনি সইতে পারেন না। তার কাতর প্রার্থনা পূরণ না করে পারেন না।

নারায়ণ চন্দ্র দে কলকাতার ভবানীপুরের বাসিন্দা। গঙ্গাপ্রসাদ মুখার্জী রোডে তাঁর বাড়ি। গড়িয়াহাট মার্কেটে 'দে জুয়েলার্স' নামে একটি গয়নার দোকান আছে, তিনি তাঁর মালিক। দিন কতক আগে এক খরিদ্দার কতকগুলি সোনার গয়না তৈরি করতে দিয়ে যায়। জিনিসগুলি তৈরি

করার পর দোকান থেকে সেগুলি হারিয়ে যায়। দু তিন দিন পর জিনিস-গুলি খরিদ্দারকে দিতে হবে। অথচ অনেক খোঁজাখুজি করেও জিনিস-গুলির কোন হদিস পাওয়া গেল না।

দুশ্চিন্তায় দারুণ কাতর হয়ে পড়লেন দে মশাই। এ অবস্থায় তিনি কি করবেন, অনেক ভেবেও তা ঠিক করতে পারলেন না। ভারাক্রান্ত হৃদয়ে তিনি বাড়ি ফিরে গয়না হারানোর কথা বাড়ির সকলকে সব বললেন। মুক্তি নামে তাঁর এগার বছরের একটি মেয়ে ছিল। মেয়েটি বয়সে ছোট হলেও খুবই বুদ্ধিমতী ছিল।

বাড়িতে বাবা লোকনাথের একটি ফটোসহ পূজার আসন ছিল। তার সামনে বসে নিয়মিত তাঁরা বাবার পূজা করতেন।

মুক্তি সব কথা শুনে আপন জনের মত লোকনাথ বাবাকে সব কথা জানাল। তাঁর ফটোর সামনে বসে কাতর কণ্ঠে বলল, বাবা, যদি জিনিস-গুলি পাওয়া না যায় তবে আমার বাবা কি করবেন?

ভক্তিমতী এক সরল বালিকার কাতর প্রার্থনায় সাড়া না দিয়ে পারলেন না করুণাময় ভক্তবৎসল বাবা লোকনাথ।

এর পর মুক্তি কি একটা কাজে তিনতলার ছাদে গিয়েছিল। সেখানে গিয়ে সে দেখল, জিনিসগুলি দোকানে যে অবস্থায় রাখা ছিল এবং পরে হারিয়ে যায়, সেই প্যাকিং করা অবস্থায় ছাদের এককোণে পড়ে রয়েছে।

বাবার হারানো জিনিসগুলি পেয়ে মুক্তির আনন্দ আর ধরে না। সে তৎক্ষণাৎ উল্লসিত হয়ে তার বাবার কাছে গিয়ে বলল, দেখত বাবা, এই জিনিসগুলি কি?

দে মশাই তা হাতে নিয়ে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলেন। প্যাকিং খুলে দেখলেন, খরিদ্দারের জন্য তৈরি করা জিনিসগুলি সব ঠিক আছে। কিন্তু জিনিসগুলি ছাদের কোণে কি করে গেল, তা কিছুতেই ভেবে পেলেন না। পরে বুঝলেন, এই অসম্ভব ব্যাপারটি বাবা লোকনাথের অলৌকিক কৃপা-শক্তির দ্বারাই সম্ভব হয়েছে। বাবা লোকনাথই তাঁর সরল শিশুকন্যার কাতর প্রার্থনায় সাড়া দিয়ে তাঁর হারানো জিনিসগুলি অলৌকিকভাবে এনে দিয়ে তাঁকে এক চরম বিপদে থেকে উদ্ধার করেছেন।

আনন্দের আবেগে কন্যাকে স্নেহভরে বুকে টেনে নিলেন দে মশাই। তাঁর চোখে জল এসে গেল। তিনি অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে বললেন, মা, তুই যখন বাবার ফটোর সামনে প্রার্থনা করছিলি তখন বাবাই তোর মন ঘুরিয়ে সূক্ষ্ম নির্দেশে তোকে ছাদে ডেকে নিয়ে গিয়ে জিনিসগুলি পাঠিয়ে দেন। আমরা মূঢ়, আমরা লোকনাথবাবার যে মর্ম বুঝিনি, তুই এই বয়সেই তা বুঝেছিস। আমি যখন দুঃখে ভেঙ্গে পড়ে শুধু হা হুতাশ করছিলাম, তখন একবারও বাবা লোকনাথের কথা মনে পড়েনি। কোন প্রার্থনাই জানাইনি। কিন্তু তুই আমার কাছ থেকে সব বৃত্তান্ত শুনেই নিজে থেকে পরম বিশ্বাস ও ভক্তির সঙ্গে বাবার কাছে কাতরভাবে প্রার্থনা করিস। তোকে ত কেউ তা করতে বলেনি। আমি তখন বুঝতে পারিনি, বিপন্ন ভক্তের প্রতি বাবার কৃপা ও করুণার সীমা নেই, তুলনা নেই। কিন্তু তুই তা বুঝেছিলি।

ওঁ

ঢাকার নর্থ ব্রুকহল রোডে সুরথলাল দাস বাস করতেন। তার যুবক ছেলে অসীমকুমার দাস ১৩৭৯ সালের আষাঢ় মাস হতে এক দূষিত জ্বরে ভুগছিল।

জ্বর কিছুতেই ছাড়ত না। ১০০ ডিগ্রী সব সময় লেগে থাকত। বড় বড় ডাক্তার দেখিয়ে চিকিৎসা করানো হলো। কিন্তু জ্বরের আসল কারণ ধরা পড়ল না। ডাক্তারেরা রোগ নির্ণয় করতে পারলো না কোনমতেই।

সুরথবাবুর বাড়িতে বাবা লোকনাথের একটি ফটোকে নিয়মিত পুজো করা হত। বাবার তিরোধান দিবস ১৯শে জ্যৈষ্ঠ তারিখে বাবার নামে বাড়িতে প্রতিবার উৎসব হত। বাবা লোকনাথের প্রতি বাড়ির সকলেরই ভক্তিবিশ্বাস ছিল অকুণ্ঠ এবং অগাধ। তাই নয়মাস ধরে ক্রমাগত রোগ ভোগ করেও মনোবল হারায়নি অসীমকুমার।

নয়মাস ক্রমাগত রোগভোগের পর ডাক্তারি চিকিৎসা ও ওষুধের উপর দারুণ বিতৃষ্ণা এসে গিয়েছিল তার। তাছাড়া তখন তার কেবলি মনে হত, একমাত্র মহাযোগী মহাপুরুষ বাবা লোকনাথ ছাড়া তার এ রোগ আর কেউ সারাতে পারবে না। কিন্তু ডাক্তারী চিকিৎসা বন্ধ না করলে বাবা

লোকনাথের কৃপা সে পাবে না। দুটো একসঙ্গে হয় না। ডাক্তারি চিকিৎসা একেবারে বন্ধ করে অটল বিশ্বাস ও অবিচলিত ভক্তির সঙ্গে যদি বাবার উপর নির্ভর করা হয়, অন্তরে আকুতি নিয়ে যদি তাঁকে সর্বক্ষণ ডাকা হয়, তবেই তিনি কৃপা করে তার রোগ সারাবেন।

এই সব ভেবে অসীমকুমার সেই দিন রাত্রিতেই ওষুধ খাওয়া বন্ধ করে দিল। বাপ মার শত চেষ্টাতেও সে ওষুধ খেল না।

সেইদিনই মধ্যরাত্রিতে এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখল অসীম। স্বপ্নের মধ্যে সে স্পষ্ট দেখল, বাবা লোকনাথ ব্রহ্মচারী একগ্লাস জল হাতে নিয়ে তাকে বললেন, নে, এই জলটুকু খেয়ে নে। তোকে আর ওষুধ খেতে হবে না।

পরদিন হতেই আরোগ্যের পথে যেতে লাগল সে। তার নয়মাসে পুরনো দূষিত জ্বর ছেড়ে গেল। তাকে আর ওষুধ খেতে হলো না। কিছুদিনের মধ্যে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠল সে।

বরিশাল জেলার পটুয়াখালির অন্তর্গত খৈরাপাড়া গ্রামনিবাসী চিত্তরঞ্জন রায় একজন ধনী ও গণমান্য ব্যক্তি। তিনি পূর্ববাংলার ঢাকা শহরের পূবালী হোটেলের মালিক। ১৯৭০ সালে তিনি নিজ গ্রামে তাঁর কন্যার বিয়ের আয়োজন করেন।

সেই বিয়ে উপলক্ষে ঢাকার কয়েকজন বিশিষ্ট লোককে নিজ গ্রামে নিয়ে যাবার জন্য নিমন্ত্রণ করেন। ঢাকা থেকে পটুয়াখালি বন্দরে জলপথে যাবার জন্য বরিশাল বিউটি নামে একটি লঞ্চ রিজার্ভ করা হলো। নিমন্ত্রিত অতিথিরা সেই লঞ্চে যাবেন।

বিয়ের আগের দিন লঞ্চটি অতিথিদের নিয়ে ঢাকা হতে সকালবেলায় রওনা হলো। পরের দিন বেলা পাঁচটার সময় লঞ্চটি পটুয়াখালি বন্দরের কাছাকাছি এসে পড়ল।

এমন সময় এক সামুদ্রিক ঝড় শুরু হলো। সেখান থেকে সমুদ্র মাত্র তিরিশ চল্লিশ মাইল দূরে। ক্রমে ঝড়ের গতি প্রবল থেকে প্রবলতর হয়ে উঠল। সারেং অনেক চেষ্টা করেও লঞ্চটিকে নদীর কিনারায় ভেড়াতে পারল না। সেই সময় যাত্রীরা লঞ্চ থেকে দেখতে পেল, তাদের সামনে অদূরে প্রচণ্ড ঝড় ও ঢেউএর আঘাতে তিন চারখানি নৌকা ও দুটি লঞ্চ নদীগর্ভে ডুবে গেল।

এই ভয়ংকর দৃশ্য দেখে ভয়ে যাত্রীদের শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল। তারা জীবনের আশা ত্যাগ করে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হয়ে উঠল। এমন সময় যাত্রীদের মধ্যে একজন সকলকে বাবা লোকনাথের নাম স্মরণ করতে বলল। একমাত্র তিনিই উদ্ধার করতে পারেন তাদের এ বিপদ থেকে। জলে স্থলে অন্তরীক্ষে সর্বত্রই তাঁর সূক্ষ্ম আত্মা বিরাজ করে।

তখন হিন্দু মুসলমান মিলিয়ে লঞ্চে যে পঁচিশজন যাত্রী ছিল, তারা সকলে মিলে বাবা লোকনাথকে স্মরণ করে 'হে বাবা লোকনাথ বাঁচাও, বাবা লোকনাথ বাঁচাও' বলে ডাকতে লাগল।

তখন প্রতিকূল বাতাসের গতিবেগে লঞ্চ সমুদ্রের দিকে যেতে লাগল। লঞ্চের মুখ কিছুতেই ঘোরাতে পারল না সারেং। তা দেখে যাত্রীরা সারেংকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করলে, সে বলল, এখন বিপরীত দিকে লঞ্চ ঘোরাতে গেলে ডুবে যাবে। কোন উপায় নেই। কুলেও ভেড়ানো যাবে না লঞ্চ।

এদিকে ঝড়ের বেগে লঞ্চ বিদ্যুৎবেগে সমুদ্রের দিকে ছুটে যেতে লাগল। এইভাবে অল্প সময়ের মধ্যেই লঞ্চ সমুদ্রে গিয়ে পড়বে। আর তা হলে তাদের প্রাণরক্ষার কোন উপায়ই থাকবে না।

তখন চারদিকে ঘোর অন্ধকার। যাত্রীরা বারবার সারেংকে প্রশ্ন করতে লাগল, সমুদ্র আর কতদূর?

সারেংও বারবার উত্তর করতে লাগল, অন্ধকারে কিছুই দেখতে পাচ্ছি না।

যাত্রীরা তখন অসহায়ভাবে কাতরকন্ঠে লোকনাথবাবাকে ডাকতে লাগল, হে বাবা লোকনাথ বাঁচাও, বাঁচাও।

তাদের আর্ত চিৎকার ও সকাতর প্রার্থনায় অবশেষে বিচলিত হলো পরম করুণাময় বাবা লোকনাথের আত্মা।

অল্প সময়ের মধ্যেই দু তিনটি বজ্রপাত হওয়ার পর ঝড়ের বেগ কমতে লাগল। নদীর বুকে ঢেউ-এর তাণ্ডবনৃত্যও কমে গেল। ঝড়ের বেগ কমার সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল, লঞ্চটি সমুদ্রের অভিমুখে যেতে যেতে পটুয়াখালি বন্দরের অনতি দূরে একটি ঘাটে এসে নোঙর করল। দেখা গেল, যাত্রীদের গন্তব্যস্থল খৈরাপাড়া যেতে হলে যে ঘাটে লঞ্চ ভিড়বার

কথা ছিল সেই ঘাটেই লঞ্চ ভিড়েছে। সমুদ্রের অভিমুখে বেগে ধাবমান নিয়ন্ত্রণহীন লঞ্চ কিভাবে আপনা থেকে নির্দিষ্ট ঘাটে এসে ভিড়ল, তা সত্যিই এক আশ্চর্যজনক ব্যাপার। এটা যে বাবা লোকনাথের কৃপা ভিন্ন আর কোনক্রমেই সম্ভব নয়, তা বুঝতে কারো বাকি রইল না। বাবাই তাঁর অলৌকিক কৃপাশক্তির দ্বারা সমুদ্রাভিমুখী লঞ্চটিকে পশ্চাদমুখী করে নির্দিষ্ট ঘাটে এনে ভিড়িয়ে দিয়েছেন। সকলে তখন ভক্তিভরে বাবা লোকনাথের জয়ধ্বনি দিতে লাগল।

এই যাত্রীদের মধ্যে অনিলকুমার দাস নামে এক ভদ্রলোক পরে ঢাকা থেকে এই ঘটনাটির কথা জানান।

ওঁ

বেহালার অন্তর্গত পেয়ারাবাগানের বাসিন্দা অসীমকুমার চট্টোপাধ্যায় ফুড কর্পোরেশন অফ ইণ্ডিয়াতে চাকরি করেন। অসীমবাবুর মা লোকনাথবাবার পরম ভক্ত।

একদিন অসীমবাবু কিছু জিনিস কেনার জন্য বাজারের দিকে যাচ্ছিলেন। তাঁর মানিব্যাগে পঁচানব্বই টাকা ছিল। সহসা অসাবধানতাবশতঃ তাঁর মানিব্যাগটি তাঁর পকেট থেকে কখন পড়ে যায় তা তিনি বুঝতে পারেননি। অথবা পকেটমারও হতে পারে।

বাড়ি থেকে বেরিয়ে তিনি যে পথ ধরে তিনি যাচ্ছিলেন সেই পথের সর্বত্র তিনি অনেক খোঁজাখুঁজি করলেন। কিন্তু কোথাও ব্যাগটি দেখতে পেলেন না। তাঁরই অসাবধানতার জন্য এতগুলি টাকা তিনি হারালেন—এ কথা ভাবতেই অনুশোচনা তীব্র হয়ে উঠল তাঁর মনে।

যাই হোক, তিনি ভারাক্রান্ত হৃদয়ে বাড়ি ফিরে তাঁর মাকে সব কথা বললেন।

সব কথা শুনে অসীমবাবুর মা বললেন, চিন্তার কোন কারণ নেই। তুমি বিশ্বাস ও ভক্তিসহকারে বাবা লোকনাথের নাম স্মরণ করে বাজারের যেখানে গিয়েছিলে সেইখানে যাও। নিশ্চয়ই তোমার মানিব্যাগ পাবে। মায়ের কথা অবহেলা না করে এখনই সেখানে যাও। শুধু যাবার আগে

বাবার আসনে গিয়ে প্রণাম করে যাও।

মার কথামত অসীমবাবু বাবার আসনে ভক্তিভরে প্রণাম করে ও বাবার নাম স্মরণ করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলেন। বাবা লোকনাথের প্রতি তার মার ভক্তির প্রগাঢ়তা ও বিশ্বাসের দৃঢ়তা দেখে বিস্মিত হন অসীমবাবু। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মধ্যেও সেই ভক্তি ও বিশ্বাস সঞ্চারিত হয়। মুহূর্তে সব দুঃখ ও হতাশা দূর হয়ে যায়।

যেখান পর্যন্ত তিনি গিয়েছিলেন বাজারের পথে সেইখানে ফিরে গেলেন অসীমবাবু। সারা পথ তিনি বাবার নাম জপ করতে লাগলেন। সেখানে যেতেই পাশের এক দর্জি তার দোকান হতে জিজ্ঞাসা করল, আপনি কি খুঁজছেন অসীমবাবু ?

অসীমবাবু উত্তর করলেন, ঘণ্টা দুই আগে পকেটমার হয়েছে।

দর্জি তখন বলল, আপনার ব্যাগে কত টাকা ছিল ?

অসীমবাবু বললেন, পঁচানব্বই টাকা।

দর্জি আবার কত কত টাকার নোট ছিল তা জিজ্ঞাসা করতে অসীম-বাবু সব ঠিক ঠিক বললেন। দর্জি তখন তার দোকান হতে মানিব্যাগটি এনে অসীমবাবুর হাতে দিল। বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলেন অসীমবাবু। একটু আগে তিনি এইখানে কত খুঁজেছেন। কিন্তু কেউ তাকে ব্যাগটির সন্ধান দেয়নি। কিন্তু বাবাকে ভক্তিভরে স্মরণ করতেই তাঁর কৃপায় ব্যাগটি অলৌকিকভাবে পেয়ে গেলেন। বিশ্বাসে যে বস্তু মেলে আজ তা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করলেন অসীমবাবু।

বাড়ি ফিরে মাকে সব কথা বলে বাবা লোকনাথের আসনের সামনে গিয়ে আবার ভক্তিভরে প্রণাম করলেন। মনে মনে বলতে লাগলেন, বাবা, তুমি সত্যিই ভগবান। অপরিসীম অলৌকিক তোমার শক্তি। আমি মূঢ়, পাপী, তাই তোমার মহিমা বুঝতে পারি না। অথচ আমার মা তা বুঝতে পেরে-ছেন। তোমার কাছে আমার প্রার্থনা, তোমার চরণে যেন আমার মতি চির অটুট থাকে, তোমার প্রতি আমার বিশ্বাস আমার মার মতই যেন অটল হয়।

কুমারটুলীর বিখ্যাত মৃৎশিল্পী সুধীরচন্দ্র পাল কৃষ্ণনগর গোয়ারীর অন্তর্গত ষষ্ঠীতলার অধিবাসী। তিনি যেমন ধর্মপ্রাণ, তেমনি সত্যনিষ্ঠ। ১৩৭৮ সালে একদিন পাল মশাই তাঁর গ্রামের বাড়িতে সুস্থ শরীরে বসে

ছিলেন। এমন সময় হঠাৎ গা বমি-বমি ভাব হয়। কিছুক্ষণের মধ্যেই বমি হতে শুরু হলো। বমির সংখ্যা বেড়ে যেতে লাগল ক্রমশঃ। সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তার ডাকা হলো। কিন্তু ওষুধে কোন ফল হলো না।

অল্প সময়ের মধ্যে তিনি উত্থানশক্তিরহিত হয়ে পড়লেন। তারপর জ্ঞান হারিয়ে ফেললেন। বাবা লোকনাথের প্রতি পাল মশায়ের ভক্তি ছিল অগাধ এবং অপরিসীম। যতক্ষণ তাঁর জ্ঞান ছিল তিনি বাবার নাম স্মরণ করেন।

সেই অজ্ঞান অবস্থাতেই তিনি এক স্বপ্ন দেখলেন। তিনি দেখলেন, সহসা ব্রহ্মচারী বাবা সেখানে আবির্ভূত হয়ে তাঁর মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বললেন, তুই ভাল হবি।

এই কথা বলেই বাবা অন্তর্হিত হলেন।

এদিকে সঙ্গে সঙ্গে সুধীরবাবুর জ্ঞান ফিরে এল। আর বমি হলো না। বমি বন্ধ হতেই শরীরে বল পেলেন তিনি।

তখন তিনি বাড়ির সকলকে তাঁর স্বপ্নে পাওয়া বাবার কৃপার কথা বলতেই সকলে আশ্চর্য হয়ে গেল। অজ্ঞান অচৈতন্য অবস্থায় স্বপ্ন দেখা সম্ভব নয়। তাঁরা বুঝতে পারলেন, বাবা লোকনাথই সেই অসম্ভবকে সম্ভব করে তুলে অলৌকিকভাবে সুধীরবাবুকে বাঁচিয়ে দিয়েছেন।

পর্ণশ্রী, বেহালার অধিবাসী ক্ষিতীন্দ্রনাথ সেন দুটি ঘটনার কথা লিখে গেছেন নিজের অভিজ্ঞতা থেকে।

প্রথম ঘটনার কথা উল্লেখ করে তিনি লিখেছেন, তাঁর দীক্ষা গুরু স্বর্গীয় নিশিকান্ত বসু মশায় তখন কলকাতায় তাঁর হিন্দুস্থান পার্কের বাড়িতে থাকতেন। তিনি ছিলেন ব্রহ্মচারীবাবার একনিষ্ঠ ভক্ত ও সেবক।

সেই সময় প্রতি শনিবার তাঁর ৫৫ হিন্দুস্থান পার্কের বাড়িতে ভক্ত সম্মেলন ও ধর্মালোচনা হত। ক্ষিতীন্দ্রনাথবাবু ১৯৪৫ সাল হতে সেই ধর্মসভায় যোগদান করতেন। সেই সময় মিসেস চক্রবর্তী ও মিসেস শুক্লাজীর সঙ্গে ক্ষিতীন্দ্রবাবুর পরিচয় ঘটে।

মিসেস চক্রবর্তীর স্বামী সরকারী ডাকবিভাগে ভাল পদে চাকরি করতেন। ১৯৪২ সালে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। কয়েকমাস ধরে

ক্রমাগত রোগ ভোগ করে চক্রবর্তী মশায়ের প্রাণসংশয় হয়ে ওঠে। অনেক ডাক্তার দেখিয়েও কোন ফল হলো না।

মিসেস চক্রবর্তী খুবই ধর্মপরায়ণা মহিলা ছিলেন। তিনি প্রতিদিন বাড়িতে গৃহদেবতার পুজো করতেন। রোজ পুজোর সময় তিনি দেবতার কাছে স্বামীর প্রাণভিক্ষা চেয়ে প্রার্থনা করতেন।

একদিন দুপুরে মিসেস চক্রবর্তী স্বামীর রোগমুক্তির চিন্তায় বিষাদ-গ্রস্ত হয়ে বসেছিলেন। এমন সময় দেখলেন, জটাধারী লেংটি পরা দীর্ঘ-কায় এক সাধু তাঁর স্বামীর বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে তাঁর গায়ে কমণ্ডলু হতে জল ছিটিয়ে দিয়ে বললেন, তোর স্বামীকে রোগমুক্ত করে দিলাম।

এই বলে সেই সাধু দোতলা হতে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামতে লাগলেন। সাধুকে কিছু বলার জন্য ছুটে গেলেন মিসেস চক্রবর্তী। কিন্তু মুহূর্ত-মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেলেন সাধু।

পরদিন হতে রুগ্ন মরণাপন্ন চক্রবর্তী মশায়ের রোগ দ্রুত আরোগ্য লাভের পথে চলল।

এই ঘটনার দুদিন পর সেই সাধু মিসেস চক্রবর্তীকে স্বপ্নে দর্শন দিয়ে বললেন, তুই ৫৫ নং হিন্দুস্থান পার্কে যা। সেইখানে সব জানতে পারবি।

এই অলৌকিক ঘটনাটি স্বচক্ষে দেখার পর হতে মিসেস চক্রবর্তীর সমস্ত অন্তর এক তীব্র কৌতূহল ও বিস্ময়ে আলোড়িত হচ্ছিল। জানতে ইচ্ছা করছিল, যিনি সূক্ষ্ম শরীরে আবির্ভূত হয়ে তার অযাচিত কৃপারদ্বারা তাঁর স্বামীকে রোগমুক্ত করে দিয়ে গেলেন, সেই মহাশক্তিধর সাধুটি কে! কিন্তু ৫৫ হিন্দুস্থান পার্কের বাড়িতে তিনি কখনো যাননি এবং সে বাড়িটি কার তা তিনি জানেন না।

একদিন মিসেস চক্রবর্তী তাঁর এক পরিচিত লোককে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করতে তিনি বললেন, ঐ বাড়িটি আমি জানি। প্রতি শনিবার সেখানে ধর্মালোচনা হয়। আজই ত শনিবার চলুন না, দেখে আসবেন।

সেইদিনই মিসেস চক্রবর্তী ৫৫ হিন্দুস্থান পার্কের বাড়িতে চলে গেলেন। গিয়ে দেখলেন, সেই সাধু ভক্তপরিবৃত হয়ে বসে রয়েছেন সেখানে। মিসেস চক্রবর্তী ভক্তিভরে তাঁকে প্রণাম করে জানতে পারলেন, ইনিই মহাযোগী মহাশক্তিধর মহাপুরুষ লোকনাথ ব্রহ্মচারী। তখনই অন্ত-

হির্ত হলেন বাবা লোকনাথ।

উপস্থিত সকলকে মিসেস চক্রবর্তী বললেন, এই মহাপুরুষই ত এক-দিন আমাদের বাড়িতে আবির্ভূত হয়ে আমার স্বামীকে রোগমুক্ত করেন এবং স্বপ্নে আমায় দর্শন দিয়ে এখানে আসতে বলেছিলেন।

এই ঘটনার পর হতে মিসেস চক্রবর্তী নানাভাবে বাবা লোকনাথের অহৈতুকী কৃপালাভ করে ধন্য হন।

মিসেস ব্যানার্জী বাংলার স্বদেশী যুগের অনুশীলন সমিতির সংগ্রামী নেতা প্রফুল্লচন্দ্র গাঙ্গুলীর ভগ্নী। তিনি ঢাকায় থাকা কালে শ্রীমৎ বিজয় কৃষ্ণ গোস্বামীর আশ্রম হতে ও রজনী ব্রহ্মচারীর কাছ থেকে বারদীর ব্রহ্মচারী লোকনাথ বাবার লীলাকাহিনী শুনে তাঁর ভক্ত হয়ে ওঠেন। তারপর তিনি নিজ বাড়িতে বাবার একটি প্রতিকৃতি রেখে রোজ ভক্তিভরে পুজো করতেন। বাবা তাঁকে মাঝে মাঝে দর্শন দিয়ে নানা রকমের নির্দেশ দিতেন।

প্রতি শনিবার তাঁদের হিন্দুস্থান পার্কের বাড়িতে ধর্মালোচনার সময় বাবা লোকনাথ যে সুক্ষ্ম শরীরে উপস্থিত থাকতেন, সেকথা নিশিকান্ত বসু মশায় মিসেস ব্যানার্জীকে প্রায়ই বলতেন। গঙ্গাজলের কমণ্ডলুটি বাঁ দিকে রেখে বাবা বসতেন, তা তাঁরা দেখেছেন।

মিসেস ব্যানার্জী কোন এক শনিবারে তাঁর কোন আত্মীয় বাড়ি যাবার জন্য বাড়ি থেকে বার হন। এমন সময় বাবা লোকনাথ তাঁকে সুক্ষ্ম নির্দেশ দিয়ে বলেন, তুই কোথায় যাচ্ছিস? আমি হিন্দুস্থান পার্কের বাড়িতে যাচ্ছি, তুই আয়।

বাবার এই নির্দেশ পেয়ে মিসেস ব্যানার্জী আত্মীয়বাড়ি না গিয়ে সোজা হিন্দুস্থান পার্কের বাড়িতে চলে যান।

সেখানে তিনি যেতেই নিশিকান্ত বসু মশায় তাকে প্রশ্ন করলেন, আচ্ছা বলুন ত মিসেস ব্যানার্জী, বাবার কমণ্ডলু কোন দিকে?

মিসেস ব্যানার্জী উত্তর করলেন, আজ বাবার কমণ্ডলু ডান দিকে কেন? অন্য দিন ত তাঁর আসনের বাঁ দিকে নিয়েই বসেন।

এমন সময় মিসেস চক্রবর্তী এসে বাবার আসনের সামনে প্রণাম করে বললেন, আজ কমণ্ডলুটি ডান দিকে দেখছি কেন?

এর থেকে বোঝা যায় বাবা লোকনাথ স্থূলদেহে না থাকলেও তাঁদের ধর্মসভায় তাঁর সূক্ষ্ম শরীরের উপস্থিতির কথা তাঁরা সকলেই জানতেন এবং তা বুঝতে পারতেন।

একদিন বেহালার ক্ষিতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের স্ত্রী তাঁর স্বামীর সঙ্গে হিন্দুস্থান পার্কের বাড়িতে বিকাল চারটের সময় যান। তখন ১৯৪৬ সাল। তাঁকে দেখে নিশিকান্ত বসু মশায় বললেন, আপনি কাল সকালে স্নান করে আসবেন। আমি আপনাকে দীক্ষা দেব।

তখন সেখানে বাবা লোকনাথের বিশেষ ভক্ত জ্যোতির্ময় দাশগুপ্তও উপস্থিত ছিলেন।

কিছুক্ষণ পর নিশিকান্তবাবু ক্ষিতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বললেন, আমি দেখছি বাবার শরীর হতে একটি জ্যোতি বেরিয়ে এসে আপনার অঙ্গ স্পর্শ করে রয়েছে। মনে হচ্ছে আমাকে দীক্ষা দিতে হবে না, বাবা নিজেই আপনাকে দীক্ষা দেবেন।

সেই রাত্রেই ক্ষিতীন্দ্রবাবুর স্ত্রী এক স্বপ্ন দেখলেন। রাত্রি তৃতীয় প্রহরে তিনি স্বপ্নে দেখলেন, বাবা লোকনাথ সহসা আবির্ভূত হয়ে তাঁর মাথার পাশে দাঁড়িয়ে সংস্কৃত ও ভাল বাংলা ভাষায় তাঁকে নানা উপদেশ দিলেন। কিভাবে পুজো করতে হবে, কিভাবে মন্ত্রপাঠ করতে হবে তা ভালভাবে বলে দিলেন। পরে দীক্ষামন্ত্রটি সহজ সরলভাবে বুঝিয়ে দিয়ে আমাকে জপ করতে বললেন। স্বপ্নটি অনেকক্ষণ স্থায়ী হয়েছিল। দীক্ষা মন্ত্রটি পাছে ভুলে যান তার জন্য মিসেস সেনগুপ্ত একটি কাগজে সেটি লিখে রাখেন।

পরদিন সকালে এই স্বপ্নবৃত্তান্ত তাঁর স্বামীর কাছে প্রকাশ করলেন না। স্নান করে নিশিকান্তবাবুর কাছে দীক্ষা নিতে গিয়েও তাঁকে তা বললেন না।

নিশিকান্তবাবু বাবার প্রতিকৃতির সামনে মিসেস সেনগুপ্তকে বসিয়ে দীক্ষা দিলেন। তখন মিসেস সেনগুপ্ত আগের রাতের ঘটনা ও স্বপ্নবৃত্তান্তটি বললেন এবং কাগজে লিখিত মন্ত্রটি গুরুদেবকে দেখতে দিলেন।

নিশিকান্তবাবু দেখলেন, তাঁর দেওয়া মন্ত্র ও কাগজে লিখিত মন্ত্র

দুটিই এক। তখন তিনি বললেন, দীক্ষার আগে একথা আমাকে বলা উচিত ছিল। গতকালই আমি জ্যোতি লক্ষ্য করে বলেছিলাম, আমার অনুমান বাবাই হয়ত তোমাকে দীক্ষা দেবেন।

এই বলে তিনি মিসেস সেনগুপ্তের মাথায় হাত রেখে আবার বললেন, তুমি মহাভাগ্যবতী। তোমার মত ভাগ্য ক'জনের হয়?

এর পর তাঁর স্বামীকেও দীক্ষা দিলেন নিশিকান্তবাবু।

ওঁ

ডাক্তার আশুতোষ গাঙ্গুলীর আদি নিবাস ছিল ঢাকা জেলার শ্রীনগর থানার অন্তর্গত কয়কীর্তন গ্রামে। তিনি ছিলেন ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের ডাক্তার। তিনি কার্যোপলক্ষে ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত ইটনা গ্রামে সরকারী ডিসপেন্সারিতে থাকতেন। দেশবিভাগের পর তিনি মধ্যপ্রদেশে সুরগুজা জেলার পইরি কলিয়ারিতে ডাক্তার নিযুক্ত হন।

১৯৬৩ সালের ফাল্গুন মাসে মেজ মেয়ের বিবাহ উপলক্ষে পইরি কলিয়ারি হতে কলকাতায় আসবেন বলে স্থির করেন ডাক্তারবাবু। কলকাতাগামী ট্রেন ধরতে হলে তাঁকে রাত্রি আটটার আগেই চিড়িমিড়ি স্টেশানে পেঁছিতে হবে। পইরি কলিয়ারি হতে চিড়িমিড়ি স্টেশান কুড়ি বাইশ মাইল দূরে। উচু নীচু পাহাড়ী পথ। এই পথ পার হয়ে তাঁকে স্টেশানে যেতে হবে।

সন্ধ্যা সাতটার সময় কলিয়ারি কোয়ার্টার হতে রওনা হতে হবে। কিন্তু রওনা হবার আগে কালবৈশাখীর কালো মেঘ চারদিক অন্ধকার করে আকাশ আচ্ছন্ন করে ফেলল। সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎসহ বজ্রগর্জন শুরু হলো। এ অবস্থায় বাড়ির সকলে যাওয়া স্থগিত রাখতে বলল।

কিন্তু আশুতোষবাবু কোন নিষেধ শুনলেন না। তিনি শুধু একই কথা বারবার বলতে লাগলেন, ব্রহ্মচারী বাবার নাম নিয়ে যখন যাবার জন্য তৈরি হয়েছি, তখন যাবই।

এই বলে তিনি একজন নার্স আর তাঁর এক পুত্রকে সঙ্গে নিয়ে বাসা থেকে জীপ গাড়িতে করে রওনা হয়ে পড়লেন। তখন বৃষ্টি থেমে গেছে। তবে ঝড় তখনও থামেনি। বৃষ্টির জলে অন্ধকার পাহাড়ী পথ পিচ্ছিল

হয়ে পড়েছে। রাস্তার দুপাশে মাঝে মাঝে বিরাট খাদ। ড্রাইভার অতি সাবধানে গাড়ি চালাতে লাগল।

চিঁড়িমিড়ি স্টেশানের দু মাইল আগে পথ ঢালু হয়ে নীচের দিকে নেমে গেছে। সে পথে আবার তিন চারটি বিপজ্জনক মোড় পার হতে হবে। এমন সময় জীপগাড়িটির ব্রেক ফেল করল। ড্রাইভার 'ব্রেক ফেল' বলে চিৎকার করতে লাগল।

একে সামনে তিন চারটে বিপজ্জনক মোড়, তার উপর আবার রাস্তার দুপাশে গভীর খাদ। সকলে বুঝল এমত অবস্থায় মৃত্যু অনিবার্য, কারণ গাড়ির ব্রেক অচল। ডাক্তারবাবু তখন বাবা লোকনাথকে স্মরণ করে এই বিপদ থেকে উদ্ধারের জন্য কাতরভাবে প্রার্থনা জানাতে লাগলেন।

দেখতে দেখতে গাড়িটা বিপজ্জনক মোড়গুলি পার হয়ে গেল। কিন্তু আবার এক বিপদ দেখা দিল। স্টেশানের নিকটে সমতলভূমিতে পড়ার আগে পাহাড়ী পথটি এবার উত্তর দক্ষিণে চলে যাওয়া একটি পথে এসে যেখানে মিলেছে তার সামনে দশহাত দূরে এক বিরাট খাদ। ব্রেক অচল হওয়ায় গাড়ি সোজা গিয়ে অবশ্যই সেই খাদে গিয়ে পড়বে।

ডাক্তারবাবু তখন জীবন বিপন্ন ভেবে শেষবারের মত বাবা লোকনাথকে স্মরণ করে বাবা লোকনাথ 'বাঁচাও, বাঁচাও' বলে জোরে চিৎকার করতে লাগলেন।

এমন সময় গাড়ির গতি আপনা থেকে কমে গেল। এদিকে বৃষ্টির জলের বেগে পাহাড় হতে কিছু শক্ত মাটি ধ্বসে কাদার মত হয়ে সামনে খাদের কাছে জমা হয়ে ছিল। গাড়ির গতিবেগ আগেই কমে গিয়েছিল। এবার খাদের কাছে সেই কাদামাটির স্তূপে এসে তার গতি রুদ্ধ হয়ে গেল। তবে সামনের চাকাদুটি সেই স্তূপ ঠেলে খাদের দিকে এগিয়ে গেল, কিন্তু পিছনের চাকাদুটি আটকে গেল কাদায়। তখন সামনের চাকাদুটি উপর দিকে শূন্যে উঠে যাওয়ায় গাড়ীর আরোহীরা পিছন দিক দিয়ে মাটিতে পড়ে গেল। কিন্তু সকলের দেহ অক্ষত রয়ে গেল। কারো দেহে কোন আঘাত লাগল না। তখন সকলে স্টেশানে গিয়ে যথাসময়ে কলকাতাগামী ট্রেনে উঠে পড়ল।

ডাক্তারবাবু বুঝতে পারলেন, এ হচ্ছে বাবা লোকনাথের অলৌকিক লীলা। বাবাই কৃপা করে তাঁর অলৌকিক শক্তির দ্বারা বৃষ্টি ঘটিয়ে কাদা-

মাটির স্তূপ সৃষ্টি করে ব্রেকফেল জীপ গাড়ির গতি রুদ্ধ করে দিয়েছেন। তা না হলে গাড়িটি সোজা গিয়ে সামনের খাদে পড়ত। কোনক্রমেই তাঁদের প্রাণ বাঁচত না।

কলকাতায় পেঁছে আশুতোষবাবু প্রথমেই বাবা লোকনাথকে প্রণাম করার জন্য গড়িয়া আশ্রমে গেলেন। প্রণাম করার সঙ্গে সঙ্গেই বাবার কণ্ঠস্বর বেজে উঠল তাঁর কানে। বাবা তাকে বলছেন, কিরে খুব বিপদে পড়েছিলি বুঝি?

হেরম্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ঢাকা জেলা বিক্রমপুর পরগণার শ্রীনগর থানার অন্তর্গত দোয়াড়ী গ্রামে বাস করতেন। তাঁর পিতার নাম রজনীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর কন্যার নাম পারুলবালা।

হেরম্বনাথ লোকনাথবাবার পরম ভক্ত ছিলেন। বাবা লোকনাথ ব্রহ্মচারী জীবিত থাকাকালে তিনি প্রতি শনিবার বারদীর আশ্রমে গিয়ে বাবাকে পূজা করতেন। তাঁর বাড়িতে লোকনাথ বাবার প্রতিকৃতি ত্রিসন্ধ্যায় পূজিত হত। এই সব দেখে বাল্যকাল হতেই বাবা লোকনাথের প্রতি বিশেষ ভক্তিশ্রদ্ধা জন্মেছিল পারুলবালার মনে। সে সারাদিনের মধ্যে বেশীর ভাগ সময় যে ঘরে বাবা লোকনাথের প্রতিকৃতি গৃহদেবতারূপে পূজিত হত, সেই ঘরে কাটাতেন দরজা বন্ধ করে।

পারুলবালার বয়স যখন পনের, তখন হেরম্বনাথ কন্যার বিবাহের জন্য চেষ্টা করতে থাকেন। হেরম্বনাথ জমিদারী সেরেস্তায় নায়েবের চাকরি করতেন।

অবশেষে দুটি পাত্রের সন্ধান পেলেন হেরম্বনাথ। একটি পাত্র ডাক্তার, তবে দোজবর। প্রথম পক্ষের স্ত্রী বিয়ের ছয় মাসের মধ্যেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। অন্য পাত্রটি অল্প মাইনের চাকুরে।

বাবা মার মধ্যে তার বিয়ের ব্যাপারে যে সব কথাবার্তা হত, পারুলবালা তা সব শুনত। তা সব বোঝার মত বয়স তার হয়েছিল। সে প্রতিদিন ঠাকুরঘরে গিয়ে বাবা লোকনাথকে তার মনের কথা সব জানাত। তিনি শুধু বলতেন, হে ঠাকুর, তুমি এমন ঘরে আমার বিয়ের সম্বন্ধ ঠিক করে দিও যে ঘরে তুমি আছ, যে ঘরে তোমার পূজা হয়। আমি যেন তোমার চরণে ফুল তুলসী দিতে পারি। আমি ছোট বেলা হতে শুধু তোমাকেই

জানি। তুমিই আমার গুরু, তুমি আমার ইষ্ট এবং তুমিই আমার আরাধ্য ; অন্য কাউকে গুরু বলে, ইষ্ট বলে বা আরাধ্য বলে মানতে পারব না।

এদিকে হেরম্বনাথ ডাক্তার হলেও দোজবর বলে তার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিতে চাইলেন না। যে ছেলেটি অফিসে চাকরি করত, তার সঙ্গেই বিয়ে দেবার জন্য মনস্থির করলেন। এ বিষয়ে বাড়ির কারো কোন আপত্তি শুনলেন না। ডাক্তার ছেলেটির বংশমর্যাদা, বাড়ির অবস্থা, বিদ্যাবুদ্ধি, স্বাস্থ্য—সব কিছুই ভাল। তাই বাড়ির অন্যান্য সকলের সেইখানেই বিয়ে দেবার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু বাড়ির কর্তা হেরম্বনাথের বিরুদ্ধে কোন কথা বলার সাহস পেলেন না তাঁরা। সুতরাং হেরম্বনাথ সেই চাকুরে ছেলের সঙ্গেই বিয়ের সম্বন্ধ সব ঠিক করে ফেললেন। শুধু দিনস্থির বাকি।

এদিকে এই সময় সেই ছেলের মা তাঁর ছেলের নামে একটি বীয়ারিং চিঠি ছেলের চাকরির জায়গায় পাঠিয়ে দিলেন। সে চিঠিতে তিনি লিখলেন, তোমার বিয়ের ঠিক হয়েছে আমাদের বিক্রমপুরের শ্রীনগর থানার অধীন দেওয়াড়ী গ্রামের হেরম্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মেয়ের সঙ্গে। এখানে আমার খুবই কষ্টে দিন কাটছে। হাতে টাকা পয়সা নেই, বাজার খরচ নেই। ঘরে চাল, কয়লা, জ্বালানী কাঠ কিছুই নেই। পরনে কাপড় নেই। বিয়ের সময় যে কাপড় পরে নূতন আত্মীয়দের কাছে বেরোতে হবে তারও ব্যবস্থা নেই। তোমরা যদি মেয়ের সম্বন্ধে খোঁজখবর নিতে চাও, তাহলে তা নিতে পার। এর জন্য মেয়ের বাপের ঠিকানা দিলাম। ইতি তোমার মা।

চিঠিখানি নিয়ে একটি বীয়ারিং খামে ভরে ছেলের ঠিকানায় পাঠিয়ে দিলেন। কিন্তু নিজের ঠিকানা বা তারিখ দিলেন না।

চিঠিখানা ছেলের কাছে পেঁছিতে চিঠির উপর প্রেরকের নাম ঠিকানা না থাকায় ছেলে কে তাকে এই বীয়ারিং চিঠি দিয়েছে তার কিছুই বুঝতে পারল না। সে চিঠিখানি না নিয়ে ফেরৎ দিল পিওনের হাতে। ফলে চিঠিখানা ডেড লেটার অফিসে জমা পড়ল।

ডেড লেটার অফিসের লোক তখন প্রেরকের নাম ঠিকানা পাওয়ার জন্য চিঠিখানা খুলে সব পড়ল। কিন্তু তাতে দেখল, প্রেরকের নাম ঠিকানা কিছু নেই। তবে বিয়ের সম্বন্ধের ব্যাপারে হেরম্বনাথের ঠিকানা পেয়ে চিঠিখানি সেইখানে পাঠিয়ে দিল।

হেরম্বনাথ যখন অফিসে ছিলেন তখন চিঠিখানি তাঁর হাতে গেল। তিনিও প্রেরকের নাম ঠিকানা না থাকায় বীয়ারিং চিঠিখানি নিতে চাইলেন না। তখন তাঁর আর্দালী বলল, বাবু চিঠিখানিতে কোন দরকারী কথাও থাকতে পারে। সুতরাং মাত্র দশ পয়সার মায়া না করে চিঠিটা নিয়ে নিন।

আর্দালীর কথামত চিঠিটা নিয়ে তা খুলে পড়ে দেখলেন হেরম্বনাথ। আর্দালীকেও সে কথা শোনালেন। তা শুনে আর্দালী বলল, এমন ঘরে মেয়ের বিয়ে দেবেন না বাবু।

হেরম্বনাথ সব ঘটনা জেনে সব কিছু বিচার করে সেই চাকুরে ছেলের সঙ্গে বিয়ের সম্বন্ধ বাতিল করে দিলেন। পরে তিনি সেই ডাক্তার ছেলের সঙ্গে যোগাযোগ করে তার সঙ্গেই মেয়ের বিয়ে দিলেন।

বিয়ের পর পারুলবালা প্রথম শ্বশুরবাড়ি গিয়েই আশ্চর্য হয়ে গেলেন। দেখলেন, তাঁদের বাড়ির মত এ বাড়িতেও লোকনাথ বাবার প্রতিকৃতি প্রতি-দিন নিয়মিত পুজিত হয়। শুধু তাই নয়, তিনি আরও দেখলেন তাঁর স্বামী বাবা লোকনাথের পরম ভক্ত এবং বাবার নামে অজ্ঞান।

পারুলবালা বুঝতে পারলেন, তাঁর প্রার্থনায় অন্তর্যামী বাবা লোকনাথ সাড়া দিয়ে তাঁর অলৌকিক কৃপাদ্বারা তাঁর মনের অভিলাষ এইভাবে পূরণ করেছেন।

ওঁ

ক্ষিতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত মশায়ের স্ত্রী কিভাবে বাবা লোকনাথের কৃপা লাভ করেন সেকথা আগেই বলা হয়েছে। সেটা ছিল ১৯৪৬ সাল। পরে ১৯৪৮ সালে ক্ষিতীন্দ্রবাবুর জীবনেও এক অলৌকিক ঘটনা ঘটে। তাঁর আদি নিবাস ছিল ঢাকা জেলার অন্তর্গত বিক্রমপুর পরগণায়। পরে তিনি কলকাতার বেহালায় এসে বসবাস করতে থাকেন। ব্রিটিশ আমলে মিঃ সেনগুপ্ত ছিলেন একজন উচ্চপদস্থ সরকারী অফিসার।

দেশবিভাগের সঙ্গে সঙ্গে ভারত সরকারের উপর মহল হতে তাঁকে দিল্লীতে আসার জন্য জরুরী আদেশ দেওয়া হয়। তিনি দিল্লীতে গেলে তাঁর উপর এক নূতন কাজের দায়িত্বভার দেওয়া হলো। দিল্লীতে প্রথম কাস্টমস্ অফিস স্থাপন করা হবে। কালেক্টর হিসাবে কাস্টমস্-এর সমস্ত

কাজ পরিচালনা করতে হবে মিঃ সেনগুপ্তকে। বোম্বাই ছাড়া উত্তর ভারতের সমস্ত অঞ্চলকে দিল্লী কাস্টমস-এর আওতার মধ্যে আনা হলো। ১৯৫১ সালে তৎকালীন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল তখন দেশীয় রাজ্যগুলির ভারতভুক্তির পরিকল্পনাকে কার্যে রূপায়িত করার ব্যাপারে বিশেষ তৎপর হয়ে উঠেছিলেন। সেই সময় তিনি কেন্দ্রীয় এক-সাইজ ও কাস্টমস-এর বড় বড় কর্তা বা কালেকটরদের ডেকে বিভিন্ন দেশীয় রাজ্যের রাজাদের সঙ্গে পরামর্শ করে তাঁদের রাজ্যগুলির চার্জ বুঝে নেবার জন্য আদেশ দেন।

এই বিরাট কাজের ভার নিয়ে মিঃ সেনগুপ্তকে প্রায়ই বিভিন্ন দেশীয় রাজ্যে গিয়ে রাজন্যবর্গের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করতে হত। ১৯৫১ সালের আগস্ট মাসের শেষ দিকে কতকগুলি জরুরী তথ্য সংগ্রহের জন্য চাম্বা, মুণ্ডি ও হিমাচলের রাজ এস্টেটে যেতে হয়েছিল তাঁকে।

মুণ্ডি রাজ্যে গিয়ে তিনি একটা জিনিস লক্ষ্য করে আশ্চর্য হয়ে গেলেন। তিনি দেখলেন মুণ্ডির রাজার নাম যোগেন্দ্র সিং। অথচ রাজ্যের রাস্তা, ঘাট, পুল, স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল প্রভৃতির সঙ্গে যোগেন্দ্র সেন, দেবেন্দ্র সেন, নগেন্দ্র সেন প্রভৃতি নাম যুক্ত রয়েছে। এর কারণ কিছু বুঝতে না পেরে মুণ্ডির রাজাকে প্রশ্ন করলেন, আচ্ছা, আপনাদের উপাধি সিংহ, কিন্তু এখানকার রাস্তাঘাট, স্কুল, কলেজ সবকিছুতে সেন উপাধিধারী লোকের নাম যুক্ত রয়েছে। এই সেন কারা?

মুণ্ডির রাজা তখন বললেন, আপনি হয়ত জানেন না, বাংলার বল্লাল সেনের বংশধরগণ সুজাউদ্দৌল্লার সময়ে মোগলদের অত্যাচারে দেশ ছেড়ে হিমাচল প্রদেশে এসে এই মুণ্ডি রাজ্য স্থাপন করেন। আমি তাঁদেরই বংশধর। আমার প্রপিতামহ বিবাহাদির কারণে সিংহ উপাধি গ্রহণে বাধ্য হন। আমার নাম যোগেন্দ্র সিংহ। আমার পূর্বপুরুষদের দ্বারা স্থাপিত গ্রন্থাগারে আমার পূর্বপুরুষদের অনেক ইতিবৃত্ত জানতে পেয়েছি। সেন বংশের আদি নিবাস ছিল ঢাকা বিক্রমপুর।

মিঃ সেনগুপ্তের বাড়িও ঢাকা বিক্রমপুরে ছিল শুনে রাজা যোগেন্দ্র সিংহ তাঁকে দু তিন দিন তাঁর রাজপ্রাসাদে অবস্থান করার জন্য আমন্ত্রণ জানালেন। মিঃ সেনগুপ্ত সে আমন্ত্রণ গ্রহণ করে দিল্লীর অফিসে টেলিগ্রাম

করে জানালেন, তাঁর ফিরতে দু তিন দিন দেরী হবে।

তাঁর টেলিগ্রাম পেয়ে দিল্লীর কর্তৃপক্ষ তাঁকে টেলিগ্রাম করে জানালেন, ৪ঠা সেপ্টেম্বর সকালে তাঁকে অবশ্যই দিল্লীতে থাকতে হবে। কারণ ৩রা তারিখে সর্দার প্যাটেল ও অর্থমন্ত্রী সি. ডি. দেশমুখ অমৃতসর সীমান্তে কাস্টমস্ পোস্টে যাবেন। তাই তাঁকে ৪ তারিখ ভোরে দিল্লীতে থাকতে হবে।

মিঃ সেনগুপ্ত তখন ছিলেন মুণ্ডিরাজ্যের অন্তর্গত কুলুভ্যালিতে। ২রা সেপ্টেম্বর টেলিগ্রাম পাবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাঁর অধীনস্থ সহকারীদের যাবার জন্য প্রস্তুত হতে বললেন। সেই দিনই তাঁরা রওনা হলেন। কিন্তু কুল বাসস্ট্যাণ্ডে এসে বাসে কোন সীট না পেয়ে ফিরে গেলেন। পরদিন অর্থাৎ ৩রা তারিখে ভোর পাঁচটায় বাস ধরার জন্য সেইদিনই বাসে পাঁচ ছটা সীট রিজার্ভ করা হলো।

পরদিন তাঁরা ভোরে বাসযোগে পাঠানকোট হয়ে দিল্লী যাবার জন্য রওনা হলেন। কুলু হতে পাঠানকোট পেঁছিতে সাত আট ঘণ্টা সময় লাগে। দুর্গম পাহাড়ী পথ।

সেই পথে দশ বারো মাইল অতিক্রম করার পর বিপাশা নদীর তীরে এসে বাস পেঁছিল। অপ্রশস্ত রাস্তা চলেছে খাড়াই পাহাড়ের গা ঘেঁষে। একদিকে উচু খাড়া পাহাড়, আর অন্য দিকে খরস্রোতা বিপাশা নদী। এক তরফা রাস্তা।

হঠাৎ দেখা গেল সামনে অনতিদূরে অনেক লোক জটলা পাকিয়ে কি করছে। ড্রাইভার সেইখানে গিয়ে বাস থামালে বাসের যাত্রীরা দেখলেন, ১০।১২ ফুট উচু এবং সেই পরিমাণ লম্বা চওড়া এক বিরাট পাথর রাস্তা জুড়ে পড়ে রয়েছে। সেই পাথর না সরালে বাস চলবে না। ভোর হতে কুলিরা ডিনামাইট চার্জ করে পাথরটা ভাঙ্গতে পারছে না। ডিনামাইট চার্জ করে দেখা গেছে সেই পাথরটার একদিক থেকে মাত্র দুটো ছোট টুকরো উপরে উঠে গেছে। পাথরটা যেমন ছিল তেমনিই আছে। রাস্তার কুলিরা বলল, আবার ডিনামাইট ফিট করতে ৪।৫ ঘণ্টা সময় লাগবে।

এতবড় পাথরটা কোনদিক থেকে গড়িয়ে পড়ল তা কেউ বুঝতে পারল না। কারণ পাহাড়ের গায়ে ঘন শটীগাছগুলো অক্ষত অবস্থায় দাঁড়িয়ে

আছে। পাহাড়ের মাথা থেকে পাথরটা গড়িয়ে পড়লে তার ভয়ংকর চাপ তারা সহ্য করতে পারত না। অনেক গাছই পিষ্ট হত। তিন চার জন পাহাড়ী কুলি পাহাড়ের উপর দিকে কোন জায়গাটা থেকে পাথরটা পড়েছে তা দেখার জন্য পাহাড়ের উপর উঠে গেল। কিন্তু কোথা থেকে পাথরটা ভেঙ্গে পড়েছে তার কোন চিহ্নই পেল না।

মিঃ সেনগুপ্ত ড্রাইভারকে বাস ঘুরিয়ে বিকল্প রাস্তা দিয়ে পাঠান কোট যাবার আদেশ দিলেন। সেইদিন বেলা ৪টায় পাঠান কোট থেকে দিল্লীর ট্রেন ছাড়বে আর সেই ট্রেনের প্রথম শ্রেণীর একটি কামরা রিজার্ভ করা আছে। তখন প্রায় ১২টা বাজে।

কিন্তু তাঁদের বাস বিকল্প রাস্তা দিয়ে বেগে ছুটতে শুরু করলেও বেলা সাড়ে চারটের সময় সে বাস যোগীন্দ্র নগরে পেঁছিল। সেখান থেকে পাঠানকোট অনেক দূর। অর্থাৎ আধ ঘণ্টা আগে দিল্লীর ট্রেন পাঠানকোট ছেড়ে গেছে। তখন মিঃ সেনগুপ্ত ও তাঁর সহকারী অফিসারেরা ঠিক করলেন, এর পর পাঠানকোট গিয়ে কোন লাভ নেই। কারণ স্টেশানে রাতে থাকার মত কোন ভাল ব্যবস্থা নেই। তাই তারা সেদিন কার মত যোগীন্দ্রনগর সারকিট হাউসে থেকে গেলেন। পরদিন বেলা ১১টার বাস ধরে তিনটের সময় পাঠানকোট স্টেশানে পেঁছিলেন।

স্টেশানে পেঁছিতেই মিঃ সেনগুপ্তকে স্টেশান মাস্টার মিস্টার রাক বললেন, গতকাল ৪ টার ট্রেনে প্রথম শ্রেণীতে আপনাদের রিজার্ভেশান ছিল। আপনার জন্য ট্রেন পাঁচ মিনিট লেট বা বিলম্ব করানো হয়েছিল। কিন্তু আপনি খুবই ভাগ্যবান। কারণ গতকাল ট্রেনটি গুরুদাসপুর স্টেশানের নিকট গেলে দেখা যায় সামনে লাইন জলে ডুবে গেছে। ড্রাই-ভারের ইচ্ছা না থাকলেও উপরওয়ালা কর্মচারীর আদেশে সে আস্তে আস্তে ট্রেন চালিয়ে যেতে থাকে জলে ডুবে যাওয়া লাইনের উপর দিয়ে। এক জায়গায় লাইনের নিচে স্লীপারগুলি ভেসে যায়। ফলে যেখানে ট্রেন যেতেই ইঞ্জিনসহ গোটা ট্রেনটি এগার ফুট জলের তলায় ডুবে যায়। একজন যাত্রীও বাঁচতে পারেনি। ঈশ্বর আপনাকে রক্ষা করেছেন। গতকাল ট্রেন ধরতে না পেরে আপনি প্রাণে বেঁচে গেছেন।

এই বলে সাহেব স্টেশান মাস্টার মিঃ সেনগুপ্তের করমর্দন করলেন।

পরে মিঃ সেনগুপ্ত জানতে পারলেন, ঐ ট্রেনে কাশ্মীরের মহারাজার মা ছিলেন। তিনিই জোর করে ড্রাইভারকে সেই অবস্থায় ট্রেন চালাতে বাধ্য করেন। একটি বিরাট খালের পুলের উপর ট্রেনটি ওঠার সঙ্গে সঙ্গে সেই খালের জলে পড়ে ডুবে যায়।

প্রথম শ্রেণীর দশজন যাত্রীসহ চারশো রেলযাত্রী প্রাণ হারায়।

পরদিন প্রথম শ্রেণীর বগীটি জলের তলা থেকে উদ্ধার করা হলো। দিল্লীর কর্তৃপক্ষ সকলের জানা ছিল কালেক্টর মিঃ সেন গুপ্ত ঐ ট্রেনেরই যাত্রী ছিলেন। তাই তাঁরা ধারণা করেছিলেন, মিঃ সেনগুপ্তও প্রাণ হারিয়েছেন। তাঁরা তাঁর মৃতদেহ দিল্লীতে নিয়ে আসার জন্য দুটি জীপগাড়ি পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু দিল্লী-গুরুদাসপুরের রাস্তা বন্ধ থাকায় জীপ ফিরে গিয়েছিল।

পরের দিন এই দুঃসংবাদ খবরের কাগজের মাধ্যমে সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়ে। মিসেস সেনগুপ্ত স্বামীশোকে মুহ্যমান হয়ে পড়লে মিঃ সেনগুপ্তের দু চারজন সহকর্মী তাঁকে এই বলে সান্ত্বনা দেন যে, বিশ্বাস করুন, তিনি লোকনাথ ভক্ত ও আশ্রিত। তাঁর কিছুই হবে না, হতে পারে না। কোন দিনই লোকনাথ ভক্তদের কোন বিপদ হতে শুনিনি। ঘরে আসনে যিনি গৃহদেবতারূপে স্থাপিত রয়েছেন, তিনিই সমস্ত বিপদ হতে রক্ষা করবেন।

মিঃ সেনগুপ্ত পরের দিন দিল্লীতে এসে উপস্থিত হলেন। তিনি যে বাবা লোকনাথের অশেষ করুণার প্রভাবে এ যাত্রা রক্ষা পেয়েছেন তা মর্মে মর্মে অনুভব করলেন। এতক্ষণে সেই পথে পাথর পড়ার রহস্যটি বুঝতে, পারলেন! কোন ঝড়জল নেই, কিন্তু একটি অতবড় পাথর পাহাড় থেকে পথে এসে পড়ল। অথচ পাহাড়ের গাছগুলি অক্ষত রয়ে গেল। বাবা লোকনাথই এই অঘটন ঘটিয়ে তাঁর ভক্ত সন্তানদের প্রাণরক্ষা করেছেন। কারণ সে পাথর তখন সে পথে না পড়লে সেইদিনই তিনি ঐ ট্রেনে চড়ে সকলের সঙ্গে প্রাণ হারাতেন। তিনি এক পরম বিস্ময়ের সঙ্গে উপলব্ধি করলেন, বাবার কৃপা সূক্ষ্মভাবে প্রতিনিয়ত সর্বত্র কিকরে কাজ করে চলেছে। বাবা লোকনাথের প্রতি অগাধ ভক্তি ও শ্রদ্ধায় নূতন করে বিগলিত হলো তাঁর চিত্ত।

অজিতচন্দ্র ঘোষ ছিলেন পূর্ব বাংলার অধিবাসী। দেশ বিভাগের পর তিনি পশ্চিম দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট মহকুমায় এসে স্থায়ীভাবে বাড়ি ঘর করে বসবাস করতে থাকেন। তিনি ছিলেন বাবা লোকনাথের একনিষ্ঠ ভক্ত।

১৯৬৫ সালে শিবচতুর্দশীর দিনকতক আগে তাঁর আকাঙ্ক্ষা হলো, এবার শিবচতুর্দশীর দিন শিবজ্ঞানে বাবার পাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি দেবেন। কিন্তু এই আকাঙ্কা জাগার দু তিন দিন পর হঠাৎ তাঁর শ্বশুরবাড়ি হতে খবর এল, শ্বশুরমশাই কঠিন রোগে শয্যাগত হয়ে আছেন। তিনি মেয়ে জামাইকে শেষ বারের মত দেখতে চেয়েছেন। তখন বাধ্য হয়ে অজিতবাবু সংসারের অসুবিধার জন্য নিজে না গিয়ে স্ত্রীকে পাঠিয়ে দিলেন।

ফলে সেবার এইভাবে বাধা পড়ায় এবং স্ত্রীর অবর্তমানে শিবজ্ঞানে বাবা লোকনাথের পুজা আর হলো না। পরের বছরের অপেক্ষায় রইল।

পরের বছর শিবচতুর্দশীর পনের দিন আগে পাকিস্তান থেকে সহসা খবর এল অজিতবাবুর মেজকাকার মৃত্যু হয়েছে। ফলে বন্ধ হলো আকাঙ্ক্ষিত পুজা। মনে মনে বাবার কাছে নিজেকে মহা অপরাধী বলে অনেক কান্নাকাটি করলেন অজিতবাবু। বারবার ক্ষমা প্রার্থনা করলেন।

চৈত্রমাসের শেষ সপ্তায় একদিন দুপুরবেলায় খাওয়ার পর দোকানের নূতন খাতার চিন্তা করতে করতে ঘুমিয়ে পড়লেন অজিতবাবু। লোকনাথ ব্রহ্মচারীর একটি বড় ফটো মাথার দিকের দেওয়ালে টাঙ্গানো ছিল। সহসা সেই ফটোর ভিতর থেকে কে যেন বলে উঠল কাল সংযমে থাকবি। পরশু-দিন আমার পুজা করবি।

আদেশের সুরে বলা কথাগুলি শোনার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ঘুম ভেঙ্গে গেল। বিছানায় উঠে বসে ফটোর দিকে তাকালেন। সঙ্গে সঙ্গে আবার সেই কথাগুলি একইভাবে ধ্বনিত হলো।

অজিতবাবু ভালভাবে চারদিক দেখে বুঝতে পারলেন, বাবার ফটো হতেই কথাগুলি ধ্বনিত হয়েছে। সুতরাং এ আদেশ স্বয়ং ব্রহ্মচারী বাবার। তিনি তখন একা একা বসে ভাবতে লাগলেন। পাঁচ দিন পরু নূতন খাতা। যদি শিবচতুর্দশী করতে হয় তবে আগামী কালই সংযম পালন করে পরশুদিন পুজা করা কি সম্ভব ?

এমন সময় অজিতবাবুর স্ত্রী এসে তাঁকে বললেন, পরশু দিন নীল পুজো। কাল সংযমে থাকব। রাত্রে ফলমূল খেয়ে পরশুদিন ফলমূল ভোগ দেব। বাজার থেকে ফলমূল আনতে হবে।

অজিতবাবু তখন বাবার স্বপ্নাদেশের কথা স্ত্রীকে বললেন। ঠিক হলো, কাল দুজনেই তাঁরা সংযমে থাকবেন। পরশুদিন বাবার ভোগ দেবেন। শিবের অন্য নাম নীলকন্ঠ; আমরা সংক্ষেপে নীল বলি। বাবা লোকনাথও শিবকল্প। এই কথা স্ত্রীকে বুঝিয়ে দিলেন অজিতবাবু।

দোকানে গিয়ে তিনি পাঁজী খুলে দেখলেন, পরশুদিন সত্যিই নীলের পুজো। তিনি তখন মনে মনে বাবা লোকনাথের উদ্দেশে বললেন, বাবা, তুমি বাঞ্ছা কল্পতরু। তোমার অশেষ কৃপা। যতদিন তুমি দেহে ছিলে, ততদিন তুমি ভক্ত অভক্ত সবার জন্য নিজের জীবন ক্ষয় করে গেছো। আজও প্রতিটি জীবের অন্তরে সূক্ষ্মদেহে থেকে কিভাবে ভক্তবাঞ্ছা পূরণ করে যাচ্ছ তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না।

সেবার নীল পুজোর দিন শিবজ্ঞানে বাবা লোকনাথকে পুজো করে অপার আনন্দ লাভ করলেন অজিতবাবু।

এই ঘটনার দু বছর পর আর একবার বাবা লোকনাথকে শ্রীকৃষ্ণজ্ঞানে পুজা করার বাসনা হয় অজিতবাবুর। তখন ১৯৬৭ সাল, ভাদ্র মাস। জন্মাষ্টমীর মাত্র তিন দিন বাকি। এই শুভ তিথিতে বাবা লোকনাথ ব্রহ্মচারীকে শ্রীকৃষ্ণজ্ঞানে ভোগ দেওয়ার মনস্থ করলেন তিনি।

জন্মাষ্টমীর আগের দিন অজিতবাবু স্ত্রীকে বললেন, কাল পঞ্চ ব্যঞ্জন তাঁর তরকারী রান্না করে ব্রহ্মচারী বাবাকে ভোগ দেব ঠিক করেছি।

স্ত্রী একথায় আনন্দে সম্মত হলেন। এতদিন নিজেরাই যে কোন শুভ তিথিতে ভোগরান্না করে বাবাকে নিবেদন করতেন। বর্তমানে বাড়িতে শ্বাশুড়ী আছেন। কিছুদিন আগে অজিতবাবুর মা বাংলাদেশ হতে বা[illegible]রঘাটে তাঁর কাছে আসেন। তাই এবার শ্বাশুড়ীকে ভোগ রান্না করে দি[illegible]লেন অজিতবাবুর স্ত্রী।

[illegible]কিন্তু অজিতবাবুর মা বললেন, অন্নভোগ রান্না করে দেওয়ার আমার [illegible]রবংশে কোন রীতি নেই। ভবিষ্যতে তোমরা আর কোন দিন এমন

পাপ করবে না। ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্নভোগ কেউ ঠাকুরকে দিতে পারে না।

মার এই নিষেধাজ্ঞা শুনে কি করবেন কিছুই স্থির করতে পারলেন না অজিতবাবু। একদিকে মার নিষেধাজ্ঞা, অন্য দিকে অন্তরের আকুল বাসনা। অবশেষে অন্তরে দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে ঠিক করলেন, বাবা যা করান তাই করবেন। বাবার ইচ্ছা থাকলে তিনিই এর ব্যবস্থা করবেন।

এই ভেবে তিনি নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়লেন। ভোর রাতে স্বপ্নে দেখলেন, তিনখানা ইট দিয়ে উনুন তৈরি করে বাবা নিজেই রান্না করছেন। কিন্তু কাঠগুলি ভিজে বলে জ্বলছে না, প্রচুর ধোঁয়া হচ্ছে। এর পর যে তক্তাপোষে তিনি শুয়েছিলেন, সেই তক্তাপোষের একপাশে বসে বাবা ধোঁয়ার জন্য চোখে হাত দিয়ে বললেন, তোরা আমার খাবারটা রান্না করে দে। কাঠগুলো খুব ভিজে, খুব ধোঁয়া হচ্ছে। তাই আমি পারছি না।

স্বপ্ন শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘুম ভেঙ্গে গেল অজিতবাবুর। তিনি বিছানায় উঠে বসে স্ত্রীকে ডেকে বললেন, মার আদেশ রক্ষা করা যাবে না। ব্রহ্মচারী বাবা স্বপ্নে ভোগ রান্না করে দেবার আদেশ দিয়েছেন। তোমাকেই ভোগ রান্না করে দিতে হবে।

এমন সময় মা এসে অজিতবাবুকে বললেন, বাবা স্বপ্নে আমাকে বলেছেন, বাবা আমাদের হাতের রান্নাই গ্রহণ করবেন। অন্য কারো হাতে নয়।

এইভাবে সূক্ষ্মদেহে স্বপ্নে আবির্ভূত হয়ে ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করলেন সর্বান্তর্যামী বাবা লোকনাথ।

ওঁ

বাদলচন্দ্র দাস পশ্চিম দিনাজপুরের বালুরঘাট মহকুমার এক নদীর ধারে বাস করতেন। তিনি ট্যাক্সিচালক। গরীবের সংসার। কোন রকমে সংসার চলত। স্বামী স্ত্রী দুজনেই ছিলেন বাবা লোকনাথের পরম ভক্ত, লোকনাথগত প্রাণ।

তখন বাংলা ১৩৭৩ সাল। বাদলচন্দ্র মনে মনে সংকল্প করলেন, দোল পূর্ণিমার দিন বাবা লোকনাথকে ভোগ দেবেন এবং সেই উপলক্ষে বাবার কয়েকজন ভক্তকে প্রসাদ পাওয়ার জন্য নিমন্ত্রণ করবেন।

কিন্তু অদৃষ্টের পরিহাস। যে ট্যাক্সিটি তিনি চালাতেন, সেই ট্যাক্সিটি হঠাৎ খারাপ হয়ে গেল। ফলে জীবিকা অর্জনের পথ বন্ধ হয়ে গেল। অথচ দোল পূর্ণিমার মাত্র একমাস বাকি। ক্রমে সংসার অচল হয়ে পড়ল। এদিকে উৎসবের দিন আরও এগিয়ে এল। আর মাত্র ১২।১৩ দিন বাকি।

কিন্তু বাদলচন্দ্র খুব ধীর স্থির স্বভাবের লোক। তিনি এই অবস্থাতে কিছুমাত্র বিচলিত হলেন না। হাসিমুখে বেকারত্বের জ্বালা সব সহ্য করে যেতে লাগলেন। পরিচিতদের সবাইকে দোল যাত্রার দিন লোকনাথবাবার উৎসবে নিমন্ত্রণ করলেন। তাঁর স্ত্রীও স্বামীর মতই ধীর স্থির স্বভাবের। তিনিও তাঁর পরিচিতদের ঐ উৎসব উপলক্ষে নিমন্ত্রণ করলেন। দুজনেই প্রতিদিন তাঁদের মানরক্ষার জন্য বাবার কাছে আকুল প্রার্থনা জানালেন।

অন্তর্যামী বাবা লোকনাথও তাঁদের অন্তরের বাসনার কথা বুঝে তাঁদের কাতর প্রার্থনায় সাড়া দিলেন। বাবার কৃপায় বাদলচন্দ্র এক ভদ্রলোকের গাড়ি চালাবার এক অস্থায়ী কাজ পেয়ে গেলেন। দোলপূর্ণিমার ঠিক নয়দিন আগে। এক সপ্তা কাজ করার পর মালিক তাঁকে পঞ্চাশ টাকা দিলেন।

সেই টাকা নিয়ে বাদলচন্দ্র লোকনাথবাবার পরম ভক্ত অজিতচন্দ্র ঘোষের কাছে গেলেন। টাকাটা তাঁর হাতে দিয়ে বাদলচন্দ্র বললেন, মাসাবধিকাল আমার কাজকর্ম ছিল না। বাবার কৃপায় অস্থায়ী ভাবে একজনের কাছে কাজে লেগেছি। এক সপ্তা কাজ করে এই পঞ্চাশ টাকা পেয়েছি। টাকাটা তোমার হাতে দিয়ে গেলাম। উৎসবের দিন যা যা লাগবে, কেনাকাটা তোমাকেই সব করতে হবে। আমার সময় নেই। রোজ গাড়ি নিয়ে বেরোতে হয়। উৎসবের দিন তুমি তোমার কীর্তনের দল ও আর একটি দল যোগাড় ক'রে নিয়ে যাবে। সঙ্গে বৌমাকেও নিয়ে যাবে। তোমাকেই সব কিছু দেখে শুনে করতে হবে। ঐ দিন সকালে আমাকে পাবে। কলাপাতার ব্যবস্থা আমি করেছি। পাতা বাদে সব দায়িত্ব তোমার।

এই বলে বাদলচন্দ্র অজিতবাবুর উপর উৎসবের সব দায়িত্বভার দিয়ে চলে গেলেন।

অজিতবাবু যথাসময়ে সেই টাকা থেকে চাল ডাল, তেল প্রভৃতি যাবতীয় জিনিসপত্র কিনে বাদলচন্দ্রের বাড়িতে পাঠিয়ে দিলেন। উৎসবের আগের

দিন সব কেনাকাটা হয়ে গেল।

উৎসবের দিন সকালে অজিতবাবু তাঁর স্ত্রীকে ও দুটি কীর্তনের দল নিয়ে বাদলচন্দ্রের বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হলেন। কীর্তনের দল সকাল হতেই কীর্তন করে যেতে লাগল। যথারীতি বেলা বারোটার পরই বাবা লোকনাথের পূজা হয়ে গেল।

এখন প্রসাদ পাবার পালা। প্রথমে যে দুশো লোক উপস্থিত ছিল, তারা সবাই পেট ভরে প্রসাদ পেল। প্রথমবার প্রসাদ বিতরণের পর দেখা গেল আরও দুশো আড়াইশো লোক প্রসাদ পাবার জন্য দাঁড়িয়ে আছে।

অজিতবাবু চিন্তিত হয়ে পড়লেন, তিনি বুঝতে পারলেন না, ঠিক কত লোক নিমন্ত্রিত হয়েছে? জিনিসপত্রের যা কিছু আয়োজন করা হয়েছে, তাতে খুব বেশীসংখ্যক লোককে ত প্রসাদ দেওয়া সম্ভব নয়। তাই অজিতবাবু চিন্তান্বিত মনে ভাঁড়ার ঘরে গিয়ে বাদলচন্দ্রের স্ত্রীকে বললেন, মোট কত লোককে তোমরা নিমন্ত্রণ করেছ?

বাদলচন্দ্রের স্ত্রী বললেন, এখনো ত অনেক প্রসাদ রয়েছে। আপনি সবাইকে বসিয়ে দিন। হয়ে যাবে।

দ্বিতীয়বার আড়াইশো লোককে প্রসাদ বিতরণের পর আবার সেই সংখ্যক লোক এসে উপস্থিত হলো। তারাও সকলে পেট ভরে প্রসাদ পেল। এইভাবে পর পর তিন পঙক্তির লোক প্রসাদ পাবার পর দেখা গেল, প্রসাদ প্রায় দশ আনার মত খরচ হয়েছে। এখনো ছয় আনার মত প্রসাদ অবশিষ্ট আছে।

ক্রমাগত লোক আসছে দলে দলে। আরও দুই পঙ্‌ক্তির লোককে প্রসাদ বিতরণ করা হলো। তারাও পেট ভরে প্রসাদ খেল। তবু প্রসাদ শেষ হলো না। দেখা গেল, বারোশো কলাপাতা নিঃশেষিত হয়েছে। তার মানে বারোশো লোক প্রসাদ পেয়েছে। তবু ভাঁড়ারে অনেক প্রসাদ মজুত আছে। অজিতবাবু বুঝতে পারলেন, বাবা লোকনাথের কৃপাবলেই এটা সম্ভব হয়েছে। বুঝতে পারলেন, নিমন্ত্রিত ছাড়াও বহু লোক এসেছে এবং আসছে। তাই তিনি উৎসাহিত হয়ে তাঁর বাড়িতে লোক পাঠিয়ে একহাজার শালপাতা আনালেন। আরও অনেক লোক প্রসাদ পেল।

সেই শালপাতা সব ফুরিয়ে গেলো তখনো তিনশো লোক খেতে বাকি

আছে। সন্ধ্যার সময় কীর্তনের দলের লোকসহ সেই তিনশো জন লোক একসঙ্গে বসে প্রসাদ গ্রহণ করল। এর পর কীর্তনের দল বিদায় নিতে চাইলে বাদলচন্দ্র বললেন, আপনারা থাকুন। আপনারা আর একবার বাবার নাম করে রাত্রিতে খাওয়া দাওয়া করে এখানেই থাকবেন। কাল সকালে যাবেন।

এত লোক খাওয়ার পরও পরদিন কিছু চাল ডাল অবশিষ্ট ছিল। সুষ্ঠুভাবে সব সংকুলান হয়ে গেল, কোন কিছুরই অনটন পড়ল না।

এইভাবে ভক্তদের দ্বারা অনুষ্ঠিত প্রতিটি উৎসবে বাবা লোকনাথ সূক্ষ্মদেহে উপস্থিত থেকে কিভাবে প্রসাদের পরিমাণ অলৌকিকভাবে বাড়িয়ে দিয়ে ভক্তদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করতেন, বাদলচন্দ্রের উৎসবানুষ্ঠানই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। বাবার অলৌকিক কৃপাছাড়া বাদলচন্দ্র এত কম টাকায় কিছুতেই এত লোক খাওয়াতে পারতেন না।

ওঁ

কলকাতার সত্যেন বসু রোডের বাসিন্দা বনমালী ভট্টাচার্যের স্ত্রী অনুপমা ভট্টাচার্য বিয়ের কয়েক বছর পর হতে দুরারোগ্য হাঁপানী রোগে আক্রান্ত হন। অনুপমার পিতৃকুল ও শ্বশুরকুল দুই কুলই সম্ভ্রান্ত স্থানীয়। তাঁরা তিন বোন। এক বোনের বিয়ে হয় ভদ্রেশ্বরে এবং অনুপমা ও তাঁর এক বোনের বিয়ে হয় একই বাড়িতে।

হাঁপানী রোগে আক্রান্ত হওয়ার পর হতে শ্বাসকষ্টের জ্বালায় অনুপমার মেজাজের পরিবর্তন হয়। তাঁর মেজাজ অতিশয় খিটখিটে ও স্বভাব রুক্ষ হয়ে ওঠে। কথা বলতে দারুণ অনিচ্ছা দেখা দেয়। অসহ্য হাঁপানীর টানে ভদ্রমহিলা জীবন্মৃত অবস্থায় দিন কাটাতে থাকেন। কারো কোন কথাই শুনতে তাঁর ভাল লাগে না।

১৯৭৮ সালের ১লা জুন তারিখে সকাল বেলায় বাড়ির ঝি আনন্দবাজার পত্রিকাটি হাতে নিয়ে অনুপমার কাছে এসে বলল, মাসিমা, ৩রা জুন সালকিয়াতে লোকনাথ বাবার তিরোধান উৎসব।

কথাটা মোটেই ভাল লাগল না অনুপমার। কারণ লোকনাথ বাবার মহিমা সম্বন্ধে তাঁর কোন ধারণা ছিল না। কোন দৈবশক্তিতে তাঁর বিশ্বাস

নেই। তার উপর রোগযন্ত্রণায় জর্জরিত অবস্থায় ক্রমাগত রোগভোগের ফলে এবং কোন ডাক্তারী চিকিৎসায় ফল না হওয়ায় এক নিবিড় হতাশায় আচ্ছন্ন হয়ে ওঠে তাঁর মন।

তার জন্য কাগজখানা একবার বিরক্তির সঙ্গে হাতে নিয়ে সংবাদটির উপর একবার চোখ বুলিয়ে কাগজখানা ঝির হাতে ফিরিয়ে দিয়ে বললেন, কি হবে গো মা দেখে? এমন কোন মহাপুরুষ নেই যিনি আমার এই রোগ সারাতে পারেন।

ঝি তবু বলল, একবার চেষ্টা করে দেখতে পারতেন। বাবা লোকনাথের শরণাগত হয়ে অনেকেই অনেক দুরারোগ্য ব্যাধি হতে মুক্ত হয়েছে।

তবু মনের কোন পরিবর্তন হলো না অনুপমার।

কিন্তু কি আশ্চর্য! বাবা লোকনাথের নাম উচ্চারণ করে এই সব কথা-বার্তা বলার পর হতেই রোগমুক্ত হলেন অনুপমা। যে ভয়ংকর শ্বাসকষ্টে প্রতিনিয়ত কষ্ট পাচ্ছিলেন তিনি এতদিন, তা একেবারে বন্ধ হয়ে গেল। হাঁপানী রোগের কোন লক্ষণই পাওয়া গেল না তাঁর দেহে। তিনি একেবারে সুস্থ ও স্বাভাবিক হয়ে উঠলেন।

এতক্ষণে মনের পরিবর্তন হলো অনুপমার। মহাযোগী মহাপুরুষ বাবা লোকনাথের অলৌকিক শক্তি ও আশ্চর্যজনক মহিমা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করলেন তিনি। বুঝলেন, দৈবশক্তির কী অসাধারণ প্রভাব। সঙ্গে সঙ্গে বাবা লোকনাথের প্রতি অকুণ্ঠ ভক্তি ও বিশ্বাসে চিত্ত বিগলিত হলো তাঁর। কী অপরিসীম উদারতা, মহানুভবতা ও করুণা এই মহাশক্তিধর মহাপুরুষের। যাঁর প্রতি কিছুক্ষণ মাত্র আগে চরম অভক্তি অবিশ্বাস প্রকাশ করেছেন, সেই নিত্যলীলাময় মহাপুরুষ অযাচিতভাবে তাঁর মত এক অভক্ত নাস্তিককে এক মুহূর্তে চিরতরে রোগমুক্ত করলেন।

অনুপমা এবার পরম উৎসাহভরে ঝিকে বললেন, আমি সালকিয়াতে লোকনাথ বাবার উৎসবে যাব।

দুদিন পর অর্থাৎ ৩রা জুন তারিখে সালকিয়ার উৎসবে যোগদান করলেন অনুপমা। কিন্তু বিরাট লোকসমাগম ও অত্যধিক ভীড়ের চাপে প্রসাদ নিয়ে চলে যেতে বাধ্য হলেন। বাবার পূজাবিধি সম্পর্কে উৎসবের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কোন কথা বলার সুযোগ পেলেন না।

উৎসবের প্রায় একমাস পরে অনুপমা সালকিয়াতে গিয়ে উৎসবের কর্তৃপক্ষের কাছে তাঁর সব বৃত্তান্ত খুলে বললেন। তারপর কিভাবে বাবাকে ভোগ নিবেদন করবেন, কিভাবে বাবার প্রতি তাঁর রোগমুক্তির জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবেন এবং কি করলে বাবা তৃপ্ত হবেন—তা সব প্রশ্ন করে জেনে নিলেন।

এইভাবে বাবা লোকনাথের প্রতি ভক্তি ও বিশ্বাস প্রগাঢ় হয়ে উঠল অনুপমার। তিনি বুঝতে পারলেন, মহাপ্রয়াণের দীর্ঘকাল পরেও নিত্যলীলার অন্ত সেই বাবার। তিনি সূক্ষ্ম দেহে ভক্ত অভক্ত নির্বিশেষে প্রতিটি জীবের অন্তরে বিরাজ করে সূক্ষ্মভাবে ক্রিয়া করে যাচ্ছেন।

কলকাতার বেহালায় বনমালী ঘোষাল লেনের বাসিন্দা সত্যেন্দ্রনাথের স্ত্রী মিসেস বন্দনা দত্ত মটর ভেহিক্‌ল্‌স এর একজন পদস্থ কর্মী ছিলেন। ১৯৭৩ সালের জানুয়ারী অথবা ফেব্রুয়ারি মাসে কলকাতায় একটি নূতন রোগের প্রাদুর্ভাব হয়।

অল্প কিছুদিনের মধ্যে এই নূতন রোগটি চারদিকে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু এটি কি ধরনের রোগ এবং কোথা হতে এর উৎপত্তি, চিকিৎসকগণ তা ধরতে পারলেন না। অনেক চিন্তা ভাবনা করেও রোগ নির্ণয় করতে না পেরে তারা মনগড়া চিকিৎসা করতে লাগলেন।

বড় বড় হাসপাতালে অপারেশন বা অস্ত্রোপচারের সাহায্যে এই রোগ সারানো হত।

এই রোগের প্রধান উপসর্গ হলো পায়ের তলায় গোড়ালি ফুলে যেত, দু একদিন পরে মনে হত গোড়ালির ভিতরটা পেকে গেছে। না মাটিতে ছোঁয়ালেই অসহ্য ব্যথা হত।

কোন কোন ডাক্তারের মতে গোড়ালির হাড় বেড়ে যাওয়ার জন্যই এই রোগের সৃষ্টি হয়েছে। অপারেশান ছাড়া উপায় নেই।

মিসেস দত্ত একদিন এই রোগে আক্রান্ত হলেন। কিন্তু বললেন, কিছুতেই তিনি অস্ত্রোপচার করবেন না। তাতে তাঁর রোগ সারে সারবে, না সারে ত না সারবে। বাবা লোকনাথের উপর তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। মনে মনে তিনি তাঁর রোগ নিরাময়ের সব ভার বাবার উপর অর্পণ করলেন।

তিনি কোন ডাক্তারের কাছেও গেলেন না।

তাঁদের বাড়িতে লোকনাথবাবার একটি প্রতিকৃতি আসনে স্থাপিত ছিল। রোজ নিয়মিত ফুল তুলসী দিয়ে সেই প্রতিকৃতিটিকে পূজা করা হত। বাবার কাছে রোজ পূজা ও ভোগ দেওয়ার সময় প্রার্থনা জানাতেন মিসেস দত্ত। স্বামী সত্যেন্দ্রনাথ ডাক্তার দেখাবার পরামর্শ দিলেও তা তিনি গ্রহণ করলেন না।

একদিন কি মনে হলো, মিসেস দত্ত বাবার আসনের ধুলো বাবার রজ মনে করে তা পায়ের গোড়ালির ব্যথার জায়গাটিতে ভাল করে মাখিয়ে দিলেন।

প্রথমবার দেওয়ার পরই দেখা গেল, আর কোন ব্যথা নেই। পায়ের ফুলোও মিলিয়ে গেল এক মুহূর্তে।

মিসেস দত্ত ভক্তিবিগলিত চিত্তে তাঁর এই অলৌকিক আশ্চর্য জনক রোগমুক্তির কথা সকলের কাছে বলতে থাকেন। বিনা ডাক্তারী চিকিৎসায় বিনা অপারেশানে এই কঠিন রোগ একমাত্র মহাযোগী মহাপুরুষ ব্রহ্মচারী বাবার দয়াতেই নিরাময় হয়েছে। সকলেই বলাবলি করতে লাগল, বাবার কী অসীম শক্তি, কী অসীম কৃপা!

বেহালার বনমালী ঘোষাল লেনের বাসিন্দা বিভূতিভূষণ দত্তের ছেলে বলাই দত্ত টালিগঞ্জের আই. টি. আই টেকনিক্যাল কলেজে প্রথম বছরের ছাত্র ছিলেন। তখন ১৯৭৩ সাল। সেই সময় রাজনৈতিক কারণে পাড়ায় পাড়ায় যুবকদের মধ্যে বিবাদ বিসম্বাদ খুনোখুনি লেগেই ছিল।

ঐ বছর ২৩শে ডিসেম্বর তারিখে বলাই দত্ত কলেজ হতে বাড়ি ফিরেই শুনতে পেল, তাদের পাড়ার চোদ্দ পনের বছরের একটি ছেলেকে অন্য পাড়ার কয়েকজন ছেলে এসে ধরে নিয়ে গেছে।

বলাই ছিল স্বভাবতঃ পরোপকারী। পরের কোন দুঃখকষ্ট বা কোন অন্যায় অবিচার সে সহ্য করতে পারত না। বলাই তাই পাড়ার লোকদের বলল, তোমাদের সামনে ছেলেটাকে ধরে নিয়ে গেল। তোমরা কোন বাধা দিলে না বা কোন প্রতিবাদ করলে না। এটা কি প্রতিবেশীর কাজ?

যাই হোক, বলাই পাড়ার দুটি সমবয়সী ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে যে পাড়ার লোকেরা ছেলেটিকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল, সেই পাড়ায় চলে গেল। দেখল

ছেলেটিকে তারা সত্যিই ধরে এনেছে। কয়েকজন যুবক সেই ছেলেটিকে ঘিরে আছে। বলাই তখন সেই যুবকদের এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে তারা বলাই ও তার সঙ্গী ছেলেদুটিকে মারধর করতে লাগল। তাদের হাতে, লাঠি, ছুরি, লোহার রড প্রভৃতি অস্ত্রও ছিল। বলাই তাদের বোঝাতে লাগল, তারা নিরস্ত্র অবস্থায় এসেছে ছেলেটিকে নিয়ে যাবার জন্য, তারা মারামারি করতে আসেনি। তবু যুবকেরা কোন কথা শুনল না। বলাই-এর সঙ্গী দুজনকে মেরে অজ্ঞান করে পুলিসী হামলার ভয়ে পাড়ার বাইরে এক নির্জন জায়গায় রেখে এল। তারপর তারা বলাইএর হাত পা বেঁধে তাকে পুকুরে ডুবিয়ে দেবে বলে ঠিক করল। এই উদ্দেশ্যে তারা তাকে বাঁধা অবস্থাতেই পাড়ার বাইরে গাছপালায় ঘেরা এক নির্জন পুকুরপারে নিয়ে গেল।

বলাই অতি আধুনিক যুগের ছেলে। লোকনাথ বাবার মহিমা সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানত না। তবে তাঁর নাম শুনেছিল এবং জানত তিনি ছিলেন এক শক্তিধর মহাপুরুষ। তাই তাঁর প্রতি একটা ভক্তিভাব ছিল।

বলাই যখন বুঝতে পারল, তার মৃত্যু অবধারিত এবং আসন্ন, তখন হঠাৎ তার লোকনাথবাবার নাম স্মরণ হলো। তখন এক মনে এক প্রাণে আকুলভাবে বাবার কাছে প্রার্থনা জানাতে লাগল, ঠাকুর, তুমি রক্ষা করো, বাবা, তুমি আমাকে বাঁচাও। আমার হাত পা বাঁধা। এরা আমাকে বিনা দোষে হত্যা করতে চাইছে।

এমন সময় এক অলৌকিক কাণ্ড ঘটে গেল। যে ছেলেটি প্রথমে বলাই এর মাথায় লাঠি মেরে অজ্ঞান করে ফেলবে বলে লাঠির ঘা মারতে গেল, তার সেই লাঠির ঘা বলাইএর মাথার উপর না পড়ে তাদেরই দলের একটি যুবকের মাথায় পড়ল এবং তাতেই সে মাথা ফেটে যাওয়ায় অজ্ঞান হয়ে পড়ল। অথচ তার এই লক্ষ্য ভ্রষ্ট হবার কোন কারণ ছিল না। এমন আশ্চর্য অঘটন কখনো ঘটতে দেখেনি সে। তখন তাদের মধ্যে তিন চার জন যুবক আহত যুবককে ডাক্তারখানায় নিয়ে গেল।

তারপর আর একটি যুবক বলাইকে একেবারে ধরাশায়ী করার জন্য তার পায়ে গায়ের সমস্ত শক্তি দিয়ে লাঠি মারতে উদ্যত হলো। কিন্তু তার লক্ষ্যও ব্যর্থ হলো এক অলৌকিক অপ্রত্যক্ষ কারণে। তার সেই লাঠির ঘা

বলাইএর পায়ে না পড়ে তার এক সহকর্মী যুবকের পায়ে পড়ে তার পা ভেঙ্গে গেল। অসহ্য যন্ত্রণায় সে কাতর হয়ে লুটিয়ে পড়ল মাটিতে।

এবার সেই দুর্ধর্ষ যুবকগুলি সত্যিই ভয় পেয়ে গেল। তাদের মনে হলো, নিশ্চয় কোন দেবতা বলাইএর সহায় হয়ে তাকে রক্ষা করে চলেছে। তা না হলে এমন সব অব্যর্থ আঘাত কখনো ব্যর্থ হত না এমন করে অকারণে। তারা আরও ভাবল, এর পর বলাইএর ক্ষতি করতে গেলে তাদেরই আরও ক্ষতি হবে, অথচ বলাইএর কোন ক্ষতি হবে না।

তাই তারা নিজেদের মধ্যে যুক্তি করে বলাইএর হাত পায়ের বাঁধন খুলে দিয়ে তাকে একটি মিষ্টির দোকানে নিয়ে গিয়ে মিষ্টি ও গরম দুধ খেতে বলল। কিন্তু বলাই খেল না। সে তখন শুধু তার সঙ্গীদুজন আর সেই ধৃত ছেলেটির কথা ভাবছিল।

এদিকে বাবা লোকনাথের প্রতি ভক্তি ও বিশ্বাস অটল হয়েছে বলাইএর। তার তখন এই বিশ্বাস দৃঢ় হয়ে উঠল যে, যে মহাপুরুষের অলৌকিক কৃপায় সে নিজে প্রাণরক্ষা পেয়েছে, তাঁরই কৃপায় তার সঙ্গীরাও মুক্তি পাবে। বাবা সহায় থাকলে কেউ তাদের ক্ষতি করতে পারবে না। এই ভেবে বলাই একমনে লোকনাথবাবাকে স্মরণ করতে লাগল এবং তাঁর কাছে প্রার্থনা জানাতে লাগল।

অবশেষে সত্যে পরিণত হলো তার বিশ্বাস। বাবার কৃপায় যুবকেরা বলাই ও তার সব সঙ্গীদের ছেড়ে দিল।

নিত্যানন্দ কুণ্ডুর আদি নিবাস ছিল পূর্ব বাংলার ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত কোন এক গ্রামে। তাঁর পিতার নাম অমৃতকুমার কুণ্ডু। তাঁদের বর্তমান নিবাস পশ্চিমবাংলার বেলঘরিয়ার অন্তর্গত পাটনা নিমতা। তিনি দেশবিভাগের পর পূর্ব বাংলা হতে পশ্চিম বাংলায় চলে আসতে বাধ্য হন। তখন ছিল পাকিস্তানী আমল। গ্রামে কুণ্ডুবাবুরা ছিলেন বনেদী বংশের লোক। তাঁদের ব্যবসা ছিল। গ্রামে একদিন তাঁরা প্রভাব প্রতিপত্তিসহ সম্মানের সঙ্গে বসবাস করেছেন। কিন্তু দেশ বিভাগের পর স্থানীয় মুসলমানেরা হিন্দুদের পরগাছা ও অবাঞ্ছিত ভেবে তাদের প্রতি নানাভাবে অভদ্র আচরণ করত। তাই নিত্যানন্দবাবু দেখলেন, আত্মসম্মান বজায় রেখে

গ্রামে আর বাস করা সম্ভব নয়। তাছাড়া নিরাপত্তার একান্ত অভাব। তাই ভবিষ্যতের কথা ভেবে নিত্যানন্দবাবু সপরিবারে পশ্চিম বাংলায় চলে আসেন। সেই থেকে বেলঘরিয়াতে বসবাস করতে থাকেন।

১৯৬৭ সালের জুন মাসে একদিন তিনি কোন কার্যোপলক্ষে এক জায়গায় যাচ্ছিলেন। বেলঘরিয়ার নন্দননগর কলোনীর রাস্তা পার হবার সময় সহসা একদল গুণ্ডার দ্বারা আক্রান্ত হন। গুণ্ডারা তাঁর কাছে টাকাপয়সা যা ছিল সব কেড়ে নিয়ে তাঁর হাত পা বেঁধে তাঁকে হত্যা করে পাশে ঝিলের জলে ফেলে দেবার মনস্থ করে। তাঁকে হত্যা করার প্রস্তুতি চলতে থাকে। তাদের কথাবার্তা শুনে সব বুঝতে পারেন নিত্যানন্দবাবু। তিনি বুঝতে পারেন, তাঁর মৃত্যু অনিবার্য।

নিত্যানন্দবাবু ছিলেন লোকনাথবাবার পরম ভক্ত। তাই তিনি অবধারিত ও আসন্ন মৃত্যুর আগে শেষবারের মত বাবাকে স্মরণ করলেন। তাঁর মনে পড়ল বাবা লোকনাথ প্রায়ই বলতেন, প্রারব্ধ কর্মফল হিসাবেই মানুষকে সুখদুঃখ ভোগ করতে হয়। সেই কর্মফল শেষ হলেই তার দুঃখ বা সুখের শেষ হয়।

এই ভেবে তিনি আপন মনকে সান্ত্বনা দিয়ে নির্বিকারভাবে সব সহ্য করে যেতে লাগলেন। তিনি ভাবলেন, তাঁর প্রারব্ধ কর্মের ফল যদি এই শোচনীয় মৃত্যুরূপে দেখা দেয়, তাহলে সে মৃত্যুকে তিনি বরণ করে নেবেন। সে মৃত্যু যদি আসে ত আসুক। তাতে ক্ষতি নেই। শুধু তিনি সে মৃত্যুর আগে তাঁর পরমগুরু জগৎগুরু বাবা লোকনাথকে স্মরণ করে তাঁকে একবার প্রাণভরে ডাকতে চান।

কিন্তু কি আশ্চর্য! বাবা লোকনাথকে স্মরণ করামাত্র গুণ্ডাদলের পাণ্ডার অকস্মাৎ মনের পরিবর্তন হলো। সে প্রথমে তার দলের লোকদের বলল, শালাকে মেরে কি হবে? ওর কাছে ত বেশী টাকা পয়সা নেই। বরং ওকে বাঁচিয়ে রেখে কিকরে কিছু বেশী টাকা ঝাড়া যায় তার ব্যবস্থা কর।

এই বলে সে নিত্যানন্দবাবুর বাঁধন খুলে দিয়ে তাঁকে বলল, কাল এইখানে তুই এসে এক হাজার টাকা আমাদের হাতে দিয়ে যাবি। যদি দিতে রাজী হস এবং কথা দিস, তাহলে তোর প্রাণরক্ষা হবে এবং তোকে ছেড়ে

দেওয়া হবে। আর যদি দেব বলে না দিস তাহলে তোর বাড়ি থেকে তোকে ধরে নিয়ে আসব।

নিত্যানন্দবাবু তখন প্রাণের ভয়ে বাধ্য হয়ে তাদের টাকা দেবার প্রতিশ্রুতি দিলেন। তখন তারা তাঁকে ছেড়ে দিল। তিনি শূন্য হাতে বাড়ি ফিরে গেলেন। এইভাবে নিগৃহীত হয়েও নিত্যানন্দবাবুর মনে হলো, তিনি নিশ্চিত মৃত্যুর কবল থেকে ফিরে এসে পুনর্জন্ম লাভ করেছেন এবং এই পুনর্জন্মলাভ একমাত্র পূর্ণব্রহ্ম বাবা লোকনাথের কৃপাতেই সম্ভব হয়েছে। তা না হলে যে মানুষ কিছুক্ষণ আগে তাঁকে হত্যা করার আদেশ দেয়, সেই মানুষই লোকনাথবাবাকে স্মরণ করার সঙ্গে সঙ্গে কিকরে তাঁর প্রাণরক্ষার আদেশ দেয়? কিকরে তার মনের এমন পরিবর্তন হয় আকস্মিক ভাবে?

বাবার বাক্য অমোঘ, তা কখনো মিথ্যা হবার নয়। তিনি বলে গেছেন, আমি যেমন এখন আছি, তেমনিই ভবিষ্যতে থাকব। বিপদে পড়লে আমাকে স্মরণ করলেই বা আমাকে ডাকলেই আমি তোদের বিপদ থেকে উদ্ধার করব।

বাবার এই অভয়বাণী যে কতদূর সত্য ও অব্যর্থ তা আজ পরিস্কার ভাবে বুঝতে পারলেন নিত্যানন্দবাবু।

হরেকৃষ্ণ দাসের পুত্র শিবশংকর দাসের আদি নিবাস ছিল পূর্ববাংলায় ঢাকা জেলার অন্তর্গত বিক্রমপুর পরগণায় বজ্রযোগিনী গ্রামে গুহ পাড়ায়। দেশ বিভাগের পর শিবশংকরবাবু পূর্ব বাংলা হতে পশ্চিম বাংলায় চলে আসেন। তাঁর বর্তমান নিবাস হলো চব্বিশ পরগণার অন্তর্গত সোদপুরের দেশবন্ধু নগরে।

শিবশংকরের কোন চাকরি ছিল না। সম্পূর্ণ বেকার অবস্থায় বাড়িতে দিন কাটাতে লজ্জাবোধ হচ্ছিল। বাড়িতে খাওয়া পরার কোন অভাব না থাকলেও নিজে কোন টাকা পয়সা উপার্জন করতে না পারায় একটা সংকোচ বোধে মনটা আচ্ছন্ন হয়ে থাকত সব সময়। এই লজ্জা ও সংকোচবোধ সব সময় পীড়া দিতে থাকে তার মনটাকে।

এই সব সহ্য করতে না পেরে শিবশংকর ১৩৮০ সালে ভাদ্র মাসে দুই বন্ধুর সঙ্গে অল্প কিছু টাকা নিয়ে চাকরির সন্ধানে বোম্বে যাত্রা করে।

যাওয়া আসার ভাড়ার টাকা ছাড়া অতিরিক্ত টাকা পয়সা কারো কাছেই ছিল না। তিনজনের মধ্যে আবার শিবশংকরের টাকা সবচেয়ে কম ছিল। শিবশংকরের একমাত্র সম্বল ছিল বাবা লোকনাথ ব্রহ্মচারীর একখানা পকেট সাইজ ছবি। আর বাবার প্রতি অকুণ্ঠ ভক্তি ও বিশ্বাস। এই ভক্তি বিশ্বাস নিয়ে বাবার নাম স্মরণ করে নিরুদ্দেশের পথে যাত্রা করল শিবশংকর। তবে সে যে না খেয়ে মরবে না—এ বিষয়ে তার মনোবল ও বিশ্বাস ছিল।

যাই হোক তারা নির্বিঘ্নে বোম্বে এসে দশ বারো দিন চাকরির সন্ধানে নানা জায়গায় ঘোরা ফেরা করল। কিন্তু কোন ব্যবস্থাই হলো না। চাকরির কোন সন্ধান পেল না কোথাও। জানা শোনা ভিন্ন বা কোন জামিনদার না থাকলে চাকরি পাওয়া সম্ভব নয় বুঝতে পেরে তারা সকলে বাড়ি ফিরে যাবার সংকল্প করল। যে কয়দিন তারা সেখানে ছিল কোনদিন অর্ধাহারে কোনদিন অনাহারে দিন কাটিছিল। বাড়ি ফেরার মত ভাড়ার টাকাও কাছে ছিল না। গাড়িভাড়া ও গাড়িতে খাওয়ারও কোন খরচ ছিল না।

স্টেশানে এসে তারা তিনখানা প্ল্যাটফরম টিকিট কেটে প্ল্যাট ফরমের মধ্যে ঢুকে পড়ল বাবা লোকনাথের নাম স্মরণ করে। তারপর কলকাতা-গামী ট্রেনে উঠে বসতেই ট্রেন ছেড়ে দিল। টিকিট চেকারের হাতে ধরা পড়ার ভয়ে মনটা তাদের আরষ্ট হয়ে রইল। মনে মনে ঠিকমত বাবার স্মরণ নিতেও পারছিল না। মাঝে মাঝে বাবাকে ডাকছিল মনে মনে, আর জানালা দিয়ে চেকার আসছিল কিনা দেখছিল। ধরা পড়ার ভাবনায় ক্ষুধা তৃষ্ণাবোধও চলে গিয়েছিল।

কয়েক ঘণ্টা পর ট্রেন নাগপুরে এসে পেঁছিল। পথে ইতিমধ্যে কোন চেকার ওঠেনি। কিন্তু নাগপুর স্টেশান হতে গাড়ি ছাড়ার কিছু পরেই অন্য কামরা হতে একজন টিকিট চেকার এসে তাদের কাছে টিকিট চাইল। তারা বলল তারা নাগপুর স্টেশান হতে উঠেছে। চেকার তখন ভাড়া ও জরিমানাসহ মোটা টাকা চার্জ করল। কিন্তু সে টাকা তারা দিতে না পারায় পরের স্টেশান গুণ্ডিয়াতে তাদের নামিয়ে স্টেশান মাস্টারের কাছে কেস লিখিয়ে স্টেশান মাষ্টারের হেফাজতে রেখে গেল চেকার। স্টেশান মাষ্টার তাদের বলল, তাদের জেল হবে। এই বলে ছয়টি ছাপানো ফর্মে তাদের সই করালে। তারপর তাদের জি. আর. পি. রেল হাজতে পাঠিয়ে

দিল। শিবশংকর বাবা লোকনাথের ছবিখানি বুকে ধরে কাঁদতে লাগল।

কিন্তু রেল হাজতের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী কাগজপত্র দেখে বলল, তার হাজতে আর লোক রাখার জায়গা নেই। এই বলে সে তাদের পুলিশ পাহারায় স্টেশান মাস্টারের কাছে পাঠিয়ে দিল। স্টেশান মাস্টার তখন বিছানাপত্র থালা ঘটিসহ তাদের থানা হাজতে পাঠিয়ে দিল। কিন্তু ফর্মে বিছানা থালা ঘটি ইত্যাদি লেখা না থাকায় থানার অফিসার তাদের হাজতে রাখল না, স্টেশান মাস্টারের কাছেই ফেরৎ পাঠাল। পরে তাদের কোর্ট হাজতে তাদের নিয়ে যাওয়া হলে হাজতের কর্মচারী দেখল ফর্মে আসামী-দের মালপত্রের কোন উল্লেখ নেই। তাই তারাও তাদের হাজতে না রেখে ফেরৎ পাঠাল।

অবশেষে বারবার ব্যর্থ হয়ে স্টেশান মাস্টার তিনটে ফর্মে তাদের সই করিয়ে নিয়ে তাদের ছেড়ে দিল। এইভাবে শিবশংকর ও তার সঙ্গীদ্বয় বাবা লোকনাথের কৃপায় মুক্ত হয়ে বাবাকে মনে মনে প্রণাম জানিয়ে গাড়ি ধরার জন্য গুন্ডিয়া স্টেশানে অপেক্ষা করতে লাগল। পরে কলকাতাগামী একটি ট্রেন ধরে নির্বিঘ্নে কলকাতা পেঁছায়। ভক্তের কাতর প্রার্থনায় সাড়া দিয়ে কিভাবে বাবা লোকনাথ তাদের চরম বিপদ হতে অলৌকিকভাবে উদ্ধার করেন, শিবশংকরদের তিন তিনবার হাজতে স্থান না হওয়াই তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। এত বড় আশ্চর্যজনক ঘটনা কখনো ঘটেনি কারো জীবনে।

নকুলচন্দ্র কর আগে ছিলেন পূর্ব বাংলার অধিবাসী। ঢাকা জেলার নারায়ণগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত লালাটি গ্রামে ছিল তাঁদের আদি নিবাস। দেশ বিভাগের পর তিনি তাঁর পিতা জয়চন্দ্র করের সঙ্গে সপরিবারে পশ্চিম বাংলায় বেলঘরিয়াতে এসে বসবাস করতে থাকেন। দেশে সব বিষয়সম্পত্তি ছেড়ে রিক্ত হাতে চলে এসে এই উদ্বাস্তু দরিদ্র পরিবারটি কোনমতে অক্লান্ত শ্রম ও সংগ্রামের মধ্য দিয়ে দিন চালাতে থাকে।

নকুলচন্দ্র রাজনীতি করতেন। বিশেষ এক রাজনৈতিক দলের কর্মী হিসাবে তাঁকে অনেকবার পুলিসী নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছিল। রাজ-নৈতিক বন্দী হিসাবে বেশ কিছুদিন করে জেলেও কাটাতে হয় তাঁকে। তবে জীবনের কোন অবস্থাতেই বাবা লোকনাথের প্রতি ভক্তি ও বিশ্বাস

হারায়নি কখনো সে।

১৯৭৫ সালের জুলাই মাসে কোন এক লোকনাথভক্ত নকুলচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করেন, আপনি রাজনীতির লোক হয়ে ধর্মে বিশ্বাসী হলেন কিভাবে? বিশেষ করে লোকনাথ ব্রহ্মচারী বাবার প্রতি এত অনুরক্ত হয়ে উঠলেন কেন? প্রতি বছর ১৯শে জৈষ্ঠ তারিখে বাবার তিরোধান দিবস উপলক্ষে এত টাকা পয়সা খরচ করে লোকজন খাওয়ান কেন?

নকুলচন্দ্র তখন বললেন, দেশবিভাগের পর নিজে একজন বাস্তুহারা হয়ে বাস্তুহারাদের দুর্দশাগ্রস্ত জীবন দেখে মনে জ্বালা ধরল। মনে মনে সংকল্প করলাম, যেমন করে হোক শক্তি সঞ্চয় করে এর প্রতিকার করব। এই উদ্দেশ্যে এক বিশেষ পার্টিতে যোগ দিয়ে তার নির্দেশমত কাজ করতে লাগলাম। সে পার্টি ক্ষমতাচ্যুত হলে আবার আমাদের উপর নির্যাতন শুরু হলো। বিনা অপরাধে পুলিসী নির্যাতন চলতে থাকে। নানা যায়গায় ঘুরে ঘুরে আত্মগোপন করে থাকতে হয়।

এক সময় আত্মগোপন করে হাওড়ার সালকিয়াতে ছিলাম। তখন এক ভদ্রলোকের বাড়িতে দেখলাম, লোকনাথবাবার এক অভয়বাণী কাঁচের ফ্রেমে বাঁধানো অবস্থায় একটি ঘরেরর দেওয়ালে টাঙ্গানো আছে। সেই বাণীটির এক জায়গায় লেখা ছিল, রণে বনে জলে জঙ্গলে যখনই বিপদে পড়িবে, আমাকে স্মরণ করিও, আমি রক্ষা করিব।

লেখাটি পড়তে আমার এত ভাল লাগল যে পর পর দু তিনবার পড়লাম আমি তখন মনে মনে বললাম, হে বাবা লোকনাথ, আমাকে বিপদ হতে মুক্ত করে দাও।

কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গে একটা অজানিত অব্যক্ত শক্তির প্রবাহ আমার মনের মধ্যে ও দেহের প্রতিটি শিরায় শিরায় বয়ে যেতে লাগল। মনের সহায় শক্তিহীন ভাবটা মুহূর্তে কোথায় দূরীভূত হয়ে গেল। এক নূতন বলে বলীয়ান হয়ে উঠল আমার মনটা। এক নূতন উদ্যমে উদ্দীপিত হয়ে উঠলাম আমি। আমি যে এক আত্মগোপনকারী একথাও ভুলে গেলাম।

সঙ্গে সঙ্গে আমি সব ভয় মন থেকে ঝেড়ে ফেলে বেলঘরিয়ায় আমার কর্মস্থানে ফিরে এলাম। বাড়িতে আসার পর কতবার কত বিপদের সম্মুখীন হয়েছি। কিন্তু কিভাবে বাবা আমার সব বিপদ কাটিয়ে দিচ্ছেন

তা বেশ বুঝতে পারলাম। যখনি মনে ভয় জাগত এবং কোন বিপদের সম্ভাবনা দেখতাম তখনি লোকনাথবাবাকে স্মরণ করতাম। সঙ্গে সঙ্গে কে যেন শক্তি সঞ্চার করে দিত আমার মনে।

তারপর বাবার একটি প্রতিকৃতি যোগাড় করে বাড়িতে প্রতিষ্ঠা করি। তখন আমি বেলঘরিয়ায় ফীডার রোডে জমিদার তারকনাথ রায়চৌধুরীর একটি মাটির বাড়িতে বাস করতাম। আর্থিক অনটনের জন্য একবার কিছু ভাড়া বাকি পড়ে যায়। একদিন কাজ থেকে ফিরে দেখি জমিদারের লোক এসে আমার বাসার মাটির ঘরগুলি ভেঙ্গে ভূমিসাৎ করে দিয়েছে। বাবার ছবিটিও মাটিতে পড়ে আছে। ছবিটি তখন উঠিয়ে বুকে চেপে ধরে মনে মনে বাবাকে বললাম বাবা, তুমি যদি সত্য হও, তাহলে তিন চার মাসের মধ্যে এই বাড়ি আমার নিজস্ব করে দেবে।

এর পর বাড়িটি কেনার জন্য জমিদারের কাছে লোক পাঠালাম। দশ হাজার টাকায় রফা হলো। এত টাকা আমার ছিল না। আমার স্ত্রীর এক হাজার টাকার গয়না ছিল। বাকি টাকা ধার দেনা করে সহজেই যোগাড় হয়ে গেল এবং কিছুদিনের মধ্যেই তা শোধ করে ফেললাম। কোন বেগ পেতে হলো না।

১৯৭০ সালে মামলার ওয়ারেন্ট ছিল আমার উপর। অবস্থা অনুসারে আমাকে আত্মগোপন করে থাকতে হত। ঐ বছর ১৯ শে জ্যৈষ্ঠ আমি ধরা পড়ার সম্ভাবনা সত্ত্বেও বাড়িতেই প্রকাশ্যে বাবার উৎসবের আয়োজন করলাম।

লোকজন যখন বাড়িতে প্রসাদ গ্রহণ করছিল তখন আমাকে ধরার জন্য পুলিশ এল আমি তখন বাবার পুজোর ঘরে বসে রইলাম। সমস্ত বাড়ি তন্ন তন্ন করে খুজল পুলিশ। আমি যেঘরে ছিলাম, সে ঘরেও তারা তিনচার বার এল, বাবার ফটোটিকে তারা প্রণাম করল। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় আমাকে তারা দেখতে পেল না। কিভাবে মহাশক্তিধর মহাযোগী বাবা লোকনাথ এক মায়াজাল বিস্তার করে পুলিশদের দৃষ্টিশক্তিকে আচ্ছন্ন করে আমাকে অপরিদৃশ্য করে রাখলেন তাদের কাছে, যে কথা ভাবলে আজও আশ্চর্য হয়ে যাই আমি। কী অলৌকিক তাঁর লীলা। অবশেষে পুলিশেরা আমার মার অনুরোধে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই প্রসাদ গ্রহণ

করে চলে গেল।

এর পর ১৯৭৪ সালে আমাকে গ্রেপ্তার করে দমদম সেন্ট্রাল জেল হাজতে নিয়ে গিয়ে আটক করে রাখে। এদিকে ১৯শে জ্যৈষ্ঠের উৎসবের দিন এসে গেছে। এত তাড়াতাড়ি জামিন নেওয়া সম্ভব হলো না। আমাদের দলের অনেককেই ধরা হয়েছিল। সেবার উৎসব করতে না পারায় আমার মনটা খারাপ হয়ে গেল। আর মাত্র দু তিন দিন বাকি।

সেদিন রাতে হঠাৎ আমার মনে এক সংকল্প দানা বেঁধে উঠল, জেলের ভিতরেই আমি বাবার উৎসব করব। বাবার একটি পকেট সাইজের ছবি আমার কাছে তখন ছিল। আমার দলের জয়রাম দাস নামে একটি লোক প্রায়ই আমার সঙ্গে দেখা করতে আসত। আমি তার মাধ্যমে বাবার পরম ভক্ত নিত্যানন্দ কুন্ডু মশাইকে আমার ইচ্ছার কথাটা জানালাম।

কথাটা শোনবার সঙ্গে সঙ্গে নিত্যানন্দ কুন্ডু অনেক তরি তরকারী কিনে তার হাত দিয়ে পাঠিয়ে দিলেন। আমাদের জেল সুপারিন্টেনডেন্ট খুব ধর্মপরায়ণ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি লোকনাথ বাবার উৎসবের কথা শুনে সানন্দে অনুমতি দিলেন। উপরন্তু তিনি জেলখানা হতে চাল, ডাল, তেল মশলা, তরি তরকারীর সব ব্যবস্থা করে দিলেন। জেলের কয়েদীদের মধ্যে বিশ্বনাথ সাউ নামে একজন রান্না করার লোক পাওয়া গেল এবং পূজা ও ভোগ নিবেদনের জন্য একজন ব্রাহ্মণও জুটে গেল। তাঁর নাম লোকনাথ চক্রবর্তী। তাঁর বাড়ি গড়িয়া। জেল সুপার হতে আরম্ভ করে জেলের সব কর্মচারী ও জেলের ভিতরকার অনেক কয়েদী সেদিন বাবার প্রসাদ পেয়েছিল।

বাবার ইচ্ছা ও কৃপা হলে কিভাবে তাঁর সূক্ষ্ম আদেশ প্রতিকূল পরিবেশে সকলের মনের উপর ক্রিয়া করে এবং ভক্তবাঞ্ছা পূরণের জন্য অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে, নকুলচন্দ্রের বাসনা ও তৎপরতায় অনুষ্ঠিত জেলখানায় এই উৎসব থেকে বেশ বোঝা যায়।

ওঁ

সতীশচন্দ্র নন্দী ছিলেন ঢাকা জেলার বিক্রমপুর পরগণার অন্তর্গত

দামালিয়া গ্রামের অধিবাসী। দেশ বিভাগের পর তিনি কলকাতায় এসে সেণ্ট্রাল রোড, যাদবপুরে বসবাস করতে থাকেন। তিনি ছিলেন একজন ব্যবসায়ী। যোড়হাটে তাঁর কারবার ছিল। তাঁকে ব্যবসা ও কাজ কারবার সংক্রান্ত ব্যাপারে প্রায়ই কলকাতায় আসতে হত।

সতীশচন্দ্র ছিলেন সভাবতঃ খুবুধীর স্হির। তাঁর দুই পুত্র ও তিন কন্যা, সকলেই বেশ সুশিক্ষিত ছিল। তিনি নিজে ও বাড়ির সকলেই ছিলেন বাবা লোকনাথের পরম ভক্ত। প্রতি বছর অগ্রহায়ণ মাসের শেষ রবিবার বাড়িতে লোকনাথবাবার নামে উৎসব করেন। তাঁর কার্যস্হল যোড়হাটে হরিসভার প্রাঙ্গণে প্রতিবছর লোকনাথ বাবার তিরোধান দিবস উপলক্ষে যে উৎসব হয়, সতীশচন্দ্র ছিলেন তার প্রধান উদ্যোক্তা।

১৯৮৯ সালে আষাঢ় মাসের মাঝামাঝি সতীশচন্দ্র আসাম হতে যাদবপুরের বাড়িতে আসেন। পরদিন তিনি হাওড়ার বেলুড়ে অবস্হিত লোকনাথ মন্দির দর্শন করতে যাবেন বলে স্হির করেন। এ জন্য তিনি সেদিন বেলা বারোটায় বাড়ি হতে রওনা হয়ে দেড়টায় বেলুড় স্টেশানে নামেন। নেমে দেখলেন, স্টেশানের পাশেই রিকশা স্ট্যাণ্ডে একটিও রিকশা নেই। তখন ভর্তি দুপুর। প্রখর রোদে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকেও কোন রিকশা পেলেন না। নিকটবর্তী একটি চায়ের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে তখন তিনি ভাবতে লাগলেন, কিছু কম এক মাইল রাস্তা এই দারুণ রোদে কি করে যাবেন? মনে মনে বাবা লোকনাথকে স্মরণ করে বলতে লাগলেন, আমি মহা অপরাধী, তাই বাবার মন্দির দর্শনের পথে এই বাধা এসে উপস্হিত হলো।

এমন সময় কোথা হতে হঠাৎ একটি টেম্পো এসে 'মন্দিরে যাবেন' বলে হাঁক দিয়ে তাঁর পাশে এসে দাঁড়াল। হাতে যেন চাঁদ পেলেন সতীশচন্দ্র। মুহূর্তে সব হতাশার ভাব কেটে গেল এবং তিনি উৎফুল্ল হয়ে ভাড়ার কথা জিজ্ঞাসা না করেই টেম্পোতে চেপে বসলেন। ভাবলেন, সম্প্রতি হয়ত এ রাস্তায় টেম্পো সার্ভিস চালু হয়েছে।

ফাঁকা রাস্তা। তাই অল্প সময়ের মধ্যে টেম্পোটি তাঁকে লোকনাথ মঠের সামনে নামিয়ে দিল। ভাড়ার কথা জিজ্ঞাসা করলে ড্রাইভার বলল, আপনার যা ইচ্ছা তাই দিন।

সতীশচন্দ্র তখন একটি টাকা ড্রাইভারকে দিলেন। কোন কথা না বলে ড্রাইভার টাকাটি নিল।

মন্দিরের দিকে কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে পিছন ফিরে সতীশচন্দ্র দেখলেন, ড্রাইভার টেম্পোটি ঘোরাতেই সেটি অদৃশ্য হয়ে গেল। টেম্পোটিকে আর দেখতে পাওয়া গেল না। ফাঁকা প্রশস্ত রাস্তা, কোন বাঁক নেই। টেম্পোটি কিভাবে কোন দিকে কোথায় গেল, কি ভাবে এমন রহস্যজনক ভাবে মুহূর্তে তা অদৃশ্য হলো, তার কিছুই বুঝতে না পেরে সতীশচন্দ্র বিহ্বল হয়ে ভাবতে লাগলেন। তার পর তিনি বিস্ময়ের আবেশে আচ্ছন্ন হয়ে মন্দিরে গিয়ে মন্দিরের একজন লোককে জিজ্ঞাসা করলেন, আচ্ছা এ রাস্তায় কি এখন টেম্পো সার্ভিস চালু হয়েছে? বেলুড় স্টেশানে এই টেম্পোটি আমি পাই।

মন্দিরের লোকটি তখন বললেন, একথা কেন আপনি জিজ্ঞাসা করছেন?

তখন সতীশচন্দ্র আদ্যোপান্ত সব কথা খুলে বললেন। সেই সব কথা শুনে ভদ্রলোক বললেন, বেলুড় স্টেশান থেকে এ রাস্তায় টেম্পো সার্ভিস নেই। প্রখর রোদে আপনার হেঁটে আসতে কষ্ট হবে বলে বাবা স্বয়ং টেম্পোর ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। তাই সে টেম্পো আপনাকে নামিয়ে দিয়েই অদৃশ্য হয়ে যায়।

এতবড় অলৌকিক ঘটনা জীবনে কখনো কোথাও প্রত্যক্ষ করেন নি সতীশচন্দ্র। তাই একথা শুনে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলেন তিনি। পরে বুঝলেন, সর্বান্তর্যামী, সর্বজ্ঞ ও সর্বব্যাপী বাবা লোকনাথের সূক্ষ্ম আত্মা নিত্যলীলায় সর্বত্র অবস্থান করে শরণাগত ভক্তকে ছোটখাটো বিপদ থেকেও এমনি করে অলৌকিকভাবে উদ্ধার করেন। তাঁর নিত্যলীলা ও অপার কৃপা ও করুণার অন্ত নেই।

শিবানন্দ সাহা পূর্বে ছিলেন ঢাকা জেলার অন্তর্গত নারায়ণগঞ্জ মহকুমার সদাসদী নামে এক সমৃদ্ধিশালী গ্রামের বাসিন্দা। তাঁর বর্তমান নিবাস কলকাতার অন্তর্গত টালীগঞ্জ অঞ্চলে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু রোড।

শিবানন্দবাবু উচ্চশিক্ষিত—ডাবল এম. এ, বি. কম, বি. টি, এল. এল.

বি। তিনি রাণী ভবানী স্কুলের একজন উচ্চপদস্থ শিক্ষক এবং কোন এক কলেজের অধ্যাপক।

১৯৭৫ সালের ৫ই জুন তারিখে বিশেষ কাজের জন্য বাড়ি ফিরতে রাত হয়। তিনি রাত্রি এগারোটার সময় টালীগঞ্জের মোড় থেকে একা বাড়ি ফিরছিলেন।

এমন সময় সহসা একটি ট্যাক্সি এসে তাঁর কাছে থামতেই ট্যাক্সি থেকে চারজন যুবক নেমে তাঁর পথরোধ করে দাঁড়াল। তারপর তাদের মধ্যে একজন একটি পাইপগান তাঁর বুকের উপর এবং দুজন দুটি ছোরা তাঁর পেটের উপর ধরল। অন্য একজন তাঁর গলা ধরে বলল, কোন রকম শব্দ বা চিৎকার চেঁচামিচি করবেন না। আপনার সঙ্গে যা যা আছে সব আমাদের হাতে দিয়ে দিন। তা না হলে প্রাণ যাবে।

শিবানন্দবাবু জীবন বিপন্ন দেখে আশীটাকাসহ মানি ব্যাগ, জরুরী কাগজপত্রসহ ফোলিও ব্যাগ, হাতঘড়ি, চশমা সব একে একে তাদের হাতে তুলে দিলেন। কোন কথা বললেন না।

তারা সেই সব নিয়ে ট্যাক্সিতে চেপে চলে গেল।

যাই হোক, বিহ্বল বিমূঢ় অবস্থায় মনের সব ক্ষোভ মনের মধ্যেই চেপে রেখে বাড়ির দিকে এগিয়ে যেতে লাগলেন শিবানন্দবাবু। পথে পাড়ার একটি ছেলের সঙ্গে দেখা হতে তিনি তাকে সব বললেন।

সব কথা শুনে ছেলেটি বলল, আপনি একটু দাঁড়ান মাষ্টারমশাই। আমি একটু ঘুরে দেখে আসি।

এই বলে সে পাড়ার আরও চার পাঁচ জন ছেলেকে সঙ্গে করে কিছুদূর গিয়ে সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে এসে বলল, আমাদের পাড়ার কেউ এ কাজ করেনি। মনে হচ্ছে অন্য জায়গার লোক।

শিবানন্দবাবু যখন ক্ষুণ্ণ ও বিষন্ন মনে বাড়ি ফিরলেন, তখন রাত একটা বাজে। তাঁর ফিরতে অত্যধিক দেরি হওয়ার বাড়ির সব লোক চিন্তায় আকুল হয়ে ছিল। তিনি সব কথা তাদের বলতে তারা বলল, এই কথাই আমরা ভাবছিলাম। যা ভয় করেছিলাম, তাই হলো।

শিবানন্দবাবু ছিলেন লোকনাথবাবার পরম ভক্ত। একটি ঘরে বাবার প্রতিকৃতি রেখে রোজ ভক্তিভরে পুজো করতেন। তাই তিনি সেদিন হাত

মুখ ধুয়ে খাবার আগেই ঠাকুর ঘরে গিয়ে বাবা লোকনাথকে সব কথা জানালেন। তারপর নিবিড় অভিমানের সুরে বললেন, বাবা, কোনদিন আমি তোমাকে প্রণাম না করে ঘরের বার হই না। তবে কেন বিনা অপরাধে আমার টাকা পয়সা জিনিসপত্র সব ছিনতাই হলো? দুদিন আগে গড়িয়া আশ্রমে ১৯শে জ্যৈষ্ঠর উৎসবে আমি কত খাটাখাটুনি করলাম। তার পরিনাম কি এই? কাল হতে তোমার আর পুজো করব না। তাতে আমার যা হয় হবে।

মনের দুঃখে ও অভিমানে বাবাকে প্রণাম না করে ঠাকুরঘর হতে বেরিয়ে খাওয়া দাওয়া সেরে বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়লেন শিবানন্দবাবু। শোয়ার সঙ্গে সঙ্গে কড়া নাড়ার শব্দ হলো। সেই সঙ্গে কে জোরগলায় হাঁকল, শিবানন্দবাবু, বাড়ি আছেন?

শিবানন্দবাবু উঠে গিয়ে প্রশ্ন করলেন, কে আপনি?

উত্তর এলো, আমরা পুলিশের লোক।

শিবানন্দবাবু কিছুটা বিস্মিত হলেন। তিনি পুলিশকে কিছু না জানাতেই পুলিশ এল কেন তা বুঝতে পারলেন না। যাই হোক, তিনি নিজে গিয়ে গেটের দরজা খুলে দাঁড়ালেন।

পুলিশ জিজ্ঞাসা করল, আপনার কোন মালপত্র বাড়ি থেকে চুরি হয়েছে?

শিবানন্দবাবু বললেন, না, বাড়ি, থেকে চুরি হয়নি। রাত্রি এগারোটার সময় টালিগঞ্জের মোড় থেকে আমি যখন বাড়ি ফিরছিলাম তখন আমার কাছে যা ছিল সব ছিনতাই হয়েছে। আমার মানি ব্যাগ, ফলিও ব্যাগ, ঘড়ি, চশমা চারজন যুবক ট্যাক্সি থেকে নেমে ছিনতাই করে পালিয়ে যায়।

পুলিশ প্রশ্ন করল, আপনার মানি ব্যাগে কত টাকা ছিল?

শিবানন্দবাবু উত্তর করলেন, আশী টাকা।

এরপর পুলিশ আবার প্রশ্ন করল, আপনার ফলিও ব্যাগে কি কি ছিল?

দরকারী কাগজপত্র।

পুলিশ এবার একটি ঘড়ি ও একটি চশমা দেখিয়ে বলল, এগুলি কি আপনার?

শিবানন্দবাবু বললেন, হ্যাঁ, এ ঘড়ি ও চশমা আমার। এইসব জিনিস

গুলিই আমার ছিনতাই হয়।

এরপর পুলিশের সঙ্গে যে চারজন লোক ছিল তাদের দেখিয়ে পুলিশ শিবানন্দবাবুকে প্রশ্ন করল, এদের আপনি চেনেন ?

শিবানন্দবাবু বললেন, হ্যাঁ, এরাই ত ট্যাক্সি থেকে নেমে আমার সব ছিনতাই করে।

পুলিশ এবার বলল, আপনি একবার যাদবপুর থানায় চলুন। আপনাকে গিয়ে ডায়েরী লিখিয়ে এই জিনিসগুলির দাবি জানাতে হবে।

শিবানন্দবাবু তখন পুলিশদের জিজ্ঞাসা করলেন, এদের আপনারা কোথায় পেলেন ?

পুলিশ বলল, আমরা যখন জীপে করে রাউণ্ড দিচ্ছিলাম, তখন হঠাৎ দেখলাম চারজন লোক আমাদের দেখে আমবাগানের দিকে পালাচ্ছে। তখন আমাদের সন্দেহ হওয়ায় তাদের ধরে জীপে চাপিয়ে নিয়ে এসেছি। তাদের সার্চ করে আপনার যে ফলিও ব্যাগ পাই তাতে আপনার নাম ঠিকানা থাকায় এখানে খোঁজ করতে এসেছি।

পুলিশ আসার শব্দ পেয়ে পাড়ার সব লোক তখন জেগে উঠেছে। সকলে ব্যাপারটার সব কিছু শুনে আশ্চর্য হয়ে গেল। তারা সবাই বলাবলি করতে লাগল, এত অল্প সময়ের মধ্যে মালসহ ছিনতাইকারীরা কখনো ধরা পড়ে না। বাবা লোকনাথের কী অপার করুণা! থানাতে পুলিশকে জানাবার আগেই ভক্তবৎসল বাবা লোকনাথ ভক্তের চুরি যাওয়া জিনিস আসামীসহ ধরে নিয়ে এসেছেন। তাঁর কৃপা ছাড়া এ কখনই সম্ভব হতে পারে না।

এই ঘটনাতে দুটি বিষয় লক্ষ্য করার আছে। একদিকে বাবা লোকনাথ শরণাগতের রক্ষাকর্তা, অন্যদিকে দুষ্কৃতকারীর শাস্তিদাতা। একাধারে তিনি শিষ্টের পালনকর্তা ও দুষ্টের দমনকর্তা। একদিকে যেমন অশুভ কর্মের সব বিঘ্ন বিনাশ করেন, অন্যদিকে তেমনি সমস্ত অশুভ কর্মের শাস্তি দান করেন। এক্ষেত্রে আর একটি লক্ষণীয় বিষয় হলো এই যে, শিবানন্দবাবু তার জিনিসপত্র ছিনতাই হলে তিনি দুঃখ ও অভিমানভরে বাবার কাছে গিয়ে অনুযোগে ফেটে পড়ে বলেন, তাঁর পুজো আর তিনি করবেন না এবং বাবাকে প্রণাম না করেই ঘর থেকে বেরিয়ে যান। তবু

বাবা অতি অল্পসময়ের মধ্যে তাঁর অপহৃত সব জিনিস পুনরুদ্ধার করে তাঁর দুঃখের প্রতিকার করেন। তার মানে তিনি সব ভক্তকে সন্তান জ্ঞানে স্নেহ করেন। সন্তান যেমন পিতার কাছ থেকে কোন বিষয়ে সুবিচার না পেয়ে দুঃখে ও অভিমানে নানা অনুযোগ করলে, পিতা সস্নেহে সন্তানকে কাছে টেনে নিয়ে তার দুঃখের প্রতিকার করেন, বাবা লোকনাথও তাই করেছিলেন। এখানে তাই তাঁর অলৌকিক কৃপা ও করুণার ভিন্নধর্মী এক স্বরূপের পরিচয় পাওয়া যায়।

জহরলাল দে'র পূর্ব নিবাস ছিল ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত বাজিতপুর গ্রামে। দেশবিভাগের পর বাজিতপুর গ্রামের অনেকে ও তাঁর আত্মীয় স্বজনেরা বাংলাদেশ ছেড়ে এসে বেলঘরিয়ায় বসবাস করতে থাকেন, তখন তিনিও বেলঘরিয়ায়ায় এসে বাড়ি করেন। জহরবাবু ছিলেন লোকনাথ বাবার পরম ভক্ত।

১৯৭৫ সালে কোন একদিন রাত্রি দশটার সময় ইস্ত্রী করবার জন্য সুইচ-বোর্ডে প্লাগ লাগিয়ে দেখলেন কারেণ্ট হচ্ছে না। তারপর প্লাগটি ঘুরিয়ে আবার লাগিয়ে দেখলেন সেই একই অবস্থা। তখন তিনি প্ল্যাগটি হাতে শক্ত করে ধরে যেই জোরে চাপ দিলেন, অমনি তার মাথা থেকে কোমর পর্যন্ত অবশ হয়ে গেল এবং ঘাড়টি বাঁ দিকে বেঁকে গেল।

এমন সময় তিনি দেখলেন, বাবা লোকনাথ সশরীরে তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে চোখের পলকে এক মুহূর্তে প্লাগটি সুইচবোর্ড হতে খুলে দিলেন। প্লাগটি মাটিতে পড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে জহরবাবু অনুভবশক্তি ফিরে পেলেন। তারপর ভাল করে দেখলেন, ব্রহ্মচারী বাবা নেই। প্লাগটি মাটিতে পড়ে আছে।

তাঁর স্ত্রী তখন ঘুমোচ্ছিলেন। তিনি জেগে উঠলে জহরবাবু তাকে সব কথা বললেন। বললেন, আজ আমি এ. সি কারেণ্টের আঘাতে মারা যেতাম। আমাকে বাঁচাতে গেলে আমার গায়ে হাত দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তোমরাও মারা যেতে। ব্রহ্মচারীবাবা স্বয়ং এসে প্লাগটি খুলে দিয়ে আমার প্রাণ রক্ষা করেন।

পরদিন জহরবাবু অন্য এক ভক্তের সঙ্গে হাওড়ার লোকনাথ মঠে গিয়ে বাবাকে প্রণাম করে বললেন, বাবা, কেন তুমি আমার প্রাণরক্ষা করলে?

আমি পাপী, আমার এই পাপদেহ তোমার কি কাজে লাগবে? তুমি আমার রক্ষাকর্তা, জীবনদাতা। তুমি আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম গ্রহণ করো। তুমি তোমার সন্তানবৎ ভক্তদের অকালমৃত্যুর কবল হতে প্রাণরক্ষা করার জন্য বিশ্বময় বিচরণ করে বেড়াচ্ছ। তোমার কৃপার অন্ত নেই।

নলিনী চক্রবর্তীর স্ত্রী পূর্ণিমা চক্রবর্তী বেহালায় বারিকপাড়া রোডে থাকতেন। তাঁর বাপের বাড়ি হাওড়া বোটানিক্যাল গার্ডেন।

১৩৮০ সালে কোন একদিন পূর্ণিমা দেবী কোন কাজের জন্য বাপের বাড়ি যাচ্ছিলেন বাসে করে। তাঁর গন্তব্যস্থানের কাছে বাস থেকে নামতেই তাঁদের পাড়ার একটি ছেলের সঙ্গে দেখা হলো। ছেলেটির হাতে মোড়ানো অবস্থায় একটি কাগজ দেখতে পেয়ে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তোর হাতে মোড়ানো কাগজটি কি রে?

ছেলেটি তখন কাগজটি খুলে তা দেখিয়ে তাঁকে বলল, এটি লোকনাথ বাবার ছবি। খুব জাগ্রত। এতদিন শুধু নামই শুনেছি, চোখে দেখিনি।

এই কথা শুনেই পূর্ণিমা বাবার ছবিটি হাতে নিয়ে প্রণাম করলেন। তারপর ছবির নিচের লেখাটি পড়লেন—রণে, বনে, জলে, জঙ্গলে যখনই বিপদে পড়িবে, আমাকে স্মরণ করিও। আমি রক্ষা করিব।

ছবিটি হাতে নিয়ে স্পর্শ করতেই তাঁর সমস্ত দেহমন শিউরে উঠল। যেন একটা বিদ্যুৎতরঙ্গ বয়ে গেল তাঁর দেহের প্রতিটি শিরায় শিরায়। তিনি বললেন, ছবিটা আমায় দিবি?

বলার সঙ্গে সঙ্গে ছেলেটি বলল, খুব জাগ্রত, নিয়ে যাও। তবে পুজো দিও কিন্তু। তাঁর ছবি ঘরে থাকলে কোন বিপদ আপদ বা সংসারে কোন অভাব অনটন থাকে না।

এই বলে সে ছবিটি দিয়ে চলে গেল। সেইদিনই ছবিটি নিয়ে সন্ধ্যার সময় বেহালার বাড়িতে ফিরে আসেন পূর্ণিমা দেবী। সময়মত ছবিটি বাঁধাবেন ভেবে বাক্সের মধ্যে যত্ন করে সেটি রেখে দিলেন। এর পর প্রায় পনের দিন কেটে গেল। কিন্তু ছবিটি বাঁধাবার সময় হলো না।

একদিন সংসারে ছোটখাটো একটা ঘটনা নিয়ে স্বামীর সঙ্গে কথা কাটাকাটি হলো পূর্ণিমা দেবীর। স্বামী না খেয়েই অফিসে চলে গেলেন।

মানসিক অশান্তি সহ্য করতে না পেরে তিনি দুই মেয়েকে বাড়িতে রেখে মনটাকে কিছুক্ষণ ভুলিয়ে রাখার জন্য সিনেমায় চলে গেলেন। যাবার সময় ঘরের চাবি মেয়েদের কাছে রেখে গেলেন।

সিনেমা দেখে বাড়ি ফিরেই দেখলেন, বড় মেয়ের মাথায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। মা বাড়িতে না থাকায় দুই বোনে খেলার ছলে এই দুর্ঘটনা ঘটিয়েছে। চাবি চাইতেই তারা বলল, চাবিটি কোথায় হারিয়ে গেছে।

বিপদের উপর বিপদ। ঘর বন্ধ, চাবি নেই, মেয়ের মাথা ফেটেছে। স্বামী এসে যদি এই অবস্থা দেখেন, তাহলে আবার কি নূতন বিপদ ঘটবে —এই আশঙ্কায় ও দুর্ভাবনায় অস্থির হয়ে উঠলেন পূর্ণিমা দেবী।

বাড়ির অন্যান্য ভাড়াটেদের অনেক চাবি এনে ঘর খোলার চেষ্টা করা হলো। কিন্তু কোন ফল হল না। সে সব চাবিতে ঘরের তালা খুলল না। নিরুপায় হয়ে তখন বসে বসে ভাবতে লাগলেন পূর্ণিমা দেবী। হঠাৎ মনে পড়ে গেল লোকনাথ বাবার ছবির নিচের সেই লেখার কথা। তখন বাবাকে স্মরণ করে তাঁর বিপদের কথা তিনি জানালেন।

হঠাৎ তাঁর কি মনে হলো, যে চাবি নিয়ে এর আগে কতবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছেন, সেই চাবি নিয়েই তালাটি খুলতে গেলেন। এবার কিন্তু একবার চেষ্টা করতেই তালা খুলে গেল।

এই অলৌকিক ঘটনা প্রত্যক্ষ করে বাড়িসুদ্ধ সব লোক আশ্চর্য হয়ে গেল। সকলেই একবাক্যে স্বীকার করল, বাবা লোকনাথের কৃপা বলেই এটা সম্ভব হয়েছে।

সব দুশ্চিন্তার বোঝা ভার নেমে যেতে মনটা হালকা হয়ে উঠল পূর্ণিমা দেবীর। তাঁর মনে এক দৃঢ় বিশ্বাস জাগল, বাবার কৃপায় সব বিপদ কেটে যাবে এবার।

হলোও ঠিক তাই। স্বামী অফিস থেকে এসে সব কিছু শুনে কোন রাগ করলেন না। তাঁর মনেও বাবা লোকনাথের প্রতি ভক্তি জাগল।

পরদিনই পূর্ণিমা দেবী বাবার ছবিটি বাঁধিয়ে এনে ঘরের দেওয়ালে টাঙ্গিয়ে রাখলেন। ভাড়াটে বাড়ি, একখানি মাত্র ঘর। সে ঘরের এক কোনে লক্ষ্মীর আসনও ছিল।

১৯৭৬ সালের ১৭ই জ্যৈষ্ঠ ভোর রাতে অদ্ভূত এক স্বপ্ন দেখলেন

পূর্ণিমা দেবী। দেখলেন, দীর্ঘকায় এক সন্ন্যাসী তাঁর মাথার পাশে দাঁড়িয়ে আছেন। অনেক পরিমাণ চাল, ডাল, তরিতরকারিতে তাঁর ঘর ভর্তি। পূর্ণিমা দেবী তাঁকে জিজ্ঞসা করলেন, এত সব জিনিসপত্র দিয়ে কি হবে?

সেই পুরুষ উত্তর করলেন, মহোৎসব করবি।

স্বপ্নবৃত্তান্ত ভাড়াটেদের মধ্যে এক বয়স্ক মহিলাকে বললেন পূর্ণিমা দেবী। সেই মহিলা তা শুনে বললেন, মহা ভাগ্যবতী তুমি। আগামীকাল ১৯শে জৈষ্ঠ। বাবার ফটো যখন ঘরে রেখেছ, তখন ভোগ রান্না করে কাল বাবাকে দিও। এতে তোমার মঙ্গল হবে।

সেই দিনই সেই স্বপ্নবৃত্তান্ত ও সেই মহিলার কথা স্বামীকে বললেন পূর্ণিমা দেবী। স্বামীও কোন অমত করলেন না।

পরদিন সকাল থেকে পূজার আয়োজন ও ভোগরান্নার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন পূর্ণিমা দেবী। স্বামী অফিস চলে গেলেন। দুই মেয়ে তাঁকে সাহায্য করতে লাগল।

ভোগের রান্নাগুলি ঘরের মধ্যে লক্ষ্মীর আসনের সামনে রাখতে লাগলেন। তাঁর ইচ্ছা বাবার ফটোটি নামিয়ে লক্ষ্মীর আসনে রেখে ভোগ নিবেদন করবেন।

কিন্তু শুদ্ধ বস্ত্র পরে ফটোটি নামাতে গিয়ে দেখলেন সেখানে তা নেই। মুহূর্তে তাঁর সব উৎসাহ উদ্যম স্তিমিত হয়ে গেল। এক অব্যক্তনিবিড় হতাশায় আচ্ছন্ন হয়ে উঠল তাঁর সমস্ত মনপ্রাণ। তিনি বসে পড়লেন। তাঁর মনে হলো, ভোগ রান্নার ত্রুটি অথবা কোন অজানিত অপরাধের জন্য বাবা ঘর থেকে চলে গেছেন।

অবশেষে নিরুপায় হয়ে লক্ষ্মীর আসনেই বাবার উদ্দেশ্যে ভোগ দেবেন বলে স্থির করলেন। চোখে জল এসেছিল তাঁর। সেই জল মুছে লক্ষ্মীর আসনের সামনে ভোগ নিবেদনের জন্য বসতেই তিনি দেখতে পেলেন, দেওয়ালে টাঙ্গানো বাবার সেই ফটোখানি লক্ষ্মীর আসনে সাজানো অবস্থায় স্থাপিত রয়েছে।

অপার অনির্বচনীয় এক আনন্দের আবেগে উচ্ছ্বাসে আত্মহারা হয়ে উঠলেন পূর্ণিমা দেবী। তাঁর মনে পড়ে গেল, লক্ষ্মীর আসন প্রতিষ্ঠার সময় তাঁর মনে হয়েছিল, লক্ষ্মী ত বসালাম, কিন্তু তাঁর পাশে নারায়ণ ও

ত দরকার। তবে কি বাবা নিজে থেকে নারায়ণ হয়ে এসে লক্ষ্মীর পাশে বসে ভোগ গ্রহণ করলেন ?

ভোগ নিবেদনের পর পূর্ণিমা দেবী বাবার ফটোখানি বুকে টেনে নিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বললেন, বাবা, তুমি শুধু ব্রহ্মচারী সাধু নও, যোগী নও, তুমি নারায়ণ, তুমি ভগবান। তোমার লীলা বোঝার সাধ্য আমার নেই। তোমার স্বরূপের যথার্থ উপলব্ধি মানুষের বোধি ও বুদ্ধির অতীত।

গঙ্গানারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের পৈত্রিক নিবাস হাওড়া জেলার পুরাশ নামে এক গ্রামে। পিতার নাম বেচারাম চট্টোপাধ্যায়। বর্তমানে তিনি হাওড়া শহরে কাসুন্দিয়া অঞ্চলে বাড়ি ভাড়া করে বাস করেন। মধ্য হাওড়ায় তাঁর টেলারিং-এর কারবার আছে।

গঙ্গাবাবুর বয়স পঞ্চান্ন। অকৃতদার। কিন্তু জীবনে বিয়ে থা না করলেও তাঁর এক বোনের ছেলেদের নিয়ে এক সংসারে ঘোর সংসারীর মত জীবন যাপন করেন। তিনি ধর্মপরায়ণ ও মহানুভব প্রকৃতির লোক। সংসারে থেকে ব্যবসাসংক্রান্ত কাজকর্ম প্রতিদিন নিরলসভাবে করে চললেও বিষয়ভোগে কোন আসক্তি নেই তাঁর। পদ্মপত্রে জলের মত সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত নির্বিকার অবস্থায় নিষ্কামভাবে কর্তব্যবোধে সব কাজকর্ম করে যান। ব্যবসার যাবতীয় লভ্যাংশ তিনি আত্মীয় স্বজনদের নানা প্রকার অভাব অভিযোগ ও সুখ-সুবিধার পিছনে অকাতরে খরচ করে যান। নিজের ভবিষ্যতের কথা মোটেই ভাবেন না। ভবিষ্যতের সব ভাবনা ঈশ্বরের অমোঘ বিধানের উপর ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্তভাবে জীবন যাপন করে যান। তাঁকে দেখে মনে হয় ঠিক যেন গীতায় বর্ণিত গৃহী কর্ম-সন্ন্যাসী। কর্মফলে অনাশ্রিত, সংকল্পে সম্পূর্ণ অসংন্যস্ত।

গঙ্গাবাবুর পেশা ব্যবসা হলেও ধর্মই তাঁর নেশা। জীবন ও জীবিকার দুস্তর ব্যবধানটিকে এক নিবিড় ধর্মভাবের সেতুবন্ধনীর দ্বারা স্বচ্ছন্দে পূরণ করে দিয়েছেন যেন তিনি। সাধু সন্ন্যাসীদের প্রতি তাঁর কৌতূহল অপরিসীম। কাজের ফাঁকে ফাঁকে ও অবসর সময়ে ধর্মগ্রন্থ পাঠ ও ধর্মবিষয়ে আলোচনা করতে তিনি ভালবাসেন।

সম্প্রতি গঙ্গাবাবু বাবা লোকনাথের অলৌকিক লীলা-মাহাত্ম্য ও যোগসিদ্ধির কথা বইয়ে পড়ে ও লোকমুখে শুনে লোকনাথবাবার একনিষ্ঠ

ভক্ত হয়ে ওঠেন।

১৯৯১ সালে গঙ্গাবাবুর এক ভাগিনী-জামাই শিশির দুরারোগ্য জল-উদরী রোগে আক্রান্ত হয়। প্রথমে সাধারণ পেটের রোগ ভেবে কিছু চিকিৎসা করানো হয়। কিন্তু রোগের কোন উপশম না হওয়ায় বড় ডাক্তার দেখানো হয়। ফলে আসল রোগ ধরা পড়ে। ডাক্তারেরা বলেন সিরোসিস অফ লিভার, চলতি কথায় যাকে বলা হয় জল-উদরী। পেটে জল জমে। অপারেশন করতে হবে।

শিশির অফিসে চাকরি করে। সংসারে স্ত্রী ও তিনটি ছেলেমেয়ে। চোখে অন্ধকার দেখতে লাগল শিশির। আকাশ ভেঙ্গে পড়ল যেন মাথায়। সংসার চালিয়ে এই কঠিন রোগের চিকিৎসার এত বড় ব্যয়ভার কি করে বহন করবে সে ?

গঙ্গাবাবু ভাগনি ও ভাগিনজামাইকে অভয় দিয়ে নিজের বাসায় সাদরে নিয়ে এলেন। প্রথমে অপারেশন করানো হলো। কিন্তু রোগ সারল না। আবার জল জমতে লাগল পেটে। ডাক্তারেরা পরামর্শ দিলেন, আমেরিকা থেকে এক মেশিন এনে পেটে ফিট করে দিতে হবে জল জমা বন্ধ করার জন্য।

অবশেষে কুড়ি হাজার টাকা খরচ করে গঙ্গাবাবু ও তাঁর ভাগনেদের তৎপরতায় সেই মেশিন আনানো হলো। পেটে সেই মেশিন বসানো হলো। দুচার দিন ভাল রইল শিশির। কিন্তু আবার সেই অবস্থা।

এদিকে রোগীর দেহ ক্ষীণ হয়ে যেতে লাগল দিনে দিনে। কিছু খেতে পারে না। রোগী অতিশয় দুর্বল ও উত্থানশক্তিরহিত। ডাক্তারেরা বললেন, এ অবস্থায় আবার অপারেশান করা সম্ভব নয়। রোগীকে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দিলেন তাঁরা নিরাশ হয়ে। রোগীর জীবনের আর কোন আশা নেই। যে কয়দিন থাকে, বাড়ীতেই থাকুক—এই ভেবে বাড়িতে আনা আনা হলো শিশিরকে। রোগী মৃতপ্রায়। আবিল ও আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল তার চেতনা। বিছানায় মিশে যাওয়া শিশির তার নিকট আত্মীয় বন্ধুদের দেখে চিনতে পারে না। যে কোন সময়ে রোগীর জীবনের ক্ষীণতম দীপশিখাটি নির্বাপিত হয়ে যাবে ভেবে শোকে দুঃখে মুহ্যমান হয়ে উঠল বাড়ির সকলে।

চূড়ান্ত বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা একে একে সব প্রয়োগ করেও যখন বিফল হতে হলো, তখন ধর্মপ্রাণ গঙ্গাবাবু ভাবলেন, একমাত্র দৈব ছাড়া আর কোন উপায় নেই। তিনি তখন লোকনাথবাবাকে ভক্তিভরে স্মরণ করে ডাকতে লাগলেন আকুলভাবে। কিন্তু তিনি তাঁর এই ভক্তিবিশ্বাস ও দৈব নির্ভরতা বাড়ির অন্য সকলের মধ্যে সঞ্চারিত করতে পারলেন না। কারণ বাবার প্রতি বা দৈবশক্তির উপর তাদের কোন আস্থা নেই।

এমত অবস্থায় রোগীর পক্ষ থেকে একাই গঙ্গাবাবু সকাতর প্রার্থনা জানাতে লাগলেন লোকনাথবাবার চরণে। বাবার একখানি ছবি একসময় তিনি সকলের অলক্ষ্যে অগোচরে শিশিরের বিছানায় বালিশের তলায় রেখে দিলেন। বাবার উদ্দেশে প্রণাম নিবেদন করে তিনি মনে মনে বলতে লাগলেন, হে করুণাময় বাবা, তুমি দয়া করে শিশিরকে বাঁচিয়ে দাও। তার অবর্তমানে তার স্ত্রী ও ছেলেমেয়েরা অনাথ হবে। তুমি বলতে, মানুষ প্রারব্ধের ফলেই ব্যাধিগ্রস্ত হয়। আবার প্রারব্ধ ক্ষয় হলে ব্যাধিমুক্ত হয়। শিশিরের প্রারব্ধ যদি ক্ষয় না হয়ে থাকে, তাহলেও তাকে এ জন্মের মত বাঁচিয়ে দাও, তাকে রোগমুক্ত করো। পরজন্মে যদি তাকে সে প্রারব্ধ ভোগ করতে হয় ত হবে। তুমি ত এর আগে কতজনকে কত দুরারোগ্য ব্যাধি হতে মুক্ত করেছ। প্রয়োজন বোধে কত দুরারোগ্য ব্যাধি নিজের দিব্যদেহে গ্রহণ করেছ। তোমার একবার কৃপা হলেই তার মধ্য দিয়ে তোমার অলৌকিক লীলাবিভূতি ও এক আশ্চর্য অধ্যাত্মশক্তি নেমে এসে ক্রিয়া করবে আর তাতেই রোগমুক্ত হবে রোগী, বিপন্ন শরণাগত হবে বিপন্মুক্ত।

ধর্মপ্রাণ নিরাসক্তচিত্ত ও পরম ভক্ত গঙ্গানারায়ণের প্রার্থনার ডাকে সাড়া না দিয়ে পারলেন না ভক্ত ও শরণাগতবৎসল বাবা লোকনাথ।

কিন্তু তিনি নিজে কিছু করলেন না। কোথা হতে এক মুসলমান পীরবাবাকে জুটিয়ে দিলেন। সেই পীরবাবা এসে দৈব ওষুধ দিতেই তাতে আশ্চর্যভাবে কাজ হলো। ধীরে ধীরে রোগমুক্ত হয়ে উঠল শিশির। কিছু-দিনের মধ্যেই সে সুস্থ ও সবল হয়ে উঠল।

বাবা লোকনাথের এ এক অভিনব লীলা। অতীতে আর একবার তিনি এইভাবে এক রোগিণীকে রোগমুক্ত করেন। তিনি রোগিণীকে স্বপ্নে আদেশ দেন, তোমাদের বাড়ির অদূরে যে এক বৃদ্ধা মুসলমান মহিলা

আছেন, তাঁকে গিয়ে বল। তিনি তোমার রোগ সারিয়ে দেবেন।

রোগিনী সেই মুসলমান মহিলাকে একথা বলতে তিনি তাঁর পীর সাহেবের অনুমতি নিয়ে দৈব ওষুধ দেন। আর তাতেই তার রোগ সেরে যায়।

এই ঘটনার দ্বারা দুটি শিক্ষা লাভ করা যায়। প্রথমতঃ রোগী যদি অভক্ত হয় তাহলে তার পক্ষ থেকে কোন ভক্ত বাবার কাছে প্রার্থনা জানালেও তাঁর করুণার উদ্রেক হয় এবং লীলাবিভূতি ঝরে পড়ে। দ্বিতীয়তঃ বাবা এই শিক্ষা দিলেন যে, হিন্দু মুসলমান একই পরম পিতা ঈশ্বরের সন্তান। সুতরাং কোন ভেদজ্ঞান বা গোঁড়ামি থাকা উচিত নয় কারো মধ্যে। সব ভেদজ্ঞান মন থেকে ঝেড়ে ফেলে কোন হিন্দু যদি কোন মুসলমান সাধক বা যোগীর শরণাপন্ন হয়, তাহলেও তার দ্বারা তার মঙ্গল হয়।

স্বর্গীয় হরিলাল দাসের নিবাস ঢাকার বাংলা বাজারে ৬২ নং হেমেন্দ্র-দাস রোডে। তিনি যেমন খুবই ধার্মিক প্রকৃতির ও নীতিবাদী ব্যক্তি ছিলেন, তেমনি স্ত্রী রাধারানী দাসও ছিলেন ধর্মপরায়ণা মহিলা।

১৩২৫ সালে তিনি ফরিদপুর জেলার গোবিন্দপুর গ্রামের প্রিয়নাথ গোস্বামীর কাছে দীক্ষা গ্রহণ করেন। সর্বদা গুরুর ধ্যান ও গুরুমন্ত্র জপ করেও মনে শান্তি পেতেন না হরিলালবাবু।

তাঁর মনে শুধু একটাই দুঃখ ছিল, তাঁর পাঁচটি কন্যাসন্তান। একটিও পুত্রসন্তান হয়নি। ঠাকুরের কাছে সর্বদা অন্তরের আকুল প্রার্থনা জানাতেন পুত্রলাভের জন্য।

একবার তীর্থভ্রমণে বার হয়ে শ্রীধাম বৃন্দাবনে গিয়ে অষ্টধাতুর এক গোপালমূর্তি বাড়ি নিয়ে আসেন। কিন্তু সে মূর্তি আসনে প্রতিষ্ঠা করলেন না। সংকল্প করলেন, তাঁর মনের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হলে সে মূর্তি প্রতিষ্ঠা করবেন।

কিন্তু আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ না হওয়ায় তিনি কি মনে হতে ঢাকা থেকে কলকাতায় কালীঘাটে এসে অন্তরের প্রবল আকুতি নিয়ে কালীমায়ের কাছে প্রার্থনা জানালেন। পুত্রলাভের জন্য পুজো দেবার মানত করলেন।

অবশেষে তাঁর প্রার্থনা পূরণ করলেন দেবী। ১৩৪৬ সালের ১লা

পৌষ তারিখে হরিলালবাবুর একটি পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করলো। পুত্র-মুখ দেখলেন, কিন্তু পুত্রকে কোলে না নিয়ে আগে কালীঘাটে ছুটে গিয়ে মানতের পুজো দিয়ে দেবীর আশীর্বাদী ফুল নিয়ে এসে তবে পুত্রকে কোলে নিলেন।

কালীর সাধনা করে পুত্রলাভ করেন বলে পুত্রের নাম রাখলেন কালী-সাধন। পরে চন্দ্রনাথ তীর্থ দর্শনের পর দ্বিতীয় পুত্রের জন্ম হয় বলে তার নাম রাখেন চন্দ্রশেখর। সাধন ভজনের মাধ্যমে দুই ছেলে পান বলে ছেলেদুটির ডাকনাম রাখলেন সাধন ভজন।

গুরু প্রণাম, সূর্য প্রণাম, তুলসী প্রণাম, আচমন প্রভৃতি ছিল হরিলাল দাস মশায়ের নিত্যকর্ম। সংসারে থেকেও কোনদিন সংসারে আসক্ত হননি হরিলাল। অকৃত্রিম গুরুভক্তি, গুরুনিষ্ঠা, নিয়মিত ধ্যান, জপ, তপ প্রভৃতির দ্বারা সিদ্ধিলাভ করে ১৩৫৮ সালের ৯ই ফাল্গুন তারিখে শিবরাত্রির দিন সন্ধ্যা ৮টায় সাধনোচিত ধামে গমন করেন পুণ্যাত্মা গৃহী-সাধক হরিলাল। জ্যেষ্ঠপুত্র কালীসাধনের বয়স তখন মাত্র বারো। স্ত্রী রাধারাণী স্বামীর যোগ্য সহধর্মিনীরূপে স্বামীর নির্দেশিত ধর্ম ও নীতি অনুসারে সংসার চালাতে লাগলেন।

বালক কালীসাধন এই বয়সেই কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করলেন। এমন সময় তিনি তাঁর এক নিকট আত্মীয়ের কাছে শুনতে পেলেন পরম করুণাময় বাবা লোকনাথের নাম। এই নাম শুনে অন্তরের টানে ভক্তিপূর্ণ চিত্তে বারদীর পুণ্যভূমি দর্শন করতে গেলেন। সেই থেকে সদা সর্বদা বাবার নাম গান ও ধ্যান জপ করে যেতে লাগলেন।

অবশেষে বালকের ভক্তি ও নিষ্ঠা দেখে তাঁর প্রতি প্রসন্ন হলেন বাবা লোকনাথ। তাঁর কাজ কারবারের উন্নতি হতে লাগল। এইভাবে কালী-সাধন ও তাঁর পরিবারের সকলেই বাবার কৃপালাভে কৃতার্থ ও ধন্য হলেন। লোকনাথের চরণই তাঁদের একমাত্র আশা ভরসা হয়ে উঠল। এই সময় সংসারের সব দায়িত্ব পুত্রদের হাতে দিয়ে ১৩৮৪ সালে ৮ই চৈত্র তারিখে লোকনাথবাবার নাম করতে করতে সজ্ঞানে দেহত্যাগ করে নিত্যধামে গমন করলেন রাধারাণী।

এরপর হাওড়া লোকনাথ মঠ ও মিশনের প্রতিষ্ঠাতা ও লোকনাথ ভক্ত

জগতে সর্বজনশ্রদ্ধেয় শ্রীনিত্যগোপাল সাহার সঙ্গে দেখা করেন কালীসাধন। নিত্যগোপাল সাহা শুধু লোকনাথবাবার পরম ভক্ত ছিলেন না। লোকনাথের মাহাত্ম্য ও মহিমা প্রচারই ছিল তাঁর জীবনের একমাত্র ব্রত। বয়োপ্রবীণ এই ভক্তসাধক লোকনাথ ভক্তমণ্ডলীতে দাদু নামে পরিচিত ছিলেন।

নিত্যগোপালবাবু কালীসাধনকে সস্নেহে বললেন, হরিলাল দাস ও রাধারাণী দাসের নাম চিরস্মরণীয় করে রাখার জন্য একটা স্থায়ী কিছু করে যান। আজ ঠাকুরের যে যে কৃপালাভে আপনারা ধন্য হয়েছেন, তা শুধু আপনাদের অর্জিত কর্মফলের জন্য নয়, আপনাদের পিতামাতার পুণ্যকর্মের ফলও তাতে রয়েছে।

এই উপদেশ সর্বান্তঃকরণে মেনে নিলেন ধর্মপ্রাণ ও নীতিনিষ্ঠ কালীসাধন। তিনি পিতামাতার নাম চিরস্মরণীয় করে রাখার জন্য ১৯৮৯ সালে ১৮ই নভেম্বর তারিখে তেঘড়িয়ায় শ্রীশ্রী লোকনাথ মন্দিরের ভিত্তিস্থাপন করেন। ভিত্তিফলক স্থাপন করলেন লোকনাথগত প্রাণ শ্রদ্ধেয় দাদু নিত্য-গোপাল সাহা মশাই। সেই বছরেই অক্ষয় তৃতীয়ার দিন মন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটন হলো।

এই মন্দিরের সঙ্গে হরিলাল দাস ও রাধারাণী দাসের নাম যুক্ত করে একটি সোসাইটি বা সংস্থা প্রতিষ্ঠা করা হলো। নাম দেওয়া হলো জয়বাবা লোকনাথ সোসাইটি অফ হরিলাল দাস এণ্ড রাধারাণী দাস।

এক বিরাট সুপ্রশস্ত জায়গার উপর প্রতিষ্ঠিত অতি সুন্দর এই মন্দিরের সমগ্র পরিবেশটি ভক্তিভাবোদ্দীপক। সোসাইটির কর্তৃপক্ষ অতি সুশৃংখলভাবে মন্দিরের যাবতীয় কার্যাবলী পরিচালনা করে চলেছেন। মন্দির রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত কর্মীবৃন্দকে দেখে মনে হয়, তাঁরা যেন কর্তব্যের খাতিরে কর্তব্য পালন করছেন না, তাঁরা সকলেই বাবা লোক-নাথের প্রতি ভক্তিভাবে উদ্দীপিত। প্রতিদিন দুইবেলা কলকাতা ও দূর-দূরান্তের বিভিন্ন অঞ্চল হতে সমাগত অসংখ্য লোকনাথভক্ত নরনারী মন্দির ও মন্দিরের গর্ভগৃহে প্রতিষ্ঠিত বাবা লোকনাথের শ্বেতমর্মরপ্রস্তর-নির্মিত বিগ্রহমূর্তিটিকে দর্শন করে ভক্তিবিগলিত চিত্তে এক দিব্য আনন্দ লাভ করছেন।

মন্দির কর্তৃপক্ষ লোকনাথের নামমাহাত্ম্য প্রচারযজ্ঞে এমন অনলস

অক্লান্তভাবে এবং অবিচ্ছিন্ন তৎপরতার সঙ্গে কাজ করে চলেছেন যা দেখে বিস্মিত হতে হয় এবং যা সত্যই প্রশংসনীয়।

ওঁ

১৩২১ সালের ১২ই মাঘ তারিখে মহাতীর্থ কালীঘাটের ভগ্ন কালী-মন্দিরে একজন শিষ্যসহ এক মহাপুরুষ এসে উপস্থিত হলেন। তপ্ত-কাঞ্চনের মত দেহ। আজানুলম্বিত বাহুযুগল। মুণ্ডিত মস্তক। তাঁর যে সিদ্ধ দেহটিকে দেখে মনে হচ্ছিল তা ব্রহ্মজ্ঞানবিচ্ছুরিত এক দিব্য জ্যোতির দ্বারা উদ্ভাসিত।

পশ্চিমবঙ্গের কালিয়াবেন্দানিবাসী ক্ষিতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য ছিলেন সুপ্রসিদ্ধ শাক্তসাধক স্বর্গীয় মধুসূদন ভট্টাচার্য আগমবাগীশের পুত্র। কালীঘাটে এক যোগসিদ্ধ মহাপুরুষ এসেছেন শুনে ক্ষিতীশ ঠাকুর তাঁকে দর্শন করার জন্য কালীঘাটে এসে উপস্থিত হলেন। তাঁকে দেখেই একজন মহাপুরুষ ভেবে তাঁর পরিচয় জিজ্ঞাসা করলেন।

তখন সেই মহাপুরুষ বললেন, আমি ব্রাহ্মণ। বয়স একশো পঁচাত্তর বছরের অধিক হয়েছে। তোমাদের দেশে সব ভোগী, যোগীর অভাব। কিন্তু আমাদের একজন যোগসিদ্ধ মহাপুরুষ ঢাকা অঞ্চলের কোন স্থানে জীবনের শেষভাগ যাপন করে অনেক অলৌকিক লীলা করে গেছেন।

ক্ষিতীশ ঠাকুর বুঝতে পারলেন, তিনি লোকনাথ ব্রহ্মচারী। সে কথা বলতেই মহাপুরুষ বললেন, লোকনাথ ও আমি এক গুরুর শিষ্য। লোকনাথ অষ্টাঙ্গযোগে সিদ্ধি ও ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেছিলেন। লোকনাথ আমার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পরও যখনি তাকে স্মরণ করেছি তিনি আমাকে দর্শন দিয়েছেন। হিমালয়ের উত্তর খণ্ডে আমার আশ্রম আছে।

মহাপুরুষের এই কথা হতে বোঝা যায়, ইনিই সেই বেণীমাধব যিনি ছিলেন বাবা লোকনাথের অভিন্নহৃদয় বাল্যবন্ধু এবং যাঁর সঙ্গে তিনি গুরু ভগবান গাঙ্গুলীর নেতৃত্বে সন্ন্যাস অবলম্বন করে গৃহত্যাগ করেন।

বেণীমাধব ব্রহ্মচারী নিজেকে গোপন রাখতে ভালবাসতেন। তিনি

১১৩৭ সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং জীবনের শেষভাগ ঢাকা জেলার অন্তর্গত ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে লাঙ্গলবন্দের আশ্রমে অতিবাহিত করে ১৩৩৭ সালে পূর্ণ দুশো বছর বয়সে স্ব-ইচ্ছায় সজ্ঞানে দেহত্যাগ করেন।

ওঁ

সর্বজ্ঞ বাবা লোকনাথ তাঁর অনন্ত জ্ঞানের দৃষ্টি নিয়ে দেখেছিলেন, তিনি নিত্য, তাঁর বিনাশ নেই। তাঁর পাঞ্চভৌতিক শরীর দেহপাতের সঙ্গে সঙ্গে মিলিয়ে যাবে পঞ্চমহাভূতের সঙ্গে। কিন্তু তিনি সূক্ষ্মদেহে বিরাট, ব্যাপক ও শাশ্বত হয়ে বিশ্বময় বিরাজ করবেন। একদিন তাঁর স্থূলশরীরকে কেন্দ্র করে যে সব লীলাবিভূতি ঝরে পরত অজস্র ত্রিতাপজ্বালাগ্রস্ত জীবনে, আজ তাঁর সূক্ষ্মশরীরকে কেন্দ্র করেও তেমনি অজস্র লীলাবিভূতি ঝরে পড়ছে নিত্য নূতনভাবে। আজ তাঁর নিত্যলীলা অন্তঃসলিলা পতিতপাবনী ফল্গুধারার মত অবিরাম প্রবাহিত হয়ে চলেছে অসংখ্য ভক্ত ও শরণাগতের জীবনে। কিন্তু সাধারণ দেহাভিমানী মানুষ মন বুদ্ধির অতীত সেই সূক্ষ্মশরীরের স্বরূপটিকে উপলব্ধি করতে পারে না। শুধু যে সব ভক্ত ও শরণাগত বাবাকে স্মরণ করে বিপদ থেকে উদ্ধার পান, তাঁরাই তা উপলব্ধি করতে পারেন।

ফল্গু সলিলের স্পর্শসুখ উপভোগ করতে হলে যেমন তার উপরের বালুকারাশিকে অপসারণ করতে হয়, তেমনি বাবা লোকনাথের নিত্য লীলামৃতের আস্বাদন করতে হলে জ্ঞানভক্তির দ্বারা দেহাভিমানী স্থূলভাবটিকে দূরে সরিয়ে ফেলতে হয়।

ভক্তবৎসল ভক্তাধীন বাবা লোকনাথ আজও ভক্তবাঞ্ছা-কল্পতরুরূপে তাঁর ভক্তদের সঙ্গে সঙ্গে সর্বদাই বিচরণ করছেন। আগের মতই তিনি আজও তাঁর অধ্যাত্মসম্পদের অক্ষয় অনন্ত ভাণ্ডার থেকে অকাতর হস্তে ধন বিতরণ করে চলেছেন। পরমপুরুষ লোকনাথ ব্রহ্মচারীবাবার মহিমা অপার, লীলা অনন্ত, করুণা অনন্ত ও জ্ঞান অনন্ত।

॥ সমাপ্ত ॥